

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMGK 2007	Place of Publication <i>কলিকতা</i>
Collection KLMGK	Publisher <i>কলিকতা</i>
Title <i>সংস্করণ</i>	Size 5"x8" 12.70x20.32 cm.
Vol. & Number	Year of Publication <i>জানু-৬১, ১২৭০</i>
	Condition: <input checked="" type="checkbox"/> Brittle / <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor <i>সঞ্জিব কুমার গুপ্তা</i>	Remarks :

C D Roll No. KLMGK

বঙ্গদর্শন।

প্রথম খণ্ড।

(১২৭৯ অব্দের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
সম্পাদিত।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ হস্তে শ্রীকৃষ্ণমোহন বসু
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৩।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

গবেষণা কেন্দ্র

১৮/৩ম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯



বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

১ম খণ্ড।

১লা বৈশাখ ১২৭২।

১ সংখ্যা।

পত্র সূচনা।

ক'থারা বাঙ্গালা ভাষার এষ বা সান-
দিক পত্র প্রচারে অহত্ব হইলেন, তাঁহা-
দিগের দিশের হুহুট। তাঁহারা বস্তু
কল্প না কেন, বেশী কৃতবিদ্যা সম্ভার
এই উদ্ভাবিতের রচনা পাঠে বিহু।
ইংরাজিগ্রির কৃতবিদ্যাগণের আর হির-
জান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য
কিই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে
পায় না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা
ভাষায় লেখক হইতেই হইত বিদ্যাব্র-
হ্মণ, লিপিকৌশল-পূনা; নহত ইং-
রাজিগ্রির অহুদিক। তাঁহাদের বিশ্বাস
যে, তাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ
না, তাহা হইত অপাঠ্য, নহত কোন
ইংরাজিগ্রির দ্বারা হইত; ইংরাজিতে

বাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালার প-
ড়িয়া আশ্বাসনবার এতদ্ব্যকন কি?
সমস্ত কালো চামড়ার অপরাধে ধরা
পড়িয়া আশ্বা নানা রূপ সাফাইয়ের
চেতায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া
কবুলজবার কেন দিব?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সং-
কল্প পাণ্ডিত্যভিনাদিগের "ভাষায়" এ
রূপ প্রভা উদ্বিগ্নে বিশিরাহসার অ-
বশ্যকতা নাই। বাহারা "বিদ্যার বোক-
তা"দিগের শব্দে সকল ভাষাই সমান
কোন ভাষার বহি পড়িয়ার তাঁহাদের
অবকাশ নাই। ছেলে কুলে দিয়াছেন, এ
পড়া আর নিমন্ত্রণ বাহারা তার ছেলে
উপর। অতঃপর বাঙ্গালা এতদ্ব্যকন

দর্শন।

(সমালোচন।)

১ম খণ্ড।

১ সংখ্যা।

ভাষায় বাহা
ইংরাজিগ্রির
পড়িয়া আশ্বা
সমস্ত কালো
চামড়ার অপরাধে
ধরা পড়িয়া
আশ্বা নানা
রূপ সাফাইয়ের
চেতায় বেড়াইতেছি
বাঙ্গালা পড়িয়া
কবুলজবার কেন
দিব?
ইংরাজি ভক্তদিগের
এই রূপ। সংকল্প
পাণ্ডিত্যভিনাদিগের
"ভাষায়" এ রূপ
প্রভা উদ্বিগ্নে
বিশিরাহসার অবশ্যকতা
নাই। বাহারা
"বিদ্যার বোকতা"
দিগের শব্দে সকল
ভাষাই সমান কোন
ভাষার বহি পড়িয়ার
তাঁহাদের অবকাশ
নাই। ছেলে কুলে
দিয়াছেন, এ পড়া
আর নিমন্ত্রণ
বাহারা তার ছেলে
উপর। অতঃপর
বাঙ্গালা এতদ্ব্যকন

কর পয় ও রসায়ন হইয়া উঠিলে। ফলস্বরূপে সন্নিবিষ্ট কালের প্রকারকারি সাধনাদি বিশেষ বিধিবার সময়ে এই প্রকার উপায় গ্রহণ করিবে।

যে হাঙ্গাই হইল, আমাদিগের দেশেও এই রূপের বিদ্যা প্রচলিত হইতে পারে। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। কিন্তু এখনকার দিনেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

যে, একজন আমাদিগের দেশেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

যে, একজন আমাদিগের দেশেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

যে, একজন আমাদিগের দেশেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

যে, একজন আমাদিগের দেশেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

যে, একজন আমাদিগের দেশেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত। অতীত কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তবে কোন কালেও এইরূপ কার্য করা হইত। তাহা হইলে সাধারণভাবে অসমর্থেরও শিক্ষা হইত।

ধর্ম-বাজকদিগের পার্থক্য হেতু, অকালে সমাজোন্নতি লোণ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণের যে রূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের যুগিয়ার বর্ণনা করা-নে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। ছাত্রাও ক্রমে শিক্ষা, এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। অশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বঙ্গালি উচ্চাদিগের মর্থ বুঝিতে পারে না, উচ্চাদিগের চিনিতে পারে না। উচ্চাদিগের সংজ্ঞাও আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জ্ঞান থাকে, যে সাধারণ বাঙ্গালি তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নচে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে অশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবর্ত করিলাম। কিন্তু রচনা কালে অশিক্ষিত বাঙ্গালি ভাষা ব্যবহার করার

একটা বিশেষ বিয় আছে। অশিক্ষিত বাঙ্গালি পড়ে না। অশিক্ষিতে বাঙ্গালি পড়িলে না, তাহা অশিক্ষিতে লিখিলে চাহে না।

‘আপরিভাষ্যাদি’ না লিখা মনে প্রয়োজন।

আমরা সকলেই স্বাধীনতাধারী। যে যথার্থ বাস্তব হইলে অশিক্ষিতের মুখে। অল্পে সদস্য বিচার ক্ষমতা হইবে; তাহাদের নিকট যথার্থ হইবে তাহাতে লিপ্য-পরিচ্ছেদের পার্থক্য নহে। অশিক্ষিতেরা অশিক্ষিতেরা লিখিত ব্যক্তি লিখিলে না।

একিঞ্চি-কোন অশিক্ষিত বাঙ্গালি যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ‘বঙ্গদর্শন’ বাঙ্গালি—বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালি পুনঃ পুনঃ হইত। কেন? তিনি উত্তর করতঃ, “কোন বাঙ্গালি এমত বা পুণ্য আদর করি? পাঠ্য রচনা পাইলে তাহা পড়ি।” আমরা যুক্তিতে দাবী করি, যে একবার উত্তর নাই। যে কখন বাঙ্গালা রচনা পাঠ্য রচনা ও তাহা ছই তিন দিনের মধ্যে পড়ি।

এই রূপ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি। অশিক্ষিত বাঙ্গালির অনাদর ভিত্তিতে। অশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালি রচনা যথার্থ বলিয়া অশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালি রচনা পাঠ্য রচনা পাইলে বিমুখ। অশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালি পাঠ্য রচনা পাইলে বিমুখ। অশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালি রচনা

আমরা এই পত্রকে স্থাপিত হইয়া
আমরা পত্রোপযোগী কার্যে ব্রত করি-
বার, এই বার পত্রের শাস্তি। ব-
সন্ত সন্তোষ কনকভাষি। এই আশা
গে। প্রথম উল্লেখ
এই পত্রের প্রথম কৃতবিদ্যা
আমাদের কল্যাণে। আরও এই কামনা
করিলান যে, তাঁহারা ইহাকে
পিনাতিগর বরষাবৎ স্বরূপ ব্যবহার
করেন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহা-
দের বিশেষ কল্যাণে। লিপি কোশ-
পত্রের প্রকাশের পরিচয় দিক।
দিগের উক্ত বহন করিয়া, ইহা
কানের প্রচার করুক। প্রত্যেক
পত্র বাঙ্গালী বিবেচনা করেন-
বৈষ্ণবের প্রভু হইয়া অতীত আছে
অতীত জগৎকে এই পত্রের
উদ্দেশ্য। পিনাতিগে কোন বিচার,
নিষ্পত্তি রচনা, পত্রোপযোগী হইলে
দ্বিতীয় প্রথম করুক। এই প্রথম, কোন
পত্রের সর্বজন জন্য বা কোন
পত্রের বিশেষ সম্বল সাধনার্থে নাট
ক। বিবাদিগের মনোরঞ্জন
এই পত্রের বিবেচনা
না। যাঁহারা আপাসর সাধ-
না পত্রোপযোগী নাহেন সেনা-
নি করিলেন, ইহাতে এই পত্র সর্ব-
পাতা করুক। আমাদিগের বিশেষ
পত্র। বাঙ্গালী সাধারণের উচিত
ইহা হইতে সাধারণ উচিত সিদ্ধ
হইতে পারে না। ইহা বলিয়াছি। যদি
ই পত্রের দ্বারা সাধারণের মনে
সর্বজন না করতান।

আকাশ রূপ কার্য বিবেচনা।
অত্রকে বিবেচনা করেন যে, বাঙ্গালীর
পত্রোপযোগী আভি সারন কথা ভিন্ন
সাধারণের সৌখিনতা বা পাত্র-
এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যা-
হারা বিখ্যাত প্রভু কল্যাণ, তাঁহাদি-
গের রচনা। প্রথম কল্যাণ, বাহ-
শিক্ষিত ব্যক্তিগের পত্রোপযোগী মতে, তাহা
কল্যাণে পড়িতে না। তাহা উত্তম, তাহা
সকল পড়িতে চাহে; যে না বুঝিত
পারে, যে বুঝিতে বরং করে। এই
সকল সাধারণের শিক্ষার উপ-
আমরা যত্ন করি।
কল্যাণ, বাহ্যিক মতে, সাধারণের
বৃত্তি। আপনান সাধারণের সন্তোষ
সাধিত হয়, আমরা তাঁহার সাধনা-
মতে অনুমোদন করি। আরও অনেক
কাজ করি বলিয়া করি। কিন্তু যত
গতকৃত বর্ষ না। পত্রকারী সাংকে-
রই পত্রের কথা সত্য। বাঙ্গালী সাম-
য়িক পত্রের পক্ষে লিখিব। আমরা
এই পত্রের সাধারণের একটা সন্তোষ
সাধনার্থে স্বরূপ হইব না, এমন বলি
না। আমাদিগের পত্রকারী এইরূপ
এক বার স্বাক্ষর করিয়া, কল্যাণ
সকল পত্রের হইয়াছেন। আমাদিগের অ-
ন্য পত্রের সন্তোষ সাধি। তাহা বৃত্তি
পারি না। যদি তাহাই হয়, তাহাও
আমরা কতি বিবেচনা করিব না। এ
জনকে কিছুই নিশ্চয় নহে। এক দানি
সাধিক পত্রের কল্যাণ কল্যাণে নিশ্চয়
হইতে না। যে সাধারণের বাল, তাহা
দানি সাধিক উগতি সিদ্ধ হইয়া থাকে,
সকল পত্রের জন্য, কল্যাণ, এত

তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য
কল্যাণ পত্রেরও জন্য, অলম্ব্য সামান্য
জিক নিয়মাধীন, মৃত্যু যে নিয়মাধীন,
জীবনের পরিমাণ যে অলম্ব্য, নিয়মের
ধীন। কল্যাণেতে এ সকল জলবুদ্ধ
মোজ। এই বঙ্গদর্শন কার্যক্রমে নিয়মা-

ধীন জলবুদ্ধ স্বরূপ ভাসিল; নিয়ম
বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লক্ষ্য
আমরা প্রতিপাদ্য বা হাস্যাস্পদ হই-
না। ইহার জন্য কল্যাণই নিশ্চয় হই-
না। এ সংসারে জলবুদ্ধও নিদারুণ
নিশ্চয় নহে।

ভারত-কলঙ্ক।

ভারতবর্ষের পূর্ব সৌভেব লইয়া আ-
মরা অনেক স্পষ্ট করি। বাস্তবিক, স্পষ্ট
করিবার বিষয় অনেক আছে। এক্ষণে ই-
উত্তরাণীয় জাতিগণেরও প্রাচীন ভারত-
বর্ষীয়দিগের পাণ্ডিত্য, শিল্প সাহিত্যবি-
জ্ঞানদর্শনাদিতে ব্যাপ্তি স্বীকার করেন।
কিন্তু আমরা কখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়-
দিগের রণনৈপুণ্য লইয়া পোহব করি না।
এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের চিরকলঙ্ক।
ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া কল্যাণ-
কালে স্মৃণাত নহেন। এই জন্য, তাঁহারা
বাহুবলপূর্ণ ভিন্ন জাতিয়দিগের কাছে
সকলদূর ঘৃণিত। সাহেবেরা আধুনিক
সিপাহীদিগকে যুদ্ধে কিছু দূর পট্ট বলিয়া
স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু সে পট্ট
তাঁহাদিগের অল্প শিক্ষা ও বিজ্ঞানী মুক্ত
প্রবীণের গুণেই হইয়াছে বলিয়া থাকেন।
ভারতবর্ষীয়েরা, এক্ষণে বাহ্যিক শক্তি,
কোন কালে যে যুদ্ধে অনায়া ইতিহাস-
কীর্তিত জাতির সমকক্ষ ছিলেন না, এমন
আমরা সহসা স্বীকার করি না, এবং
পূর্বকালিক ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবী-
মুখে রণশুশ্রী জাতিগণের অগ্রগণ্য
হইতে পারিতেন, ইহা সর্বজন করিতে
আমরা অন্তত আজি।

আমরা স্বীকার করি, যে এই পক্ষ সম-
র্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে
পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই
কেবল পুরাতন অবলম্বন করিয়া কল্যাণ
করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা
জাতিয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা
পনাদিগের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া
থানেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়
রাজ্যের পুরাতন ভারতবর্ষীয়দিগের
প্রাচীন কীর্তি ছিল, তাহাও লোপ
হইয়াছে। এই প্রথম "পূর্ব" বলিয়া
খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাতন
কিছুই নাই। বাহা কিছু আছে তাহা
অনৈসর্গিক এবং অভিমাত্র। উপন্যাস
এরূপ আশ্রম, যে প্রকৃত ঘটনা কি,
কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।
যে বাহ্যিক হউক, ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ব
কালে যুদ্ধনিপুণ কি হীনবল ছিলেন, তাহা
দ্বিগ্ন বিশ্ব করিবার জন্য ইতিহাস-
প্রমাণ এক্ষণে অতি বিরল। ভাগ্যক্রমে
ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের দ্বারা
হই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের
যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
প্রথম, বাহ্যিকীয় আলেকজান্ডার বা স-
কল্যাণে খাড়া করিয়া ভারতবর্ষে

[illegible]

৪. সশ্রদ্ধা ১৫০৭ আশ্রয় ও তুর-
অধিকার পরিচালনা মন্ত্রণালয়।

১১৪১। সুদূরপাল্লার জাহাজবন্দীদিগের
 সাহায্যও রক্ষণার্থেওর একইদল করিয়াছে।
 মুসলিমদিগের বিদ্রোহ বর্ণনা হইলে, তাহারা
 এইরূপ পুনরায় নিদ্রিত করিয়াছে যে, আ-
 সিয়া একদমে এইরূপ রূপান্তরিত দ্বিতীয়
 জাতি হইবার মধ্যে নাই। এবং নিম্ন-
 গণ্যরূপেই যেহেতু যুনাঈদীরা হা-
 দিয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্মৃতি জাতি বলা
 গিয়াছে। আদমি জাহাজবন্দীদিগের নগ-
 নকল্য সর্বত্রই সচি কাহারও সংশয় নাই।
 তবে তিনি মুসলিমদিগের বিদ্রোহের স্বাভা-
 বিক যুনাঈদীদিগের এখ পাঠ করিবেন।
 জাহাজবন্দী সর্বত্রই প্রচলিত। পরাজয়
 গণের নিত্যই যেহেতু পরাজী। এই জন্য
 সর্বত্রই নানা জাতি আসিয়া উত্তর
 পশ্চিমের পাল্লিকা দ্বারা প্রবেশ নাভপূর্বক
 কারজন্য সাধিকারের মধ্যে পাইয়াছে।
 পারস্যক, বোনা, বাস্কিক, শা, দেন
 কান্দা, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং
 সিন্ধু পারে না ততক্ষণ উত্তর স্থাপ্য প্রদেশ
 কিছু দিলের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে
 বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর
 পর্বাৎ, ইরানের সকল জাতিতেই সচি
 বিদ্রোহ দ্রুতকৃত হইয়া আক্রমণের রক
 করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বহনত-এক
 প্রবল জাতি মাদেইদী অক্লান্তবলসী
 হইয়া এককালে যে স্বতন্ত্রতা পূর্ণা করি-
 য়াছে, একথা আন বোনা জাতি বুঝি
 নাই, এবং যখন ছিল কি না মদেই
 জাতি নীচকাল পর্য্যন্ত যে বিদ্রোহের
 মুক্তি অক্ষর হইয়াছিল, তাহারিগের বা-
 মদেই ইচ্ছার কারণ, মদেই নাই। অন-
 কার্যের দ্বারা যোগ না।

এই সকল অমায়িক মন্তব্যে মর্মস্পর্শ

যায় যে, হিন্দুত্ব চিরকাল রণে অপারণ।
অদ্রদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই
চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিহাস দাঁই :-আপ-
নার গুণগান, আপনি নী পারিলে কে
পায় ? লোকের ধর্ম এই যে, আপ-
নাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে,
কেহ তাকে সাক্ষ্যের সম্মত গণ্য করে
না। কোন জাতির পুথ্যটি কেবল প্রপ-
জ্ঞাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে ? রো-
মকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রো-
মক লিখিত ইতিহাস। মুসলিমদিগের
যোদ্ধাদের পরিচয়—মুসলিম লোকের
লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহা রণে
কুশলী, ইহাও কেবল মুসলমানের লেখা-
তেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতে-
ছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গো-
রব নাই—কেননা যে কাল হিন্দু সাক্ষী
নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পর-
রাজ্যাপাহারী, প্রায় ভারতবর্ষে বণিত
বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হ-
ইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষার দ্বা-
সে সন্মত হইয়া, পর রাজ্য লাভের কথ-
ন শুনিয়া, পরে নাই, তাহার কখনই বীর-
গৌরব লাভ করে নাই। নায়-শ্রিংশ এবং
বীর-গৌরব একাধারে সূচরাজ ঘটে না।
অদ্যাপিও এ দেশীয় ভাষায়, “ভাল মা-
নুষ্য” শব্দের অর্থ ভীরুত্বভাবে লোক
—অর্থ—“হরি নিতাশ ভাল মানুষ্য”
অর্থ—হরি নিতাশ অপদার্থ।

হিন্দু রাজগণ যে একেবারে পুর-
রাজ্যে লোভ শূন্য ছিলেন, এমন আমরা
বলি না। তাঁহারা পত্রস্পর্শকে আক্রমণ

করিতে, কখন জাতি, করতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিমুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র মণ্ডল বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষে এতদূশ শব্দ তৎপ্রদেশে যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ, তাহারা বাহিরের জায়ে যাইবার রাসনা করিতেন না;—যে হিমুরাজ্য কাম্বিনাকালে মোগ্রা ভাষ্য রাজ্যভুক্ত করিতে, পাঠান নাই। প্রতীয়ত, হিমুরা যখন স্বেচ্ছা এইভিত্তি পূর্বদ্বারভাগী জাতিগণকে বিশেষ করিতেন না, তাহাদিগের উত্তর প্রদেশ করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এ সম্ভাবনা নহে; বরং তৎক্ষণাতঃ করিলে আপন জাতি-ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা সম্ভাবনা। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর হিমুরাজ্য ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়কাঙ্ক্ষা যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর হিমুরাজ্য অধিকাংশ পূর্বকালে হিমুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এই কলঙ্কের তুচ্ছ
কারণ—হিন্দুরা হিন্দুই হইতে পরাধীন
যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহা হইতে
আবার বীর-গৌরব কি? কিন্তু এক্ষণে
হিন্দুদিগের বীর্য-লাব্ধি প্রাচীন হি
ন্দুদিগের অবসমানতার উপযুক্ত কারণ না
প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, তা
হীন এবং আর্থিক সৌখিন্যে মধ্যোচ্চ
পণ্ডা দাম্পত্য অধিক নহে। ইটালি
গ্রীস, ভারতবর্ষের নাসার এই কথাটির
স্বরূপ স্থল। মধ্য-কালিক ইটালি, গ্রী
স বর্তমান গ্রীসের চরিত্র হইতে প্রা
চীন হইতে য়ুনানীদিগের কাপুরুষ

জ। আবার ধর্মভেদে, আর্থিক দমনশাস্ত্রে
অচেষ্টা-পন্থা, সর্বত্র বিদ্যমান।
বৈদিক, কি, বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম,
কোনই এই নিষেধে ভ্রূরই সঙ্গুনাপরি-
বেশেই হইতে দেখিত সাংঘাতিক ধর্ম-
ভেদ উপস্থিত; তদুপকারে নয় বা ভোগ-
বিভিই দেখিত; নিদ্রা-বাহ্য পুণ্য। বৌদ্ধ
ধর্ম সার, — বিস্মা-ই মুক্তির পৌরাণিক
ধর্ম দর্শন ভগবদগীতা। তাহার সার
এই যে, সকল কর্মই বুঝা, কর্মহীনই
সে একপা নিঃকর্ম-ধর্ম-বীকিত জাতি,
যাহার সাধা স্বাভাবিক অহুরাগী হইবে
না?

একদে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দু
জাতি যদি চিরকাল স্বাভাবিক হত্যার,
নৃ-ধনবিলয়ের পুণ্যে সাক্ষ্য সহস্র বৎ-
সর তাহার কেন ব্রহ্ম করিয়া পুনঃ ধর্ম-
জাতিবিষয় পুঙ্খ ন্যাসীনতা। সাক্ষ্য
প্রমাণিত? পরজাতিগণ সহজে কখন
যুদ্ধ হয় নাই, অনেক কষ্টেই হয়। ধর্ম-
ভেদে-স্বপ্নেই প্রতি আশ্রয় নী, সে
ধর্মের জন্য হিন্দু সমাজ কেন এত কষ্ট
কর করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দু সমাজ যে কখন শক বোনা
সম্প্রতিভিক বিদ্যাকরণ জন্য বিবেচনা
করান হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কো-
থায়? তা হিন্দু রাজগণ আপনার রাজ্য-
সমিতি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন,
সিদ্ধিগণের সংগ্রহীত বোনা যুদ্ধ করিত;
যে পারিত শত্রুবিষয় করিত, তাহাতেই
সেই আত্মরক্ষা করিত; তন্নিমিত্ত
সেই রাজগণ দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা
হইতে দিব না? বলিয়া সাধারণ জনগণ
সে উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়া

ছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং
তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়।
যখনই সমরলক্ষ্যের কোপদৃষ্টি প্রকাশিত
হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি যখন হত
হইয়াছেন, তখনই হিন্দু সেনাপতির রণে উদ্ধৃত
সিদ্ধি পলায়ন করিয়াছে, প্রাণ যুদ্ধে সম-
কর্তে হয় নাই। কেননা আর্য্যের জন্য পরজা-
তি যুদ্ধ করিতে? যখনই রাজ্য নিধন প্রাপ্ত, বা
অন্য কারণে রাজ্য রক্ষণ নিষেধেই হয়।
জেন, তখনই হিন্দু রাজ্য সমাধি হইয়াছে।
আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাভাবিক
পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সম-
সাজ হইতে অধিকৃত রাজ্য রক্ষার কোন
উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপক্ষে
যখন বা যুগান্ত, শক বা খালিক, কোন
প্রদেশে যখন রাজ্যের রণে পরাজিত
করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, আ-
জগণ তখনই তাহাকে পুঙ্খপ্রভুর ভূত্যা
সমাদর করিয়াছে, রাজ্যগণরূপে কোন
আপত্তি করে নাই। ভিন্ন সম্রাট বংশের
আর্য্য কাল ধরিয়া, আর্সের সঙ্গে আর্থ্য
জাতীয়, আর্থ্য জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন
জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জা-
তীয়; — যগধের সঙ্গে কান্যকুবজ, কান্য-
কুবজের সঙ্গে দ্বীপী, দ্বীপীর সঙ্গে লাক্ষার,
হিন্দুর সঙ্গে পাণ্ডি, পাণ্ডাদের সঙ্গে মো-
গল, মোগলের সঙ্গে ইংরাজ, — সকলের
সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত
সমরালে দেশ হত্ন করিয়াছে। কিন্তু
সে সকল কেবল রাজ্যের যুদ্ধ; সাধারণ
হিন্দু সমাজ কখন কাহারও হইয়া কার্যে
সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দু রাজগণ
অথবা হিন্দুস্বানের রাজগণ, ভূমোভূয়
ভিন্ন জাতি কর্তৃক হত্ন হইয়াছে, কিন্তু

যখন হিন্দু সমাজ যে কখন কোন পর-
জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত
বাহিতে পারে না; কেননা সাধারণ
সমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে
করে নাই।
এই তর্কে হিন্দু জাতির দীর্ঘকালগত
স্বাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আশিয়া পূ-
বে য়ে কারণ, — হিন্দু সমাজের অটন-
সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব,
স্বাধীনতার অভাব, অথবা অন্য
কোন কারণেই হইবে। আমরা সবিস্তারে তাহা
বিস্তারিত হইবে।
যদি হিন্দু, তুমি হিন্দু, আমি হিন্দু, যত্ন
আমিও লক্ষ্য হিন্দু আছে। এই লক্ষ্য
হিন্দুস্বানেরই বাহাতে মঙ্গল, তা-
হা আমাদের সমাজ। সাধারণ তাহা-
মঙ্গল নাই, আমরাও তাহাতে মঙ্গল
অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল বাজেই
যা, তাহাই আমার কর্তব্য।
কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা
আমাদের অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ
কোন এই রূপ অকর্তব্য, তোমা-
দের এই রূপ উদ্ধৃত, যত্নও তর্জণ
কর্তব্য। এই তর্কে, সকল হিন্দুর যদি
এক রূপ কর্তব্য হইবে, তবে সকল হিন্দুর
কর্তব্য যে এক জাতি, এক সভাবলী,
সমাজ-সমিতি হইয়া কার্য করে। এই
জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অ-
ন্য ভাগ।
হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অ-
জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল সা-
ধারণ আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে।
অনেক স্থানে তাহাদের সঙ্গে আমাদের
সমাজ। যেখানে তাহাদের মঙ্গল আ-

মাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহা আমাদের
বাহ্য হইতে না হয়, আমরা তাহাই
ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে
করিব। অপিত, যেমন তাহাদের
আমাদের অমঙ্গল ঘটতে পারে
নি আমাদের মঙ্গল। তাহাদের
হইতে পারে। হয় ইউরোপীয়
আমরা জাতিগণের মঙ্গল সাধনে
ইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধনে
আমরা মঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও
জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ
দেখা যাইতেছে যে, এই রূপ
রাজ্য নিষ্পাপ, পরজাতি ভাব বিল-
কার করা হইতে পারে না। ইহা
তর দোষাবহ বিকার আছে। সেই
রে, জাতিসাধারণের একপা, আর্থ্য
যে, পরজাতির মঙ্গল মাঝেই
অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল বাজেই
যা, তাহাই আমার কর্তব্য।
কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা
আমাদের অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ
কোন এই রূপ অকর্তব্য, তোমা-
দের এই রূপ উদ্ধৃত, যত্নও তর্জণ
কর্তব্য। এই তর্কে, সকল হিন্দুর যদি
এক রূপ কর্তব্য হইবে, তবে সকল হিন্দুর
কর্তব্য যে এক জাতি, এক সভাবলী,
সমাজ-সমিতি হইয়া কার্য করে। এই
জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অ-
ন্য ভাগ।
হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অ-
জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল সা-
ধারণ আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে।
অনেক স্থানে তাহাদের সঙ্গে আমাদের
সমাজ। যেখানে তাহাদের মঙ্গল আ-

ভাবে তথায় অনেক বিষয়-রাজ্যবিশ্ব
পাতিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক
কাল ভুজু হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে
বিশ্ব-প্রতাপশালী স্ত্রুতন জর্জেন সাঁসা
স্থাপিত হইয়াছে ও আরও কি হইল বলা
যায় না।

এমত, বলি' না যে, ভারতবর্ষে এই
প্রতি প্রতিষ্ঠা কমিন্ কালে ছিল না।
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন
যে, আর্ঘ্য জাতিদেরা চিরকাল ভারতবর্ষ-
মাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে
সাম্রাজ্য আদেশ অধিকার করিয়াছিল।
প্রথম আর্ঘ্য জয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি
হইয়া, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈ-
দিক কাল কহে। বৈদিক কালে এবং
তাহার অব্যবহিত পরেই জাতি প্রতিষ্ঠা
হইয়া আর্ঘ্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবৎ
ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক
মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক
সমাজ-নিয়ন্ত্রাঙ্গাঙ্গেরা যে রূপে সমাজ
বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের
পরিচয় স্থল ৪ আর্ঘ্য কর্ণ এবং শূদ্রে যে
ইহা বৈলক্ষণ্য বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও
সমাজের ফল। কিন্তু ক্রমে আর্ঘ্যবংশ বিস্তৃত
হইয়া পড়িলে আর সে জাতি প্রতিষ্ঠা র-
হিল না। আর্ঘ্যবংশীদের বিস্তৃত ভারতব-
র্ষ-সম্রাজ্য আদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে
একত্ব খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভা-
রতবর্ষে এক্ষণে বহুসংখ্যক খণ্ডসমাজ
চিহ্নিত হইল। সমাজ ভেদ, ভাষার ভেদ,
নাচার ব্যবহারের ভেদ, নানাবিধ ভেদ, শেষে
সামাজিক পরিণত হইল। বাহ্যিক হই-
ত পৌণ্ড পণ্ডিত, কাম্যার হইতে চোলা ও
পাণ্ড পণ্ডিত সমস্ত ভারত-জুনি সঙ্কীর্ণ

সমাজল মধুতরুর নায় নানা জাতি, নানা
সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিপূর্ণের, ক-
পিলবস্তুর রাজসম্রাজ্য, শাক্য সিংহের
হস্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে,
অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম-ভেদ জ-
ন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য,
ভিন্ন ধর্ম; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায়
থাকে? সাধারণতঃ স্মৃতিসম্মত ভারত-
বর্ষেরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার
যবনের আগিল। যবন দিগের বংশধর
হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্মির উপর
সাগরোর্মিবৎ হুতন হুতন যবন সাম্র-
জ্য, পাশ্চাত্য পশ্চিম পীর হইতে আসি-
তে লাগিল। দর্শনীয় লোক সমুদ্রে
রাজ্যরূপকার লোভে বা রাজপীড়ায়
যবন হইতে লাগিল। স্মৃতিসম্মত ভারত-
বর্ষবাসিগণ যবন হিন্দু মিশ্রিত হইল।
হিন্দু মুসলমান, যোগল পাঠ্য রাজপুত
মহারাত্রি, একত্র কর্ম করিতে লাগিল।
তখন জাতির এক্য কোথায়? এক্য-
জ্ঞান কিদে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি বাস-
স্থানে প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের
প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি
বাহ্যলী পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী মহারাষ্ট্রী,
রাজপুত জাতি হিন্দু, মুসলমান, ইহার
মধ্যে কে কতকাল সঙ্গ একতায়ুক্ত হইবে?
ধর্মগত, একা থাকিলে, বংশগত একা
নাই, বংশগত একা থাকিলে ভাষাগত
একা নাই, ভাষাগত একা থাকিলে, নি-
বাসগত একা নাই। রাজপুত জাতি, এক
ধর্মকলঙ্ক হইলে, ভিন্ন বংশীয় 'বলিয়
ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালী বৈহারী, এক বংশীয়
হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; এবং 'বলিয়

নানোঁ একতাবী হইলে; নিবাসভেদে
ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারত-
বর্ষের এমনই অদ্ভুত, যেখানে কোন
দেশীয় লোক সর্বদাশে এক; বাহাদের
এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ,
ইহাদের মধ্যেও জাতির একতা-জ্ঞান
ই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালি জাতির
একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীক
জাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বি-
শেষ কারণ আছে। বহু কাল পর্যন্ত বহু
প্রকার ভিন্ন জাতি এক বহুত্ব সাধারণ-
জ হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হ-
ইতে থাকে। ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জল-
মিশ্র যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে,
আর তদ্রূপে ভেদজ্ঞান করা যায় না।
সম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের নাই
রূপ ঘটে। তাহাদিগের পাঠ্যকা বায়,
অত এক জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্য
মিশ্রিত জাতিগণের এই রূপ দর্শন ঘটি-
য়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটয়াছে।
জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারত-
বর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে।
লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দু সমাজ
এক কোন জাতীয়-কার্য সমাধা হয়
না। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জা-
তিই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদের
সমাজ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। এই
নাই স্বাভাবিক কারণ হিন্দু সমাজ
কখন তর্জনির বিবেকপও করে নাই।
ইতিহাস-কীর্তিত কাল মধ্যে কেবল
ইহার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতি-
ষ্ঠা অনেক হইয়াছিল। এক বার, হিন্দু
ঐ শিবজী এই সম্রাজ্য পাঠ করিয়া-
ছিলেন। তাহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র

জাগ্রিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্র
মহারাষ্ট্রীয়ে জাতীভাব হইল। এই অ-
শ্রদ্ধা মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ণ যোগ
সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রী কর্তৃক সংস্রাপি
হইল। চিরজীবী যবন হিন্দু কর্তৃক বিজি-
ত হইল। সমুদ্রীয় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রে
পদাবনত হইল। অদ্যাপিও মোহাউ
ইংরাজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভা-
কিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐঙ্গজালিক রণভি-
সিংহ; ইঙ্গজাল খালসা। জাতীয় বন্ধ
দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশের
কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শত
পারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরাজ
কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐঙ্গজালি-
গণ। পটুতর ঐঙ্গজালিক লালোহি-
হস্তে খালসা ইঙ্গজাল জাঙ্গিল। কিং
রামনগর এবং ঢিলিয়ানওয়ালা ইতিহাস
লেখা রহিল।

যদি কদাচিত কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি
প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটয়াছিল
তবে সমুদ্র ভারত এক জাতীয় বন্ধ
বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত? ইংরাজ
ভারতবর্ষের পরমোপকারী
ইংরাজের ধর্ম ভারতবর্ষ কখন শোষিত
পারিবে না। ইংরাজ বাঙ্গালি বন্ধ
হইলে, রেইলওয়ে বসাইতেছে, টেলিগ্রাফ
খাটাইতেছে, শাস্ত্রবিদ্যা করিতেছে, সর্বা
প্রচার ও স্ববিচার বিস্তর করিতেছে, কিন্তু
এ সকলের জন্য বলি না। ইংরাজ আ-
মাদিগকে হুতন কথা শিখাইতেছে
বাঁধা আমরা কখন জ্ঞানিতাম না, তাহা
জ্ঞানাইতেছে; বাহা কখন দেখি নাই
শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে

স্বপ্নের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, মাগকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। মাঠে মাঠে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা ঘুঘর, লইয়া কৃষকঃ মহিষীরা, রূপার মাঝি, নাকছাঁচি, পিতলের পৈছে, ছুই মাসের মদলা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনির্মিত সায়ের বর্গ, রূক্ষ কোষ, লইয়া বাজার গাইতেছেন। তাহার মধ্যে কোন দেবী মাতার বামা মাখিয়া মাভা দিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঁকাইতেছেন, কেহ কোন অস্থিটুকি, অব্যক্তনাসী, গুণ্ডি বাসিনীরা সঙ্গে উদ্দেশে কান্দল দিতেছেন, কেহ কচি কাগড় আছড়া তেছেন। কোন কোন তরুণীসের মাঠে ফুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, মগমবস্ত্রকারী শ্রিতপ্তা করিতেছেন—যুবতীরা কোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চোঁচাইতে-ছ, কাদা মাখিতেছে, প্রজ্ঞার ফুল বুড়াইতেছে, সীতারু দিতেছে, সকলের গায়ে ল দিতেছে, কখন কখন শ্যানে মগা দিতনান কোন গৃহিণীর সম্মুখ শ্রদ্ধা পুষ্প লইয়া পলাইতেছে। আক্রান্তেরা নিরাশ ডাল সাহসের মত উপন মনে গঙ্গার স্তব পাড়িতেছেন, জা করিতেছেন, এক একবার আত্মীয়া মজ্জিতা কোন যুবতীর প্রান্তি অলসভাবে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে দাদা মেঘ : স্রোত তপ্ত হইয়া ছুটিতে-ছে, তাহার নীচে রূক্ষবন্যে পাখী ডিঙিতেছে, মারিকেলগাছে টাল বসিয়া, জমজীর মত চারি দিক দেখিতেছে, ছোর কিসে ছেঁ মারিবে। বক ছোট

লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাঙ্করসকল লোক ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হারিয়ারা নৌকা হটর হটর করিয়া বাইতেছে,—আপনার এয়োজন। ফেরা নৌকা গজেন্দ্র গমনে বাইতেছে,—পরের এয়োজন। বোকাই নৌকা বাইতেছে না,—তাহারের এজুর এয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম ছুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশ মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কাহ হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিপদ হইল। নগেন্দ্র নাথিক দিগন্তে আঁজা করিলেন, “নৌকাটি কিনারায় বাঁপিও” রহমত মোজা মাফি তখন নোমাজ করিতেছিল, কখন উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাফিগিরি করে নাই—তাহার নানার হুঁহ মাফির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ষে মাফিগিরি উদ্দেশ্য হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধ-তাৎপার হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নুন, নোমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল “ভয় কি ছদ্ম্বর। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন।” রহমত মোজার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা গাফি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা না-নিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয় রহমত মোজার সঙ্গে দেখা-তার কিছু বিবাস্ত ছিল, বড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। বড় আগে আসিল। বড় ফণেক কাগ লাগপালায় সঙ্গে সময়ক

করিয়া সহোদর রক্তিকে ডাকিয়া আনিল। তখন ছুই ভাই বড় মাতামাতি-স্বারস্ত করিল। ভাই রক্তি ভাই বড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। ছুই ভাই গা-ছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাজে, লতা কেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর-জল উড়ায়, নানা উৎসাহ করে। এক ভাই রহমত মোজার উপি-উড়ায়। লইয়া গেল, আর এক ছুই তাহার দাড়িতে প্রজবনের স্বজন কাঁপিল। মাল্লারা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সানী ফেলিয়া দিলেন। ছুতারা নৌকাসহা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে বড়ের ভয়ে নামিলে, নাবিকেরা কাশ্মুখ মনে করিলেন—না নামিলে স্বর্ঘ্য-রুখীরা কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কে কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তাহাতেই বা ক্ষতি কি?’ ক্ষতি কি আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতে-ছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোজা স্বয়ং বলিল যে “হজুর? পুরাতন কাছি কিনিল কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ডাল হইত।” স্বতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়, নদীতীরে বড় রক্তিতে-বা-ডান কাহার সাধ্য নহে। বিশেষ সঙ্কট হইল, বড় পামিল না, স্বতরাং আশ্রয়-হুমকানে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্তী, নগেন্দ্র পদ-ব্রজে কর্মমগ্ন পথে চলিলেন। রক্তি পামিল, বড়ও অপমান রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘ-পরিপূর্ণ; স্বতরাং রাজে

আবার বড় রক্তির সন্ধান। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না। আকাশের মেঘাঘড়ের কারণ, প্রাতি প্রদোষ কালেই ঘনাক্ত তমোময়ী হইল। গ্রাম, গ্রহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবলমাত্র, বনকিণী সকল সহস্র সহস্র “খদোভামালা-পরিমণ্ডিত হইয়া চীরক-খচিত কুর্মি স্বকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গজেন্দ্র বিরত শ্বেত-কুণ্ডল দেখামালার মধ্যে প্র-স্বদীপ্তি সৌধামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিত ছিল—স্ত্রীলোকের কোথ একবারের ছাত্র প্রাপ্ত-হয় না। কেবলমাত্র নব-বারি-মানব-অমূল্য ভেকেরা উৎসব করিতে ছিল, বিজয়ীর মনোযোগ পূর্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যা-অশ্রান্তব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনো-যোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দে মধ্যে রক্ষাও হইতে রক্ষপত্রের উপ-বর্ষাবশিষ্ট বারিবিম্বর পতনশব্দ, রক্ষ-তলহ বর্ষাজলে পড়চাত ললবিম্বর-শব্দ, পথিখ অনিঃসৃত জলে শূণ্যের পদসঞ্চার শব্দ, কদাচিৎ রক্ষাক্রুর পক্ষী-আহ পক্ষের জল বাচনার্থ পক্ষ-বিন-শব্দ। মধ্যে মধ্যে, শমিতপ্রায় বায়ু-কণিক গর্জন, তৎসঙ্গে রক্ষপড়চাত বা-রিবিন্দ্র সকলের এককালীন পতন-শব্দ ফলে নগেন্দ্র-হরে একটা আলো দেখিলে জানিল। জলপ্লাবিত ভূমি অভিক্রম করিয়া, রক্ষচূড়-বারি কর্তৃক সিজ হইয়া রক্ষতলহ শূণ্যের ভীতি-বিধান করিয়া নগেন্দ্র সেই আলোবাভিমুখে চলিলেন। বহু কটে আলোক সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন এক ইটক নির্মি-

প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আকস্মিক নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেঞ্জের হত্যাকাণ্ডে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্বাণ।

গৃহস্থী নিভাত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ লক্ষণ কিছুই নাই। একোই সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সামান্য-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক বিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি সমাধারিত। একটীমাত্র কণ্ঠে আলো জ্বলিতেছে। সেই কক্ষমধ্যে নগেঞ্জ প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্য-বসনোপযোগী দুই একটা সূক্ষ্মদ্রব্য আছে। কিন্তু সে মনুষ্য সান্নিধ্যই দারিদ্র্য-চিহ্ন। দুই একটা হাড়ি—একটা ভাঙ্গা নান—তিন চারি খানি তৈজস—ইহাই কনকহার। দেওয়ালে কালি, কোণে ল ; চারি দিক আরম্ভলা, মাকড়সা, কুটিকি, ইমুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন বাগি এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া ছিলেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার স্ত্রিমূর্তি উপস্থিত। চক্ষু স্নান, নিশ্বাস শ্বাস, ওঠ কপিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত টুক খণ্ডের উপর একটা ক্ষুণ্ণ প্রাণী, হাতে তৈলাভারি ; শয্যোপরিস্থিত নন্দিতও তাই। আর শয্যাপার্শ্বে আরও এক প্রাণী ছিল, এক অনিদ্দিত-গৌর-কৃষ্ণ-জ্যোতির্ধর-রূপিশী বালিকা। তৈলহীন প্রাণীপের জ্যোতিঃ অপ্রাণের নয়। হুটক, অথবা গৃহবাসী দুই জন

আশুভাবী বিরহের চিন্তায় অগাত্যতর বিমন্য-ধাক্কির কার্যেই হউক, নগেঞ্জের প্রবেশ কালে, কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেঞ্জ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা এই বহুলোক-পূর্ণ লোকান্তরে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সঙ্গ ছিল, লোকজন দাস দাসী সহায় যৌথৈব সর্বছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার রূপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সন্ন্যাসমাগত মিত্রানীর পীড়নকে পুঞ্জকন্যার দুঃখও ল, ছিঁদ্রানীর ক্ষুণ্ণ-পাশবৎ দিন দিন স্নান দেখিয়া, অত্রোই গৃহিণী নদী-দৈকত শয়াম-শয়ন করিলেন। আর সকল তারিগুণ্ডিনও সেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নি-বিল। এক বৎসরের পুঞ্জ, মাতার চক্ষের নদী, পিতার বাক্কীর তরঙ্গ, সেও পিতৃ সমক্ষে চিত্তারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই যৌবন-ননোমোহিনী বালিকা সেই বিজন বন-বেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের এক মাত্র উপায়। কন্দ-নন্দিনী, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কন্দ পিতার অন্ধের প্রতি, এই সংসার বন্ধনের এখন একমাত্র প্রতি; রক্ত আর্গধরিত্য তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। “আর কিছু দিন বাস, কন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব ? কি লইয়া থাকিব ?” বিবাহের কথা মনে হইলে, ব্রজ এই রূপে ভারিতে। একথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়বে

সে দিন কন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ? আজি অকস্মাৎ যমদূত আগিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কন্দনন্দিনী কানি কোথায় দাঁড়াইবে ? এই গভীর, অনিবার্য যন্ত্রণা, মুহুর্ত প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিদ্যায় মুদিতোন্মুখধনেনে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে ঐশ্বর্যময়ী শ্রুতির ন্যায় সেই জ্যোতঃশব্দী বালিকা স্থিরমুখে যত্নমেবাহ্ম পিতৃমুখ প্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কানি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখ প্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে রক্তের বাক্যকৃতি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল, ব্যাধিত আশ্রয় বাধা হইতে নিষ্কৃতি গাইল। সেই নিতৃত কক্ষ, স্তিমিত প্রাণীপে; কন্দ নন্দিনী একাকিনী, পিতার মৃত দেহ কোড়ে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিশ্বাস বন্দাক্ষরী; বাহিরে এখনও বিম্ব বিম্ব রক্ত পড়িতেছিল, রক্তপথে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কণাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নন্দিনীমুখ চঞ্চল ক্ষণ প্রাণীপালোকা, কণে কণে শব্দ মুখে পড়িয়া আবার কণে কণে অক্ষর-বৎ হইতেছিল। সে প্রাণীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রাণীপ বিলিয়া গেল।

তখন নগেঞ্জ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ দ্বার হইতে অস্পষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
ছাত্রী পূর্বগামিনী।

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহমধ্যে কন্দ-নন্দিনী ও তাহার পিতার শব্দ! কন্দ ডাকিল, “বাবা।” কেহ উত্তর দিল না। কন্দ এক বার মনে করিল পিতা যুগ্ম-লেন, আবার মনে করিল, বুকি যুগ্ম—কন্দ সে কথা স্পষ্ট মনে আনিতে পারিল না। শেষে, কন্দ আর ডাকিতে পারিল না, ভারিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজন হস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিত-তাহায়া শয়ন ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব্দ পড়িয়া ছিল, সেই স্থানে বায়ু বহমান করিতে লাগিল। নিশ্বাসি শেষে স্থির করিল, কেননা মরিলে কন্দের দর্শন কি হইবে ? নিশ্বাস রক্ত জাগরণে এবং এককণ্ঠ ক্লেশ বালিকার তন্ত্র আসিল। কন্দনন্দিনী রাতি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিতেছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কন্দনন্দিনী তাহা হস্তে হস্তে সেই অনার্য কঠিন শীতল হর্ম্যতেল আপন মৃগানন্দিত বাতৃপরি মন্তক রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কন্দনন্দিনী সুপ্ত দেখিল। ঐখিল যেন রাজি অতি পরিষ্কার জ্যোতঃস্বায়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই ভায়ব নীল আকাশ মণ্ডলে যেন হুচ্চর মণ্ডলের বিদ্য হইয়াছে। এত বড় চক্ষু ওল কন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীর্ঘ অস্তিত্ব ভায়ব, অথচ নয়ন-স্নিক্কর কিশি সেই রমণীয় একাধ চক্ষুসম মণ্ডলে চক্ষু নাই; তৎপরবর্তে কন্দ হৃৎকর বর্ধিত এক অশ্রু জ্যোতির্ধর দৈবী দৃশ্য দেখিল। সেই জ্যোতির্ধর মূর্তি-সদৃশ

চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিভ্রাণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নিচে নামিতে ছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতল-রশ্মি-স্পর্শকৃত করিয়া, ক্রন্দনমণ্ডিনীর সমুদ্রের উপর আসিয়া। তখন ক্রন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-সমুদ্রাশোভিনী, আলোক-ময় ক্রিষ্ণ-কুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা মুক্তি স্রীকাকের আকৃতি। রমণীয় কারুণ্য পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে, মেঘ পরিপূর্ণ হাস্যে অধর স্পৃহিত হইতেছে। তখন ক্রন্দ সমুদ্রের সানন্দে চিনিলা, যে সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃত্যু-প্রভৃতির অবয়ব প্রাণ করিয়াছে। আলোকময়ী সমুদ্র-মানে ক্রন্দকে জুতল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া ফেড়ে লইলেন। এবং মাহুতীনা ক্রন্দ জুতল কাল পরে “মা” কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে ক্রোটির্মণ্ডল-মাহুতীনা ক্রন্দের মুখ চুখন করিয়া বলিলেন বাছা! তই বিস্তর দুঃখ পাইতেছি। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইনি। তোর এই বালিকা বয়স, এই লুক্কায়িত শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর পানেন থাকিস না। পৃথিবী ভাগ করিয়া আমার সঙ্গে আস।” ক্রন্দ যেন মুখে উত্তর করিল যে, “কোথায় যাব?” তখন ক্রন্দের জননী উদ্বেগে অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র-লোক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে “ঐ” সেই।” ক্রন্দ তখন যেন বহু দূরবর্তী, লাবিহীন অনন্তসাগরপারদ্বয়, অপ-প্রজ্ঞিত নক্ষত্র লোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, “আমি অত দূর বাইতে পারিব না; আমার বল নাই।” তখন ইহা শুনিয়া

জননীরা কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গভীর মুখ-মণ্ডলে ঐষৎ অনস্বাদ্য-জনিতবৎ জলুটী বিকাশ হইল, এবং তিনি যুগপতীরা স্মরে কহিলেন, “বাছা বাছা তোমার ইচ্ছা তাহা-কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্র-লোক প্রণতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য প্রণতি চাহিয়া।” অঙ্গুলি-দ্বারা এক বার তোমাকে দেখা দিয়া যখন তুমি মনঃ-পাড়াইয়া দূরবর্তী হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাদিবে, তখন আমি আবার আসিয়া দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলি সম্বন্ধে-তীতনয়নে, আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তুমি আমাকে দুইটা মনুষ্য মুক্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি গার তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিব-ধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।”

তখন ক্রোটির্ময়ী, অঙ্গুলি সম্বন্ধে তের দ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। ক্রন্দ তৎসম্বন্ধে তাহা স্মরে দেখিল, নীল গগন-পটে এক দেবনির্মিত পুরুষমুষ্টি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত-লজাট; সরল, সক্রমণ, কৃতাঙ্গ; তাহার মরালবৎ ঐষৎ, ঐষৎ বন্ধন গ্রীবা, এবং অন্যান্য মাহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমেই সে প্রতিমূর্তি জলদ্রুতদ্বয় গগনপটে বিলীন হইলো, জননী ক্রন্দকে কহিলেন, “ই-হার দেবকান্ত-রূপ দেখিয়া ভুলিও না।

ইনি মহাদায় হইলেও, প্রত্যাশার অমঙ্গ-লের কারণ। অতএব বিষয়র বোধে ই-হাকে ভাগ করিও।” পরে আলোকময়ী পুনশ্চ “ঐ দেখ” বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দেশ করিল, ক্রন্দ দ্বিতীয় মুষ্টি আ-কাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষ মুষ্টি নহে। ক্রন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণিনী, পদ্মপলশ-নয়নী, যুবতী দেখিল। তাকে দেখিয়াও ক্রন্দ ভীত হইল না। জননী কহিলেন, “এই শ্যামাঙ্গিনী নারী বেশে বসিয়া। ইহা-কে দেখিলে পলায়ন করিও।”

ইহা বলিতেই মহাসাআকাশ অন্ধকার-ময় হইল, রহস্তমণ্ডল আকাশে অন্ত-হীত হইল, এবং তৎসম্বন্ধে তৎসম্বন্ধ-মহা-শক্তি তেজোময়ীও অন্তহিত হইলেন। তখন ক্রন্দের নিশ্চিন্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।
এই সেই ।

নগেন্দ্র গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন। শুনিজেন গ্রামের নাম যুগময়পুর। তা-হার অর্ধেকের এবং অর্ধেকের গ্রামের কেহই আসিয়া মৃতের সংস্কারের আয়ো-জন করিতে লাগিল। এক জন প্রতি-বাসিনী ক্রন্দনমণ্ডিনীর, নিকটে রহিল। ক্রন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সংস্কারের জন্য লইয়া গেল, তখন তা-হার মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবি-রত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবাসিনী আপন-গ্রহ-কার্য্যে গেল। ক্রন্দনমণ্ডিনীর-সামুদ্রা-ন্থে আপন কন্যা চাঁপা-কে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা ক্রন্দের সমবয়স্ক এবং সঙ্গিনী।

চাঁপা আসিয়া ক্রন্দের সঙ্গে নানা কথা কহিয়া তাহার সামুদ্রা করিতে গিল। কিন্তু দেখিল যে ক্রন্দ কোন ক-শনিতেনে না, রোদন করিতেই মে-মধ্যেই প্রত্যাশা-পরাবৎ আকাশ-প-চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কোড প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, “এক শ-আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?” ক্রন্দ তখন কহিল, “আকাশ যে কাল মা আসিয়াছিল। তিনি ই-মাকে ডাকিলেন, ‘আমার সঙ্গে আস’ আমার কেমন ছন্দু হইল, আমি পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এ-ভাবিতেছি কেন গেলাম না। এখন অ-যদি তিনি আসেন তর্কে আমি যাই-তাই যনং আকাশ পানে চাহিয়া-খিতেছি।”

চাঁপা কহিল, “হাঁ! মরা মানুষ মা-আবার আসিয়া থাকে।”

তখন ক্রন্দ স্বপ্ন রজাঙ্গ সর্বল বলি-শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, “আকাশের-গায়ে যে পুরুষ আ-ক-মা-লুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চে-ক্রন্দ। “না, তাহাদের আর ক-দেখি নাই।” সেই পুরুষের মত ক্রন্দ পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন-রূপ-খন দেখি নাই।”

এ-দিকে নগেন্দ্র প্রভাতে প্রাতো-করিয়া গ্রামের সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞা-করিলেন, “এই মৃত ব্যক্তির কন্যা-হইবে? সে কোথায় থাকিবে? ত-কে-কে আছে?” ই-হাতে সকলেই উ-উ-হায় কেহ নাই। তখন নগেন্দ্র ক-

“তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ
উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয়
দ্বিবি। আর যত দিন সে তোমা-
র বাড়ীতে থাকিবে, তত দিন আমি
তার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মা-
কিছু টাকা দিব।”

নগেন্দ্র যাহা নগদ টাকা ফেলিয়া
ছিলেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার
যে স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে
সে চণ্ডিয়া গেলে কুম্ভকে বিদায় ক-
রিত, অথবা মাণ্যবৃত্তিতে নিযুক্ত
তাহাকে নগেন্দ্র সেরূপ মুচতার
করিলেন না। স্বতরাং নগদ টাকা
দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় স্বীকৃত
ল না।

৬খন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া
জন বলিল, “শ্যামবাজারে ইহার
মানসী বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ
তার মেসো। আপনি কলিকাতায় বাই-
ছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া
যা সেই খানে রাখিয়া আসেন, তবেই
কায়স্থ কন্যার উপায় হয় এবং আ-
নুগত্য স্বকায়স্থের কাজ করা হয়।”

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হই-
লেন। এবং কুম্ভকে এই কথা বলিবার
ন্যে, তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।
পা কুম্ভকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আ-
লেন।

আসিতে দুই হইতে নগেন্দ্রকে দে-
য়া, কুম্ভ অকস্মাৎ সজ্জিতের ন্যায় দাঁড়া-
ল। তাহার আর পা সরিল না। সে
সময়ে অক্ষয়লাচনে বিদ্যুত ন্যায় ন-
গেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।
চাঁপা কহিল, “ও কি দাঁড়াইল যে?”

কুম্ভ অজ্ঞ নিদর্শনের দ্বারা দেখা-
ইয়া কহিল, “এই সেই।”
চাঁপা কহিল, “ওই কে?” কুম্ভ কহিল,
“যাহাকে মা কালু রাজে আকাশের গায়ে
দেখাইয়াছিলেন।”

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা
হইয়া দাঁড়াইল। বালিকাদিগকে অগ্রসর
হইতে সঙ্কুচিত দেখা যা নগেন্দ্র তাহা-
দিগের নিকট আসিলেন এবং কুম্ভকে
সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুম্ভ কোন
উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিষম-
বিশ্রান্তত্বলাচনে নগেন্দ্রের প্রতি চা-
হিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক প্রকারের কথা।

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুম্ভকে কলিকা-
তায় আশ্রয়মভিযাহারে লইয়া আসি-
লেন। প্রথমে তাহার মাতৃবৃন্দ-প্রতির-
অনেক সন্মান করিলেন। শ্যামবাজারে
বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া
গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া
গেল—সে সখ্য অস্বীকার করিল। স্বত-
রাং কুম্ভ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরী ভগিনী ছি-
লেন। তিনি নগেন্দ্রের অম্মজা। তাঁহার
নাম কমলমণি। তাঁহার স্বপুত্রালয় কলি-
কাতায়। ক্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী।
ক্রীশ বাবু পুত্রের ক্ষেত্রালির বাড়ীর মৃত-
স্বহৃদ। হোস বড় ভাির—ক্রীশচন্দ্র বড়
ধনবান। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ
সম্প্রীতি। কুম্ভনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেই
খানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া
কুম্ভের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখা-
বয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। জাতা ভগিনী উভ-
য়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্য
গৌরবের সঙ্গেই বিদায় টপাতি ছিল।
নগেন্দ্রের পিতা, মিস্ত্রী গণিত নানী এক
জন শিক্ষাদাতী নিযুক্ত রাখিয়া কমল-
মণিকে এবং স্বয়ং কুম্ভকে বিশেষ যত্নে লেখা
পড়া শিক্ষাইয়াছিলেন। কমলের স্বপ্ন
বর্তমান। কিন্তু তিনি ক্রীশচন্দ্রের পৈতৃক
বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় ক-
মলই স্থগিণী।

নগেন্দ্র কুম্ভের পরিচয় দিয়া কহিলেন
“এখন তুমি ইহাকে নন্দ রাখিলে আর
রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন
বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লই-
য়া যাইব।”

কমল বড় ছুটি। নগেন্দ্র এই কথা ব-
লিয়া পিচাৎ ফিরিলেই কমল কুম্ভকে
কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়াইল। একটা
টবে ককটী অসিত তপ্ত জল ছিল, অ-
কস্মাৎ কুম্ভকে তাহার ভিতরে ফেলিল।
কুম্ভ নন্দীভূতা হইল। কমল তখন হা-
সিতেই মৃদু সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে
লইয়া স্বয়ং তাহার শাওঁ-স্নেহ করিতে
আরম্ভ করিলেন। এক জন পরিচারিকা
যথং কমলকে এই রূপ কাজে ব্যাপ্ত
দেখিয়া, তাড়াতাড়ি “ভাসি দিতেছি।”
বলিয়া দৌড়াইয়া আসি-
তেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটা-
ইয়া পরিচারিকার গায়ে দিল, পরিচা-
রিকা পলাইল।

কমল স্বপুত্র কুম্ভকে মার্কিত এবং
স্নাত করাইল—কুম্ভ শিশির-ধৌত পদ্ম-
বৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কম-

ল, তাহাঁকে অমল স্নেহে চারু বস্ত্র পর-
াইয়া, গন্ধউল সহিত তাহার কেশ সূচ-
করিয়া দিল। এবং কতকগুলি অ-
ক্ষার পরাইয়া দিয়া, কমল, “যা-এ-
দাদী বাবুকে এগাম বলিয়া।” অ-
দেখিস—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রে-
ম করে ফেলিস না—এ বাড়ীর বাবু দে-
লেই বিয়ে করে ফেলিবে।”

নগেন্দ্রনাথ, কুম্ভের সকল কথা স্বয়ং
কুম্ভকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষ
নামে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধু দূর দে-
বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও ক-
লেখার কালে কুম্ভনন্দিনীর উল্লেখ ক-
লেন,—যথা,—

“বল দেখি কোন বয়স্ক স্ত্রীলোক
ন্দরী? তুমি বলিবে ‘চল্লিশ পরে, কে-
না তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এ-
বৎসর হইয়াছে। কুম্ভ নামে যে, কন্যা
পরিচয় দিলাম—তাঁহার বয়স তের ব-
সর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যে এ
সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবনসম্বারে
অবাবহিত পুরস্কেই যেরূপ মাধুর্য্য এই
সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এ
কুম্ভের সরলতা চমৎকার। সে কিছু
বুঝে না। অজিও মস্তার বালকদিগের
সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবুর বারি
করিলেই ভীতা হইয়া, প্রতিবর্তী হয়।
কমল ভূতাহাকে লেখা পড়া শিক্ষাইতেছে।
কমল বলে, লেখা পড়ান তাহার নি-
বৃত্তি। কিন্তু অন্য কেমন কথাই বুঝে না।
বলিলে, হুহুং, নীল দুইটা চক্ষু—মু-
ছেইটা শরতের পঙ্কজের মত সর্বদা ই-
চ্ছা ভাসিছে—সেই দুইটা চক্ষু আ-
মার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া

কে; কিছু বলে না—আমি-সে চক্ষু দে-
তেই অনানন্দ হই, আর বুঝাইতে
রি না। তুমি আমার মল্লিহর্যোর এই
রিচর শুনিয়া হাসিকে বিশেষ তুমি বা-
গ্গের গুণে গাছ কম চুল পাখিহরিবাম্ব
রবার পরওয়ানা হামিল করিয়াছ; কিন্তু
দি তোমাকে সেই ছুটি চক্ষের সমুখে
দি করাইতে পারি, তবে তোমারও ম-
ল্লিহর্যোর পরিচয় পাই। চক্ষু ছুটি যে
রূপ, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে
পারিলাম না। তাহা ছুইবার এক রকম
খিলান মল্লিহর্যোর; আমার বোধ হয় যেন এ
খিলার সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সা-
ধী যেন তাল করিয়া দেখে না; অস্ত-
ক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নি-
স্ত আছে। রুদ্ধ যে নির্দোষ হৃদয়ী
হা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তা-
র বুঝাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রাণ-
ীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়,
যিনি হৃদয়ী কখন দেখি নাই। বোধ
হয় যেন কন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু
যাচ্ছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়;
যেন চক্ষুর কি পুষ্পমৌরভকে শরীরী
রিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে
তুলনা করিবার সামগ্রী ইহাও মনে হয়
না। অসুখা পদার্থ; তাহার সঙ্গী
পাঠ্যভাব-বান্ধি—যদি স্বল্প মনোবোধ শ-
চক্ষের করণ সম্পাতে যে ভাব-বান্ধি
তা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার
মুশ কতক অরুচি করিতে পারিবে।
তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।

নগেন্দ্র স্বর্ঘ্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর
আসিল। উত্তর এই রূপ;—
“দাদী শ্রীশ্রবণে কি অপরাধ করিয়াছে,
তাহা বুঝিতে পারিলাম না। থাকি-
তায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে
হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া
পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বি-
শেষ মনোনিবেশ; হুজুম পাইলেই ছুটিব।
একটা খালিকা কুড়াইয়া পথিয়া কি
আমাকে ভুলিয়ে দিবে? জিনিসের
কাঁচারই আদর। কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা
শশী লোকে তাল বাসে, নারিকেলের
ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি
কেবল কাঁচা মিটে? নহিলে খালিকাটি
পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?”

তামাসা স্বাক্ষর, তুমি কি মেয়েটিকে
একবারে স্বত্বভাগ করিয়া বিলাইয়া দি-
য়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে
ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আ-
মার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী
পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হও-
য়া উচিত, কিন্তু আর্জি কালি দেখিতে
ছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার।
কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি
বঁড় ছাখিত হইব না।

মেয়েটিতে আমার কি কাজ? আমি
তারারচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবি।
তারারচরণের জন্ম একটা ভাল মেয়ে
আমি কত খুঁজিতেছি তাত জান। যদি
একটা ভাল মেয়ে বিধাতা বিলাইয়া
ছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না।
কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কন্দনন্দিনীকে
আমিবার নয় মেয়ে সঙ্গে করিয়া
লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অজ-
রোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা
গড়াইতে ও বিবাহের আরও উদ্যোগ

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। “কলিকাতায়
বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় নাকি ছয়
মাস থাকিলে মাছের ভেড়া হয়। আর
যদি কন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভি-
প্রায় না করিয়া থাক, তবে সঙ্গে লইয়া
আসিও, ভূমি আসিলেই বিবাহ দিব।
যদি নিজে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়
করিয়া থাক, তবে বেল, আমি বরং ডালা
সাজাইতে বসি।”

তারারচরণ কে তাহা পরে প্রকাশ ক-
রিব। কিন্তু সে যেই হউক, স্বর্ঘ্যমুখীর
প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে প-
ন্থ্যত হইলেন। স্ত্রতরাং স্থির হইল যে,
নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন ক-
ন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। স-
কালে আহ্বান পুস্তক সম্মত হইয়াছিলেন,
কমলও কন্দকের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে
দিলেন। কিন্তু মহুয়া ত চিরাক্ষ। কয়েক
বৎসর পরে এমন এক দিন আইল যে যখন
কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূলবলুণ্ঠিত হইয়া

কপালে করিয়া দিয়া ভাবিলেন যে
কি কৃষ্ণে কন্দনন্দিনীকে পাইয়াছি-
লাম? কি কৃষ্ণে স্বর্ঘ্যমুখীর পক্ষে পন্থ্যত
হইয়াছিল।

এখন কমলমণি, স্বর্ঘ্যমুখী, নগেন্দ্র
তিন জনে মিলিত হইয়া বিবাহের রোপ
করিলেন। পরে তিন জনেই “হাহাকার”
করিলেন।

এখন বজুর সাজাইয়া, নগেন্দ্র কন্দকে
লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কন্দ স্বয়ং প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।
নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রা কালে একবার তাহা
স্মরণ পথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের
কারণপূর্ণ মুখকান্তি, এবং লোকবৎস-
চরিত্র মনে করিয়া কন্দ “কিছুতেই বিবাহ
করিল না যে, ইহা হইতে তাহার আশা
হইবে। অথবা কেইং এমন পতিভ্র-
ম, অল্প বয়সেই দেখিয়াও তামা-
প্রবৃত্তি হয়।

আমরা বড় লোক।

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় দেখিতে
পাওয়া যায় যে, জাতিভেদে মহুযের
পরিচ্ছদ-প্রণালীর এক একটি স্বতন্ত্র নীতি
আছে এবং মহুযের অবস্থার উন্নতির
সহিত বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়মও উৎকৃষ্ট
হইয়া আইসে। এই প্রথাটা এত সাধারণ
হয়, মহুয জাতির মধ্যে একে সভ্য, কে
অসভ্য, পরিচ্ছদ দৃষ্টি মাজেই বলা যাইতে
পারে; এবং স্তম্ভারা কে কোন দেশের
বা কোন জাতির লোক, প্রায়ই বুঝিতে
পারা যায়। এমন কি, বর্ন অসভ্য জা-

তিরও যে সর্বাঙ্গে উল্লিক ব্যস্তার করিয়া
থাকে, তাহাতেও পরিচ্ছদের মধ্যে
এক আছে; দেখিলে বুঝি যায়, কে কে
জাতীয় বর্ন।

কিন্তু আমরা “বড় লোক।” আমরা
পের পরিচ্ছদ দৃষ্টে আমরা কোন জা-
তীয়—বর্ন কি সভ্য—তাঁহা বিচার করি-
উঠা বিধাতারও অসাধ্য। কেহ যদি
দেঁশের কোন রাজ্যমণ্ডলী লোক জমাতা
প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন
তবে প্রকৃতিতে পারিবেন, সেমি কি ছয়

পাণি। আমরা যে কত বার কত দিন
বাঁক হইয়া এই রহস্য দেখিয়াছি, বলিতে
পারি না। অপরসাধারণের কথা থাক;
মূল্যলোকের কথাই মনে কর। যখন
উনহলে কোন সভা হয়, তখন বড়
চরই ব্রহ্ম, ফেটিন, আপিসজান, এবং
শিক্ষণাজী, চড়িয়া স্বসজ্জিত বাবুরা সম-
বেত হইতে থাকেন। কিন্তু বেশবিন্যাস
দখিয়া উঠারা যে, কোন জাতীয় লোক,
ক জাতীয় কি না, এবং কোথা হইতে
স্থিত হইলেন, স্থির করিয়া উঠে কা-
র মাথা। স্বর্গলোক কি চন্দ্রলোক হ-
তে নানির্ভেদে, অথবা জ্বলোকবাসী
অন্যে ধারণ করিয়া মনুষ্য জাতিকে
কেনা করিতেছেন, নিরূপণ করা বুঝি
গুণ্য। কেহ বা অতিরিক্ত প্রপিতামহের
নামের 'পুষ্করিণী' জন্মজন্মজন্ম, কেহ
বুদ্ধকাটা কাবা, মেহ বা বকুমকে স্মৃতি
কমলের চোপ চাপকান, কেহ বা দোহ-
নাম চোগা, লবদা, কেহ বা আলপালা
ঐন্দ্রপোষের আদমাহেবি চায়না কাই,
কেহ বা বুদ্ধফলান পুরোমাহেবী কামিজ-
নাট, কেহ বা ইজের চাপকানের উপর
চিকিরা অথবা কৌচান চাদর, কেহ বা
খুঁত চাদর পরেই আসিয়াছেন। তা-
হতে আঁবার মায়া, কালো, গোলাপি,
সবুজ, জরদা, সবুজ, নীল রঙের বিচিত্র
পাভা। মধ্যে কুটিকি, ফুলকাটাও দে-
খতে পাওয়া যায়। মস্তকের সজ্জা আরো
সুত। মেরশা মোগলাই, আমান, আমিলা,
ক্যাপ, টোপ, টুপি, ভাজ—
ত শত প্রকার, তাহার সীমা পরিসীমা
হই।

পাঠকগণ স্মরণ করিও এ সকল ই-

রাজী ধরনের সভায় সভ্য হইবার পো-
ষাক। দেশীয় সামাজিক কার্যোপলক্ষে
সভ্য হইবার পরিচ্ছদপদ্ধতি অনাক্রম্য।
তখন, ছ একটা শিশু ও রক্ত বালক ছাড়া,
প্রায় সকলেই বিলাতি—মিশ্রনো দেশি-
চেলে সজ্জা করিয়া আইনেন। ধুতিচাদর,
হাফ মোতা, ফুল মোজা এবং সূচ্য
পিরনেরই ধুম পুড়ে যান। লস্করপেড়ে,
লালপেড়ে, নরনপেড়ে, খড়কেপেড়ে,
বিদ্যাসাগরপেড়ে, অথবা সাদাপেড়ে—
ফিনফিনে ঢাকাই, শান্তিপুর্, সিমলের
ধুতি এবং তদপুঙ্খ নীতি সলমল, ঢাকাই
বা কেরপের উড়ানীতে দালান, উতান,
বৈঠকখানা, বারান্দা ফরফর করতে থাকে।
পিরনের ত কথাই নাই, কতই রঙ্গের,
কতই রঞ্জের, কতই ফেসিয়নের চিত্রবি-
চিত্র করা; দেখিলে চুচান্দর অবাক হইয়া
থাকিতে হয়। ফলে, পোশাকের চাকচক্য
এবং অসমদৃশ্যতার সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন
জাতিই আমাদের সহিত তুলনা নিতে
পারেন না। এ বিষয়ে আমাদেরও রুচি
এবং প্রেরণার সীমা নাই। বোধ হয়,
মিউজিয়ং হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর
অপর প্রান্তভাগ গ্রীনলও পর্যন্ত গুঁজিয়া
সকল জাতীয় এক একটা সল্য অথবা
ফিম্বা বনা একক কলিলে বৎ প্রকার
পরিচ্ছদের মনোবেশ হয়, আমাদেরই
মধ্যে ভাবভেদেরই অস্বরূপ আছে। অ-
তরাং আমরা “বড় লোক।”
“অনেক দিন আমরা মনে মনে ভাবিয়া-
ছি যে, পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটা প্র-
ধান জাতি—অতি সভ্য, বুদ্ধিমান, বিবদন,
ও বিচক্ষণ, তথাপি এপর্যন্ত এই একটা
সামান্য বিষয়ের কিনারা করিয়া উঠিতে

পারিতেছি না কেন? যে বর্ধন-আসিয়া
আমাদিগকে পদনত করে, তখন তাহা-
দের বস্ত্রাদির অস্বকরণ করি। অস্বকরণ
ভিন্ন কি আমাদেরই উপায় নাই? অথবা
যে কোন রকম হউক, এমন একটা পোশাক
অস্বকরণ করিতে পারা যায় না, বাহা
সকল সময়ে, সকলো জনা, সর্ব বিধায়ে
উপযোগী হইতে পারে? আমাদেরই
পিতৃপৈতামহিক যে বস্ত্রাদি আছে, বিস্তর
বিসেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ল-
কল দিক রক্ষা হয় না। ধুতি আর
চাদর বড় আরামের জিনিষ হইতে, এবং
তাহা পরিধান করিয়া সর্বক্ষেত্রে বায়ুসেবন
করা অপেক্ষা, বোধ হয়, উপাদেয় আর
কিছুই নাই। কিন্তু ভাব্যতা রক্ষা এবং
লজ্জা নিবারণের পক্ষে তাহাতে সময়ে
সময়ে মহা গোজোবোণ উপস্থিত হয়।
বহিতে পারি না, এ বিষয়ে, মহাশয়
ব্যক্তিরা কি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আ-
মাদেরই স্থান বুদ্ধিতে, ধানপুত্রেই
হউক আর দিশি মীথি পুত্রেই হউক, ব্যব-
হারের বিরুদ্ধে একটা বিশেষ প্রতিব-
ন্ধক আছে। আমরা বাঙ্গালী জাতি
—অতি সাবধানী—বিবেচক—বিপদ অ-
থবা উৎপাতের উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিতে
অতিশয় পটু, স্বতরাং সেই কার্যেই তা-
হাতে নির্নিয়ম সমাধা হয়, তত্ত্বপযোগী
বস্ত্রাদি ব্যবহার করাই আমাদেরই ক-
র্তব্য। ধুতিচাদর সেই অতি প্রয়োজনীয়
কার্যের অতিশয় বাধাত জন্মে। ছুটিবার
সময়, বিশেষতঃ ছুটিয়া পলাইবার সময়,
কাছা কি কোঁচা খুলিয়া গেলে, লোকের
নিকট অসম্মদ এবং হাস্যাস্পদ হইতে
হয়। নতুবা ধুতিচাদর মদ নয়। আমা-

দের দেশের লোক স্ত্রী, অপরূপ বটে,
বিস্ত্র হইলে ক্ষতি নাই, বরং স্ত্রী-
শোভন স্বচরিত্রপে প্রকাশ পায়; স্বত-
রাং যত অল্প এবং পাতলা কাপড় ব্যব-
হার করা যায় ততই ভাল; এবং তখন
আমরাও পাতলা কাপড় ব্যবহার করিয়া
থাকি। কিন্তু পলাবার উপায় কি? সেই
টিই আমাদের পক্ষে বিষম মীমসা। অ-
নেক সময়ে ইহাও ভাবিয়াছি যে, হিন্দু-
স্থানী কিম্বা মহারাত্রীদিগের ন্যায় মাল-
কোঁচা করিয়া ধুতি পরাই আমাদেরই
পক্ষে সর্বোপেক্ষা প্রায়স্কর। কিন্তু তা-
হাতেও, গুরুতর না হউক, একটা আপত্তি
আছে। আমরা যে কোঁচোরাত্রী জাতি
এবং যেরূপ দীর্ঘকায়, ঐ কোঁচার মনোবেশ
ধারণ করিলে পাছে তাল্পাতার সিপা-
হির মত দেখায়—আমাদেরই এই আ-
শঙ্কা। বাহা হউক, সে বিষয়ের ইতিকর্ষ
ব্যাৎ কভারাই স্থির করিবেন, আমাদের
গের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমা-
দের রুচির কিঞ্চিৎ খরস্তু এবং
করিলেই ভাল হয়। অতঃপর গিন্নী
কিরূপ একবার দেখা আবশ্যক।
যরের লক্ষ্যীদের বেশভূষার কথা উ-
পায়ন করা বড় ভাল। হিন্দুমাত্র অ-
পর্যায়র কথা বুলিলে কত গিন্নী উভর
রই নিকটে লাঞ্ছনার ডাজন হইতে হয়,
এবং যের বাহিরে ভাল করে সাজা তুলে
মুখ দেখান ডার হইয়া উঠে। কিন্তু
আমাদের সে ভয় নাই; কারণ এ দেশে
স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে
যদ্যপি নিন্দা করিবার কিছুমাত্র আবশ্য-
কতা থাকিত তাহা হইলে একটিন বিষয়ে
আমরা হস্তক্ষেপ করিতাম না। ছিরা-

হুসন্ধানের তিলাক্ষ্যায় স্থল নাই বলিয়াই আমরা ইহার উল্লেখ করিতেছি। খ্রী-
ষ্টাব্দে জগতের শ্রেষ্ঠ—সকল সৌন্দর্য্য-
চরম সীমা। তাহাদিগের অঙ্গ অবয়ব
এবং লাবণ্যমধুরী যতই প্রকাশ পায়
ততই জগতের শোভা বৃদ্ধি হয়। চক্ষু-
রিলিয় হৃৎকিরবার নিমিত্ত খ্রীলোকের
অঙ্গসৌন্দর্য্য তুল্য আর কি পদার্থ
আছে? তবে বৈ বর্ষরজ্জ্বীয় বিবস্ত্রা
খ্রীলোক দেখিয়া আমাদের মনে অ-
ত্যন্ত ঘৃণা এবং বিতরকার উদ্বেক হয়,
তাহাদিগের কদর্য্যতাই তাহার একমাত্র
কারণ। বিবস্ত্রা খ্রীলোক বলিয়া নয়, বোধ
হয় রিকটমূর্ত্তি বার্ষঙ্গী বলিয়াই আমরা
তাহাদিগকে অত্যাচার এবং ঘৃণা করি।
কিন্তু এ দেশের খ্রীলোকেরা অপসরার
ন্যায় সুন্দরী, সুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতি
চমৎকার। এতাদৃশ অপসরাদিগের অঙ্গ
অবয়ব অনারত না রাখিয়া কোন সুরসিক
পুরুষ আগমার করিতে পারে। আমা-
সান দেশের লোক অতিশয় রসজ্ঞ,
কিন্তু এ দেশের মোহিনীগণকে এক
কিছু বড় দশহাত কাপড়ের সাড়ী পরাইয়া
রাখাচ্ছেন। খ্রীলোকদিগের লজ্জানিবার-
ণ এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশের এমন কোশল
বোধ হয়, কোন দেশে, কুশ্মিন কালে,
কোন জাতিতেই উদ্ভাবন করিতে পারে
নাই। অন্তঃকর অসভা জাতিরা খ্রীলোক-
দিকে কোপীন অথবা পজাস্থান পরা-
ইয়া রাখেন, কিন্তু সভ্য বাঙ্গালীরা একখানি
প্রাণ সাড়ী পরাইয়াছেন। ইহাচুত
দৃষ্টিকটোরও হয় না, অথচ অন্যায়সে
সর্বাস্বের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।
আমরা যখন কোন সর্দার সুন্দরী

বাঙ্গালী-খ্রীলোককে বেশ ভূষা করিয়া বা-
ইতে দেখি তখন মনে মনে আমাদের
দেশের লোকের বিচক্ষণতা ও অগাধ
বুদ্ধির যে কত প্রশংসা করি তাহা এক
মুখে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। কিন্তু
স্বপরিবারস্থ কহানকে দেখিলেই কিঞ্চিৎ
জড়মুদ্র হইতে হয়।

কালক্রমে সভ্যতার সর্গশ-বুদ্ধি হই-
তেছে, অতরাং এ দেশের খ্রীলোকদিগের
পরিচ্ছদও ক্রমশঃ আরো উৎকৃষ্ট হইয়া
উঠিতেছে। পূর্বে সাড়ীখানি পুরো দশ
হাত না হউক, মোটা গোচের ছিল। ক্রমে
চক্রবেড়, চক্রকোনা, শান্তিপুর, কলসে,
সিমুলে, ঢাকাই চপে, হুস্মা, অতিহুস্মা
হইয়া প্রাসিয়া একগণে কেরপে দাঁড়াই-
য়াছে। বোধ হয় আর কিছু দিন পরেই
মাকড়সার জালে পরিণত হইবে, অথবা
এ দেশের খ্রীলোকেরা পুনর্বার স্বভাবের
সরলভাব গারণ করিবে। তাহা হইতেও আ-
মরা ক্ষতি বোধ করি না; কারণ আমা-
দের দেশের গৃহিণীরা অন্তঃপুরবাসিনী
এবং তাহাদের ন্যায়-পতিপারায়ণা সভ্য
কুজাপি নাই। ইহারা পরপুরুষের নয়ন-
গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং নয়ন-
গোচর হইলেই বা লজ্জার বিষয় কি?
কেইকালে বাপুতি করিতে পারেন যে,
একগণার খ্রীলোকদিগের মধ্যে অনেককে
অন্তঃপুর পরিভাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া-
ছেন। কিন্তু আমরা কত ভক্ত, মাতঙ্গর
লোককে তাহাদিগের পরিবারগণকে এক-
কথনি সাড়ী পরাইয়া রেলওয়ের গাড়ী
এবং মাতঙ্গর লইয়া যাইতে দেখিয়াছি;
তাহাকে তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র মা-
লিনা জন্মে নাই, এবং সেই সকল যো-

যাদিগের মনেও কিছুমাত্র লজ্জা হয় না।
ফলে আমাদের বিবেচনায় এমন অ-
রূপা সভ্য লক্ষ্যদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া
লোকালয়ে পাঠাইতে কোন আপত্তি হ-
ইতে পারে না। আমাদের ঘরের
গিন্নী যদ্যপি লোকালয়ে বাহির করিবার
যোগ্য হইতেন, তবু আমরাও তাহাই
করিতাম; কিন্তু সঙ্গে যাইতে লজ্জা বোধ
হইত।

পূর্বে আমরা কখন কখন মনে করি-
তাম যে, আমাদের দেশের খ্রীলোকদি-
গকে ইহুদি খ্রীলোকদিগের পোশাক দিয়া

সাজে এবং উছাদিগকে কখন লোকালয়ে
আনিতে হইলে এরূপ পোশাক পরাইয়া
বাহির করাই কর্তব্য। কিন্তু এক্ষণে দেখি-
তেছি আমাদের গোট জম—যদি এ-
প্রমাণ সাড়ীতেই ঘরে বাহিরে অন-
য়াসে চলে, তবে এমন মনোহারিণী সা-
ড়ীকে পরিভাগ করিতে কে উপদেশ
দিতে পারে? পরন্তু যতই প্রথিতোচ-
িততই আমাদের প্রীতি জমিতে
যে, আমরা অতি স্ববোধ-বিজ্ঞ, রসজ্ঞ এবং
যথার্থ বিচক্ষণ লোক; সংক্ষেপে—
“আমরা বড় লোক।”

সঙ্গীত।

সঙ্গীত কহাকে বলে? সকলেই জা-
নেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত, কিন্তু
সুর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত
হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আঘাত পদার্থের
পরমাণু মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে,
তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়।
যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইটক-
থণ্ড নিক্ষেপ করিলে, ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা
সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে
ধাবিত হয়, সেই রূপ কম্পিত বায়ুর তি-
রঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে।
সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়।
কর্ণমধ্যে এক খানি হুস্মা চর্চা আছে। ঐ
সকল বায়বীয় তরঙ্গ পরস্পরা সেই
চর্চাপাথির প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন
আব্রু প্রভৃতি দ্বারা আবার ধমনীতে নীত
হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে
আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর একক শব্দ জন্মে
যুগ্ম কারণ। দার্শনিকেরা স্থির করিয়া
ছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকণ্ডে ৪৮,০০
বার বায়ুর একক হয়, তাহা আমরা শু-
নিতে পারি না। সমুদ্র সাবর্ভি অবধারি-
করিয়াছেন যে, প্রতি সেকণ্ডে ১৪ ব-
রের ম্যানসংখ্যক একক যেরূপে শব্দে,
শব্দ আমরা শুনিতে পারি না। ঐই এক-
কম্পের সময়ে মাত্রা সুরের কারণ
হুইতি এককম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়
তাহা যদি সর্বত্র বারো সমান থাকে, তাহা
হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল বেরূপ
মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দ এককম্পের
রূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দ
নিতই সমতা নাই, তাহা সুর রূপে পরি-
ণত হয় না। সে শব্দ “বৈশ্ব”-অর্থাৎ
গগণগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতে
মাত্র।

এই স্রবের একতা বা বহুত্বই 'সঙ্গীত'। তাহা নির্গত তত্ত্বে সঙ্গীত এই রূপ, কিন্তু প্রাচীনতম মানসিক স্বর্থ জগ্রে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে তাহা নাকোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং এক বার মনো-বৃত্তি তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমূর্ত্তির স্বজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দোষ স্রবের মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য স্রব, সকলেরই ক্রোন না কোন দোষ আছে; কিন্তু 'স' সকল দোষ তাগ করিয়া আমরা স্বন্দর-কান্তি মাজেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারি। এই রূপ উৎকর্ষের চরম স্রব—টিকা, কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

ক যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটি-করম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বাল-কর, কথ্য মিষ্ট লাগে; যুবতীর কণ্ঠস্বর মধুর; বজ্রার বরভঙ্গাই বজ্রতার মত। বজ্রতা শ্রমিয়্যাত ভাল লাগে, প্রাচীনকল্পী তত ভাল লাগে না, কেননা যুব বরভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত রস হয়। যখনও একটি মাত্র সামান্য কথা, এত শোণক, এত প্রেম, বা এত আত্মদা বাক্য হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোণক বা প্রেম আত্মদা জানাইবার জন্য রচিত হ-

দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে একরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটি চর-মোৎকর্ষ অর্থে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত স্বথকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেননা সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও সন্যক চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। মনের ভাব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব-প্রকাশ করা যায়।

তজ্জি, প্রেম ও আত্মদা বাক্য সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব লোক মধ্যে আছে। কেবল খলতা-বাক্যক সঙ্গীত নাই। যাঁহাতে রাগ ধ্রুববাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীত-মধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু এ সকল বাদ্য হিংসা-প্রকাশক নহে; কেবল উৎসাহ-বন্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসম্মত নহে। শৌকপ্রকাশক গীত আছে, গীত মধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শৌক ক্রুর্য্য নহে; তজ্জি ও প্রেম বাক্য।

সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে সকল কালে সঙ্গীত আছে। এবং সকল দেশে সকল কালে সর্ব লোককেই ইহা আদর-ণীয়। কিন্তু সর্ব স্থানে ইহার উৎকর্ষ সম-রূপ নহে; অনেক দেশের ও জাতির গীত উৎকৃষ্ট নহে। বুদ্ধি-সভ্যতা-ভারতম্য ও কালপ্রভাবে ভাল, মন্দ, মধ্য ইত্যাদি হইয়াছে। বংশ ভেদে সঙ্গীতেরও প্রভেদ

দেখা যায়। কাকিদিগের, প্রাচীন আ-মেরিকান অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের, ইহুদী বংশের ও আর্য্যবংশের গীতপ্রণালীতে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। মনুষ্য সমূহ এক স্বভাবাপন্ন; সঙ্গীত স্বভাবপ্রবাক শব্দ; বংশভেদে দ্বিতীয় ভিন্ন হইবেক, এমন নহে। কিন্তু সকল জাতি সমাজ-বিশিষ্ট নহে, এই কারণে সঙ্গীতের ভারতম্য হইয়াছে। সকল জাতি মধ্যে আর্য্য জাতি প্রেষ্ঠ; এ জন্য আর্য্য জাতির গীতপ্রণালীও প্রেষ্ঠ।

উত্তরাঞ্চল আর্য্য বংশের আদি বাস-স্থান। তাহা হইতে তাহারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি করিয়াছে। কোন কোন শাখা অতি পূর্ব্বকাল, কোন কোন শাখা তৎপরে, কোনও শাখা অন্য শা-খার সহিত একত্রে দেশ ত্যাগ করে। কিন্তু সকলের ভাষার ও প্রাচীন ধর্ম্মের এবং ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গী-তের প্রণালীতেও তদ্রূপ; দেশ কাল পাত্র ও অন্যান্য ভেদে এই সাদৃশ্যের অ-নেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। কিন্তু মূল সঙ্ক-লোর এক। সকলেরই গুণ স্রব, ত্রুণ দীর্ঘ দ্রুত ভেদে উচ্চারণ ও সময়ের নির্দেশ; একজিত স্বর সমূহের ধনি ও গাঠন্যে আস্থা এবং স্রবের নাম ও গ্রামের প্রকা-রূপ। এ সকল বিষয় ক্রমে প্রস্তাবের নিম্নভাগে বোধ হয় সমগ্রণ্য হইবেক।

স্রবের এবং সময়ের একমাত্র মিলন দ্বারা একে একে অথবা অনেকে একজিত হইয়া বেদধ্বনি করা আমাদের আদি স-ঙ্গীত। অপরও সঙ্গীতও ছিল। কালে সে সকল পরিমার্জিত ও পরিমার্জিত হইয়া পুরাণাদিতে বিন্যস্ত হইয়াছে। স-

ঙ্গীত দুই প্রকার; গীত ও বাদ্য। কো-বিদ্যাই প্রথমোক্ত পদ্ধতি-কালে উৎকর্ষ প্রা-হয় না, ক্রমে তাহার উন্নতি হয় বাদ্য তৎপ্রথাগত। পিনাক, তানপুরা প্রভৃ-সামান্য যন্ত্র সকল ইহার উদ্ভাবন মৃদঙ্গ, বোধ হয় দেশীয় যন্ত্র; সাঁওতা হইতে প্রাপ্ত। সেতার এই বীণ নহে। যেমন প্রাচীন কবিতায় উৎক-কবি, তেমনি প্রাচীন হিন্দু-গীত-প্রণালী আশ্চর্য্য। গীতে কেবল বুদ্ধির প্রাথম-কল্পনা, ভাব ও মনোযোগ আবশ্যক প্রাচীনরা এই সকল বিষয়ে সহাবল-বিশিষ্ট ছিলেন, সহজেই গীতের অসাধ-রণ উন্নতি করিয়াছিলেন।

নাভি, কণ্ঠ এবং তালু স্রবের তি-স্থান পৌরাণিকেরা নির্দেশ করিয়াছেন। একই স্থলসমূহপন্ন স্রবকে একই প্রা-কহে। একই গ্রামে সাতই স্রব অর্থা-সারি গা মা পা ধা নী। প্রথম পঞ্চম-সপ্তম স্রব রাবীত অপরা সকল স্রবে ত্রিত্রাত ও কোমলতা থাকতে, সে সব লকে অর্দ্ধ স্রব বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সহজেই সংলগ্ন স্রবের সংখ্যা ১২ টি মাত্র। প্রাচীনরা ত্রিত্র ও কোমল অর্থাৎ অর্দ্ধ স্রব সকলকে এত ভাগে-বিভা-করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। ইহা তাহাদের বুদ্ধি ও মনোযোগের এবং বিচার শক্তির পরিচয় বটে, কিন্তু বারটী স্রবই সহজসাধ্য এবং সামান্যতঃ আবশ্যক।

সকল গীতে সকল স্রবের আবশ্যক হয় না; কোন গীতে সাত, কোন গীতে তিন, কোন গীতে পাঁচ ইত্যাদি আবশ্যক হয়। অতএব সকল গীতকে ভাগে-বি

উক, এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত, তাহাতে বাবশাক বিষয় সকল সমাধা হইতেছে। তবে ১২ শ্রবের ইত্যাদি চিরস্থাবরভোগ্য পোষণা উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

শ্রবের শ্রব, ভাণ্ড ও ভাণ্ড যেমত আবশ্যক, সমাধা হইরূপ আবশ্যক। ইউরোপীয় ভিত্তি সহিত উক্ত সকল বিষয়ে নানাদেশের মতাদেশ আছে। কেবল আমাদের বহুমিলন নাই, অর্থাৎ আমাদের গতিপ্রণয় গ্রামে মিলন আছে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে পৃথক শ্রবের একজন মিলন নাই। তানপুরাতে জুড়ির সহিত পঞ্চম ও খরজের মিল এবং এসরার প্রভৃতিতে তিন গ্রামের তারের মিল আছে

ব্যাভ্রাচার্য্য রহস্যানুসূচী

একদা ক্ষুদ্রবন-মধ্যে ব্যাভ্রদিগের মাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বন-এ প্রাপ্ত ভূমি খণ্ডে ভীমানুভূতি বহুতর ব্যাভ্র লাজ্জলে ভর করিয়া, সংগ্রহপ্রভায়, বন্য প্রাণে আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে ক্রমত হইয়া অমিতোদঃ নামে এক ভিত্তি প্রাচীন ব্যাভ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাজ্জলাসন গ্রহণ পূর্বক, সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভাদিগকে সম্বোধন করিয়াছিলেন;—

“অদ্য আমাদিগের কিশুত দিন! আমা বত অরুণাঙ্গী মাংসাভি-ব্যাভ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের সমাদানার্থ এই অরুণামধ্যে এক-

কিছু এই মুকল মিল গ্রামাভ্যাসী মাজ। ভিন্ন শ্রবের একজন মিলন নাই। ইউরোপেও এই প্রকার মিলন ছিল না। কেবল এক মিলনমাত্র ছিল। দুই তিন শত বৎসর গত হইল, ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের নানা বিষয়ে উন্নতিসাধন হইতেছে, সঙ্গীতেও তদ্রূপ হওয়া আশ্চর্য্যক। ভরসা করি যে, ইউরোপীয় লেখা প্রণালী যেমত গৃহীত হইতেছে, তদেমশীয় সঙ্গীত শাস্ত্র সেইমত গৃহীত হইয়া আমাদের সঙ্গীতের যাহা অভাব আছে, তাহা পরিপূরিত করিবেক।

জিত হইয়াছে। আশা! কৃৎসাকরী খল-স্বভাব অন্যান্য পশুবর্ণের রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে একা নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত হস্তান্তর ব্যাভ্রমণ্ডলী একত্র হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভাপতির যেরূপ দিনত ক্রীড়িত হইতেছে, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শাস্ত্রিই ব্যাভ্রের সভাপতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিনত এই রূপ জাতি-হিংসিতা প্রকাশ পূর্বক পরস্পর নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন!” (সভা মধ্যে লাজ্জলাসন চট্টাচার্য্য)

এক্ষণে যে ভাটবন্দ! অরুণাঙ্গী প্রাচীন সম্পাদনার্থ সীমবেত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবরিত করি। আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, এই ক্ষুদ্রবন-বনে বাস সমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাস এই, আমরা বিদ্বান হইব। কেননা আমাদিগের সকলই ধর্ম্মানু হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাভ্রসমাজ সংস্থাপিত হই-

এক্ষণে, আমরা বক্তব্য এই যে, আমরা ইহার অল্পমোদন করুন। সভাপতির এই বক্তব্য সমাপ্ত হই-

সভাপতির এই বক্তব্য শব্দে এই প্রস্তাবের মোদন করিল। তখন যথার্থীতি হয়েমতি প্রস্তাব পাঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভাগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তব্য হইল, তাহা ব্যাকরণগত এবং অলঙ্কার-পরিমিত হইল। তাহাতে শব্দ বিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তব্যের চোটে ক্ষুদ্রবন কী-

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন, এই ক্ষুদ্রবনে রহস্যানুসূচী নামে এক গণ্ডিত ব্যাভ্র বাস করেন। অদ্য তিনি আমাদিগের অহরোধে ম-

আত্ম হইয়া, গর্জন পূর্বক গাজোখান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিশ্রাম-শ্রবের নিম্নলিখিত প্রবন্ধী পাঠ করিলেন;—

সভাপতি হইয়া, তিনি গণ্ডিত ব্যাভ্রের নাম লইয়া, “আমাদিগের সকলই ধর্ম্মানু হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাভ্রসমাজ সংস্থাপিত হই-

চতুস্পদগণের যে অল্প যে অল্প আছে, সমুদায়ও সেই রূপ আছে। অন্তঃ-মহুবাদিগকে এক প্রকার চতুস্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুস্পদের যে রূপ গঠনের পারিপাট্য, সমুদায়ের তাৎপর্য্য নাই কেবল মাত্র দৈর্ঘ্য প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্তব্য নহে যে, আমরা সমুদায় দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুস্পদমধ্যে বামনদিগের সঙ্গে সমুদায় গণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলে যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, সমুদায়-পশুও কালপ্রভাবে লাজ্জলাসিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা উঠিবে। সমুদায়-পশু যে আত্মত্ব প্রযোজ্য এবং স্বাভাবিক তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভাগণ সকলে আপন নখ চাটিলেন।) তাহার সমস্তরচনা অন্যান্যমতই মারা পড়ে। যুগাদির ন্যায় তাহার চক্রত পলায়নে সক্ষম নহে। অন্তঃ-মহুবা-পশুর ন্যায়, তাহার আত্মত্ব প্রযোজ্য এবং স্বাভাবিক তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভাগণ সকলে আপন নখ চাটিলেন।)

উপ-সংসার ব্যাভ্র জাতির। স্বার্থের জন্য
কি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেই জন্য
আমাদের উপায়ে ভোজ্য পশুকে পলা-
য়ে বা রক্ষার ক্ষমতা পর্যন্ত দেন
নাই। বাস্তবিক মনুষ্য জাতি যেরূপ অর-
ক্ষত—নাশ পশুশাসিত, গমনে-
শ্বর এবং ক মূল একান্ত তাহা দেখিয়া
বাস্তব হইবে যে, কি জন্য ঈশ্বর
সাহসিককে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাভ্র জা-
তির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর
কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহা-
গের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা
মুখ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি। দুষ্টি
জাতিই ধর্মিয়া খাই। আশ্চর্যের বিষয়
ই যে, তাহারও বড় ব্যাভ্রভক্ত। এই
কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন,
তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা
মাংস ভাষিয়াছিলাম, তদ্ব্যভ্র বলি। আপ-
নারা অগত আছেন আমি বহুকালাবধি
দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি।
মানি-যে দেশে এবাসে ছিলাম, সে দেশ
নাই ব্যাভ্র-ভূমি স্বন্দরবনের উত্তরে আছে।
এখান গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অস্থির
কিন্তু গণেই বাস করে। তথাকার মনুষ্য
বর্বর। এক জাতি বৃহৎবর্ণ, এক জাতি
স্বতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়
কর্ণোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।

শুনিয়া মহাদেয় নামে এক জন উজ্জত-
এতাব ব্যাভ্র জিজ্ঞাস্য করিলেন,—
“বিষয় কণ্ঠটা কি?”
ব্রহ্মজ্ঞান মহাশয় বলিলেন, “বিষয়
আহারোদ্যেগ। এখন সভালোকে
আহা, যথেকে গিয়া কর্ম বলে। ফলে

সকলেই যে আহারোদ্যেগকে বিষয় ক-
বলে এমত নহে। সম্ভ্রান্তলোকের আহ-
রোদ্যেগের নাম বিষয় কর্ম; অসম্ভ্রান্তে
আহারোদ্যেগের নাম জরীচুরি, উল্লুখা
এবং তিক্কা। মুক্তের আহারোদ্যেগের না-
চুরি; বলবানের আহারোদ্যেগ দম্যতা
বোকাবিশেষে দম্যতা শব্দ ব্যবহার হ-
না; তৎপরিবর্তে বীর্য বলিতে হয়।
দম্যতার দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দম্যতা
কার্যের নাম দম্যতা; যে দম্যতার দণ্ড
প্রণেতা নাই, তাহার দম্যতার নাম বীর-
রত্ন। আপনারা এখন সভা সমাজে
ধিক্তি হইবেন, তখন এই সকল নাম
বৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে
অসভ্য বলিবে। ব্রজত আমায় বিবেচনা
এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই; এ
উদর-পূজা নাম রাখিতেই বীরত্বাদি সা-
লই বুঝাইতে পারে।

এই বাহাই হউক, বাহা বলিতেছিলাম
প্রবণ করণ। মহাবোরা বড় ব্যাভ্রভক্ত
আমি একদা মহাবাসতি মধ্যে বিষয়
কর্ণোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াই যে,
কিয়েক বৎসর হইল এই স্বন্দরবনে পোর্ট
ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।
মহাদেয়। পুনরাপি বজ্রতা বন্ধ করে
ইয়া জিজ্ঞাস্য করিলেন, “পোর্ট ক্যানিং
কোম্পানি কিরূপ জন্ত?”

ব্রহ্মজ্ঞান কহিলেন, “তাহা আমি
বিশেষ অবগত নহি। এ জন্তর আকা-
ইন্তদামি কিরূপ, জিজ্ঞাসাই বা কেন
ছিল, যে সকল আশ্রয় অবগত নহি
শুনিয়াছি এ জন্ত মহাবোরা প্রতিষ্ঠিত
মহাবাণিজ্যেরই হৃদয়গোষ্ঠিত পান করিত
এবং তাহারই বড় মোটা, হইয়া মরিচ

উদ্দীপনা।

সমাজ সমালোচনা।

দ্বিতীয়ভাগ।

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃ সম্ভ্রান্ত জাতি
ছিলেন, তাহা ভারতের বাহা কিছু পর্যায়-
লোভনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পা-
ইবে। ভারতের সমাজ ভাগ দেখুন।
ব্রাহ্মণে নিভুতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা
করিলেন, পরামর্শ দিলেন, ব্যবস্থা করি-
লেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহু আ-
ক্রমণ নিবারণ করিলেন, দম্য হইতে
আতান্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বা-
জিজ্ঞাস্য কৃষিকার্যে জীবন যাপন করি-
লেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন
জুগোলের ভাগে চারিটা খণ্ড দেশ ল-
ইয়া যেমন একটা দেশ, তেমন চারিটা
জাতি লইয়া একটা হিন্দু জাতি হইল।
ঠিক যন্ত্রের যত সমুদায়। প্রয়োজন
নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে
কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে?
প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাহ্মণ
শিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্যন্ত
পিতামাতার কোড়ে বন্ধিত হইলেন।
উপনয়ন হইল। সেইটী উহার বিদ্যা-
রত্ন। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। [বোডিং
ইউনিবর্সিটি বোর্ড]। কেহ বার বৎসর,
কেহ ষোল, কেহ বিশেষিত বৎসর পরে
গৃহপাত্রমে এবেশ করিলেন, বিবাহ ক-
রিলেন। ক্রমে স্থবির ব্যসে বসে গেলেন।
নদীতোতের নাম জীবনতোত। পিতা
মাতার অঙ্করণ করিতেই, শাস্ত্রস-
মারী কার্য করা হইল। যুক্তি ও শাস্ত্রও
তাহার বিপরীত কিছুই বলিতে পারিত

না। স্বতন্ত্র যুক্তিও শাস্ত্র সম্ভ্রান্ত হ-
ল; সমাজ, মুখস্থ হইয়া চলিতে ক-
গিল। এ দিকে দেখুন, বৎসর দুই
শস্যপ্রস্তুতি; খনি রত্নসম্পদ। ফল হইবে
উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পু-
বীর সকল জিনিসের নমুনা ভারত
আছে। পূর্বকালে যে সেই রূপ ছি-
তাহার আর সন্দেহ নাই। কিছুই
ভাব নাই। প্রয়োজন নাই। স্বতন্ত্র
কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। বা-
কাহাকেও কিছুই বলিতে হয় না, তা-
হার উদ্দীপনা কোথা? হইতে হইবে
তিনি কবি হইলে হইতে পারেন
হায়! রোগশোকদুঃখজরাসরসকল
পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এ
সময়ে না এক সময়ে কবি। বাহা
লেখা পড়া বোধ আছে, যিনি আপনা
মনের ভাব্য ভাবায় স্বন্দর রূপে পৃথিবী
করিতে পারেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি।
কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই কবি। যিনি
মুখস্থার্থ্য্যার পর্বে উপবিস্ত হইয়া, অশ্র-
পূর্ণ লোচনে “হায়! বৃষ্টি হারাইলাম!”
বলিয়াছেন, তিনি অন্তরে কবি। একে
অন্তরে কবি নয় কে? তাহা হইলে বলি-
হায়! [রোগশোকদুঃখজরাসরসকল
পৃথিবীতে কবি নয় কে? অনার এ
কবে বলি—ও ছো! স্বার্থসাধনের
মর্দ্যশোভা প্রতিপুষ্টিত সম্ভ্রান্ত সংসারে
কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে
কবি। কোন নারীর গেস, কখনো

পীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি মা, দ্বিতী
শ্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন,
যিনি অন্তরে কবি। যে হাঠে নাই,
দেই নাই, সে মন্থা নয়; জীবন্ত পুতুল।
সুখমাত্রেরই অন্তরে অন্তরে কবি। সং-
গে নান। রূপ ছড়ান রহিয়াছে, অবস্থা-
দ্বারে ভিত্তিমিত্ত লবণ আস্থান করি-
ত হুতচেহা মানব যদি কৃষ্ণাঙ্কুর
রসিক, অভ্যুত না হয়। থাকে, কত-
ক কবি হইতেই হইবে। কবিজ্ঞ মন্থার
ভাবধর্ম। উদ্দীপনা সে রূপ নহে,
বা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে বিশেষ বি-
শেষ রূপে পরিণত, বর্জিত ও পুষ্টি হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে
হার বিহারি কৃষ্ণ-আশ্রয় করিতে পারে
নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লা-
গানি, ও সেই কয়বার বীজ অঙ্কুরিত,
যত পল্লবিত ও পূর্ণপদ্মতা এবং বোধ হয়,
কল ভরেও অবনত হইয়াছিল। পুরা-
ন্তর কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা হয়,
চাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্তব্য।
কিরূপ স্মৃতিকাব্য, কিরূপ জল বায়ুতে বীজ
অঙ্কুরিত ও লতা বর্জিত হয়, তাহা না
জানিলে, কখনই আমরা কৃষিকার্যে সফ-
লতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষি-
কার্যও এখন বিশেষ-আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে
রাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অ-
ধিক বার সঞ্চার করি নাই। ভারত
নী পিণ্ডাল; চর দেখিয়াই, আমরা আ-
মাদের ক্ষুদ্র তরী সেই প্রবাহে বিসর্জন
করিতে ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই,
পাইলট পাই নাই, স্তরভাষ্য কয়টি রহৎ
রূপ লাগাইয়া, সেই কয়টি দেখিয়াই,

প্রত্যাহ্বিত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ
প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি
কখন দূরে একটী দ্বীপ দেখে, তাহা
মধ্যে দেখিয়া থাকি, ভরসা করিয়া যাইতে
পারি নাই। আর পাঁচ জন সঙ্গী পাই-
লেও বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়,
কাঁধেও দেখি না। তখন ভয়ে বিষাদে
বাগবন্ধিতে বহিতে হয়,—

“তরি নাহি দেখি আর, তারিনিকে অন্ধকার।
বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।”

এই রূপ অবস্থায় এক বার একজন
বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়।
তাহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়।
সাহেবেরা নৌবিদ্যায় কিছু পটু, তাহা-
জ্ঞাতিতে ইংরেজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে।
পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা
সঙ্গে চলিলাম। যোতের বিপরীত
দিকে যাওয়াই, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।
সাহেব আমাদের সঙ্গে চলিলেন, এ
দূরে চর দেখিতে পাইতেছে, ঐটি মহা-
ভারত, আর তার এদিকে এই যে দেখি-
তেছে, এইটি রামায়ণ। আমরা সিহরিয়া
উঠিলাম। দ্বীপের পর জেতা যুগ হই-
ল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি
এক বারে অপ্রত্যাশিত জগিল। তখন সেই
পুঙ্খের গানেই মোহাড়াটি গাইয়া ফিরিয়া
আসিলাম।

“কোথা আনিলে যে—

পথ ভুলালে যে—”

সেই অবধি আর কাহারো সঙ্গে ভারত
নদীতে যাই না।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়প্রাজ্ঞাধর্মম-
নসম্মুখে আমরা পৌরানিক আখ্যায়িকা
ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু

তাহার পর রাম অবতার। দক্ষিণবি-
জয়ই রামায়ণযুক্ত। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
মধ্যে, আর রাজা লইয়া বিবাদ ছিল না;
যখন সমুদায় আর্য্যাবর্তে আর্য্যসন্তা-
নেরাই বাস করিতেছিল, তখনই রামা-
য়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি; রাম-
চন্দ্র, যে উদ্দেশ্যেই হউক, এই অনার্য্য
ভূমিতে অগ্রেশ করিয়া, ইহার সীমান্তবর্তী
লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত বিজয় করেন। আর্য্য-
বর্তের সীমা ছাড়িয়াই, নির্জনস্থ অর্য্য
মুনিগণের তপোবন ছাড়িয়াই, রাম
এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রা-
চীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জ্ঞাতিভেদে
আর্য্যগণের পৌড়নে ইহার বহিষ্ঠত হই-
য়া,—উভয়ই হইয়া, দক্ষিণে বাস করি-
ত ছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে মাংসপ্র-
লোভী জানিয়া, ঘৃণা করিয়া ও চণ্ডাল
বলিয়া, ওহে অভিধান দিয়াছিল। ত্রিরা-
মকে স্বর্গীয় উদ্ধার জনা এই জাতির
সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রা-
মায়ণে এই ঘটনাই গুরু চণ্ডালের
সহিত মৈত্রিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হই-
য়াছে। পরে এক অসত্য অসভ্য জাতির
মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুক্ত
করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোন
দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছি-
লেন। ইহাই রামায়ণে বলিবার
বধ ও স্তব্ধবাস বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত।
চণ্ডালের হিন্দুসমাজবহিষ্ঠত বটে,
কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ
সমৃদ্ধিশালী। কেননা তাহারা দক্ষিণা-
তোর আদিম বাসী; চণ্ডালগণের ন্যায়

আর্য্যানীকীকৃত জাতি নহে। পরে রা-
মচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজ
বিকৃতাকার এক জাতিকে আঁয় একেবারে
লোপ করেন। ইহাই রাক্ষসের বহু-
বধ ইহার। অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী যে
আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী, নর
বলিপ্রতিষ্ঠাকারী অজহতকজাতির নর
অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষপুষ্টি হইয়াছিল
রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল
আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবিভাগ ছিল না। সম-
লেই যোদ্ধা ও শূদ্রধারী, বোদাচরবহিষ্ঠ
অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ
ঘটনার স্থল মর্ম এই, কিন্তু এ গুণ
গুরুতর ঘটনা। বৈদিক একগতির
কারী। ইহাতেই রহৎ উৎপন্ন হয়
রামকে (যিনি একজনই হউন, আর
নেক জনই হউন,) একটা অসভ্য
বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডাল
দল করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব
সামান্য বর্ণনে বলে, গুরু চণ্ডালের সহিত
কোলাকুলি। কন্দমূলকলাশী বানর
দৃশ্য জীবের ক্ষুদ্রে বীরসের উদ্ভাবন
পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের এক
করণ। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সা-
হায়ে আমমাংসলোভী; অতিবিক্রম-
শালী জাতিকে একেবারে উদ্ধীন করা
ত্রিরাচন্দ্রের কার্য। পরের চিত্তবৃত্তি
উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের
প্রাকার উপর, তাহাকে নির্ভর করিতে
হইয়াছিল। নিষ্ঠুর চিন্তা, নির্জনতার
স্বরে বেদপাঠ, আচার্য্য নিকটে শ্র-
বিতা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে এক বার নিম-
পারজন সমভিষাহারে অহোমসং

হি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অজ্ঞান নরনারায়ণ । তাঁহার জাতুগণ সকলেই দেবরূপী বুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত প্রথমধর্মের সমকালিক হওয়াতে বেদব্যাসের এই মহাভারত, রামাণ্যের ন্যায় সেই কালের উদ্ভিপ্না স্মিতের আচুর্যের পরিচয় এদান করিতেছে । মাহোদীপক বেদব্যাসের একেবারে শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কাশিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের জোয়ার একবার তুলনা করুন । ভারতের লোকের একবার শুক্লচারিত্রের সহিত নাটকের শকুন্তলাচরিত্রের একবার তুলনা করুন । উভয়েই সত্যী শাস্ত্রী পতিব্রতা, মানবমেশমিশ্র শক্তিভেৎ দ্বিতীয় । উভয়েই আর্যশর্মস্বরূপিণ্যে পালিতা, মাধুর্ঘ্যলীলাতর, সহিব উভয়েই বক্তিত; উত্তমব্যস্তচারণীর স্বরিনী উভয়েরই সন্নিধি । উভয়কেই ছন্দ্যগন্ধর্ব বিধান বিবাহ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ণক হউক, আর বিশ্বস্তি ক্রমেই হউক, বর্জন করেন, অব্ধাসের তাগিদা গিরিলেন না, সহঃক্ষিনি আখ্যা দাগি মান বক্তিরিলেন না । কিন্তু এই আচরণে দেখুন কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন কবির শকুন্তলা রাজার গোপন-ব্যবহার ছইবার স্মরণ করিয়া দিতে গিয়া, গর্তে লঙ্ঘতে ঘৃণাত নিবারিত হইয়া, আপন নার দ্বষ্ট আপনিই প্রকাশ করিলেন । যথা,—রাজা । আর্থ্যে ক্ষুণ্ড্যতাম্ ।

যৌত । গবেক্ষথিমে ওঙ্কারমেইয়িএ,
তুএবি পৃথুখিলো বহু ।
একককমসং চরিএ,
কিং ষড়্রং একং একমিসং ॥

শব্দ " (আত্মগতম) কিঞ্চ কথং অজ্ঞ উভে

ভবিস্যদি ?

রাজা। (সংশয়ান্বিত) অয়ে ! কিমিদম্-
পনাত্তং ?

মিশ্রকু। (আশ্চর্য্যভর) হদী হদী ! সাবলে-
বো সে বজগাবকথেরো ।

দাশ্যাজ। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূরী।

বানকু। (সেবিতব্যসাম্রাজ্যগতম্) হিঅঅ সং

পদং সংবুভা দে আয়ক্ষা ।

দাশ্যাজ। ভো স্তপথিনশিত্তয়মপিন খলু

খীকরনমব্রতভত্যাম্মারামি তং

কথনিমামতিব্যক্তস্বলকণ্যামাস্মা-
তি

নমকপ্রিয়ং নমান্যনঃ প্রতি-
পৎসো ।

দাশ্যাজ। (ধগতম্) হদী হদী ! কথং পরি-
নংজ্জব সন্দেহো ভগ্নগা দাণিং

দুরারোহিণী আসালদা ।

দাশ্যাজ। (ধগতম্) ইয়ং অবথস্তরং গদে

তাদিসে অগুএ কিবা স্মমপাতি

দেণ, অধবা অভা দাণিং মে সো-

ধনীও ছোছতি কিপি বদিস্সং ।

(প্রকাশম্) অজ্জউত্ত ! (ইতা-

ক্কোকে) অধবা সংসইমো দাণিং

এসো সয়ুদাচাচেরা । পোরব ! জুতং

ণাম তুহ, পুরা অস্মমপদে সত্তা-

বুভাগহিঅঅং ইয়ংজ্ঞং তদা-

সমঅপুস্কং সত্তাবিঅ সম্পদং ইদি-

সেহিং অকথরেহিং পচ্চকথাছং ।

বানকু। ভোহু জই পত্তমথদো পরপরি-
গহমস্কিণা তুএ এসং পউত্তং তা

গাণাবণেণ কেণবি তুহ আসঙ্গং

অরুণইয়সং ।

রাজা। প্রথমঃ কপ্পঃ ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরাম্শা) হদী হদী !

অঙ্গলীঅস্থগা মে অঙ্গলী !

(ইতি সবিবাহং গৌতমীমুখমী-

কতে) * * * * *

রাজা। (সম্মতম্) ইদং তাবৎ প্রভূতং

পন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্ ।

শকু। এথ দাব বিহিগা দংসিদং পউত্তং

অবরং দে কধইয়সং ।

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্ ।

শকু। ৭ংএক্ক দিয়হে বেদসলদামণ্ডবে

নলিণীকন্তভাত্যবগদং উদএং তুহ

হপ্পে সগিহিদং আসী ।

রাজা। শৃণুমস্তাবং ।

শকু। তক্কংম সো ক্ষেপুত্কিদও দীহা-

পল্লোণাম মিঅপোদও উপইটি-

দো, তদো তুএ অঅং দাব পডুসং

পিঅহুত্তি অণকপিণা উজ্জেন্দিদো

উদএণ, ৭উণ সো অপারিচিদস্স

দে হথাদো উদএং উবগদো পা-

ছং, পচ্চা তসিসং জ্জেব উদএ মএ

গহিহে কিদো তেণ পণও, এথ-

স্তরে বিহসিঅ তুএ ভবিদং সম্মো

সগণে বীসসদি, জদো ছুবেবি

তুক্ষে আরয়ক্কা অোভি ।

রাজা। আভিত্তাবদাঅ্যকার্য্যপ্রবর্তিনী-

ভিম্পরাভিরনৃতবাণ্ডিরাফ্যাস্তে

বিবয়িণং ।

গৌতমী। মহাভাত্য ! গারিহসি এসং ন-

স্তিছং, তবোবগসংখ্টিদো কথু

অঅং জণো অণভিলোকইদবসস ।

রাজা। অগি তাপসরক্ষে ।

স্ত্রীণামশিকিতপটটমসামুখীণং,

সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধব-

ভাত্যং । প্রাণস্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপতা-

জাতমটোদাধিঈক্ষপারহত্যঃ কিল

গোষয়তি ।

শকু। (সরোযম্) অণজ্জ ! অন্তো হিঅ-

আণুমাণেণ কিল সন্নং পেঞ্চসি ;

কোণামি অট্টো ধমকক্কাঅব্যবদে-

সিণো তিগচ্ছমুদ্বোবহমস্স তুহ

অঙ্গুসারী ভবিস্যদি ।

রাজা। ভজ্জে অধিতং ছয়ান্তয়া চরিত্তং,

প্রজাস্থপীদং ন দৃশ্যতে ।

শকু। তুক্ষে জ্জেব পণাণং,

জাণধ ধম্মাধিকি লোঅস্স ।

লঙ্কাবিবিজ্জিদাও

জাণন্তি ন কিপি মহিলাও ।

সুট্টুদাব অত্তচ্ছন্দাণচারিণী গ-

ণিঅা সমুবট্টিদা ।

গৌতমী। জাদে ইয়স্স পুরুবংসপট্টয়েণ

মুখমহুণ্ণো হিঅাবিসস্স ইথং

সমুগদামি ।

শকু। (পটাস্তেন মুখমাজ্জাদ্য রোদিত্তি)।

শাঙ্করব। * * * গৌতমী গচ্ছাপ্রতঃ ।

(ইতিসর্কে প্রস্থিতঃ)।

শকু। অহংদাণিং ইমিগা কিবেব বিপ্ণ-

লক্কা, তুক্ষেবি সংপরিচ্ছঅধ ।

(ইত্যমুস্থিতঃ)।

শাঙ্ক। (সরোযং প্রতিনিরতঃ) অঃ পুরো-

ভাগিনি ! কিমিদং স্নাতক্সম-

বলধ্বসে ।

শকু। (ভীতা বেপতে)

শাঙ্ক। শকুস্তলে ! শূণোভু ভবতী ।

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপাল্যথা

দৃশ্যসি কিংপুনরুৎকলয়া দ্বয়া ।

অথ তু বেংসি শুচিত্রিতমাসন্নং

পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমং

* * * * *

পুরোধাঃ । (বিচার্য্য) যদি তাবদ্যেং কিস-

তাং—

রাজা। অমুশান্ত মাং শ্রুতঃ ।

পুরোধাঃ । অরতভতী তাবাদপ্রবাদ-

স্মদগৃহে তিষ্ঠতু ।

রাজা। রূত ইদম্ ?

পুরো। হুংসাধুনৈমিভিকৈরুপদিতখুর্ক-

প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জন-

যিষমীতি । দট্টোম্মিদৌহিত্ত্বস্ত

লক্ষণোপপত্তো ভবিয়াতি ততঃ

হতিনন্দা শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশ-

য়িষ্যসি, বিপর্য্যেদ্ব্যস্যা পিতুঃ

সমীপগমনং স্থিতমেব ।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচিতং ।

পুরো। (উধ্যায়) বৎসে ইত ইতোহু-

গচ্ছ মাম্ ।

শকু। ভঅবদি বরক্করে ! দেহি মে অন্তর

(ইতি সহ পুরোধসা গৌতমী

তপস্বিভিচ্ছ রুদতী নিচ্ছান্তা)।

* রাজা। আযো বনুন্ !

গৌত। এও শুকু জনের অপেক্ষা করে নাই

তুমিও বন্ধ জনকে জিজ্ঞাসা কর নাই

একলা একলার কার্য্যে অপূরে কে বি-

বলিতে পারে ?

শকু। (আশ্চর্য্য) না জানি আর্ঘ্য পুত্র বি-

বলেন ?

রাজা। (শুনিসা) সভয়ে ! কি গা, উপন্যাস

আরছ করিলে নাকি ?

শকু। (আশ্চর্য্য) আ ছি ছি ! এর ঘটনান্ত

বে কেমন কেমন ।

বাসরে শকুন্তলা সে প্রকৃতির নহেন,
নি তিনি দ্বন্দ্বমুক্তকর্ক পরিবর্জিতা হইয়া,
যে মান বদনে, ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশা-

রাজা। কি আমি একে বিবাহ করিয়াছিলাম
নাকি?

শকু। (সিবিধাদে আশ্বাস) হা হৃদয়! যা
ভয় করিতেছিল, এখন তাই হলো!!

রাজা। যে তপস্বিগণ! ছায়াও ত হাঁককে প-
রিগৃহ করা, অশ্রু মনে করিতে পারি-
তেছি না। তবে কুলজিহের ন্যায়
কেমন করে, এই স্পষ্টগর্ভফলগণকে
গৃহণ করি?

শকু। (আশ্বাস) হি হি! বিবাহেতেই সম্ভব!
এত দিনে আমার দুরারোগিণী আশা-
লতা ভগ্ন হইল।

শকু। তেমন অনুরাগিণী যদি এমন অবস্থার
গত হইল, তবে আর মনে পাড়াইবার
চেষ্টা করিলেই বা কি হবে? তথাপি
আপনাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য
কিছু বলি। (প্রকাশ)
আর্যাপুত্র! (এই অশ্রোদ্ধি করিয়া)
অথবা এখন এ সম্বোধন যুক্ত হইতেছে
না।

শৌরব। পূর্বে আশ্রমপদে প্রণয়-প্র-
হস-অঙ্গর। আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক
আদর করিয়া, এখন এই রূপে প্রত্যা-
খ্যান করা কি, তোমার উপযুক্ত?

শকু। ভাল যদি যথাধর্ম পরজীর্ঘাশঙ্কা
করিয়া, তুমি এরূপ করিতেছ, তবে আমি
কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা
দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (অশ্রু দৈখিয়া) হায় হায়! অশ্রু লিখে

সেইর সঙ্গে আশ্বাসকে বিসর্জন দিয়া, প্র-
ত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি
লাল লম্পটী কালজুজ্বলিনীর ন্যায় মুখ
অশ্রুদীর্ণ নাই যে! (সিবিধাদে গৌতমীর
মুখ দর্শন।)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে, স্ত্রীদিগের
প্রভাৎপরমতি।

শকু। এ ছলে এখন যিথাধর্ম প্রকৃত দেখাই-
লেন, ভাল আমি তোমাকে আর কিছু
বলিতেছি।

রাজা। বল শুনিতোছি।

শকু। এক দিন বেতসলতামগুপে তোমার
হস্তে পক্ষপাতের জল ছিল।

রাজা। তার পর বল শুন।

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘপাঙ্গ নামে
আমার কৃতকপুষ্ট মুগধশাবক আসিল। এই
আগে পান করুক, এই কথা বলিয়া,
তুমি আদর করিয়া, তাহাকে জল পান
করিতে ডাকিলে; কিন্তু সে অপরিচিত
বলিয়া, তোমার হস্ত হইতে জল খাইতে
আসিল না। তার পর আমি সেই জল
লইলে, সে ভাল বলিয়া খাইল। তা-
হাতে, তুমি হাসিয়া বলিলে, সকলেই ম-
জাভিক্তে বিবাস করে। তোমরা দুজ-
নেই বন্য।

রাজা। স্ত্রী লোকে আপন কার্য সাধন জন্য
এইরূপ অসুসম্মত মিত্যা বদন দ্বারা
বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহাশয়! এরূপ মনে করিলেন না।
ততোবদনে পালিত, এই সকল লোকেরা
ইকতর জানে না।

রাজা। অগি তাপসবৃদ্ধ! পশু পক্ষীর মধ্যেও
স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুতা দেখা যায়,
তবে পরিবোধ্যতীদিগের কথা আর
কি বলিব। দেখ, কোকিলাগণ আকা-
র্ষণে উড়িতে পারিবার পূর্বে আর্পণ
শাবকদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতি-
পালিত করিয়া লয়।

ফিরিয়া, গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন
করিয়াই অত্যাশঙ্ক হইবেন? তাহলে ত

শকু। অনায়াস! এ কি আপনাদের স্বয়ং অনু-
মানে সকলকে দেখিতেছ নাকি? তুমি
ধর্মক্ষমাবেশী, তৃণাক্রান্ত কুপের মত।
অন্যকে তোমার অনুকরণ করিবে?

রাজা। ভদ্রে! দুইমস্তুর চরিত্র প্রসিদ্ধ; আ-
মার প্রজাদের মধ্যেও এরূপ দেখা
যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্ম-
স্থিতি ও তোমরাই জান, লজ্জাজিতা
মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল কি
জামা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাকারি-
ণী গণিকা হইয়া, আসিয়াছি?

গৌত। বাছা পুরুষাংশে বিশ্বাস করিয়া মধু-
মুখ গরলময়র জনের হাতে পড়েছ।

শকু। (মুখে অশ্রু দিয়া ক্রন্দন।)

শাস্ত্র। গৌতম! আগুনরা হইল, (সকলে যা-
ইতে লাগিলেন।)

শকু। এখন এই শব্দ আমার ত্যাগ করিল,
তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিবে?
(এই বলিয়া মদ্রং গমন।)

শাস্ত্র। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্কশীলে! স্বাতন্ত্র্য-
বলম্বন করিতেছিল।

শকু। (ভয়ে কম্পাশ্রিত।)

শার। শকুন্তল! তুমি শুন, রাজা যাচা বলি-
লেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি
কুলটা, তোমায় লইয়া কি হইবে? আর
যদি আপনাকে তুমি খচিত্রতা বলিয়া
জান, তাহা হইলে পণ্ডিগুণে দাস্যমুখি
ও তোমার ভাল।

পুরুষ। (চিন্তা করিয়া) যদি এরূপ করেন—

রাজা। মহাশয় উপদেশ দিন।

পুরুষ। ইনি প্রসবকাল পর্যন্ত আমার গৃহে
থাকুন।

রাজা। কেন?

কবির বটী বীর-রস-প্রবলা নায়িকা হই-
লেন মাত। তা নয়, তিনি উদ্দীপনা-
শ্রবণ করিয়া রাজাকে সন্তোষদায়ক
নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণধারিত
তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন।
তিনি সফলও হইলেন।

রাজন স্বয়ংমাত্রাণি পরজিতানি পশ্যামি।
আমাদের বিদুমাত্রাণি পশ্যামি পশ্যামি।
মেনকা ত্রিশদেশুব রিক্সাশানুমেনকা।

মইমোবিত্তিচ্যে জয় দক্ষাশ তর জয়হা।
কিতাবতিসি রাজেন্দ্র অবরীক চরামহা।

আবগোরগুর পশ্য মৌকমপয়োরিব।
মহেন্দ্রা কুবেরমা যমসা বরুণমা।

ভদ্রানশনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ।
সত্যোক্তি প্রবীড়ামং প্রবক্ষ্যামি তুংহং
নিশানার্থং নরেষাং কল্পাশং কল্পমহসি।

বিরূপো যাবাদার্শে নায়নং পশ্যতে মুখং।
ম্যতে তাবদানানোভ্যাক্ষপক্কাং।

যদা তু মুখমার্শে বিকৃতং সৌহৃদ্বিরকতে
তন্তেরং বিজানতি আশানং নেতরং জনং।

অতীত রূপমপ্যনো ন কিস্বিরমম্যতে।
অতীত জাপন দুর্ভাগো ভবতীহ বিহেতকং।

মুখোহি রূপতাপং মাং কল্পা বাচ্য ভবতীহ
অশ্রুৎ বাক্যমমতে পুরীযিব শকুন্তলং।

পুরুষ। মাধুর্য়মিতিকেরা বলিয়াছেন,
আপনার প্রথম পুত্র জন্মবটী হইবে।

যদি মুনীকীর্তি সেই রূপ লক্ষণযুক্ত
হয়, তাহা হইলে ইহাকে সমায়ের অন্তর
পুত্র লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়,
তবে ইহার বাপের বাড়ী যাওয়াই
হিঁরি।

রাজা। গুরুর যাচা অভিকৃতি,
পুরু। (উচিয়া) বাছা আশার সঙ্গে এই দিকে
আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরা! আমাকে অন্তরে
খান দেও। (পুরুষও গৌতমীর
সহিত কীদ্রিত নিষ্কৃতি।)

[illegible]

● মহারাজ! সর্বপ্রথমা পরদোষ নিরীক্ষণ
কর, কিন্তু বিলুপ্তির দিকে আন্দোষ দেখিতে
পাওনা? যেদিকে দেবগণের মধ্যে গমনীয় ও
আনন্দবীরা, অতএব তোমার ক্ষম হইতে আবার
জন্ম, যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর নন্দন নাই।
আরও বেখ, তুমিও দেখিছ পৃথিবীতে ভ্রমণ কর,
আমি পৃথিবী ও অমরীক উভয় স্থানেই গতা-
নাত করিতে পারি। অতএব আমার ও তো-
মার প্রাক্তন মূৰ্খ ও সর্বপের প্রভেদের নাই।
আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম,
কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনে ও অ-
নীসারে ব্যতীত স্থানেও স্থানে পারি। যে মায়া-
রাজ! আমি এ স্থলে এক নৈতিক মতা দৃ-
ষ্টান্ত দেখাইয়াছি, এখন কর, কষ্ট হইবে না।
দেখ কুরুপ যাকি যে পর্যন্ত আদর্শমণ্ডলে
আপন সুখমণ্ডল না দেখে, তত ফল আপনা-
কেই সর্বাংশে ক্ষুণ্ণবাপু দেখ করে। কিন্তু
যখন আপনার মুখশী নিরীক্ষণ করে, তখন
আপনার ও আমার রূপের প্রভেদ জানিতে
পারে। যে যাকি অত্যন্ত মুখ, সে কখন অ-
ন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক দাক ব্যা-
কর, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল
কহে। যেমন শূকর নানাবিধ মুখানু মিতার
পরিভাষা করিয়া পুরীমাজ গৃহণ করে;
সেই রূপ মুখ পরিভাষা সভাশুভ বাক্য শ্রবণ
করিলে, শুভ কথা পরিভাষাপূর্বক অশুভত
গৃহণ করিয়া থাকে। আর হুস যেমন সূক্ষ্ম
দৃষ্ট হইতে আবার জলীয় পুষ্টি পরিভাষাপূর্বক
সূক্ষ্মপ নানাবিধ গৃহণ করে, সেই রূপ প-
ণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের সভাশুভ বাক্য শ্রবণ
করিয়া, শুভই গৃহণ করে। সজ্ঞানরা পরের
অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিম্ব হনেন;
কিন্তু দূর্জনরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরো-
নিষ্ঠ সজ্ঞই হয়। মাধু ব্যক্তিরা যান লোক
দিগকে, সর্বধন করিয়া মাধু সুখী হন,
আদ্যধন সজ্ঞানরা অপমান করিয়া উতা-
বিধ তুচ্ছোন্মাজ করে। আদ্যোদশী মাধু ও

এই রূপ জলন্ত উদ্ভীপনা মহাত্মারতের
নানী স্থানে আছে। এখানেও দেখুন প্র-
য়োজন হইয়াছিল। জরাজন্মের, কারাগার
হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা,
সেইকরদশী আমাধু উচ্ছ্বাসই মুখে কান্ধা-
পাত করে; কার্য আমাধু মাধু ব্যাকির নিদ্র
রুরে, কিন্তু মাধু কান্ধি আমাধু কর্তৃক অ-
মানিত হইয়াও, অতাহর নির্ণা করেন না। যে
ব্যক্তি স্বয়ং দুর্দমন, সে সমাজকে দুর্দমন বলে,
ইহা হইতে হাম্যাকর আত্মকি আছে? জঙ্ঘ
কালপুরুষী সভ্যধর্ম্যাত্ম পুরুষ হইতে যখন
নান্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাধুশ আন্তি-
কেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং
যদনুষ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর
না করে, দেহত্যাগ তাহাকে শ্রীভুক্ত করেন,
এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে
না। পিতৃগণ পুত্রকেলু ও বংশের প্রতিষ্ঠা
এবং সর্ধর্ম্মোদয় বলিয়া নির্দেশ করেন,
অতএব পুত্রকে পরিভাষণ করা অত্যন্ত
ধর্ম্ম। কামান মনু কহিয়াছেন ঐবর্ষী, লজ,
ক্রীত, পালিত, এবং কহিয়াছে এই পুত্রবীর পুত্র
মহাবীর ইহকালের ধর্ম্ম, কীর্তি ও মনপ্রাপ্তি
বর্ধন করে, এবং পরকালে নরক হইতে পরি-
জ্ঞান করে। অতএব যে নরনাথ! তুমি পুত্রকে
পরিভাষণ কর। হে ধর্ম্মপাত, আত্মকলু
মত্যাগ প্রতাপালন কর। যে নরেশ্ব! কপ-
টতা পরিভাষণ করা। দেখ শত শত কুপ খনন
অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা ঐথে,
শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক
যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঐথে; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান
করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা ঐথে;
এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক
মতা প্রতিপালন করা ঐথে। এক দিকে মহমু
অখমের ও অন্য দিকে এক মতা বাহিনী তুল
করিলে, মহমু অখমের অপেক্ষা এক মতোর
ধর্ম্মক অধিক হয়। যে মহারাজ! সমুদায়
দেব অধ্যান ও সর্গ ভীতি অবলম্বন করিলে,
এবং

ভারতের সীমান্তপ্রদেশে হতন দ্বারক
নগর স্থাপন করা, এক বার রাজস্ব
যুদ্ধকালে সমস্ত ভারতের মদীন, আবার
কুরুক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতের সৈন্যের
আগমন ও বল পরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ
উৎসবে সমস্ত ভারত বিজয় করণ, এছাড়া
নানা মহৎকার্য সাধন, প্রয়োজন। এই
থানে বহু লোকের প্ররতিভাজন প্র
য়োজন, সেই খানেই উদ্দীপনার আব
শ্যক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয়
পার্দের প্রহৃত। তৎকালিক উদ্দীপনা
তৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অশ্রীই প্র
কাশিত হইবে। ভারতপঞ্জিবিত্ত উদ্দী
পনা লতার পুষ্প ভারত গ্রন্থে রাশি
রহিয়াছে :—শকুন্তলপাণ্যানে, নল
পাখ্যানে,ভীষ্মের বচনে,ভীষ্মের ভৎ সনে
গণ্ডাবদাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে, তুর্য
বচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়
সুখে সুখে রাশিকৃত রহিয়াছে। মহা
মত্তার সমান হয় কিনা সন্দেহ। যেমন ম
ত্তার সমান ধর্ম নাই, তেমন মত্তের বদা
উৎকর্ষ আর কিছুই নাই, এবং মিত্যার তুল
অপকৃষ্ট ও আর কিছু দেখিতে পাওয়া য
না। হে রাজন! মত্তই পরকৃত, মত্ত প্রজ্ঞ
প্রতিপালন করাই পরকৃত্যুত ধর্ম, অতঃ
কৃমি মত্তা পরিত্যাগ করিও না, আর যদি
তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা
তবে আমি আপনাই এ স্থান হইতে প্রস্থান
করিব। তোমার মতিত আর কখন আশা
করিব না, কিন্তু যে দুঃস্থল, তোমার অধি
স্থান এই পৃথ এই বিস্তারিতপ্রতিভা সমা
গরা বমুদ্রার অবশ্যই প্রতিপালন করিবে
সন্দেহ নাই।

কালীপ্রসন্ন গিহের মহাভারত
১ ম খণ্ড, ১১৪, ২২৭,

ভারতের পূর্বে পূর্বে রস। কবিভার রস, দীপনার রস, ছই রস সমভাবে থাকিতে, মহাভারত এক অপূর্ণ গ্রন্থ হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই ইহাকে মহাপু-
 ন বলে, পঞ্চম শ্রেণী বলে।
 অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত
 ভীত ভাব ধারণ করে। ছুটে ছেলে গুলি
 মনিক ফুল মাতামাতি করিয়া, আগ্রহ
 পূরে কোলে গিয়া অকাতরে আগ্রহ
 প্রকাশ্য। অতি অসামান্য কার্য
 করিলে পরই একটু বিশ্রাম করিতে হয়।
 প্রীতি, পুঞ্জায়, উৎসবে, ব্রতনিমিত্তে,
 সামগ্রিকভাবে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র কা-
 র্ত্তি কাপিত করিমু, বঙ্গ সমাজ ঐক্যব-
 র্ত্তি অগ্রহায়ণ চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম ক-
 রেন। মহরমে ছই প্রহরে মাতনের পর
 শ্রম, জিরেন। ইহুদিবিরণে এমন কি
 শ্রমজিন্দা স্বপ্নরকেও ছয় দিন জগৎ
 তি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া, অবিবাহে
 প্রথম করিতে হইয়াছিল। ভারত ঘট-
 নার পর হিন্দু সমাজ যে দিন কত বি-
 শ্রাম করবে, তার আর বৈজ্ঞানিক কি? এক
 প্রাচীন কালের হিন্দু সমাজ, তাহাতে
 কলঙ্ককেন্দ্র যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ্যাপি
 ইতি ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রা-
 খিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার
 বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে,
 কিন্তু এখন আমরা পাঁচ জনকে একত্র
 হইয়া, গৌলমান্ন করিতে দেখিলে বলিয়া
 দিকি, ওখানে ভীষণ কুরুক্ষেত্র হইতেছে,
 এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহু সংখ্যক সৈন্য-
 দ্বাশ হইয়া গেল। এতদ্বারা যে হিন্দু সমাজ
 কতকাল নিদ্রা যাইবে, তাহা কে বলিতে
 পারে? যে হিন্দু জাতি, কাঁঠা বাহর-

নকারী ছেদকের শিরেও নিশীভাযান
 রক্ষ, ছায়া দান করিতে বিরত হয় না,
 ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া “অহিংসা পরম
 ধর্ম” বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দু
 জাতি স্বত্ব অপেক্ষা স্তম্ভি ভাল বলিয়া
 অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ
 কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দু জাতি দৌ-
 ডান চেয়ে দাঁড়াইয়া ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা
 বস ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল,
 শোয়া চেয়ে ঘুমান ভাল, ইত্যাদি ধা-
 রাবাহিক বচন নিচয় স্মৃতি করিয়া, আপ-
 নাদের আলস্য পরতন্ত্রতার ভুয়োভুয়ঃ
 পেরিচয় প্রদান করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি
 গোত্রাণিক শাসন গ্রাম বিবর্তি জন্য,
 কেহ বাল্যক্রীড়াকালে কেতুকপ্রিয়তা-
 বশতঃ শলভপুচ্ছে শলাকা প্রদান করি-
 য়াছিল বলিয়া, তাহার শত জন্ম পরে
 শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক-
 রিয়া; নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং
 অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া-
 ছে, যে হিন্দু জাতি অতি সামান্য রক্ত-
 পাত্তকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়া
 গিয়াছে; সেই হিন্দু জাতি এই ভয়ানক
 ব্যাপার দেখিল। ভারত বর্ষাধীন, ভার-
 ত বীরশূন্য, কুরুক্ষেত্র লুপ্তপ্রায়, যত্ন-
 বংশ লুপ্ত, গৃহবিচ্ছেদে গৃহ দক্ষ। নির্জীব
 ভারত ঘুরাইতে লাগিল। সহস্র বর্ষ এই
 রূপ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। পরশুরাম
 বংশতি বার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম কর-
 পিতে পারেন নাই, কলিযুগে গৃহবিবাদে
 সেই কর্ম সম্পন্ন করিল। পৃথিবী প্রায়
 নিঃক্ষমজিয়া। নিঃক্ষমজি ভারতে ব্রাহ্ম
 সেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন
 আর ব্রাহ্মধর্মণ কেবল হোতাপোতা,

দীক্ষা-শিক্ষা দাতা, শাস্ত্রার্থজ্ঞান নহেন,
 তাঁহার ক্রমেই সকল কার্যেই হস্তার্পণ
 করিলেন, তাঁহারাই এখন সমাজের কর্তা,
 তাঁহারাই এখন শাসনবিধাতা। সে ক-
 ঠোর শাসনভাবও আমরা এখন মনঃ-
 ক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে পারি না। নিঃ-
 ক্ষমজি, রক্ত ভীরুত সেই কঠোর শাসনে
 অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্বে হইতেই যজ্ঞের ন্যায়
 চলিতেছিল। এখন সেই সমাজের এক
 দল পৃথক হইয়া যজ্ঞচালক হইল। বিষ্ণু
 বর্ষ যজ্ঞচালকের কর্তব্য অধিভুক্ত হইয়া,
 কেবল যজ্ঞচালনাতেই সার্য সাপন ক-
 রিতে লাগিলেন। তাঁহারের পূর্বের সেই
 শাস্ত্রভাব, সেই বিশুদ্ধজ্ঞান, একটু অপূর্ণ
 পারলৌকিকভাব, ঐহিক চিন্তা অবিচলিত
 ভাব, হারাইলেন। কলচালনেই ব্যস্ত
 কঠোর নিয়ম সমস্ত এচার করিলেন।
 ছায়াবাজীর পুতুলের যে বাধীনতা আছে,
 হিন্দু সমাজের সে বাধীনতাই কখনও র-
 হিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণ
 রক্ষা ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে, পু-
 তুল তখন আর চালকের আয়তানীন
 নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমন
 সুকোশলযুক্ত, যে যদি একটর আকর্ষণ
 রক্ত ছিঁড়িল, আর একটা আসিয়া তাহা
 বাধিয়া দিল।

প্রত্যেকদিনের রাত্রির শেষ ছয় মণ্ড
 হইতে পর দিন রাত্রি প্রহরেক পর্যন্ত
 এক নিয়ম; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অ-
 ন্যাসন হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে
 চতুর্দশী তিথি নিয়ম; সপ্তাহের প্রত্যেক
 বারের এইই ক্রিয়া; স্বর্গ্য-সংক্রমণ এই
 নিয়ম; উত্তরায়ণে এই; দক্ষিণায়ণে

এই; বিশেষ চতুর্দশী এই; মলমাসে
 এই; বর্ষগতিতে এই রূপ; মাতৃগৃহ
 অনুসরণস্থাপন, অবধি, শব্দাহারের পর
 বৈধিক কাল পর্যন্ত, শুদ্ধ ব্যবহার-
 নয়, ব্যবহারনয়ন নাশায় একটা চূড়-
 পায়ে পাছকা, এই আগা পিছা বাড়ান
 ব্যবহারনয়ন এইই সংস্কার, এই বর্ষক্রিয়া
 কৃতকৃত্যপন, মাসাবধি, মৈনিক কর্ম, প্রা-
 তঃপ্রহরের পদ্ধতি, প্রতিক্রমে এই করিতে
 হইবে, এই গুলি দেশাচার, এই গুলি কুল-
 চার, এইটী এই বংশের রীতি, এটা গো-
 ত্রের পদ্ধতি, এ শাখার এইটী ধর্মশাস্ত্র
 এই রূপে জগৎ লম্বিত হইবে, এইভাবে হ্রদ-
 দিতে হইবে। এই প্রকার কাদিতে হইবে
 এই রূপে মরিতে হইবে, এটা বাবে, এটা
 থাকে না, এখানে এই ভাবে বুঝিবে
 এতকণ ধ্যান করিবে, হিন্দু শাস্ত্র পাল-
 নের জন্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের
 রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দু শাস্ত্র নহে
 তোমার প্রত্যাহ পক্ষ অতিথি ব্রাহ্মণ
 সেবা করা কর্তব্য, ভূমি চারি জনের অধি-
 কের সেবা করিতে পারিলে না, তো-
 মার প্রায়শ্চিত্ত মাঝী পূর্ণিমাতে পাঁচটী
 তুমারধবল বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান করা।
 পাঁচটা বৎসই তুমারধবল হয় না
 উত্তম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতক
 বার গায়ত্রী জপ করিয়া, অষ্টোত্তর শত
 নিম্ন ব্রাহ্মণের দান। গায়ত্রীজপকালে
 ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, বেশ্য; ইহার প্র-
 যশ্চিত্ত ব্যাহ উপবাসপূর্বক গোদাবরী
 নদীতে বাত হইয়া অকটাবিংশ স্নান-
 বিধে শুভ বস্ত্র দধন; গোদাবরী স্নান-
 কালে জীবিত শব্দ পৃষ্ঠে তোমার পদ
 স্পর্শ করিয়াছে, তাল ইহার জন্য প্রা-

শিষ্ট দক্ষিণারণে অটোশীতি ব্রাহ্মণ
বিশিষ্ট। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ
শিষ্টের তারিখিদিয়া গেল, ৫৭ নম্বরের
পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সে বাঁ-
ধিতেছে, তাহার 'বর্ষ' হইতেছে, ২৬৪।
৫৭খার পুতুল বাতাস করিতেছে; ৩ নং
শিলিকা সেই বাতাস করা ভাল করে
দেখিতেছে। নান্দাহাই দেখিতেছিল, এ
৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হই-
য়া 'মাত্র' তাহাকে বিবাক করিয়া লইয়া
গেল। এই রূপে গুহবিদগের, শাখার-
গুহবিদগের কাম্পনিক গাঁথনির উপর
গাঁথনিতে এক বৃহৎ মায়াসমু অটালিকা
হইল। উপবাসে, অপে, জাগরণে, নিত্য
চন্দ্র বায়ু, কঠোর শাসনে লোক
প্রতিবাস হইয়া উঠিল। যাজ্ঞিক্যার
শিকারকরী 'ব্রাহ্মণ' জাতির উপর
শাসনারণের দিনে 'অশ্রদ্ধা' হইতে লা-
গিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্তিতা অব-
হেলা করিয়া, লোকে যে ভক্তিতে ভগ-
বানকে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে,
সেই হারাও উপায় ছিল না। 'শাস্তিবিহীন
কর্মদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করি-
লিও মহাপাপ, এই সংস্কার অনেকের
মনে হওয়াতে তাঁহার ঘৃণিত হইয়া,
কর্ম্য বিমুক্ত-সমীক্ষণের ন্যায়, ধর্ম-
বিরোধ, পরম্পরগল্পের, ব্যাক করিতে লা-
গিল।

ব্রাহ্মণগণ শমুনরক্ষ ক্রমেই পেঁচাও
করিয়া, অসংখ্য ক্রীশ, লোকের গলে,
ধকে, হস্তপদে, কপাল লিটে, পদাঙ্ক লিটে
দিয়া, ছত্রীনেৎ ফাঁশ জড়াইয়া, দশ জনে
দশ জনে ফাঁশ জড়াইয়া, জাতিতে
ফাঁশ জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দু সমাজ এক

বড় ফাঁশে জড়াইয়া, রজ্জুর ছই মুখ
একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া,
কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন; একটি
টান গুড়ে আর তৈয়ারি দড়ি গোরা
দিয়া বাড়িয়া দেন। কুরুকরের পর
ভারতের একে বিশ্রামপ্ররক্তি হইয়া-
ছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়মবধি সমাজের
শাখায়, পাতায়া শিরেৎ প্রবেশ করিয়া,
লোকের মস্তকে, মস্তকে, কেশে, অস্থির
মধ্যগত সজ্জাতে প্রবেশ করিয়া, সব এক-
বুরে অর অর করিয়া রাখিল।

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদের জন্ম
গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে এই সমস্ত বি-
পদ জঞ্জাল দূরীকরণ করিতে হইবে।
এক এক গাছ করিয়া তার ছিড়িলে এ
কার্য হইবে না। আর এক জন আসিয়া
বাঁধিয়া দিবে, অর্ধেকের চেয়ে বেশী দড়ি
একবারে ছিঁড়া চাই। ফাঁশের দড়িতে
একটু একটু করিয়া টান, দিলেও হইবে
না। মাঝ খানে এমন একটী আঘাত করা
চাই, যে সেই আঘাতে লোক এমন বেগে
ছড়াইয়া পড়িবে, যে ব্রাহ্মণের হাত হ-
ইতে বাঁধনের ছই মুখ খুলিয়া যাইবে,
সে মুখ তাঁহার আর ধরিতেও পারি-
বেন না, এবং হৃদয় দড়ি পাকাইয়া,
জোড়া দড়ি, আর বাঁধন রাখিতে পা-
রিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি
এক বিরাট আঘাতে সমস্ত তার খণ্ডে
করিয়াছিলেন, তিনি এই অবসর, দিনে
জড়ীভূত সমাজকেই এমন একটি গু-
হতর, কেন্দ্রবিয়োজক বল প্রয়োগ করি-
লেন, যে ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন এক
বারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ

প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই,
পর্যাবসিত হইল না; ভারত সাগরের
উর্মিসমুদ্র নীলজলরাশি তাহার গতি
রোধ করিতে পারিল না, সমুদ্রের
তথ্যারিত শুভ শিখরশ্রেণী সেই বেগের
প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্যিক,
লাজক, ভিন্নসং, ভাতার, চীন, মহাচীনেং,
ব্রহ্ম, অশ্ব, মলয়ক, কোচিনেং; যব, বলি,
সুমাট্রা, সিংহলদ্বীপে সেই বেগ চালিত
হইল; সমস্ত পূর্ণ আসিয়া জীবিত হই-
ল। নব বর্ষের মধ্যে পঞ্চ বর্ষ নব ভাব
ধারণ করিল। শাক্য মুনি ব্রাহ্মণদিগের
সেই মায়াগয় অটালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমি-
সং করিয়াই, ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি
সেই চূর্ণীকৃত অটালিকার উপর কলঙ্ক ল-
ইয়া, একটি অগুরু অদৃশ্য হর্ষা প্রস্তুত
করাইয়াছিলেন। তিনি রবমণিয়াগের
ন্যায় হিন্দু সমাজকে একবারে অধঃ-
পাতে নিয়া, অন্তলে ডুবাইয়া, পড়ির
রসাতল সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কল-
ইয়া ধুইয়া, সেই খানে তাহার দোষ
ফালন করিয়া, আবার নেপোলিয়নের
ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত, পদবীতে
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০ সামান্য কথা
বলে, ভাঙ্গা সমাজ, কিন্তু গড়া কঠিন।
বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে; ভাল
পাকা মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কঠ-
োর, অতীত আয়াসসাধ্য এবং সময়ে
সময়ে হয়ত একেবারে ছিন্নসাধ্য। অতি
কাঁচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ,
তেমনি বিপদ পরিত্রাণ অনেক ভাঙ্গিতে
গিয়া, চাচা পড়িয়া যাত্রা মিয়াছে। আ-
বার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক
অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ।

সে গুলি ভাঙ্গা সর্গাপেক্ষা কঠিন কার্য।
শাক্য সিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন
ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরেই তেমনি একটা
পাকা গাঁথনির স্বরূপে সমাজকে নির্মিত
করিয়াছিলেন। এই কার্যটি যেমন অসম-
মহৎ, তেমনি অকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্ভীপ-
নার সাহায্যেই সমাজ সংস্করণে সফলতা
হইল। তাঁহার জীবনভ্রাতা, আমর
তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি
ভারতবর্ষের আর্দ্রবর্ষের নানা স্থান পা-
র্যটন করেন, সকল স্থানেই তাঁহার উদ্ভী-
পনাকে মাতিয়া উঠে। শাক্য সিংহ
মগধরাজ অর্জুনশত্রু, কোশলরাজ প্র-
সেনজিৎ ও কাশীরাজ এই তিন জন
সেই ত্রুণীকৃত অটালিকার উপর কলঙ্ক ল-
বাই করিলেন। তিনি কালাচক্র ধর্ম্মসাধনা
কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীকৃত মত বিস্তার
করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ
লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া, লোক-
ভাষা সরগর করিলেন। আর্দ্রধর্ম্মসংস্কারী
নিজ অসীম ক্ষমতাবলে পৌরাণিক অব-
তার হইলেন। পৃথিবীর (ক) অর্ধেক
লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিন-ভাগের এক
ভাগ লোক তাঁহাকে কো, বোধ, ভজনা
মহৎ নামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নামা, অভিদানে
ঈশ্বরকে অভিব্যক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি
হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া
ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ-
তিনিই জগদ্রথ মুণ্ডিতে বিরাজিত থা-
কিয়া, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুগণের সার

(ক) পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১০০ লক্ষের, আর
১০ জন বিপদ ও ৩০ জন বোধ হয়, সুতরাং ১০০ র
মধ্যে ৪০ জন বুদ্ধের দেবতা হওয়ার করে।

স্বরূপ জাতিভেদ-সংঘটিত অপ্রতিভার
লোপ করিয়া, হিন্দুয়ানির সার হরণ ক-
রিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধর্ম-
পুস্তকটোর নাস্তিকের পর্যন্ত হৃদয় আক-
র্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুজন
অমায়িক মানুষের নাম করিতে হইলে,
শীঘ্র ঐক্যের সঙ্গে তাঁহাদের নাম করিতে
হয়।

আর্ঘ্যচিত্রিত ঐত দূর পর্য্যন্ত আলো-
চিতনা করিয়া, আমরা বেশ বুঝিতে পারি-
য়াছি, যে ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহা-
নাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে
পাওয়া যায় নাকি। তিন সহস্র বৎসর
মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিস্তারিত হইতে
দিত্তি বার দেখিয়াছি নাকি। কিন্তু বুদ্ধ-
দেব যে লতা বর্জিত করেন, তাহা অনেক
দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর
অবধিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায়,
যে সৌদাম্য নারী পুত্র প্রভৃতি তাঁ-
হার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে
পর্যটন করিয়া, হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত
বৌদ্ধ ধর্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন।
নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশ-
সংকলিত বর্ণিত আছে।

শাকা সিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎ-
সর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল।
ভারতসৌভাগ্য, চতুষ্পাদ পরিস্রিত হই-
য়াছিল। সে সৌভাগ্যহুর্বা কি রূপে
অন্তর্গত হয়; শঙ্কর দিগ্বিজয়ের আমাদের
কত ক্ষতি হইয়াছে; কতই বা লাভ
হইয়াছে; তাহা বর্ণন করা এ প্রবন্ধের
অভিপ্রায় নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দী-
পনা ছিল না; ইহাই দেখান আমাদের
উদ্দেশ্য ছিল। আমরা তাহাই দেখাইবার

চেষ্টা করিয়াছি। মহাশাগর যেমন জল-
ময়, ভারত তেমনি কবিতাময়। মহা-
নাগরে দ্বীপ আছে, ভারতের সেইরূপ
উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার
কথা গুলি সংহত ভাবে প্রদর্শন করিয়া;
কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া
থাকেন; তবে আমরা তাঁহাকে তক্ষণ
ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, উপসংহার ক-
রিতেছি।

আমাদের কিছল না, তাহা দেখা উ-
চিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না।
যদিও পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম
প্রবর্তি উত্তেজক, অন্যের মনের রস উদ্ভা-
বন করা, বা অন্যকে কার্যে লগয়ান যায়,
তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা,
কবিতা হইতে পৃথক্। কবিতা রসায়িকা
আত্মগত কথা। উদ্দীপনা অন্যান্যদেশ্য।
রসায়িকা কথা। নিজনে চিন্তাই কবিতার
প্রবৃত্তি; অন্য লোকের সহিত আত্ম-
প্রেম উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকি-
লেই মন্দ আছে; নিজনে চিন্তায় অধিক
কবিতা হইল; উদ্দীপনা অতি অস্পষ্ট-
হইল; তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃ-
স্ফূর্ত জাতি। ভারতের সমাজভাগ
ভূগোল ভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের
জীবন, প্রোক্তের ন্যায়; আবার তাহাতে
স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই।
কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা
নাই, স্বতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে
হইবে? আভা বা থাকিলেও, মানুষ কবি
হইতে পারে, সাধারণ স্বথ দ্রুত বোধ
থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ
ঘটনায় বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয়।
প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের

মধ্যে আমরা দ্বীপের ন্যায় উদ্দীপনা-
প্রবল কাব্য তিনবার শ্রবণ দেখিতে পাই।
পরের ঘটনাবলি আমাদের আলোচ্য
বিষয় নহে। এত বিস্তৃত ভাষে পুরাতন
আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপে মূর্তি-
কায়, কিরূপে জল বায়ুতে উদ্দীপনা লতা

বর্জিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে
আমরা কখনই উদ্দীপনার রূপ নীতি
বুঝিতে সক্ষমতা লাভ করিতে পারি-
না। সেই উদ্দীপনা রূপের কারণ ও
সময়ে বিশেষ অবশ্যক।

বিষয়ক।

উপন্যাস।

যঠ পরিচ্ছেদ।

তারারূপ।

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল,
কল যোগাইত। কবি কালিদাস দরিদ্র
ব্রাহ্মণ, কলের দাম দিতে পারিতেন না
—তৎ পরবর্তে রচিত কাব্য গুলিন
মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন
মালিনীর পুরুরে একটা অপরূপ পঙ্কটটি
ছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাস-
কে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কার
স্বরূপ সেঘট পড়িয়া শুনাইতে লাগি-
লেন। মেঘদূত কাব্য রচনার সাগর,
কিছু সকলেই জানেন, যে তাহার প্রথম
কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর
ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উ-
চিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাস্য করিলেন,
“মালিনী মতি! চলিলে যে?”

মালিনী বলিল, “তোমার কবিতার
রস কই?”
কবি। “মালিনী! তুমি কখন স্বর্ণে
যাইতে পারবে না।”
মালিনী। “কেন?”
কবি। “যেহেঁ পিঁড়ি আছে, লক্ষ-

যোজন সিঁড়ি ভাঙিয়া যর্ণে উঠিতে হয়।
আমার এই মেঘদূত কাব্য যর্ণের পিঁড়ি
আছে—এই নীরস কবিতা গুলিন সেই
পিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙিলে
পারিলে না—তবে লক্ষ যোজন সিঁড়ি
ভাঙিলে কি প্রকারে?”
মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে যর্ণ হারা
ইবার ভয়ে ভীত হইয়া, আদ্যোপাত্ত
মেঘদূত গ্রবণ করিল। গ্রবণান্তে ঐত
হইয়া, পর দিন মদনমোহিনী নামে
বিচিত্র মালা-পুষ্টিয়া আনিয়া কবিশ্রমের
পরায়ণ হইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য যর্ণও নয়—
ইহার লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই। রসও
অস্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরি-
চ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠক
প্রশ্নী মধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন,
তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই, যে
তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙিলে, সে রসমর্ষে
গ্রবণ লাভ করিতে পারিবেন না।
হৃদয়স্থার পিতৃলায় কোননগর। তাঁ-
হার পিতা এক জন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতা
তার কোন হোলে কেশিকার করিতেন

স্বর্ঘ্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশু-কালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থ কন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া স্বর্ঘ্যমুখীকে লালন পালন করিত। শ্রীমতী, একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই আসন্ন তারারূপ। সে স্বর্ঘ্যমুখীর সমবয়সীক। স্বর্ঘ্যমুখী তাঁহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিও অযুক্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার জাতবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, অতরাং পটচিত্র বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ এক জন চিত্রকর ধনী ব্যক্তির চক্ষু পড়িয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারারূপকে ফেলিয়া গিয়াছে। তারারূপ স্বর্ঘ্যমুখীর পিতৃগৃহে ছিল। স্বর্ঘ্যমুখীর পিতা অতি দয়ালু পুত্র ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে স্নানসম্বলসহ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন নীতি রহিতে অনুমতি না করিয়া, লেখা পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারারূপ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরাজি শিখিতে লাগিল।

পরে স্বর্ঘ্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পর-কল্যে কল হইল। তখন তারারূপ এক প্রকার মোটামুটি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, অল্পকাল কল্মকাচার্যের সুবিধা করিয়া পড়িতে পারেন নাই। স্বর্ঘ্যমুখীর পিতৃ-উপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি

স্বর্ঘ্যমুখীর কাছে গেলেন। স্বর্ঘ্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রেরণি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারারূপ তাহাতে মাস্টার নিযুক্ত হইলেন। একদা, প্রাক্টইন্স এডের প্রভাবে, গ্রামেই তেড়িকাটা, টঙ্কাবাজ, নিরীহ ভাল মানুষ মাস্টার বরুণা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর “মাস্টার বাবু” দেখা যাইত না। অতরাং তারারূপ এক জন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষত তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাক্ত ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে, তারারূপ বিধবাবি-বাহ্য শিক্ষিকা এবং পৌরজনিক বিদ্যেবা-দি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং “হে পরম-কালিক পরমেশ্বর!” এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্বোপদিশী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের প-দ্বিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। যথেষ্ট হর্ষদা বলিতেন “তোমরা ইট পাট খেলেরে পুজা ছাড়, খড়ী জেটায়ের বি-বাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাদের পিঞ্জরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।” স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবারালাইটি একটি বিশেষ কা-রণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক-শূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয়

নাই। স্বর্ঘ্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলভাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায়, কোন ভয় কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতার কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখী তারারূপকে জাতবৎ ভাঙ্কিত, কিশোরী ইতার লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিলেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভয় কায়স্থের স্বরূপ কন্যার সন্ধানে ছিলেন, অন্য কালে নগেন্দ্রের পক্ষে কুন্দনদিনীর রূপভরণের কথা জা-নিয়া, তাহাই ইহা সন্তে তারারূপের বিবাহ দিবে, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পদ্মপালাশলোচন! তুমি কে?

কুন্দনগজেন্দ্রের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আইল। কুন্দন, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল, এতবড় বাড়ী সে কখন দেখে নাই। তাঁহার বাহিরে তিন মূল, ভিতরে তিন মূল। এক একটা মূলই এক একটা রহৎ পুরী। অর্থাৎ, যে সদর মূল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুর্পার্শ্বে বিভিন্ন উচ্চ লোহার বেইল। ফটক নিয়া ত্বণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, স্থনির্মিত পাথ-বাইতে হয়। পাথের ছই পার্শ্বে, গোপ-গের মনোরমরূপ, কোমল নবত্ববিশিষ্ট ছই ধপ ছুনি। তৎকালে মধ্যে মণ্ডলা-কারে রোপিত, সঙ্কুশ্ম পুষ্পাঙ্গক সকল সম্মুখে, বড় উচ্চ দেড় ভাঁজা বৈঠকখা-

না। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করি-না তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বায়ে ওয়, বড় মোটা স্কুটেড থায়; হর্ম্যত ল মধ্যপ্রস্থারিত। আলিশার উপরে মধ্যস্থলে এক মুখ্য বিশাল সিংহ, জট বিলম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা, হাঠির বরণে। এইট নগেন্দ্রের বৈঠকখানার ত্বণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডের ছই পাশে অখীং বামে ও দক্ষিণে ছই মারি। এ-তাল কোঠা। এক মারিতে দপ্তরখান ও কাছারি। আর এক মারিতে তোষ-খানা এবং ভূতাবরণের বাসস্থান। ফটকের ছই পাশে দ্বারদ্বয়কর্তৃগণের থাকি-বার ঘর। এই অর্থনৈতিক নাম “ক-ছারি বাড়ী।” উহার পাশে “পুজা-বাড়ী।” পুজার বাড়ীতে স্নানমত বা পুজার দালান; অর্থাৎ তিন পার্শ্বে অর্থ-বত দোতাল। চক বা চত্তর। মধ্যে বা উঠান। এমহলে কেহ বাস করেন না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ভূমধ্যায় হয় কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দি-য়া বাস গজাইতেছে। দালান, দর দালী-পায়ারায় পুরিয়া পড়িয়াছে, হুঠারি মাল আসাবাবে ভরা—চারি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিভিন্ন দে-মন্দির; স্বদের প্রস্তরবিশিষ্ট, “না-মন্দির।” তিন পার্শ্বে দেবতামন্দিরের প-কশালা, পুজারিদিগের থাকিবার ঘ-একটি বিশিষ্ট। সে মহলে লোকে অভাব নাই। গলায় সাদা চন্দনবিশিষ্ট বিশিষ্ট পুজারির মূল, পটিকার দ-কেহ ফলের সাজ লইয়া আসিতেছে-কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘ-নাড়িতেছে, কেহ বাকানি করিতেছে

কহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করি-
তছে। দাস দাসীরা, কেহ জলের ভার
সহ্যমিতেছে, কেহ ঘর খুঁতেছে, কেহ
পাল খুঁইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদি-
গর সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিখি-
লিয়ায় কোথাও ভস্মমাখা সমাসী ঠা-
কিয়ে জটা এলাইয়া, চিঁত্ হইয়া শুইয়া
ছাচ্ছেন। কোথাও, উত্তর হস্ত এক হাত
তুল করিয়া, দত্তবড়ীর দাসী মহলে উ-
চিৎ বিতরণ করিতেছে। কোথাও শ্বেত
জ্বরশিখি, গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী
আজ মালা দোলাইয়া, নাপরী অক্ষরে
পাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছে।
কোথাও উদয়নগর উদয়পরায়ণ "সাদু"
ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বা-
ইতেছে। কোথাও, বৈরাগীর দল শুদ্ধ-
ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়ি-
তিলক করিয়া মুসল বাজাইতেছে, মা-
য়া আঁকফা নাড়িতেছে, এবং নাসিকা
দোলাইয়া "কথায় কহিতে যে পেলেম না,
—নানা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কহিতে
"বলিয়া কীর্জন করিতেছে। কোথাও,
স্বকীয় বৈরাগিরঞ্জন রস-বলি কা-
ন্থ, গল্পনীর তালে, "মদ্যে কানের"
গোবিন্দ অধিকারীর গীত গায়িতেছে।
কোথাও কিশোরবৃন্দা নবীন বৈষ্ণবী
গীতিনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও
কবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মি-
লাইতেছে। নাট সন্দিরের মালাখানে
ভাঙার নিন্দা, হেলেরা লড়াই, বকড়া,
হাওয়ার কারতেছে এবং পরস্পর মাতা
ভাতার উদ্দেশে নানা প্রকার স্বমতা
লাগালি করিতেছে।
এই তিনটি, তিন মহল সদর। এই তিন

মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর।
কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল,
তাঁহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে
কেবল তিনি, তাঁহার ভাণ্ডা ও তাঁহাদের
নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত।
এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য জব্য সাম-
গ্রী থাকিত। এই মহল ছেন, নগেন্দ্রের
নিজের প্রস্তুত; এবং তাঁহার নির্মাণ অতি
পরিপাটি। তাঁহার পাশে খুজার বাড়ীর
পশ্চাতে মাবেক অন্দর। তাঁহা পুরাতন,
কুশির্মিত; ঘর সকল অল্প, ক্ষুদ্র এবং
অপরিস্কার। এই পুরী বহুসংখ্যক আ-
জায় কুইথকনা, মাদী মাদীত ভগিনী,
পিসী পিসীত ভগিনী, বিধবা মাদী, মদবা
ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাদীত
ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুই-
নীতে কাকসমাকুল বট রন্ধের ন্যায়,
রাখি দিবা কল কল করিত। এবং অ-
ল্প নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরি-
হাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বাল-
কের ছড়াছড়ী, বালিকার রোদন, "জল
আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁবেল না,"
"ছেলে খায় নাই" "ছধ কই" ইত্যাদি
শব্দে সজ্জক সাগরব্যব শব্দিত হইত। তা-
হার পাশে, ঠাকুর বাড়ীর পশ্চাতে, রঞ্জন
শালা। সে খামে আরো জাঁক। কোথাও
কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জালদিয়া,
পা থোচো করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে
তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটায় গল্প করি-
তেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে
হুঁ দিতে খুঁয়ায় বিপলিতলোচনা হইয়া,
বাড়ীর গৌনমস্তার নিন্দা করিতেছেন,
এবং সে যে টাকা চুরি করবার মানসেই
ভিজা কাঁঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু-

বিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন
অন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদি-
য়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভালি
করিয়া আছেন, কেননা তপ্ত তৈলে ছিটকা-
ইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা
স্নানকালে বহু তৈলান্ত, অসংখ্যমিত কেশ-
খাটি, চূড়ার অন্ধকার সীমন্ত দেশে বঁট
দিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন ক্রীড়ক,
পাঁচনী হস্তে গোক ঠোকাইতেছেন। কো-
থাও বা বড় বঁট পাতিয়া বামী, ক্ষেমী,
গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কু-
মড়া বাঁড়ার, পটল, শাক কুটিতেছে।
হাতে ঘসে, চক্ক শব্দ হইতেছে, মুখে
পাড়ার নিন্দা, ঘুমিদের নিন্দা, পরস্পরকে
গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী
অপ বয়সে বিধবা হইল, চাঁদীর স্বামী
বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড়
চাকরি হইয়াছে, সে দারোগার মুহুরি,
গোপাল উড়েয় বাড়ার মত, পৃথিবীতে
এমন আর কিছুই নাই, পার্শ্বতীর ছেলের
মত ছুটি ছেলে আর বিশ্ববাস্তব নাই,
ইরাজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ
গঙ্গা এনেছিলেন, ডাটাচার্য্যদের মেয়েদে
উপপত্তি শ্যাম ভিশ্বাস, এই রূপ নানা
বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন ক-
্ষবর্ণা স্কুলানী, প্রাজ্ঞনে এক মহান্তরূপী
বঁট, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া
মংসাজির সন্ধ্যা প্রাণ সংহার করিতে-
ছেন, জিহ্বা বিপুলোদর শরীরগৌরব
এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আশু হইতে-
ছে না, কিন্তু ছই একবার ছোঁ মারিতেও
ছাড়িতেছে না। কোন পুরুষশাল জল আ-
নিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাট-
তেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী,

পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিনী এই
তিন জনে ভুয়ল সংগ্রাম উপস্থিত।
ভাণ্ডারকর্ত্তী তর্ক করিতেছেন, যে, "যে
বৃত্ত দিয়াছি, তাঁহাই ন্যায্য খরচ—পা-
চিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচ
কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী-তর্ক করি-
তেছে, যে যদি "ভাণ্ডারের চাবি খোলা
থাকে, তাঁহা হইলে আমরা কোন রূপে
কুলাইয়া দিতে পারি" ভাতের উমে-
দারীতে অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, কা-
লানী, সজ্জুর বর্সিয়া আছে। বিড়-
লো উমেদারী করে না—তাঁহারা অক-
কাশ মতে দোষভারে পরমুখে প্রবেশ
করত বিনা অমুখতি করেন। দাসী
যাইতেছে। কোথাও অনধিকার প্রবেশ
কোন পাচী লাউয়ের খোলা, গুপ্তনের
ও পাটনের দাঁটা এক-কলার পটে-অমু-
খতি বোধে চক্ষু বুজিয়া চপ্তন করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দর মহলের পরে
পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান গের, নীল
মেঘ খণ্ড তুলা প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিক
প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাসীর তিন
মহল, ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কী
পথ। তাহার ছই মুখে ছই দ্বার।
ছই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন
মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে, আশবল, ছাতিখান
রুকুদের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখান
ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনদিনী, বিশ্বভবনে নগেন্দ্র
অগণিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে শিবিক
রোহনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন
তিনি স্বর্ঘ্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া
উদ্ভাবক প্রণাম করিলেন। স্বর্ঘ্যমুখ

তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্র সঙ্কে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সামান্য অহঙ্কৃত করিয়া, ক্রন্দনমন্দিরীর মনে প্রথমতঃ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহার পুত্রী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্তির সাদৃশ্যরূপেই হইবে, কিন্তু স্বর্য়মুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। ক্রন্দনমন্দিরীর পুত্র, স্বর্য়মুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর স্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। স্বর্য়মুখী, পূর্ণচন্দ্রের তুল্য তপ্তকান্তবর্ণবর্ণী। তাঁহার চক্ষু স্বপ্নের বটে, কিন্তু যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নের মতো দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। স্বর্য়মুখীর চক্ষু হৃদয়, অলকস্পর্শী জয়গুণসমাম্রিত, উদ্ভাসিত বক্সন পল্লবেরথার মধ্যস্থ, স্থলরূপ। তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে, ঐশ্বর্যস্বীত। উজ্জল অখট হিন্দুগতিবিশিষ্ট। অস্পষ্টতা শ্যামাঙ্গীর পুত্র, একপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। স্বর্য়মুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা পুত্ররূপিত। স্বর্য়মুখীর আকার কক্ষিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত মাধবীল-মোহর ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে চুলিতছে। নরপদ্যুতা স্ত্রীমূর্তি স্বপ্নদী, কিন্তু স্বর্য়মুখী স্ত্রীতাহার অপেক্ষা শতগুণে স্বন্দর। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিশেষতঃ অধিক বোধ হয় নাই—স্বর্য়মুখীর বয়স প্রায় বড়-ভয়ংগত। স্বর্য়মুখীর সঙ্গে সেই মূর্তির যাকান সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, ক্রন্দনসমুদ্র-তটস্থ হইল।

স্বর্য়মুখী ক্রন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, হাতাহার পরিচর্যা দাসীদিককে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে ঐ-পান, তাহাকে কহিলেন, “যে এই ক্রন্দের উদ্দেশ্য আমি তারাচরণের বিবাহ দিব।

অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইয়ের নত বজ্র করবে।”

দাসী স্বীকৃত হইল। ক্রন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। ক্রন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, ক্রন্দের শরীর কণ্ঠকিত, এবং আশ্রয় মন্তক স্বেদাঙ্ক হইল। যে স্ত্রীমূর্তি ক্রন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গবিনিময়দেহ-রূপে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই ত সেই পুণ্যপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।

ক্রন্দ ভীতিবিধ্বলা হইয়া, মুখ নিকণ্ড স্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা?” দাসী কহিল, “আমার নাম হিরা।”

অন্য পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ।

এই মনে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকা এতদূর এখা আছে, যে বিবাহটা শেষে হয়, আমরা আগেই ক্রন্দনমন্দিরীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আর ও চিরকালের এখা আছে, যে নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম স্বন্দর হইবে, সর্বগুণে জুটিত, বড় বীর-পুরুষ হইবে, এবং নায়িকার অণুয়ে চলৎ করবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীরা কেবল ক্রন্দনের ছেলে মহলে একাশ—আর প্রণয়ের লিখয়টা ক্রন্দনমন্দিরীর সঙ্গে তাঁহার কত-দূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোখা বানরীর সঙ্গে একটুই ছিল।

সে বাহা হইক, ক্রন্দনমন্দিরীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে

তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ স্বন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু স্বন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এত বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, যে তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাষার প্রবন্ধ সকল প্রায় দেবেস্ত্র বাবুর বৈঠক খানাতেই পড়া হইত। তৎসময়ে তর্ক বিতর্ক কালে নাকের সর্বদাই হুহু কক্ষিয়া রহিত যে, “কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন রিক্ত করার দৃষ্টান্ত দেখাই। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সমুখে বাহির করিব।” এখন ত বিবাহ হইল—ক্রন্দনমন্দিরীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি হিরাই মহলে প্রচার হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, “কোথা রহিল সে গা?” দেবেস্ত্র বলিলেন, “কই যে তুমিও কি ওলড ফুলদের মতো? স্ত্রীর সহিত আমাদিগের আলাপ করিয়া দাও না কেন?” তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। “দেবেস্ত্র বাবুর অল্প-রোধ ও বাক্যব্রজা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেস্ত্রের সঙ্গে ক্রন্দনমন্দিরীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয়, পাছে স্বর্য়মুখী শুনিয়া রাগ করে। এই মত টালমাটাল করিয়া বসবারাবি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, ক্রন্দকে বাড়ী সরোয়াতের ওজর করিয়া নগেন্দ্রের গৃহে পঠাইয়া দিলেন। বাড়ী সরোয়াত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেস্ত্র এক দিন ষয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য বশ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ ক্রন্দনমন্দিরীকে

সাজাইয়া আনিয়া, দেবেস্ত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। ক্রন্দনমন্দিরী দেবেস্ত্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্রন্দ কাল যোগটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কান্দিয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু দেবেস্ত্র তাঁহার নবযৌবন সঞ্চারের অধিক শোভা দেখিয়া, মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

হিয়ার কিছুদিন পরে, দেবেস্ত্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাহার বাটী হইতে একটা বালিকা ক্রন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু স্বর্য়মুখী তাহা শুনিতে পাইয়া, নিমন্ত্রণ যত্নসহ নিষেধ করিল। স্তব্রং বাবু হইল না।

হিয়ার পর আর একবার দেবেস্ত্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, ক্রন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, স্বর্য়মুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভৎসনা করিলেন, যে সেই পর্য্যন্ত ক্রন্দনমন্দিরীর সঙ্গে দেবেস্ত্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাটিল। তাহার পর—ক্রন্দনমন্দিরী বিধবা হইলেন। স্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। স্বর্য়মুখী ক্রন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া ক্রন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন। পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন। গত, কিন্তু এতদূরে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। এতদূরে বিবরণের বীজ বপন হইল।

বিজ্ঞান-কৌতুক।

১। সর উইলিয়ম টমসন কৃত জীবসৃষ্টির
যাফা।

সকলেই দেখিয়াছেন, যে আকাশ
হইতে নক্ষত্র ধনিয়া গড়ে। অনেকই
জানেন, যে বাস্তবিক, যে সকল নক্ষত্র
নক্ষত্র, নক্ষত্র কখন খসে না। ভূপতিত
হইলে গর, দেখা গিয়াছে যে, উহা বৌহ
বা প্রস্থর বা তরুণ অন্য কোন পদার্থ। এই
রূপ ধাতু বা অন্য অধ্যাত্মক অসংখ্য বস্তু
আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। উহা-
কে ইংরাজিতে মিটিংস বলে। বাঙ্গালা-
ভাষায় উল্লেখ্য নাম প্রচলিত আছে,
তাহা জমা। কিন্তু উল্কাপিণ্ড নাম
ব্যবহৃত হয়। ইহা তাহা আমরা
এখন করিলাম। ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, যে
উল্কাপিণ্ড সকল, সূর্য্যাদির ন্যায় যথার্থ
কর্মণী শক্তি বলে, গ্রহগণের ন্যায় আ-
কাশমণ্ডলে নিয়মিত যন্ত্রে পরিভ্রমণ
করিতেছে। যখন কোন উল্কাপিণ্ড পৃথি-
বীর আকর্ষণ পথে পড়ে, তখন তদ্বলে
বৃহৎ উত্তাপের সৃষ্টি হয়। অর্পাতকালে পৃথি-
বীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে বেগে গ্রহণ হও-
য়ায়, বায়ু এবং উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষে
অগ্নিপত্রি হয়। অতএব সেই জন্য।
ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উল্কাপিণ্ড
সকলকে ক্ষুদ্র গ্রহ বলিলেও বলা যায়।
উল্কাপিণ্ডের দুইটি মণ্ডল বিশেষ লক্ষিত।
এই দুই মণ্ডল পৃথক হইয়া পৃথিবীর পথ।
এক মণ্ডলের ভিতর দিয়া ১০ই ১১ই আ-
গন্ত তারিখে, অর্থাৎ গ্রহগণের শেষ ভাগে,
পৃথিবীকে চলিতে ছাড়ে। আর এক মণ্ডল
লম্বা করিবার সময় ১২ই ১৩ই নবেম্বর,
অর্থাৎ কান্তিক মাসের শেষ ভাগ। অন্য

সময় অপেক্ষা এই সময় উল্কাপিণ্ডের
অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। এই দুই
উল্কাপিণ্ডক মণ্ডলের আয়তন অর্থাৎ
তদন্তর্গতী উল্কাপিণ্ডের পথ, পণ্ডিতেরা
গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। একটা
ইউরেনাস নামক অর্ন্ত দূরবর্তী গ্রহের
পথ হইতেও বিস্তৃত। দ্বিতীয় উল্কাপিণ্ড
সমস্তির পথ আরও স্পষ্ট। লেপ্লান-
নামক সৌর জগদন্তর্গত গ্রহের পথ
হইতেও বহুদূর। ইহাও সামান্য কথা।
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন,
যে অনেক উল্কাপিণ্ড অন্য সৌর-জগৎ
হইতে আগত; অন্য সৌরজগতেও যা-
ইতে পারে।

কেহ বলেন যে, এই সকল উল্কাপিণ্ড
কোন জগতের বিপুলে চূর্ণিত গ্রহগণের
ভগ্নাংশ। এ কথাও কোন প্রমাণ নাই,
এবং অনেকে এক্ষণে এ কথা প্রত্যাখ্যান
করেন। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত বিলাতীয় ব্রটিশ
এসোসিয়েশনের সভাপতি সর উইলিয়ম
টমসন তত্ত্বাবলম্বন করিয়া, এক কৌতু-
কাব তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে চিরকাল জীব ছিল না, এ
কথা ভূতত্ত্বের দ্বারা সমগ্রাণ হইয়াছে।
বহু কোটি বৎসর পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।
পরে জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে?
বহু কাল হইতে ইউরোপে এই তর্ক হই-
তেছে। দেখা যায় যে, জীব ভিন্ন জীবের
জন্ম নাই। অনেকে বলিতেছেন, অগাধ
ক্ষতিতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু
একণে অস্বীকার্য যন্ত্রের সাহায্যে সে
সকল জন্ম দূর হইয়াছে। যে সকল জীব
পূর্বে “থেরাক্স” অথবা “মলজ” অথবা

“থেরাক্স” বলিয়া স্থির ছিল, তাহাও
অণুজ বলিয়া সমগ্রাণ হইয়াছে। যদি
জীব ভিন্ন জীবের পত্তি নাই, তবে প্রথম
জীব জন্মিল কি প্রকারে? পূর্বে জীব
ছিল না, পরে জীব আসিল কোথা
হইতে?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন “ঈ-
শ্বরের ইচ্ছা।” এই কথাসকলে উত্তর ব-
লিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন,
“ঈশ্বরের ইচ্ছা মানি। কিন্তু ঈশ্বরের
ইচ্ছা নিয়মে পরিণত। নিয়ম ভিন্ন এখা
ক্রিয়া কোথাও দেখা যায় না। জগদীশ্বর,
সকল কার্য্যই নিয়ম-প্রচলিত, অনন্য নিয়-
মের দ্বারা সম্পন্ন করেন, নিয়মবিরুদ্ধ
কোন কার্য্য করেন না। জীব হইতে
জীবের জন্ম এই নিয়ম। তবে বিনা জীবের
জীব হইল কি প্রকারে?

উল্কাপিণ্ড যে বিনতি গ্রহের ভগ্নাংশ,
এই কথা মনে করিয়া, সর উইলিয়ম টম-
সন প্রাণ্ডু প্রাণের উত্তর দিয়াছেন।
তিনি কহেন যে, অনেক উল্কাপিণ্ড বীজ-
বাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া
এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে জীবের
সৃষ্টি হইল কি প্রকারে? পৃথিবীর ভূত-
পূর্ব্ব ভূভাগে অচ্যুতান করিতেই প্রকাশ
পায়, যে এক কালে পৃথিবী অগ্নি-দ্রব
তাপ-লোভিত গোলকবাক ছিল, তত্পর
জীবের অধিষ্ঠান সম্ভব না। অতএব
যখন পৃথিবী প্রথমে জীবাদিষ্ঠান-যোগ্য
হইল, তখন তত্পর যি কোন জীব ছিল
না ইহা নিশ্চিত। তখন পর্তুত, জল,
বায়ু ইত্যাদি ছিল, সূর্য্য তাবৎক সমস্ত
এবং আলোকোজ্জ্বল করিতেন, তখন

পৃথিবী উদ্যানবৎ হইবার উপযুক্ত হই-
য়াছিল। তখন কি, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা
পাইয়া, আপনা হইতে রক্ত, পুষ্প, ফ-
লাদি, একবারে পূর্ণ শোভা ধারণ করি-
য়াছিল? না, উদ্ভবীজ হইতে উদ্ভ-
পন্ন হইয়া রক্তাদি ক্রমে পৃথিবী শাণ্ড ক-
রিয়াছিল?”

এই প্রশ্নের উত্তরে সর উইলিয়ম, আ-
গ্নেয় পর্ব্বতের উদাহরণ দিয়া বলিয়া-
ছেন, যে “বিসিউ-বিয়স বা এটনা পর্ব্বত-
নিঃসৃত অগ্নি-দ্রব পদার্থের স্রোত উৎ-
সাহবাহী হইয়া নামিলে, অচিরেই তাহা
শীতল হইয়া জমিয়া যায়। তৎকালে স-
প্তাহ হইয়া বৎসর মধ্যে স্থান হইতে
বাষ্পাদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ,
অথবা অন্য স্থান হইতে সন্মাদাগত জীবের
প্রসাদে, তাহা রক্ত জীবমন্দিতে পরিপূ-
রিত হয়। যখন আমরা দেখি, যে সমুদ্র-
মধ্যে অসংখ্য সমুদ্রপন্ন কোন দ্বীপ,
কতিপয় বর্ষমধ্যে রক্তাদিতে সমাচ্ছন্ন
হইয়াছে, তখন তাহা যে বাষ্পবাহিত, বা
জলচর জীবাদি দ্বারা আনীত বীজ হই-
তে উন্নত হইয়াছে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত
করিতে পারা যায় হই না।

তিনি বলেন, যে পৃথিবীতে সেই রূপ
জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষই সূর্য্য, গ্রহ,
উপগ্রহাদি অনবরত বিচরণ করিতেছে।
যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ জাহাজ, সমস্ত
বৎসর বিনা নাবিকবিচরণ করে, তবু
অসংখ্য মধ্যে নাবিকজাহাজে আশ্রিত হইবে।
আকাশ সমুদ্রেও তরুণ, পৃথিবীতে পৃ-
থিবীতে কখন কখন অবশ্য প্রহত হই-
বে। হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রহাত-জনিত
তাপে প্রহত গ্রহাদির অধিকাংশ দ্রব

হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কোনও ভাগ প্রবী-
জিত না হইয়া উল্কাপিণ্ড ভাবে, আ-
কাশপথে বিচরণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে
সকল ভিত্ত, জীব ও রক্ষাদি ছিল, তা-
সবহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহখণ্ডে অবশ্য
হইতাকিবে। কালে তজ্জপ কোন সৰ্বীজ
হইবেগ্রহাংশ উল্কাপিণ্ড স্বরূপে পৃথিবীতেলে-
গে, পতিত হইয়া, উদাহিত বীজে পৃথিবীকে
হইবেগ্রহণে উদ্ভিজ্জপূর্ণ, পরে জীবময়ী ক্রি-
প্রায়েগে।

প। এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট
স্বাক্ষরাদ্যপি গ্রাহ্য হয় নাই, এবং তাহার
কি প্রতীবাদ-দিবাহী বিশেষ কারণ আছে।
তাহাও, ইহার শীর্ষে শীকার করা যাক।
এই তাহা হইলে কি হইল? জীবযন্তির ত-
ব্যব কিছুই বুঝা গেল না। বুঝিলাম, এই
গ্রহ পৃথিবী, অন্য গ্রহেপ্রতিত বীজে, উদ্ভিজ্জ ও
জীবাদ্যমিষ্যিবিধিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে
কর্ম গ্রহেই বা প্রথম জীব কোথা হইতে আ-
কীর্ণ হইল। আবার জীবনে, “অন্য গ্রহেই-
কর্তিবে।” আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব,
বী সেই অন্য গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা
হইতে? এইরূপ পারস্পর্যের আদি নাই।
প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে
হইল, সেই অন্ধকারেই রহিল।

—

২। আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত।

স গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকানি-
উদ্ভাসী অধিতীয় জ্যোতির্বিদ ইয়ঙ সাহেব
যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মহুয়া চক্ষু
প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্ত্ব লনায়
এটন বা বিসিউভিয়সের আগ্নিবিপ্লব,
বরুণ সমুদ্রোচ্চাসের তুলনায় দুইক-

টাহে চুপ উছলান, সেইরূপ বিবেচনা
করা যাইতে পারে।

বীহার্য্য আধুনিক ইউরোপীয় জ্যো-
তির্বিদ্যার সর্বশেষ অস্থায়ীকরণ করেন
নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের
ব্যাখ্যা করার জন্য, সূর্য্যের প্রকৃতি-
সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি রহৎ তেজোময় গোলক।
এই গোলক, আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি,
কিন্তু তাহা বাস্তবিক কত রহৎ, তাহা
পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাই-
বে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর
ব্যাস ৭৯১১ মাইল। যদি পৃথিবীকে
এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ এমত
খণ্ড ভাগ করা যায়, তাহা হইলে, উনিশ
কোটি, ছয়টি লক্ষ ছাষিশ হাজার এইরূপ
বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল
দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এবং এক মাইল
উচ্চ, এরূপ ২৫৯, ৮০০০০০, ০০০ ভাগ
পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে
পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে
পৃথিবী যত টন হইয়াছে তাহা নিম্নে
অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯, ০০০,
০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০। এক টন
সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির
হয়; পৃথিবী যে কত, বৃহৎ, পদার্থ তাহা
বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি
বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র
দাখল, যে তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, এয়ো-
দশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত
হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হই-
তে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ
লক্ষ টু পৃথিবী চূর্ণ করিয়া একজ-করি-

লে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি
কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পৃথ্বীতন
গণনা অনুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে
সাক্ষর্য্য কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া
জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হই-
য়াছে, যে ৯১, ৬৭৮, ০০০ মাইল অর্থাৎ
এক কোটি, চতুর্দশ লক্ষ, উনম্বি সমস্ত
সাক্ষর্য্য সমুদ্র যোজন, পৃথিবী হইতে সূ-
র্য্যের দূরত। এই ভয়ঙ্কর দূরত। অনুমেয়
নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী প্রণীপ-
স্রায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে
সূর্য্য পর্য্যন্ত গায় না।

এই দূরত। অনুভূত করিবার জন্য
একটি উদাহরণ দিই। অস্য়াদ্যদির দেশে
রেলওয়ে ট্রেন যন্টায় ২০ মাইল যায়।
যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেল-
ওয়ে হইত, তবে কতকালে সূর্য্য লোকে
হইতে প্রারিত্য হইত? উত্তর—যদি নো-
রাজি, ট্রেন অবিরত, যন্টায় বিশ মাইল
চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে
সূর্য্য লোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে
ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সমুদ্রশ পূর-
ষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে অণুবৎ কুস্মাকৃতি প-
দার্থও বাস্তবিক অতি রহৎ। যদি সূর্য্য
মধ্যে অস্য়াদ্য একটি বাগির মত বিন্দুও
দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ কোশ
বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময়, যে
তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ জিহ্বা হইবার
সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাখিয়া
দেখিলেও অন্ধ হইতে পারে। কেবল সূর্য্য-

গ্রহণের সন্ময়ে সূর্য্যতেজঃ চক্ষুস্তরালে
লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা
যায়। তখনও সাধারণ লোকে, চক্ষুর উ-
পর কালিমাখা কাঁচ না ধরিয়া, সূর্য্যতেজঃ
সূর্য্য প্রতিও চাখিতে প্রারিত্য না।

সেই সময়ে যদি কালিনমাখা কাঁচ
ভাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের
দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে
কতক গুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।
পূর্ণ গ্রহণের সময়ে, অর্থাৎ যখন চক্ষু-
স্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত হয়, সেই
সময়ে দেখা যাইবে, যে লুক্কায়িত মণ্ডলের
চারিপার্শ্বে, অশ্লীল জ্যোতির্ময় কিরীটী
মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া ঘুরিতেছে। ইউ-
রোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে “করোনা”
বলেন। কিন্তু এই কিরীটী মণ্ডল ভিন্ন, আর
এক অল্পত বস্ত্র কখনও দেখা যায় না।
কিরীটমূলে, ছায়াগত সূর্য্যের অঙ্গের

উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে,
কোন ছজ্জের পদার্থ উদগত দেখা

যায়। যথা (ক)। এই সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র, যে তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই, তাহা রহস্য অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখনও লক্ষ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্যুপরি সাজাইয়াছে উক্ত হয় না।

এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্লিত শঙ্করবৎ, কখন অন্যত্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বলরক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল মিশ্র।

পণ্ডিতেরা শেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থর করিয়াছেন যে, এই সকল সূর্য্যের সংখ্যা। প্রথমে কেহ ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই সকল সৌর পর্লিত। পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিরোধ দেখিয়া, সে মত ত্যাগ করিলেন।

একজন নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল রহস্য পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেসকল পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে ভ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপত্তি হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে সেবার্ণের দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর-সেবও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু তৎক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

একজন পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, এইরূপ একখানি সৌরসেবা বা সূর্য্য দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড এদেশ লইয়া এক বিশ্ববিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে।

সেই সকল উৎপাতকালে সূর্য্যগর্ভনি-ক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয়, যে তদাধো এই পৃথিবীর ন্যায় অনেক গুণিন পৃথিবী ভূরিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত, অনেকই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্বে দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ বাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিশ্বাসকর। গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নমধ্যে ধরিতে পারে না, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স এখানে বিনা গ্রহণেও সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী, যে তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও এই সকল সৌর-সুপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন, যে সূর্য্যের উপরি ভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যত্র উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে পৃথিবী যেসকল বায়বীয় আয়রণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। এই মেঘবৎ পদার্থ, সৌরবায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আকৃত দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ পূর্কদিন বেলা দুই প্রহর হইতে এই রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভ গুলিন উজ্জ্বল, মেঘখানিও রহস্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে নিবি-

ড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূর্য্য সূর্য্যাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অগ্নি মেঘ সৌরবায়ুর উপরে পক্ষদশ সহস্র মাইল উর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য, যে প্রফেসর ইয়ঙ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪০০০ মাইল। বারিষ্ট পৃথিবী সারির সাক্ষাৎ, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টি পৃথিবী সারির সাক্ষাৎ, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর ব্যক্তিরা অন্ধবর্তী হইলে, মেঘ এবং তম লবঙ্গরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থাপরিবর্তনের কিছুই লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা ব্যক্তি তে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন, যে চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবীর্ণীর্ণ উজ্জ্বল সূর্য্যাকার পদার্থ সকল উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। এই সূর্য্যাকার পদার্থ সকল অতি প্রবল বেগে উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্গাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার! আ-লোক, বা ইচ্ছাভীর্ণ শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন গুরুদ্রবিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ প্রাপ্তি গোচর হয় না। ইয়ঙ সাহেব যখন এতাদৃশ হইলেন, তখন এসকল উজ্জ্বল সূর্য্যাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে বাহা

লক্ষ মাইল ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে, লক্ষ মাইল গতি হইলে, অতি সেক্ষেপে ১৬৬ মাইল গতি হইল। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দ্রুত গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতিবেগবান হইলেও কখন এক সেক্ষেপেও অল্প মাইল যাইতে পারে না। গর্জাচর কামানের গোলার বেগের নহুত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এক কথা বলিলে, অত্যাশ্চর্য্য হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে উঠিবে দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে উঠিবে, তাহা নিঃসন্দেহে তাহার বেগ, কিরূপ ছিন্ন হইবে জানিবে যে, যদি আমরা একটা ইটকে ঋণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষেপ হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইটকে খণ্ডে খণ্ড পতিত হয়। ইটকে বেগের হ্রাসের দুই কারণ; প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্যালোককে বর্জনান। যে বস্তু বহু তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ত্যাগ বলবতী। পৃথিবী আকাশ সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সূর্য্যের নাক্ষত্রমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদ্ব্যবস্থান করিয়া লক্ষ কোটি পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহা যখন সূর্যালোক ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি অতি সেক্ষেপেও অসম্ভব। মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে

কিন্তু বস্তু লক্ষ্য ক্রোশ উঠিতে পারবে, তাহা যে এক ক্রোশের শেষাঙ্গলজন-
কালে প্রতি সেকেন্ডে ১৬৬ মাইল ছুটবে,
এমত নহে। শেষাঙ্গ্রে বেগ গড়ে ৬৫ মা-
ইল মাত্র হইবে। আক্টর সাহেব গুড় ও-
গড়সে দ্বিখিয়াছেন, যে যদি বিবেচনা করা
যায়, যে সূর্যালোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা
নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ
সূর্যমধ্যাহ্নেতে যে বেগে নির্গত হই-
য়াছিল, তাহা প্রতি সেকেন্ডে ২৫৫ মা-
ইল। কণাগুলির এক জন লেখক বিবে-
চনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেন্ডে
১০০ মাইল অধিক বেগে নিকৃষ্ট হই-
য়াছিল।

কিন্তু সূর্যালোকে যে বায়বীয় পদার্থ
নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা
যায় না। সূর্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল পরি-
বৃত্ত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। আক্টর
সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির
করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্র-
তিবন্ধকতার যেরূপ বল, সেরা বায়ুর
প্রতিবন্ধকতার যদি সেই রূপ বল হয়,
তাহা হইলে এই পদার্থ, যখন সূর্য্যহইতে
নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি
সেকেন্ডে আনুমানিক সত্ৰ মাইল ছিল।
এই বেগ যনের অস্তিত্ব। এক্ষণ বেগে
নিকৃষ্ট পদার্থ এক সেকেন্ডে ভারতবর্ষ
গ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেন্ডে কলি-
ফোর্ন্স হইতে বিলান্ড পঁছছিতে পারে
এবং ২৪ সেকেন্ডে, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের
কমে, পৃথিবী বেঞ্চে করিয়া আসিতে
পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা
দি কোন মূংপিণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষেপ করি,

তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে
পড়ে। তাহার কারণ এই যে পৃথিবীর
মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয়
প্রতিবন্ধকতার, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে
বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে
বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে
পুনর্মীরা তাহা ভূপতিত হয়। সূর্যালো-
কেও অবশ্য তাহাই হইয়া সম্ভব। কিন্তু
মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধক-
তার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়ে-
রই মীমা আছে। অবশ্য এমত কোন
বেগবর্তী গতি আছে, যে তদ্বারা উভয় শ-
ক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই মীমা
কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া-
ছে। যে বস্তু নির্গম কালে প্রতি সেকেন্ডে
৬৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী
শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল
অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব ঈদৃশ
বেগধারী উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য-
লোকে ফিরিয়া আইসে না। সূর্য্যায়
এক্সেসর ইয়ও যে সৌরোপাংশ দৃষ্টি ক-
রিয়াছিলেন, তছুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূ-
র্যালোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্ত কাল,
অনন্ত আকাশ মাগরে বিচরণ করিয়া,
ধুমকেতু বা অন্য কোন খেচর রূপে পরি-
ণত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলি-
তে পারে।

আক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন, যে উৎ-
ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ্য ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর
হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃষ্টভাবে যে তদ-
বিক দূর উর্দ্ধগত হয় নাই এমত নহে।
যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং আলারিপিষ্ট
ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া
ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অদৃষ্ট হইলে,

আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির
করিয়াছেন যে, উহা সাক্ষা তিন লক্ষ মা-
ইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোপা-

শাণতিনিক্ত পদার্থ অদৃষ্ট বটে—লক্ষ-
যোজনব্যাপী, মনোপাতি, এক সূতন, সৃ-
ষ্টির আদি।

আকাশিকা।

(সুন্দরী।)

কেননা হইলি তুমি, যমুনার জল,
রে প্রাণ বুলন্ত।
কিবা কিবা কিবা রাতি, কুলেতে আঁচল পাতি,
ঋতম শুনিলারে, হোর সুধুর।
রে প্রাণ বলন্ত।

২

কেননা হইলি তুমি, যমুনার জল,
মোর শ্যামধন।
দিবরাত্রি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য হোর, নৃত্য দরশন।
ওহে শ্যামধন!

কেননা হইলি তুমি, মল্লর পবন,
ওহে ত্রুজরাজ।

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিখাসে যাইতে মোর, ছাড়রে মাখ।
ওহে ত্রুজরাজ।

৪

কেননা হইলি তুমি, কানন কুমুদ,
রাধা প্রেমাধারিণ
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, হারিবারে হোরে চুলে,
চিকন পাখিরা মাঝে, পরিভাষা হার।
মোর প্রাণাধার।

৫

কেননা হইলি তুমি, মাদের কিরণ,
ওহে স্বাক্ষরেশ।
বাতায়নে বিঘনির্দার, বসন্ত খবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রব্রেশ।
আমার প্রাণেশ।

কেননা হইলি তুমি, চিকন বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তোয়গিছে, তোমাগরে পরি কালিছে
রাখিতাম যত্ন করে, ছন উপরি।
পীতাম্বর হরি।

৬

কেননা হইলি শ্যাম, যমুনার জল আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতোম আশি যথা, দেখিতে পেতেম তথা
মনোহর এ সংসারে, বুঝি মনোহর।
শ্যামাল সুন্দর।

(সুন্দরী।)

১

কেননা হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ছুটিত আমি, রাখিকা কমল।
হৌবনেতে ঢল ঢল।

২

কেননা হইনু আমি, হোমার তরঙ্গ,
উপন নন্দিনী।
রাখিকা আসিলে জলে, নাচিরা মিলেজল জলে
দোলাতেম দেহ তার, নরীনি নরীনি।
যমুনা জল ফানীনি।

৩

কেননা হইনু আমি, হোর অমুরুপী,
মল্লর পবন।
ভূমিকাত কুঁতুলে, রাখার কুঁতল দলে,

কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন।
যে আমার প্রাণ ধন ॥

৪

কেননা হইনু যায়। দুসমের দায়,
তবুও জুযায়।

ই একনিশা স্বর্ণ মুখে, বস্ত্রীয়া রাখার বুকে,
তাজ্জিতমি নিশি খেলে, জীবন যাতন।

যেথি প্রিয় প্রদান
৫

কেননা হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাখার হরণ।

রাখার শরীরে খেতে, রাখার চাকিরে রেখে,
কুসারমে রাখারূপে অন্য জন মন।

পর জুসান কেমন ?

৬

কেননা হইনু আমি চিত্রন বসন,
সেহ আরবসন।

তোমার আদেতে খেতে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঙ্গল হইয়ে দুলে, ফুঁ ইয়ে চরণ,—
চুই যে চাঁদ বদন।

৭

কেননা হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সমসারে সুন্দর।

কে হতে না অভিনাবে, রাখা বাহা ভাল বাসে।
কে মোহিত নাহি চাকে, রাখার অন্তর—
প্রেম-সুখ রক্ষাকর ?

মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়।

মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই অভিনাব, যে তাহারা জনসমাজে প্রগতি এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিতে অথবা এক জাতিতেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। কেবল মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হইতেছে না। যে সমস্ত গুণের সমাবেশ থাকে মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আশাশীল। সেই সকল গুণ এবং উপায়-প্রণালী সর্বদা মনোবশে চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য বা করিয়া, কেবল মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা করা, বাসনের চন্দ্রধারণের আশার ন্যায়-নিষ্ফল। অতএব এই সংস্কার, জ্ঞানজিহ্বার মনে বহুদূর আছে, সেই জাতিই মহত্ত্ব লাভ করে, এবং যত দিন এই সংস্কার অবচলিত থাকে, তত দিনই তাহাদিগের প্রীতিজিহ্বা এবং উন্নতি সাধন হয়; ইহার অন্যথা হইলেই পত-

নদশা আসিয়া উপস্থিত হয়।

১। আসাদিগের দেশে একদেবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহৎ হইবার বাসনা লোকের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং শ্রমশীলিত সুখী পুরুষদিগের ন্যায় অনেকের মনে সেই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সেই বাসনাকে পরিণামে, ফলপ্রদ করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই বিষয়ের তত্ত্বা-লয়সাধন করা তাহাদিগের কর্তব্য। সেই জন্যই আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই সমস্যাটা অতি গুরুতর। ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া উঠা অনেক পরিশ্রম, বিবেচনা এবং আয়াসসাধ্য। এ বিষয়ের সম্যকরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠি, আসাদিগের তামূশ ক্ষমতা নাই, এবং তাহাও আসাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রতি

লোকের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা মনোবশে এই চিন্তাকে স্থান দান করেন, এবং ইহার তত্ত্ববিধে মনোবোণী হইয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যোগী হন, ইহাই আসাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা এ বিষয়ের বৎকিঞ্চিৎ বাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

২। মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই কথা মীমাংসা করিবার জন্য ইতিহাসই প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে, কিম্বা এখনও বাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই প্রায় একটা সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটা প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে রূতসংস্করণ ও সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তদর্থে প্রাণ পর্যন্ত পণ করা ইহা নিয়ম। দেশ-কাল এবং জাতিভেদে সেই প্রবৃত্তিটা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কখন বা মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ, কখন বা ধর্মস্বরাঙ্গ, কখন বা জ্ঞানতৃষ্ণা, কখন বা বাহুবল-গৌরব, কখন বা অর্জুনস্পৃহা ইত্যাকার কোন না কোন একটা প্রবৃত্তি সমাজ-সঙীতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফলাফল সর্বত্রই প্রায় এক রূপ হইয়া থাকে। সমাজের সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া চলিতে যত্নবান এবং তদর্থ জীবনসর্বস্ব পরিহার করিতে প্রস্তুত না থাকায়, সেই জাতিই লোকদিগের মধ্যে একতা, গতিমুখতা, একাগ্রতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম

বলিয়া, সকলেরই মনে একটা স্পষ্ট জন্ম, এবং সংকপিত কাগমী সকল কুরিবার নিমিত্ত পুরুষের প্রতি বিশ্রাস করিয়া, সকলেই কায়মনোবাক্যে তদনুকূল আচরণ করিতে থাকে, এবং প্রতিরাং এই সমস্ত গুণের সহযোগে মহত্ত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, আরব, ভারতবর্ষ এবং বর্তমান ইংলণ্ড ইহার উদাহরণস্বরূপ।

গ্রীস—প্রাচীন গ্রীকেরা জগতের মধ্যে এক অপূর্ণ জন্মিত ছিল। কোন জাতিই আজ পর্যন্তও ইহাদিগের তুল্য মহত্ত্ব লাভ করিতে পারেনি। মুক্তি, বিক্রম, সাহস, বিদ্যা, শিপিণ্ড, সাহিত্য এবং দর্শন, সকল বিষয়েই ইহার। আশাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের কীর্তি দেখিয়া, আজ পশ্চিম ও পৃথিবীর সমস্ত লোক চমকিত হয়। আজ কাল যে সকল ইউরোপীয় জাতিদিগের এত প্রবৃত্তি, তাহারাও অনেক বিষয়ে সেই গ্রীকদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাঁকী, শিপটন-পুণ্যপ্রভৃতি অনেক বিষয়ে এখনও ইহাদিগের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। গ্রীকেরা "এই অল্পম সমস্তই ছিল অল্প কালের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে তাহাদিগের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং খ্রীষ্টের ৩২০ বৎসর পূর্বে তাহারা সংসারলীলা স্বরণ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে সকল কীর্তি করিয়া গিয়াছে, সে সকল ভবিষ্যৎ আখ্যায়িকার ধান কলমে, শরীরে মোষাষা হইয়া উঠে।

গ্রীকদিগের মহত্ত্বতা বর্তা এবং উৎ

কর্মপ্রিয়তাই এই অপূর্ণ উন্নতির প্রধান কারণ। উৎকর্ষজনিত আনন্দই যেন তাহাদিগের একমাত্র বাস্তবীয় পদার্থ ছিল। তাহাদিগের মন ক্ষুদ্র বিষয়ে ধাবিত হইত না এবং যখন যে বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের অস্বাভাবিক জাগ্রত, তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন না করিয়া, তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন বাহ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখন তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তুত পণ্যমণ্ডল দূর করিয়া, গ্রাম্য কোমলাভ ঘৃণিত এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিল, যে ছই সহস্র বৎসর গত হইল, আজিও সেই সকল প্রস্তুতগরী প্রতিমা এবং গৃহাদি ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, যখন মন বিম্ময়রসে মুগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদিগের ইতিহাস, দর্শন এবং নাট্যাদি পদার্থও ইউরোপখণ্ডে আদর্শরূপে হইয়া গিয়াছিল। তাহারা নিজে অতি ক্ষুদ্র ছিল। সর্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল, এবং সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করাই যেন, তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরও সেইরূপ প্রশাসন এবং মহাশূভ ছিল। আইনজ্ঞ এবং রাজ্যের জড় ব্রহ্মাণ্ড গয় করিবার ইচ্ছা এবং অরিস্ততলের মনোব্রহ্মাণ্ড কর-তলস্ত করিবার ইচ্ছা, উভয়ই তুল্য এবং তাহারা উভয়েই স্বাভাবিক বিবেকে মলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের পণ্ডিতগণও জ্ঞানের জগততে দিগ্ভ্রমণ আলােকময় করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি আঞ্জিও অপ্র-

তিহত হইয়া, ভূগুণ্ডল এলীপ্স রহিয়াছে। যে সক্রেটিস জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানবিতরণের জন্য বিবতক্ষণে অপমৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল লোকে আজিও তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। মহামতি প্লেটোর নিকট আজিও লোকে মনোদরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এবং পণ্ডিতগণও লক্ষ্যকীর্তি অরিস্ততলের বাক্য আজিও শিরোধার্য্য করিতেছেন। গ্রীকদিগের সাহস, ধীর্ঘ এবং রণনৈপুণ্যও ইহার অস্বরূপ ছিল। যে দিন পারস্যের সম্রাট গ্রীকদিগের পবিজ মাছুচুসিতে পদপার্ষণ করিয়া, তাহাদের সর্বাঙ্গস্থিতে দারুণ প্রহার করেন, সেইদিন অবধি গ্রীকদিগের সৌভাগ্য স্বর্ঘ্য সচস্র কিরণ বিস্তার করিয়া উদয় হইয়াছিল। কেবল আধিনিয়েরাই দর্শন হাজার দৈন্য হইয়া, মারাথনক্ষেত্রে ছই লক্ষপারস্যকে পরাজয়, এবং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করে। পার্সেলির যুদ্ধের কথা শ্রবণ হইলে সর্গস্বরীর লোমকর্ষণ হয়। সেই প্রাচীনমহাবীর গিরিসম্মুখে কেবল তিন শত জন স্পার্টীয় বীরপুরুষ উদ্বেল গাংরতর-জ সৃশ্ব বিপক্ষসেনাকে স্বদীর্ঘ কাল প্রতিরোধ করিয়া, সম্মুখমরে শয়ন করে। সেই দিন হইতেই গ্রীকদিগের উন্নতি দিন দিন পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং উহার বল, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সভ্যতার অস্বীকার হইয়া; মাছুচুসিকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া, পরজাতের মধ্যে অস্বীকার হইয়া উঠিয়াছিল।

রোম—বাহুবলগৌরব ও অর্জুনস্বা

হইতে যে মহত্ত্বের উদয় হয়, প্রাচীন রোমেরা, তাহারই উদীয়নতল। বীরত্ব, সাহস, এবং রাক্ষসীতরুশলতা, কি প্রাচীন, কি বর্তমান, কোন জাতিতেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোমনগরী অস্বীকার হইবে, রোমনগরবাসীর নাম, আর কিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, লাতিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাতল শোভিত হইবে, ইহাই উহাদিগের মহাসম্পদ ছিল। এই সম্রাটের সাধন জন্য, উহার মন প্রাণ নষ্ট করিয়া, অন্ধ ভাগেরও অধিক বসুমতী দ্রব করিয়াছিল। পূর্ব দিকে পার্শিয়া, (একনকার পারস্য এবং কার্ভুল), পশ্চিমে হিম্মানী, (একনকার স্পেন এবং পর্তুগেল), উত্তরে দাচুবাখল, (একনকার জর্ম্মন রাজ্য), এবং আরো উত্তরে রুটনদ্বীপ (আধুনিক ইংলণ্ড), এবং দক্ষিণে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্য রোমেরা একজন্মে আধিপত্য করে। উহাদের শাসনপ্রণালী অতি পরিপাটি ও স্বশাসনাবদ্ধ ছিল এবং রাজ্যের সম্ভাররূপে লক্ষিত হইত। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে, একদে কত শত প্রধান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র এবং বহুভাজনদিগের ব্যবস্থা একদে সমস্ত ইউরোপখণ্ডে আলােচিত হয়। রোমসাম্রাজ্যের একা, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় যে, কিসে, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় যে, কিসে হইতে পারে।

আরব—আরবেরা প্রস্তুত ধর্ম্মাচ-

রাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে। খ্রীঃ ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ জন্মিবার পূর্বে আরবেরা অসভ্য, ক্রীড়িত ও যাবাবর ছিল। এরালাবদ্ধ সন্যাজের নিয়মাদীন ছিল না। পরস্পর ঐশ্বর্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল, নগর, গ্রাম কিম্বা পল্লীতে থাকিয়া, শাসিক ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্যদ্বারা দিনপাত করিত। কিন্তু অনেকই কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসে দেখে স্থায়ী হইয়া, বাস করিত না। বিবাদ, বিসম্বাদ এবং প্রশলীলতাদিগের প্রতি অত্যাচারের রত হইয়া জীবিকা নিরাস করিত। এই অসভ্য অসম্মদ মানবদিগকে মহম্মদ, এক অলৌকিক ধর্ম্মপ্রদে বন্ধন করিয়া যান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে এক খানি অসুস্থ গ্রন্থের স্মৃতি করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে একগু একা এবং একাগ্রতা সংস্থাপন করেন, যেন মেঘবকল মধ্যে, সেই অসভ্য ক্রীড়িত আরবেরা যুগে যুগে হতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সমস্ত বসুম্মদকে উদরসাৎ করে। পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য প্রায় ব্রহ্মদেব অলৌকিক বদ্বিগের হস্তে সিংগিত হয়। এইরূপে বহুলা উহার পৌরুষের সহিত পৃথিবীতে একাধিপত্য করে। এখনও ইউরোপ, আসিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডের বহুভর স্থানে মুসলমানদিগের নাম ও আধিপত্য দেখা যায়। রহিয়াছে। মহম্মদ প্রকৌশলী স্মৃতি করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভূগুণ্ডের কোটি কোটি লোককে শাসন করিতেছে। আর সকল ধর্ম্মই প্রায় অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছে; মুসলমান ধর্ম্ম

এখনও সজীব আছে। পার্শ্বিকগণ, এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আরবেরা কেবল বৈদেশিক এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প এবং গণিতাদির বিবিস্তরণ উন্নত হইয়াছিল। ফলে কোন একটি প্রবল মনোরতিকে অবলম্বন করিয়া, একবার সৌভাগ্যকামীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, সমাজের শ্রীবর্দ্ধক সকল বিষয়ে অগ্ণনা হইতে উন্নত এবং পরিবর্তিত হয়। আরবরা ইতিহাস দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পোরে। কেবল বিজিত, জেতবী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেই মহুযাজাতির মহত্ব হয় না। আরবেরা আজম মহাবলবান এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল; আত্মসম্মতি, মিলি প্রভৃতি কোন জাতিই বহু আয়াসেও তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই; তথাপি যতদিন মুসলমান ধর্মসূত্রে তাহাদিগের একতা বিচ্ছিন্ন না করিয়াছিলেন, এবং অনন্যকাম হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে এক মহাসম্মুখে প্রতীতি করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারতবাসীরা যে দিকরূপ উন্নত, প্রতিভাশ্রিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া উজ্জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত আর্যবংশের অংশবাসী। এক্ষণে হেয় অপকৃত্ত অপদার্থ, ভ্রমকর্ম, এবং অসার হইয়াছি। তথাপি আমরাই শ্রেষ্ঠ জগদান্য মহানতি পূর্ণপুরুষগণের কথা স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয় প্রশান্তি উভগু হইয়া উঠে। এখনও সেই হাদ্যাদিগের কীর্তি ও গৌরব জাবিয়া,

অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের মহত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কতবার অনুসন্ধান করিয়া থাকি? ইদানীং ব্রাহ্মদিগকে নির্দা, এবং তাঁহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করবার হেতু বলিয়া নির্দেশ করা, একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের হইতে ভারতবাসী আর্যবংশীয়েরা মহত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং কাহাদিগের কীর্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাতত্ত্ব নাই; কিন্তু বৎসামান্য বাহা আছে, নিবিশিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মগণরাই সেই মহত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া, তাঁহারা সর্বভাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্য জন্মগণকে সমগণ করিয়া, তাঁহারা কেবল জাতীয়ের এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালান্তাপিত করিতেন না। জানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমগিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অল্পমাত্র অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা! গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পাণ্ডিত্যবলে বিশ্বজনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মগণলীর প্রতি অবচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজ

বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। কদ্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত পূজা শাস্ত্রকলাপকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অশ্রুভব করিত। এখানে আমাদের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মাছুজুনিমেষ এবং বাহুবলগৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রকৃতি তৎকালে সমাজগণলীকে সম্পৃক্ত করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রভৃতির প্রাধান্যে তৎকালের জনসমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মদিগের প্রতি অবচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু, এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মহত্বের অন্তিম কারণ। কালধর্মের ব্রাহ্মণেরা মতিভ্রম হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রভৃতিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কি সে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মহুয়া দ্বারির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রভৃতির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে, সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড—অর্জুনপুহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ব হইয়াছে। 'অতি' প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অর্জুনপুহার উদ্ভেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পুরাণাধারী হ্রদ্বান্ত নর্মানজাতি, ইউরো-

পের উত্তর ঋতু হইতে আসিয়া, এদেশের আদিবাসী স্কসনদিগকে পরাজয় করিয়া, তাহার বাস করে। কাশসহকরি নর্মান এবং স্কসন জাতি মিশ্রিত হইয়া, একগণকার ইংরাজদিগের উৎপত্তি হয়। মহাজেই নর্মান জাতির দ্বন্দ্বস্ত অর্জুনপুহার উদ্ভাদিগকে অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র পার্শ্বভাগ এবং অল্পসংখ্যক দ্বীপ। মহুযার জীবিকানির্ভার এবং সুখ স্বাস্থ্যের উপযোগী জল্য মাংসই তাহার ভাদৃশ সজল নহে। স্বতরাং তাহার ক্ষয়ধর্মে, উদ্ভাদিগকে পৃথিবীর নান্য স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সংসারভোগ স্বচ্ছন্দে নিকা হইবে, অতুষ্ক ইংরাজেরই মনে আজম এই চিন্তাটী বলবতী হইয়া আসিয়াছিল, এই চিন্তার অনুপ্রাণী হইয়া সকলেরই চিত্ত, ক্রমশঃ এক দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সকলেরই বল, বুদ্ধি, বস্তু একপাখাবলম্বী হইয়া উঠিল। উদ্ভাদের মধ্যে, সমগিক সাহসিক পুরুষেরা অমণ্ডোয় দ্বন্দ্বস্ত পারাবার অতিক্রম ও বিদেশ পর্যটনপুঙ্খল অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাপিত হইতে থাকায়, 'সকলেরই মন ক্রমে বাণিজ্য পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অর্থোপার্জনই উদ্ভাদিগের একমাত্র কাম্য এবং উপাধ্য হইয়া উঠিল। সকলেই তখন নিরতিশয় উৎসাহের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় নিরন্তর হওয়ায়, বাণিজ্য প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেশে অর্জুনপুহার উদ্ভেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পুরাণাধারী হ্রদ্বান্ত নর্মানজাতি, ইউরো-

বাসীদিগের মনে বহুদূর হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিগোঁবর এবং পাতন্ত্র্যাপ্রিয়তার আধিক্য হইয়া আসিতে লাগিল। এই রূপে বাণিজ্য লক্ষ্মীর একান্তিক উপাসনাই ইংলণ্ডের মহত্বের মূলীভূতি কারণ। ইংলণ্ডেশ্বরীর অতুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারমধ্যে অমূল্য রত্নরূপ যে ভারতভূমি, তাহাও ঐ অর্জুনপুংহার আত্মবিক্রম ফলস্রাভ। এই রূপে ফরাসী, জার্মান, স্পেন অত্রুতি রাজ্যের ইংলিশ অশ্বঘণ করিলে, আরো বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কোন একটি প্রযুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তাহার চরিতার্থতা সাধনে কৃতসম্পূর্ণ হওয়াই মহুযাজাতির সম্ভব লাভের একমাত্র উপায়। পুরাকালে যে যে জাতি মইষ লাভ করিয়াছে, সকলেই এই অপরিহার্য নিয়মের দশবর্তী হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহাই যথ্যে আছে। কেবল বিলুপ্ত এবং বুদ্ধিমান হইলেই অথবা কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই, মহুযাজাতি কখন মৎস্য হয় না, এই কথাটা সর্বদা আসামিদিগের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমরা মহৎ হইতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যে নিয়মে মহুযাজাতি মহৎ হয়, তাহা অবলম্বন না করিলে, সম্ভবই নিরফল হইবে।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকের আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসীরা আর কখন মহৎ হইতে পারিবে না। ইহা কত দূর সত্য, তাহার নির্ণয় করা, মহুযাবুদ্ধির অসাধ্য। একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে, তাহাই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে

আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে এক বার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্বার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমকদিগের কীর্তি মন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা বহু কালাবধি হতভ্রষ্ট এবং ভীনারস্ত হইয়াছিল; কিন্তু সম্রাট পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া, একটা প্রযুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভাবিত হইয়া, জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক আছে মতঃ, ইহা বহু বিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম প্রবল আছে। তথাপি সমগ্র উপযোগী একটি প্রযুক্তি, সকলের অনেকে আকর্ষণ করিলে, এই সমস্ত লোক যে এক সম্মুখে প্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন একটি জাতি যে পুনরুজ্জীবিত হইয়া, সমুদায় ভারত ভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবে না, তাহার কোন হেতুই দৃঢ় হয় না। প্রাচীন গ্রীস অঞ্চলও এরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আখিনীয়েরা গ্রীকনামের সার্থকতার নিষিদ্ধে কি না করিয়াছে। ভারত ভূমির একদিকার এই সমস্ত বিবিধ জাতির মধ্যে কোন

জাতির যে পুনর্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতভ্রষ্ট হইয়া, নিশ্চেষ্ট থাকার ভাব নাহে। সকলেরই একতাবিধানে

উত্তরচরিত।*

প্রথম সংখ্যা।

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই প্রণত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি তত্ত্বি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদেশীয় লোকের যে রূপ অজ্ঞান, উত্তরচরিতের প্রতি, তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে “কবিত্বশক্তি অসুচারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ বোধ হয় অসম্ভব বোধ হয় না।” আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না, যাহার হউক, তাঁহার নাম ব্যক্তির লেখনী হইতে এরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অসম্ভব। শে সাধারণের কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগর যদি উত্তরচরিতের মর্ম্মাভা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না,

তবে যত্ন বাবু, মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন?

বাস্তবিক, যত কবি প্রাণিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিরিণের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরপেশম, বিল, বিল ভ্রমের যে রূপে প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষণীয়র, এক্সিলস, সফোক্লস, ক্যালিডেম, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না ইউন, তাঁহার দের নিকটবর্তী বটে।

সেক্ষণীয়র পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও, ইউরোপে তাঁহার সমুচিত সম্মান্য অপেক্ষা হইয়াছে নাজ। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব হইয়াই বৎসর পর্যন্ত, কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য নাটক সকলের মর্ম্ম বুঝিতে না। ড্রাইডেন, পোপ, জনসন, অত্রুতি সকলে যত্ন কবি, এবং সকলেই সময়ে সেক্ষণীয়রের প্রদত্ত সমান

* উত্তর চরিত। বালা না অনুবাদ। শ্রী নিমিষ চন্দ্র মৌখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর এম. এ. বি. এল. কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রায়ত্তমজ।

লোচন। করিয়াছেন, এবং সাধাচার্য্যসারে প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মৰ্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বহুতর নিজে অতি প্রধান কবি—ভাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সেকপীয়রের কিছুই মৰ্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। রূরং তিনি অনেক নিন্দা এবং উপহাস করিয়াছিলেন। এই ইংল-ণ্ডীয় কবির বার্থ মৰ্ম্মাভি। প্রথমে ইংলণ্ডে হয় নাই—গ্রেগেজ এবং অন্যান্য জ-র্মানগণ আধুনিক সেকপীয়র-পুজার শত্রুকর্তা।

যদি সেকপীয়রের এইরূপ হইল, তবে ভবভূতিরও যে এককাল সমুচিত মৰ্ম্মাভি হয় নাই, ইহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। আমরাও যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারি, এমত নহে, বিশেষ এই পক্ষে স্থান অতি অল্প। কিন্তু এই সময়ে নুসিংহ বাবু কর্তৃক ইহার এক-খানি বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং তাঁনি সা-হেব কর্তৃক একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রচার হইয়াছে, এই উপলক্ষে আমরা উত্তরচরিত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসম্বন্ধে পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যানবর্ণন-কর্তাদি সকল ভবভূতির স্বকপালক-ল্পত। রায়গণে যেকুর বাঙ্গালিকির আ-শ্রমে সীতার বাস, এবং যে রূপ ঘটনায় পুনর্মিলন এবং নিলনাগেই সীতার ভূতল

এবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচ-রিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, কবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আশ্রয়জ্ঞানের পরি-চয় দিয়াছেন, কেন না বাহ্য একবার বাঙ্গালিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন কবি তাহা পুনর্দর্শন করিয়া প্রশং-সাভাজন হইতে পারেন? ভবভূতি অ-থবা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন কবি ঐদৃশ শক্তিমান নহেন, যে তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন। যেমন ভব-ভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমা-নি সেকপীয়র তাঁহার রচিত গ্রন্থ সক-ল নাটকেরই উপাখ্যান ভাগ অন্য গ্র-ন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ণ কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেকপীয়র অধিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরি-মাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন মহাশা-না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহই তাঁহার সম্মে কবিশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল্য করিয়ালা। বিস্তার-করিলেন, সেখানে পূ-র্ণগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব লেখকদিগের অনুবর্ত্তা হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও

বক্তব্য, যে কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান ভাগ তিনি হোমার হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রৈহ্মণ্ড ও ক্রে-সিদা নাটক গ্রহণের কালে, ভবভূতি যেকুর রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেকপীয়রের ন্যায় আ-পন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্দাসনরত্ন অবলম্বন করিয়া, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণ-য়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন, যে কবিগুরু বাঙ্গা-লিকির সহিত কদাচ তুলনাকার্য্য হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বা-ঙ্গালিকে প্রণামও করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে অশ্বমেধীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োণি নিষিদ্ধ বালিয়া, ভব-ভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তত্ত্ব শোকাবহ ব্যাপার বি-ন্যস্ত করিতে পারেন নাই। ইহাও এই নাটক অসম্পূর্ণগণ বলিয়া বোধ হয়। কবি যদি সীতার জীবননাথযোগ্য পরি-ণাম অগ্রহণ করিয়া নাটক সমাপ্ত কর-তেন, এবং অন্যান্য কয়েকটি দোষের প্রতীকার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এই নাটক ভারতভূমিতে আশ্চিত্য হইত।

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে গ্রন্থ-নাঙ্ক বঙ্কীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ

পরিচিত, কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-পাধ্যায় মহাশয় এই অল্প অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিশক্ত-কৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্বরত্নস্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে, যে কবি সংকো-পে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রামসী-তার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অল্পভব করিতেনা পারিলে, সীতা-নির্দাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নী। সীতার নির্দাসন সা-ধা স্ত্রীবিষয়ক নহে। স্ত্রীবিষয়ক নাই কেবলক—সম্মতী। যে কবি আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়ে সন্দেহ হয়। যে বাল্যকালের অক্ষিচর সান্নি-কৈশোরে জীবনস্বর্ষের প্রথম শিক্ষাদাতা, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্যের প্রতিমা, বাল্যকে যে জীবনাবলম্বন—ভ্রাতা বাস্ক বা না বাস্ক, কে সে স্ত্রীকে ভাগ কর-তে পারে? ইহা যে দানী, শয়নে যে অঙ্গসার; বিপদে যে বন্ধু, যোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, বাসনে যে সমীচীন বিন্ধ্যসী-বে শিখা, যথার্থে যে গুরু;—ভাল বাস্ক বা না বাস্ক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্র-বাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে স্বপ্ন, যোগে যে শুষ্ক,—অর্জনে যে লক্ষ্মী, বাসে যে বশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে—যে শো-ভা—ভাল বাস্ক বা না বাস্ক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে? পত্নী বিসর্জন তা-হার পক্ষ কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার

* ইহা গ্রন্থভাষ্য পূর্ব্বকেনা নমোবাক্য প্রমাণ্যহে।
প্রমুখবান।

† দুঃখানন বধো যুদ্ধে রাধারত্নাধিপতিনঃ।
বিবাহো ভোজনং শাণ্ডোৎসবো মৃত্যুরত্নভাষা।
সাহিত্যদর্পণে।

যে, রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পঞ্জীর
লক্ষ্মীমাতে অশ্রুচিহ্নিত, জানে না যে,

“সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
সুখোদাধো নিদ্রা বা ক্রিয় বিহবিসম্পদ কিম্ব মদঃ।
কবঃ সপর্ণশে সপর্ণশে ধম্বি পরিমুদৈন্দ্রিয়গোপো,
বিকারকক্ষমাং ভ্রময়তি সমুদীঘরতি চ ॥”

যাহার পক্ষে,—

“হানমা জীবকুমুদাং বিকাশনানি,
সুখপূর্ণানি সন্তলেভিমাংসোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সত্ত্বাক্ষহাফ্যাং,
পশ্যিষ্যতানি মনসত রসানয়নানি ॥”

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপ-
শান,—

“যাবিবাহুসমরাসাদগুণে বনে,
শেষশব্দে তরুন ঘোরনে পুনঃ।
রাপহেতুধরুনঃপ্রিতোহনয়না,
রাসবাহুরূপধানমেঘতে ॥”

যার পত্নী—

“একমে আদি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখ
ভোগ করিতেছি; নিমিত্ত আছি, কি আগ্রহিত আছি;
কিবা কোন বিষয়বাহ দেখে রক্তদ্রব্যাঘের সজিত
নিমিত্ত হইয়া, আমার একগু অর্থবা ঘটীয়া দিয়াছে,
একবার নদ (বাহুরব) সেবন) কনিত সত্তবংশত
কপূর হইতেছে, ইহার কিছুই ছিন্ন করিতে পারিতে
ক না ॥” সুসাহস বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

“কমলনয়ন! তোমার এই বাক্যগুলি, পো-
হাশিসরূপ জীবনরূপ কুমুদের বিকাশক, ইচ্ছাস্রবণের
সমাধন ও সঙ্গপর্ণ স্বরূপ, কর্ণের অমৃত স্বরূপ, এবং
নেত্র প্রানিপিংহারক (রসায়ন) ঐষ স্বরূপ ॥” এ
৩০ পৃষ্ঠা।

“রাসবাহু বিহারে” সময় হইতে, কি গৃহে, কি

“—গোছে লক্ষ্মীরিয়মমুতবর্জিনয়নরো-
রাসবাহ্যাং নগার্শো বশুবি, বহুদলচন্দনরসঃ।
অয়ং কঠে বাহুঃ শিশিরসমুণো মৌক্তিকসরঃ”

তাহার কি কট, কি সর্গনাশ, কি জী
বনসর্গস্বপ্নসংসারিক যন্ত্রণা! তৃতীয়ার্কে
হেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্রপ্রণয়নের
উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চি-
ত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্গপ্র-
মুদ্রকর মধ্যাহ্নকুর্য—সেই বিরহযন্ত্রণা
ইহার ভাবী করালদাঘিনী,—যদি সে
মেঘের কালিমা অল্পভব করিবে, তবে
আগে এই স্বর্ঘ্যের প্রথরতা দেখে। যদি
সেই অনন্ত বিজৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগ-
রের ভীষণধরুণ অহুভব করিবে, তবে
এই স্বর্ঘ্যের উপকূল,—প্রাসাদশ্রেণীসমু-
জ্জল, ফলপুষ্পপরিশোভিতোদ্যানমালা-
মণ্ডিত, এই সর্গস্বপ্নময় উপকূল দেখে।
এই উপকূলেছরী সীতাকে রাসচন্দ্র নি-
ত্রিতবিবাহ্য এই অতললক্ষ্মী অন্ধকারমা-
গরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার
ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

মনে, সর্গত্রয় শৈশবরহস্য এবং পরে যৌনরহস্য-
ভেদে তোমার উপভাসের (মাধার দিবার বাজিলের)
কাব্য করিয়াছে ॥ এ—এ পৃষ্ঠা।

“ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইনিই
আমার নয়নের অমৃত-শব্দাক্ষরূপ, ইহারই এই
লক্ষ্মী-গাত্রলগ্ন চন্দনস্বরূপ মুগ্ধরস, এবং ইহারই
এই বাহু আমার কঠিন সীতল এবং কামল মুক্কাহার
স্বরূপ ॥ এ—এ পৃষ্ঠা।

সঙ্গীত ।

দ্বিতীয় মাংখ্যা।

যরের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ্য হয়,
ইহা সকলেই জানেন, এবং আমরাও
বলিয়াছি। উচ্চারণের প্রকরণভেদে,
আমরা প্রেম, বাৎসল্য, শোক, সন্তাপ,
আত্মদঃ, রাগপ্রভৃতি চিত্তবিকার কণ্ঠ
হইতে সহজে প্রকাশ করিয়া থাকি। শ-
ব্দের রসব্যক্তি গুণের সম্ভারণে গীত।
অতএব গীতের দ্বারা প্রেম ও শোকাদির
প্রাণটি রূপ অভিযুক্ত অবশ্যই সম্ভব।
সহজে উচ্চারিত সপ্ত স্বর, সা, রি, গা,
মা, ধা, ধা, নী, আত্মদঃ বা স্ববাসচঃ
এবং এই সকল স্বরের কোমল ও তীব্র
শোকবাসচ স্বরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে।
ইউরোপীয়েরা স্বরের উক্ত দুই বিভা-
গই গ্রহণপূর্বক আপনাদিগের “পি-
য়ানো” “হার্মোনিয়ম” প্রভৃতি যন্ত্র সঙ্ক-
লের, এবং সাধারণতঃ সঙ্গীতপ্রণালীর
“সেজর” ও “মাইনর” দুইটি মাত্র
শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবেচনা
করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, যে এ দুই
শাখার দ্বারা নানা ভাব প্রকাশিত হই-
তে পারে। আত্মদঃবাসচ শব্দে উৎসাহ,
আকাঙ্ক্ষা, স্বতরাং প্রেমপ্রভৃতি ভাবও
প্রকাশ পায়, এবং শোক বা দুঃখবাস-
চ শব্দে ভক্তি, ঈর্ষা, বিরহপ্রভৃতি
ব্যক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষত এই
রূপ বিভাগ সহজসাধ্য।

গীত লিখিত না হইলে তাহার প্রা-
দ্বিগ্ধ হয় না। আমরা পদের কণ্ঠ বলি-
তেছি না, তাহা সচরাচর লিখিত হই-
য়াই থাকে। স্বরও লিখিত না হইলে,

গীতের স্থায়িত্ব হয় না, এবং স্থায়িত্ব না
হইলে তাহার সম্যক অভ্যুদয়, ও
কেনে উৎকর্ষসাধনপক্ষে অনেক বিঘ্ন হয়;
বিশেষত বহুনিয়মলিপি ব্যতীত সম্ভব
নহে। সহজেই ইউরোপে গীত লেখার
পরে প্রায় দুইশত বৎসর হইল, বহুনি-
য়মলিপি প্রকাশিত হয়। এবং রেমস্ কর্তৃক
তাহার বিধি সকল দৃষ্ট হইয়াছে।

নির্জনে চক্ষু মুদ্রিয়া ভাব হৃদয়কম্প ইত্য-
এক ব্যক্তির সাধ্য। কিন্তু এমন অনেক
কাজ আছে, যে এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা
সাধ্য নহে। দুই তিনটি স্বর এক ব্যক্তি
দ্বারা এককালে উচ্চারণ করা অসাধ্য।
স্বতরাং বহুনিয়মলিপিপ্রণয়ক যত্নই এ-
কমাত্র অবলম্বন। তৎপক্ষে, ইউরোপীয়
“পিয়ানো” এবং “হার্মোনিয়ম” চমৎ-
কার পরিপাটী যন্ত্র। দুই বাহু সহজে
প্রসারিত করিয়া, যে আয়তন গ্রহণ ক-
রিতে পারে তাহা বাঁধ, তত্তৎ যন্ত্রের আয়তনও
তাই। অতএব স্বতঃ সমাসীন ইয়া
দুই হস্তের দশাঙ্গুলি দ্বারা তত্তৎ যন্ত্র
হইতে স্বর সমুদ্ভূত করা যাইতে পারে।
আরও, এক একটি স্বরের সম্ভবস্থান এক
একটি অভ্যুদয়লিপিপরিমিত। স্বতরাং
এক এক স্বর এক এক অভ্যুদয় দ্বারা
বিনা কণ্ঠে কনিত হয়। প্রত্যেক যন্ত্র
তিন গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামে ১২
স্বর থাকায়, কাজে কাজেই অনেক
ভাবের গীত এ যন্ত্রে সম্পন্ন হইয়া,
তাহার বহুনিয়মলিপি অপ্পায়ে সাধ্য
হয়।

কবিরা আক্ষেপ করেন, “যে কলমেও কলঙ্ক আছে” সকল আত্মাদের বিষয়ে, এবং সকল উন্নতির স্থানায়, কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে। ইউরোপীয় যন্ত্রও সেই রূপ। ইউরোপীয় যন্ত্রের বর-সম্বৎসরাদিকা শক্তি চমৎকার, সহজেই শিক্ষা যাইতে পারে, এবং বাজাইতেও বড় আরাম। তিন গ্রাম একবারে স্পনিত হয় বলিয়া, উহা বহুমিলনেরও আধার। কিন্তু “এ সকল যন্ত্র-আপ্ন স্বরবিশিষ্ট বলিয়া, এ দেশীয় সকল গীত তাহাতে বাদিত হইতে পারে না। ঈশ্বরদত্ত, বিচিত্রনানারসগণীয় আদিমন্ত্র মন্থ্যাক্ষেপের সহিত যে যন্ত্রের সাঁদুখা আছে, সেই সকল যন্ত্রেই সকল গীত বাদিতে পারে। মন্থ্যাক্ষেপের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র, এবং সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪ টি সুর হয়। শাস্ত্রকারেরা এক-সুরের চারি পাঁচ সাতটি স্ত্রী অর্থাৎ সুরাণী এবং সুরাণী সিংহেরও পুত্র পৌত্র অবধারিত করিয়াছেন। একবারে কল্পনাগ্রহৃত সুর

কোন কোন বাঁধা যন্ত্রেই আয়ত্ত হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হার্মোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অন্ততঃ ২৪ টি সুর রাখা উচিত। ভাষা হইলে তদ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় যন্ত্র কেবল ১২ টি নব সুর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রী-নিঃসৃত ভগ্নাঙ্গ-রাগরাগিণীদিগের দশার ন্যায় হইয়া উঠে ॥

আমাদের অল্পলি বড় মোটা নহে। এতোক সুরের স্থান অপ্পায়ত করিয়া, তিন গ্রামে ২৪২৪ টি সুর স্থাপিত করিলে বোধ হয়, দেশীয় গীত স্পনিত হইতে পারিবে। যে সকল মহাত্মগণ সঙ্গীত বিষয়ে এক্ষণে যত্নবান, তাঁহাদের এই বিরয়ের আলোচনা করা কর্তব্য।

আমাদের মহাদেবের পিনাক, ভোলা ভূতনাথের আদি যন্ত্র—মোট, এক শতকে এক তার—দুইটিকে দুই লাউ; লাউয়ের গুণেই স্পনিত। এই ত যন্ত্র, কিন্তু হস্তকোশলে ইহা হইতে সুরাণী প্রকাশ হইতে পারে, কেন না বাঁধা যন্ত্র নহে, —ইচ্ছামূসারে শব্দ সৃষ্টি হয়। এই কারণবশতঃ আমাদের সকল বাদ্যযন্ত্রই হস্তকোশল দ্বারা, কোমল, তীব্র, সুর, সুরাণী এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্রকৃতপ্রকাশপূর্বক দেশীয় গীতবাদনের সমর্থ রূপে উপযোগী হইয়াছে।

আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল, আমাদের গীতের উপযোগী সত্য বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োগ কটুসাধ্য। আমাদের অনেক বাদ্যের স্পনিত উৎকৃষ্ট বলিয়া, কোন মতেই গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্রের শব্দই ইউরোপীয় যন্ত্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এ জন্য এ দেশীয় হার্মোনিয়ম প্রস্তুত করা আবশ্যিক। আমরা ভরসা করি, বাঁধা দের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা আমাদের

দাখিল যে, তিনি বড় সঙ্গীত-পট। দর্শনারী ক্রীষ্ণকৃষ্ণদেব ঠাঁহাকে দেখাইলেন, যে রাগ রাগিণীগণ ভগ্নাঙ্গবাবিধ হইয়া গণিতা আছে। নারক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাগরাগিণীগণ কহিল যে, “আপনি বাজাইতে জানেন না, আপনিই আমাদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন। ভাষা হইলে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়। দেব বিদ্যা কেবল কল্পনাসিদ্ধ, তাহাতে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা সর্বাংশেই অভ্যাসের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; গীত-বিদ্যা কল্পনাসিদ্ধ, অতএব পূর্ব পুরুষেরা ইহার অসাধারণ মনোমোহিনী ক্ষমতা করিয়া গিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি তাঁহাদের কল্পনা, তৎকালিক ও পরিপ্রেক্ষ্যের পরিচয় দিতেছে। এক মিলন সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত অদ্বিতীয় এবং জগৎ পূজ্য। এমন রসগীণ বিদ্যার উন্নতিপক্ষে কোন হিন্দু যত্নবান না হইবেন, এবং প্রচুর আয়াসসহকারে ইহার উন্নতিসাধননা করিবেন?

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেঁজিশটী আদি দেবতা হইতে তেজিশটীকোটি দেবতা হইয়াছেন, সেই রূপ আদিম ছত্রাণ এবং ছত্রিণ রাগিণী হইতে অস্তুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্র পৌত্রাদি সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দু সিংহের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনাকুতূহলিনী। শব্দার্থমাজকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি সমূহেরই দেবদ্য। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু সকলেই দেব; মদ, মদী, ঘেব, দেবী। দেব দেবী সকলেই মন্থ্যের ন্যায় রূপ-বিশিষ্ট; তাঁহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা এখন সিদ্ধ হইল, যে এই জগতের

স্বষ্টিকর্তা এক জন আছেন। তিনি ব্রহ্মা দেবতা যাইতেছে, যে ঘটপটাদির স্বষ্টিকর্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। পরে রাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্মুখ। তবে তাঁহার একটা ব্রহ্মাণীও থাকি চাহি। একটা ব্রহ্মাণীও হইল। ঋগিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহাকে বাহন হইলেন—নাইলে গতি বিধি হয় কি একারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি পাল্কির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারিরা সন্তুষ্ট নহেন। মন্থ্যেরা কাকজোড়াপিরাবৎ ইহা পাণী ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারা

যেখানে স্বষ্টিকর্তা প্রভৃতি অমেষ্য সাদৃশ্য; আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিয়া, কাম্যাদি মনোবৃত্তি, —এসকল বৃত্তিবিশিষ্ট, পুত্র কলজাদিমুখ সর্ব বিষয়ে মন্থ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বাঁধা পড়ে কেন? সুররাং তাহারও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সম্মত রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটা গীত এত নহে। রাগেরা স্ত্রীলোক—পলিগণেই; এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগওলিকে “বাবু” করিয়া ডাকিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে স্বত্ব বরদ্বারা করিতে লাগিলেন তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল। কিন্তু এক কেবল রহস্য নহে।

স্বায়ত্ত্ব ভিত্তর বিশেষ সার আছে। রাগ রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল কল্পনামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটি শব্দবিশেষ প্রবেশ করিলে একটা বিশেষ ভাব উদয় হয়। একে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও, সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এখন আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাই-তাই না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা ভাবের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেই রূপ রোদনকারী যার শুনিব—অমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেই রূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম, যে এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছে। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখায়ব দেখিয়াই, তাঁহার উৎকর্ষিত মুখের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি। ইহা সেই অন্তঃপাক্ষিত মান মুখমণ্ডলের আদিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিল। সেই অবধি, যখন আবার সেই রূপ ক্লিষ্ট মুখগুল দেখি, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব উভয়ই আমাদের মনে শোকের চহ্ময়রূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মুখকান্তিতেও শোক মনে পড়ে। সর্বাঙ্গপ্রকৃতির নিয়মানুসারে

ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্ভীষ্ট করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেই রূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, সেই রূপ শব্দ মনে পড়ে। এই রূপ ভ্রূয়াভ্রুয় উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমা যরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্তির এই রূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই, প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া, তাহা-দিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্ষদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনামাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পূর্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহা-দিগের মহাঈশ্বর্য্যতা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তজ্জ্বলনে যে একটি অনির্দমনীয় ভাবে অভিভূত হইয়ন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর বাহ্যিক কবিতা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহা-দিগের সমস্ত ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। বাহ্যিক নির্দল স্বখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষক, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, সৃষ্টি নাই, রোধ নাই, শাসন

নাই। ভোগে এবং ভোগস্বখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তখন, সে পরমসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রাভরণে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিরন্ত্রিত্ব হেতুই তাহাকে বিরহ কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী বনমধ্যে গমনে একাকিনী বসিয়া, মধুপানে উল্লসিত হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান শুভেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল সজ্জিত হইয়া পড়িতেছে, বনহারিণী সকল সন্ধ্যা, তাহার সমুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

এই চিত্র অনির্দমনীয় সুন্দর—কিন্তু দর্শ্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর স্বার্থক কথা। টোড়ি রাগিণী প্রবেশ মনে যে বর উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে সেই ভাব জন্মিবে।

ই রূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। তানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপ-পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রারতা গৌরাঙ্গসুন্দরী। ঠৈতরী শুক্লধারপরিধানা মালকরভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে, মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন ইচ্ছা-রত্তাস্থেই পণ্ডিতদিগের মতের অ-লাভ, তখন কল্পনাপ্রবৃত্তি ব্যাপার নহে। যখন ইচ্ছা-রত্তাস্থেই পণ্ডিতদিগের মতের অ-লাভ, তখন কল্পনাপ্রবৃত্তি ব্যাপার নহে। যখন ইচ্ছা-রত্তাস্থেই পণ্ডিতদিগের মতের অ-লাভ, তখন কল্পনাপ্রবৃত্তি ব্যাপার নহে।

বল চক্ষু হৃদয়, ভাবিমান হইতে

কি? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা লক্ষ্যেই স্বীকার করিতে হইবে।

বলিতে পারেন, যে কোমল শব্দ শোকেও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উৎসাহও বুঝায়, তব-যত্নেও বুঝায়। এই কি একারণে উপলব্ধ হইতে উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল কল্পনাপ্রবৃত্তি দ্বারা। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। সামান্য সে, বালকেরা সানাই শুনিতে হাইলণ্ডেরা বাগ-পুঁজে পাইয়া এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমী কাঁদেন। এই অভ্যাস বুদ্ধি শিক্ষার পরিণত ফল, অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। শিক্ষার বাহ্যতে হানে, ভাবুকরা উদয়, অতএব লোকের বেশী শিক্ষার আছে, যে সঙ্গীত-স্বার্থ-বোধ স্বতাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রম। দুঃস্বাদ ইহা সত্য বলে, যে স্বাদই ভাল লাগে—বাস্তবিক সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চতর স্বাদের স্বার্থভব, শিক্ষা ভিন্ন অত্যানুশীল ব্যক্তি যেমন পণ্ডিত উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত হয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কার রাগ-রাগিণী পরিপূর্ণ কালো

বল চক্ষু হৃদয়, ভাবিমান হইতে

সেই দিন । কিন্তু উভয় স্থানেই, অ-
সংখ্যক শ্রমভাঙার চিহ্ন বলিতে হইবে।
সংস্কৃত, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সা-
হিত্যিক সকল মন্ত্রমোহই জানা উ-
ননি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম,
সংস্কারসাদার্ম মনোমোহিনী স্বস্বীত-
বাস্তবিক ভ্রমভাঙের জানা কর্ত-
ব্য। শ্রমজীবী রাজকুমারীদিগের
বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত
পাইয়াছে। বাঙ্গালির মধ্যে
কুমারীদিগের সঙ্গীত শিক্ষা
নিদ্রনীর, তাহা আমাদের
চক্ষু, কুলকামিনীরা সঙ্গীত-
শিল্পী, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বি-
শেষ আকর্ষণ স্থাপিত হয়। বাবুদের
বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনেক অপ-
রাধের "অভ্যাসে" নির্মল আ-
নন্দ এই অনেকের মদ্যসজ্জিত
প্রিয়তা হইতেই অনেকের
স্বপ্নময়।

সংস্কৃতী মূর্তিবিশিষ্ট কি একাধারে
বলিলান, এক্ষণে তাহাদি-
গের স্বাস্থ্য কি একাধারে হইল,
ইহার কারণ প্রাচীন রাগে
সংগীত। সংপাল নায়ক,
বাক্য অতীত ব্যাপ্ত
সঙ্গীতকুশল রাজগণ ও
জাতীয় অন্যান্য গায়ক-
গণ স্বরসংযোজনা দ্বারা
উৎপত্তি করিয়া, সঙ্গীত-

বিদ্যা অধিকতর সৌন্দর্য্যাসম্পন্ন করিয়া
ছেন। যথা কামদ হইতে মিত্রা কামদ
মল্লার হইতে মিত্রা মল্লার, কানড়া
হইতে মরবারি কানড়া, ঠৈরবী হইতে
পিলুকাফি ইত্যাদি। টোড়ি ও কানড়ার
যে কত রূপান্তর হইয়াছে, তাহা বলা
যায় না।

রাগ রাগিণী রূপসংস্করণে "শাস্ত্রকার-
দিগের যেমত কল্পনাশক্তির চাতুর্য্য সং-
গ্ৰহণ হইয়াছে, সেই প্রকার রাগ রাগিণীর
মিশ্র লক্ষণ নিরূপণ দ্বারা উদ্ভাবিত
তরুণ বিচারক্ষমতার, এবং যন্ত্র ও পরি-
শ্রমের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অভি-
জ্ঞ ব্যক্তির উদাহরণ দেখিলেই অনুভব
করিতে পারিবেন। যথা,

বারোঁয়া—মূলতানিট এবং ঠৈরবী-
যোগে উৎপন্ন।

বাম্বয়—পরজ ও দ্বিহীনীর যোগে
উৎপন্ন।

বাগত্রী—ইমন কানড়া এবং বিলাওলের
যোগে উৎপন্ন।

দরবারি কানড়া—কানড়া এবং মল্লা-
র হইতে উৎপন্ন।

ইত্যাদি।

অনেক রাগ রাগিণী কেবল এক অথবা
দুইমাত্র স্বরভেদে হ্রস্বতরূপ ধারণ করে।
যথা ভীমপালশী কেবল এক কোমল
সংযোগে মূলতানী হইয়াছে।

• তান সেন ময়লদাস হইল তাহার মিত্রা উ-
পাধি হইয়াছিল।

বিষয়বস্তু।

উপন্যাস।

নবমপরিচ্ছেদ।

হরিদাসী বৈকল্য।

বিধবা কুন্দনন্দিনী শ্রোত্রের গৃহে কিছু
দিন কালান্তিপাত করিল। একদিন
মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীর, সকলে মিলিত
হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল।
ঈশ্বররূপায় তাঁহার অনেকগুলি, সক-
লে স্বং মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীমূলভ কার্য্যে
বাগ্ধতা ছিল। তাহাদের মধ্যে, অন-
তীত বালা কুমারী হইতে পলিতকেশা-
বর্ষায়সী পর্যন্ত, সকলেই ছিলেন। কেহ
চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া
দিতেছিল, কেহ মাতা দেখাইতেছিল,
কেহ মাতা দেখিতেছিল, এবং "উঁউ"
করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাঁকা
চুল তোলাইতেছিল, কেহ ধান্য হস্তে
তাঁহা তুলিতেছিল। কোন স্বন্দরী স্বীয়
বালকের জন্য বিটত্র কাঁধা শিয়ারিতে-
ছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করা-
ইতেছিলেন। কোন স্বন্দরী, চুলের দড়ি
কিনাইতেছিলেন, কেহ ছেঁকে ঠোঁটাইতে-
ছিলেন; ছেলে খুঁচাখাদান করিয়া কো-
মল ভীয়ার উভয়বিশিষ্টে রোদন কর-
াইছিল। কোন রূপসী কারপেট বুনি-
গড়ছিলেন, কেহ থালা পাতিয়া তাঁহা
পাতিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশল
ছাত্রের বিবাহের কথা মনে করিয়া পি-
ণ্ডিতে আলোপনা দিতেছিলেন, কোন
সম্পূর্ণ স্বরগ্রাহিনী বিদ্যাবতী দাসব্রাহ্মণের
পাঁচালি পড়িতেছিলেন। কোন স্বীয়সী

পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রী
গণপরিভূত করিতেছিলেন, কে
যুবতী অর্দ্ধকটুপরে স্বামির
লেশবিরণে সখিদিগের কানে
বিরহিণীর মনোবেদনা বা-
লেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা,
নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের
রিতেছিলেন; অনেকই আত্মপ্রশংসা
করিতেছিল। যিনি স্বর্ঘ্যমুখীকর্তৃক প্রা-
নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মুহুভৎসিতা হই-
য়াছিলেন, তিনি আর্পন্য বুদ্ধির অসা-
ধারণ প্রাণবীর্য্যের স্রোত উদাহরণ প্র-
যোজ্য করিতেছিলেন; বাঁহার
প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি
নার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে স্বীয়
করিতেছিলেন। বাঁহার স্বামী
মধ্যে গণ্ডমুখ্য তিনি সেই স্বামির
বিশিষ্ট। পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া
ক্রিয়া করিতেছিলেন। তাঁহার
কন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংস
তিনি রত্নগর্ভ। বলিমাং প্রাক্ষাল
তোছিলেন। স্বীয়মুখী এ সভায়
না। তিনি কিছু গর্ভিতা; এক
মায়ে বড় বসিতেন না। এবং
কিলে অন্য সকলের আমোদ
হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত;
তাঁহার নিকট অন্য খালিয়া সকল কথা
চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই
সম্ভাদ্রোহে পাকিত; এখনও
একটি বালককে তাহার হাতায়

যোগে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতাছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকদের কর্তৃক সন্দেহের অতি হই। করিয়া চাহিয়াছিল; হতরাং তাহার বিশেষ বিশেষকর্ত্ত হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে “জয় রাধে” বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

মণ্ডলের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত, এবং তদাৰ্থে সেই খানে

প্রতি রবিবারে তণ্ডলাদি বিতরণ হইত। ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ

অগ্রপূরে আসিতে পাইতনা। এই জন্য অঙ্গপূর মন্ডে “জয় রাধে” শুনিয়া

একজন পূর্ববাসিনী বলিতেছিল, “কেরে মাগী বাড়ির ভিতর ঠাকুর বাড়ী বা।”

কিন্তু এই কথা বলিতেই সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্তে বলিল, “ওমা!

এ অদূরী কোন্ বৈষ্ণবী গো?”

কহিলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে

মুখতী; তাহার শরীরে তাহার

রূপধরে না। সেই বহুদূরদেশোদ্ভিত

রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা

হইতে সমসিক রূপবতী কেহই নহে,

তাহার করিত বিধায়, স্বগঠিত নাসা,

বিস্ফারিত কুণ্ডলীঘরতুল্য চক্ষু, চিহ্ন

বৈষ্ণবীর নাকে রসকল, মাতায় পেটে পাড়া পরণে কালাপোড়ে সিমালার

মুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত

লের বাল্য, এবং তাহার উপরে জল

তরঙ্গ ফুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়ো

জ্যোতা কহিল, “হাঁ-গা-ভূমি কে গো?”

বৈষ্ণবী কহিল, “আমার নাম হরি

দাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণী গান শু

নবে?”

তখন “শুনবে গো শুনবে!” এই

ধ্বনি চারিদিকে আবার হুঙ্কার কহে হইতে

বাহির হইতে লাগিল। তবে খঞ্জনী

হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাদি

গণের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল,

সেই খানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল।

কুন্দ অত্যন্ত মীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করি

বে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সঙ্গ

কটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অব

কাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেহভাজী বাল

কের হাত হইতে সন্দেহ কাড়িয়া লইয়া

আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবীজিজ্ঞাসা করিল “কি গায়িব?”

তখন প্রোজীপণ মানাবি ফরমাশ

আগন্ত করিলেন। কেহ চাহিলেন

“গোবিন্দ, অধিকারী”—কেহ “গোপালে

উড়ে।” যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়ি

তেছিল, তিনি তাহারই কামনা করি

লেন। ছই এক জন প্রাচীন কৃষ্ণবিদ

হুকুম করিলেন। তাহারই চীকা করি

গিয়া, মধ্যরমণী “সখীসখা”

“বিরহ” বলিয়া মতভেদ প্রচার করি

লেন। কেহ চাহিলেন “গোষ্ঠ”—কোন

লজ্জাশীল যুবতী বলিল, “নিধুরতপা

গায়িতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব

না।” একটি অক্ষুটবাচা বালিকা বৈষ্ণ

বীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় গাইয়া

দিল, “তোলা দাসনে দাসনে, দাসনে

দুতী।”

বৈষ্ণবী সকলের হৃদয় শুনিয়া কুন্দের

প্রতি বিদ্যাদামতুল্য এক কটাক করিয়া

কহিল, “হাঁ গা—ভূমি কিছু ফরমাশ

করিলেন?” কুন্দ তখন লজ্জাবনমুখী

হইয়া অঙ্গ একটু হাসিল, কিছু উত্তর

করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়

স্যার কানেং কহিল, “কীর্তন গায়িতে

বল না?”

বয়সী তখন কহিল “ওগো কুন্দ কী

র্তন করিতে বলিতেছে গো?” তাহা

শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্তন করিতে আরম্ভ

করিল ৪ সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী

তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড়

লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খুঞ্জনীতে

ছই একবার যুহুং যেন কীড়াঙ্কন

লি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠ

মধ্যে অতি যুহুং নবমসুগন্ধেরিতা একা

স্বরায় গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে

লাগিল—যেন লজ্জাশীল বালিকা স্বা

গির নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ

ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্র

প্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশা

রূদের অঙ্গলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘ

পতীর শব্দ বাহির হইল এবং তৎ সঙ্গে,

প্রোক্তদিগের শরীর কটাক্ত করিয়া,

অপ্সরানন্দিত কণ্ঠগীতধ্বনি সমুদ্ভূত

হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বি

স্মোহিতচিত্তে শুনিল যে সেই বৈষ্ণবীর

অতুলিত কণ্ঠ, অটলিকা পরিপূর্ণ ক

য়া আকাশ মার্গে উঠিল। মুতা পো

জীপণ সেই গানের পারিপাট্য কি মু

বে? বোদ্ধা থাকিলে মুখিত যে এই

স্বাক্ষরিত তাললব্ধপরিপূর্ণ পান্ন কে

সে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ স্বশিক্ষিত

এবং অঙ্গবয়সে তাহার প্রারম্ভ

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পো

জীপণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুন

অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সঙ্গ

বিলোলনেজে কুন্দনন্দিনীর মুখপা

চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ করিল।

দেখবো বলো যে, জীপণ পক্ষ

তাই এসেছিল। এ গৌরুলে।

আমায় স্থান দিও রাই চরুণতলে

মানের দায় তুই মানিনী।

তাই সেজেছি বিদেশিনী।

এখন বাঁচু রাধে কথা কো

থরে খাই হে চরুণ গোয়ে।

দেখবো তোমায় নয়ন ডোরে

তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।

যখন রাধে বোলে বাজে বাঁশী

তখন নয়ন জলে, আপনি ভা

তুমি যদি না চাও ফিলে,

তবে যাব সেই যমুনী তীরে,

ভাসব বাঁশী তেজবে প্রাণ,

এই বেলী তোর ভাঙ্গুক মান,

ব্রজের স্বথ রাই দিয়ে জলে,

বিকারিছ পদতলে,

এখন চরণ হুহু বেঁকেলে,

পশিব যমুনী জলে।

গীত সমাপ্ত হইলে, বৈষ্ণবী কুন্দন

দীর্ঘ মুখ চাহিয়া বলিল, “গান গাইয়া

আমার মুখ শুকাইতেছে। আমার একটু জল দাও।”

কুন্দ পাক্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, “তোমানিগের পাত্র আমি ছুইব না। আমার হাতে তুমি দাও আসিয়া, আমি জল বৈষ্ণব নাহি।”

হাতে বুকাইল, বৈষ্ণবী পূর্বে কোন অপরিজ্ঞাতায়া ছিল, একেণে বৈষ্ণব হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া, কুন্দ তাহার

পাশাপাশি জল ফেলিবার যে স্থান, সেই স্থানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা

বসিয়া রহিল, সেখান হইতে যে স্থান অল্প ব্যবধান বৈ, তথায় মুহূর্ত্ত কথা ক-

হাইল কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থান এ গিয়া, কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া

দৃষ্টি নাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে মুহূর্ত্ত, অন্যের অশ্রাব্য

শব্দে বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, “তুমি নাকি গা কুন্দ?”

কুন্দ বিস্মিত হইয়া ক্রিচ্ছাস করিল, “কেন গা?”

“তোমার শাস্ত্রীকে কখন দেখিয়াছ?”

“না।” কুন্দ শুনিয়াছিল যে তার শাস্ত্রী জট্ট। হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল।

দিয়ে এস না?”

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শাস্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ যীকারই অকর্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল যাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ি না—পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল “আমি গিন্নীকে না বলিয়া বাইতে পারিব না।”

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, “গিন্নীকে বলিও না। বাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাস্ত্রীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাস্ত্রী দেশ ছাড়া হইয়া পলাইবে।”

বৈষ্ণবী যতই দাড়া প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই স্বর্য়ামুখীর অস্বাভাব্যতা বাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল,

“আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া নইয়া বাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদা কাটা করিও, নহিলে হইবে না।”

কুন্দ ইহাও বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রফালন সমাপ্ত করিয়া অন্য মূকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমন সময়ে সেই খানে স্বর্য়ামুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একবারে বন্ধ হইল, অপর বয়স্করা সর্বলেই একটা কাজ লুইয়া বসিল।

স্বর্য়ামুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “তুমি কে

গা?” তখন নগেন্দ্রের এক মাগী কহিল, “ও এক জন বৈষ্ণবী গান গায়িতে এসেছে। গান যে স্বন্দর গায়। এমন গান কখন শুনিবে না। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসী! একটি ঠাকুরাণ বিষয় গা।”

হরিদাসী এক অপরূপ শ্যামাবিষয় গায়িলে স্বর্য়ামুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূরক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দ্রের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় হইল। স্বর্য়ামুখীর চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খস্মণিতে মুহূর্ত্ত খেমটা বাজাইয়া মুহূর্ত্ত গায়িতে গেল,

“আয় রে চাঁদের কোণ।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোনা।
আতর দিব সিন্ধি ভাঙে,
গোলাপ দিব কানী ভাঙে,
আর আপনি সেজে বাটা ভাঙে, দিব পানের সোনা।

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেক লোক কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমেৎ একটুৎ স্মৃত্ত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজে বলিল, “তা, হোক স্বন্দর, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।” তখন বামা বলিল, “রঙ্গ টা বাপু বড় ফোকাগ।” তখন চন্দ্রমুখী বলিল “চুল গুলো যেন শোনের দড়ি।” তখন টাণা বলিল, “কপাল টা একটু উচু—কমলা বলিল, “টোটা ছুখানা পুরু” হারিণী বলিল, “গরু টা বড় কাটা কাটা।” এমদা বলিল “মাগির বুকক কাছটা

যেন যাকার সঁধদের মত; দেখে ঘুসা করে।” এই রূপে স্বন্দরী বৈষ্ণবী স্রীজি অধিভায়া কুৎসিতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, “তা, দেখিতে যেমন হউক, মাগি গায় ভাল।” তাহাতেও নিষ্ঠুর নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, “তাই বাকি, মাগির গলা মোটা।” যুক্তকেশী বলিল “চিকু বলেছ—মাগি যেন বাঁড় ডাকি।” অনঙ্গ বলিল, “মাগী গান জানে না, একটা দাঁতেরায়ের গান গায়িতে পারিল না।” কনক বলিল, “মাগির তাল বোধ নাই।” ক্রমে প্রতি পদ হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে গায় গান নাই হুংসিত এমন নহে—তাহার গানও যারপর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ।
বার।

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের ইচ্ছা হইতে নিমন্ত হইয়া দেবীপুরের দিগে গেল। দেবীপুরে বিজিত লোহ রেল লাইন স্থাপিত এক পুণ্যোদ্যান আছে। জমিদার নানাবিধ ফল পুষ্পের রক্ষা, মঙ্গল করিণী, তাহার উপরে বৈঠক খান। হরিদাসী সেই পুণ্যোদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং বৈঠক খানায় প্রবেশ করিয়া নিম্নত কক্ষে গিয়া বেশ পরিচালনা করিত হইল। অকস্মাৎ সেই নির্বিঘ্ন দামরচিত কবরী মস্তকাত হইয়া পড়িল। সে ত পরচল মাজ। বক্ষ্যহইতে গুনমূল খসিল—এক সুশনিমিত্ত। বৈষ্ণবী পিতলের বাল্য ও জলতরঙ্গ চড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানান্তর, বৈষ্ণবী

মোহাবীর স্ত্রীবংশ-ব্রটিয়া, এক অপূর্ণ স্বপ্নের
কল্পিত পুরুষ দাঁড়াইল। যুবাব বয়স প-
লা প্রবিশতি বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে যু-
বাবের মণ্ডলে রোমানবীর চিহ্নমাত্র ছিল না।
মোহাবীর এবং গঠন কিশোর বয়স্ক নায়।
দাক্ষিণ্য পরম স্বপ্নের। এই যুবা পুরুষ দে-
বে ব্রজ বাবু। পুর্বেই তাঁহার কিছু পরিচয়
দেওয়া হইয়াছে।

যা-দেবেস্ত এবং নগ্নোস্ত উভয়েই এক
বিপবংশ সম্মত; কিন্তু বংশের উভয় শা-
খায় মধ্যে পুরুষাক্রমে বিবাদ চলিতেছে।
হুবা এমন কি দেবীপুত্রের বাবুদিগের সঙ্গে
এ গোবিন্দপুত্রের বাবুদিগের যথের আলাপ
অপরিচয় ছিল না। পুরুষাক্রমে দুই শা-
খায় যৌদ্ধমত চলিতেছিল। শেষে এক
মিড় যৌদ্ধমত নগ্নোস্তের পিতামহ দে-
বেস্তের পিতামহকে পরাজিত করায়,
ই-দেবীপুত্রের বাবুরা একবারে হীনবল
হইয়া পড়িলেন। ডিক্কাচারিতে তাঁহা-
দের সর্বস্ব গেল—গোবিন্দপুত্রের বাবুরা
তাঁহার তালুক সকল কিনিয়া লইলেন।
কিন্তু অবশিষ্ট দেবীপুত্র হস্ততেজা, গোবি-
ন্দপুত্র বর্জিত হইতে লাগিল। উভয়
বংশের আর কখনও মিল হইল না। দে-
বেস্তের পিতা, মনোমণোরব পুনর্বর্জিত
কারবার জন্য এক উপায় করিলেন।
গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার,
হরিপুর জেলায় মধ্যে বাস করিতেন।
তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবে-
স্তের সঙ্গে এই হৈমবতীর বিবাহ দিলেন।
হৈমবতীর অনেক গুণের মূরুপা, সু-
খর, অগ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণ।
যখন-দেবেস্তের সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহ
হইল, তখন পর্যন্ত দেবেস্তের চরিত্র

নিম্নলিখ। লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ
যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও স্বধীর ও সত্য-
নিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার
কাল হইল। যখন দেবেস্ত উপযুক্ত
বয়সপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে
ভাৰ্য্যার গুণে যুগে তাঁহার কোন স্বথেরই
আশা নাই। বয়স তবু তাঁহার রূপ-
ভুষ্কা জমিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা
নিবারণ হইল না। বয়স গুণে দম্পতী
প্রণয়াকাক্ষা জমিল—কিন্তু অগ্রিয়বা-
দিনী, আত্মপরায়ণ হৈমবতীকে প্রেমবা-
দা সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। স্বধীরে
থাকুক—দেবেস্ত দেখিলেন, যে হৈমব-
তীর রসনাবর্জিত বিদেহ জালায়, যুগে
বিস্ত্রাণও তার। একদিন হৈমবতী দে-
বেস্তকে এক কদম্ব কটাকা কহিল; দে-
বেস্ত অনেক সাহিয়াছিল—আর সাহিল
না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তা-
হাকে পদাঘাত করিল। এবং সেই দিন
হইতে পুরুষত্ব করিয়া পুংসোদ্যান মধ্যে
তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের
অনুমতি দিয়া, কলিকাতায় গেল। ইতি-
পূর্বেই দেবেস্তের পিতার পরলোকে
হইয়াছিল। স্বতরাং দেবেস্ত একদেব স্বা-
ধীন। কলিকাতায় পাণপক্ষে নিমন্ত্রণ হ-
ইয়া, দেবেস্ত অতৃপ্তবিলাসভুষ্কা নিবারণে
প্রস্তুত হইল। তজ্জনিত যে কিছু যতি-
স্তাব অপ্রসাদ জাগিত, তাহা জ্বির স্ব-
স্তাবিধিক্ষণে ধৌত করিতে ব্রজ করিতে
লাগিল। পরিশেষে তাহার আর আব-
শ্যক রহিলনা—পাণেই চিন্তের প্র-
সাদ জাগিতে লাগিল কিছুকাল পরে
বাবুগিরিতে বিলক্ষণ স্বশিক্ষিত হইয়া
দেবেস্ত দেশে ফিরিয়া আসিল, এবং ত-

থায় স্নতন উপবন গৃহে আপন আবাস
সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রস্তুত
হইল।

কলিকাতা হইতে দেবেস্ত অনেক প্র-
কার চং শিথিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি
দেবীপুত্রের প্রত্যাগমন করিয়া রিকরমর
বলিয়া আত্মপরায়ণ দিলেন। প্রথমেই
এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন।
তারারচন প্রকৃতি অনেক ব্রাহ্ম জটিল;
বক্তার আর রীমা রহিল না। একটা
ফিলেল স্কুলের জন্যও মধ্যে আড়ম্বর
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী
করিতে পারিলেন না। বিধবা বিবাহে
বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারি টা
কাওরা তিরের বিধবা মেয়ের বিবাহ
দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বর-
দ্বারায় গুণে। জেনার্না রূপ কাগারের
শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারারচনের সঙ্গে
তাঁহার এক মত, উভয়েই বলিতেন
মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেস্ত
বাবু বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন—কিন্তু
সে বাহির করার অর্থ বিশেষে।

দেবেস্ত গোবিন্দপুত্র হইতে প্রত্যাগ-
মনের পর, বৈষ্ণবী বেশ ভাগ করিয়া,
নিজমুর্জি ধারণ পূর্বক পাশ্বে কামরায়
আসিয়া বসিলেন।—একজন ভূতা প্রম-
হারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা
আনিয়া সম্মুখে দিল, দেবেস্ত কিছুকাল
সেই সর্বপ্রথমসংহারণী তামাকু দেবীর
সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্র-
সাদ সুখ ভোগ না করিয়াছে সে মনুষ্যই
নহে। যে সর্বলোকচিত্তব্রজিনি বিশ্ববি-
মোহিনি! তোমাতে যেন আমার
ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বৃন্দান উ-

লবলা, হাঁকা, গুড়গুড়ি প্রকৃতি দেব-ক-
ন্যার সর্বদা যেন আমারে ন্যূনপথে
বিরাজ করেন, সৃষ্টিকাজেই মোক্ষলীভ
করিব। হে হৃষ্ট! হে আলবলে!
হে রুণালকৃতদগরাশিসমুদ্রাধিনি! হে
ফণিনীনিমিত্তকীৰ্ত্তনসংসারিণি! হে
রক্তচকিটিমণ্ডিতশিরোদশমুখশোভিনি!
কিবা তোমার কীর্তিচিহ্নসম্মত আলব-
লমলয়াননা! কিবা শঙ্খলাস্করীয়
মন্ত্র যিতবঙ্গাপ্রভাণ মুখনের শোভা!
কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাস্করাশির
গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি
বিশ্বজনপ্রসংহারণী, অলসজন অভিপা-
লিনী, ভাৰ্য্যাতংসিত জনের চিত্ত
বিকারবিনাশিনী,—প্রভুভূত জনের সা-
হস প্রদায়িনী। যুগে তোমার সহমা
কি জানিবে! তুমি শেকরাধী জনকে
প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা
দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপ-
যুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বিশ্বরমে!
হে সর্বস্বথ প্রদায়িনী! তুমি যেন আমার
ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর! তোমার
স্বগন্ধ দিনেও বায়ুক! তোমার গর্ভস্থ
জলকললে মেঘগর্জনবৎ শ্রবিত হইতে
থাকুক! তোমার মুখকলর গাতি
নাম অধরোষ্ঠের যেন তিলেক নিমিত্ত
না হয়।

ভোগসিদ্ধ দেবেস্ত যথেষ্ট এই মহা-
দেবীর প্রসাদ ভোগ করিলেন—কিন্তু
তাছাতে পরিভূপ্ত জমিল না। পরে
অন্য মহাশক্তিই অত্যাচার উদ্যোগ হ-
ইল। তখন ভূতাহস্ত, তপস্কারতা
বোতল-ব্যুহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন
সেই অমল শব্দে অবিস্মৃত শয্যার উ-

থরে, রজতাসুহৃতাঙ্গনে সান্নাৎগণনশোভি
ব্রজাসুন্দরী তুল্য বর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহা-
কৌ, ডেকার্টের নামে আশ্রিত গটে
সংস্থাপিতা হইলেন। কই গ্রাসের কোষা
পড়িল; গোটেই জগৎ ভাঙকুণ্ড হইল;
এবং পাকশালী হইতে এক কুণ্ডকুণ্ড পুরো-
হিত হইওয়াটারপ্লেট নামক দ্রব্য পুষ্প-
পাত্রে রৌচি মটন এবং কটলেট নামক
সুগন্ধি কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন
দেবেজ দত্ত, বংশাশ্রয় ভক্তিতাবে, দে-
বীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্র-
ভৃতি সমেত গায়ক বাদক মল আসিল।
তাহারা পূজার আবশ্যকীয় সংগীতোৎ-
সব সম্পদ করিয়া গেল।

দর্শনশেখ দেবেজের সমবয়স্ক, সুশী-
তল কান্তি এক যুব পুরুষ আসিয়া বসিল।
ইনি দেবেজের মাতুলপুত্র স্বরেন্দ্র। স্ব-
রেন্দ্র, গুণে সর্বাংশে দেবেজের বিপ-
রীত। ইহার স্বভাবগুণে দেবেজও ই-
হাঁকে ভাল বাসিতেন। দেবেজ ইহাঁকে
ভিন্ন সংসারে আর কাহারও কথার ব্যা-
প্তি নহেন। স্বরেন্দ্র প্রত্যহ রাতে একবার
দেবেজের সম্মান লইতে আসিতেন।
কিন্তু মদ্যাদির ভগ্নে অধিকক্ষণ বসিতেন
না। সকল উঠিয়া গেল, স্বরেন্দ্র দেবে-
জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমার
শরীর কিরূপ আছে?”

দেব শরীরং ব্যাপি মন্দিরং।
স্ব। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর
জানিতে পারিয়াছিল কি?

দে। না।
স্ব। আর যকৃতের সেই ব্যাধিটা?

দে। পূর্ণস্বত আছে।

স্ব। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে
ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন
বলিতে? ও আমার মাথের মাথা।

স্ব। মাথের মাথা কেন? সমস্ত আসন
নাই—সম্পদে ঘাইবে না। অনেকে তাগ
করিয়াছে—তুমিও তাগ করিবে না কেন?
দে। আমি কি স্বরের জন্য তাগ
করিব? যাহারা তাগ কর, তাহাদের
অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় তাগ
করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

স্ব। তবু, বাঁচিবার আশায়, প্রাণের
আঁকাঅঁয় তাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহা-
রা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আ-
মার বাঁচিয়া কি লাভ?

স্বরেন্দ্রের চক্ষু বাপাস্কল হইল। তখন
বন্ধুমেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, “তবে
আমাদের অল্পরোধে তাগ কর।”

দেবেজের চক্ষু জল আসিল। দেবে-
জ বলিল, “আমাকে যে সংপথে ঘাইতে
অল্পরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর
কেহ নাই। যদি কখন আমি তাগ
করি, সে তোমারই অল্পরোধে করিব।
আর—

স্ব। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার প্রীত
মৃত্যুসম্মান প্রাপ্তি—তবে মদ ছাড়িব।
নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।”

স্বরেন্দ্র সজল নয়নে, মনোমধ্যে ঈহ-
বৃত্তিকে শত গালি দিতে গৃহে প্রত্যা-
গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুখ্যমুখীর পত্র।

প্রাণাধিকা ক্রীমতী কমলমণি দেবী
চিরায়ুতায়ু।

আর তোমাকে আশীর্বাদ পাঠ লি-
খিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও এক
জন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী।
তা বাহাই হউক, আমি তোমাকে আ-
মার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই
বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তো-
মাকে মানুষ করিয়াছি। অথম “ক থ”

লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর
দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার
কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা
করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিন
কাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার
এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার
নহে,—বলিতে চুঃখণ্ড হয়, লজ্জাও করে।
কিন্তু অন্তঃকরণের ভিত্তর যে কষ্ট, তাহা
কাহাকে না বলিলেও সচ্য হয় না। আর
কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের
ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ
ভাল বাসে না। আর তোমার ভাই
য়ের কথা—তুমি ভিন্ন পত্নের কাছেও
বলিতে পারি না।

আমি আপনাদের চিত্তা আপনি সাজা-
ইয়াছি। সুন্দরিন্দিনী যদি না খাইয়া ম-
রিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল?।
পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতে-
ছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না?।
আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে
আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে এখন দেখি-

য়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তা-
হার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে
যে সুন্দরী তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই
সৌন্দর্যই আমার কান্না হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ
থাকে, ত সে খানী। পৃথিবীতে যদি আ-
মার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে খানী।
পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি
থাকে, তবে সে খানী। সেই খানী, সুন্দ-
রিন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া
লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন
অভিলাষ থাকে, তবে সে খানির স্নেহ।
সেই খানির স্নেহে সুন্দরিন্দিনী আমাকে
বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার মহোদয়কে মন্দ বলিও না।
আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না।
তিনি ধর্ম্মাশ্রয়, তাঁহার চরিত্রের এখনও
শতুতেও কলঙ্ক করিতে পারেন না।
আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণ-
পণে আপনাদের চিত্তকে বশ করিতেছেন।
যে দিকে সুন্দরিন্দিনী থাকে, সাধাচার-
সমারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না।
নিত্য প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম
যুখে আনেন না। এমন কি, তাঁহার
প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন।
তাহাকে বিনা দোষে ভৎসনা করিতেও
শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়াটি লি-
খিয়া মরি? পুরুষেও এ কথা জিজ্ঞাসা
করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু
তুমি মেয়ে মানুষ, এতক্ষণ বুঝিয়াছ। যদি
সুন্দরিন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের স্তম্ভ ভী-
হার চক্ষে সামান্য হইত, তবে তিনি
কেন, তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য

ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না।
অনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হই-
বেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার
নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন।
এই জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অ-
কাগর ভৎসনা করেন। সে রাগ তাহার
উপর নহে—আপনার উপর। সে ভৎ-
সনা তাহাকে স্মৃষ্ণে, আপনাকে। এ কাল
ইহা বুঝিতে পারি। আমি এত কাল
পর্যন্ত অনন্যত্রয় হইয়া, অন্তরে বাহিরে
কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার
চামা দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলি-
তে পারি।—তিনি আমাকে কি লুচাই-
বেন? কখন কখন অসামনে তাঁহার চক্ষু
একি ওলিকি চাহে, কাহার সম্মানে চাহে
কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে
আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লুয়েন,
কেন তাহা কি বুঝিতে পারি না? কা-
হার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহা-
রের সময়, প্রাস হাতে করিয়াও কান
ভুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি
না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি
মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান ভু-
লিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দনের
স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে
হাপ্রসন্ন-হাপ্রসন্ন করিয়া ভাত খাটিতে আ-
রম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি-
না। আমার প্রাণাধিক সর্বদা প্রসন্ন
বদন—এখন এত অনামনা কেন? কথা
বলিলে কথা কানে না ভুলিয়া, অন্যমনে
উত্তর দেন ‘হুঁ’—আমি যদি গরিব করি-
য়া বলি, ‘আমি শীঘ্র মরি,’ তিনি না
শুনিয়া বলেন ‘হুঁ’। এত অনামন? কেন?
জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ‘মোকদ্দমার

আলায়।’ আমি জানি মোকদ্দমার
কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না।
যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন
হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক
কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল
কুন্দনের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্যা
দৈবধা অনাখিনী এই সকল লইয়া
তাঁহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমা-
র মহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম তাঁহার
চক্ষু জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা
ক্রোধবেগে সেখানে হইতে চলিয়া গেলেন।
এখন এক জন মৃতন দাসী রাখিয়া
ছি—তাঁহার নাম কুন্দন। বাবু তাহাকে
কুন্দন বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুন্দন
বলিয়া ডাকিতে কুন্দন বলিয়া ফেলেন।
আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?
এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি
আমাকে অবজ্ঞা বা অন্যদর করেন। বরং
পূর্ণাঙ্গেক্ষা আমার কথার যত্ন, অধিক আদর
করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি।
তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপ-
রাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে,
আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না।
যত্ন এক। ভ্রালবাসা আর। ইহার মধ্যে
প্রভেদ কি—আমরা প্রজালাক, সহজেই
বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঐশ্বর বিদ্যা-
নাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড়
পণ্ডিত আছে, তিনি আবার এক খানা
বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন
ও, বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে
যদি পণ্ডিত, তবে মূর্থকে? এখন বৈঠক-
খানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে

সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়।
সে দিন নায়, কচাঁচ ঠাকুর-শা পর-
ষতীর সাফাও বরপুত্র—বিধবা বিবা-
হের সপক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট
হইতে টোল সেরামতের জন্য দশটা
টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন
সার্কভৌম ঠাকুর ‘ব্রিধবা বিবাহের প্রতি-
বাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের
জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা
গড়াইয়া দিয়াছি। আর এক বড় বিধবা
বিবাহের দিগে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমা-
কে অনেকক্ষণ আলাতন করিয়াছি।
তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু
কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ
না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা
এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ
চেয়ে আজি ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল
কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মা-
থার দিবা, ঠাকুরজামাইকে এ পত্র দেখা-
ইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আ-
সিবে না? এই সময় একবার আসিও,
তোমাকে পাইলে অনেক ক্রেশ নিবারণ
হইবে।

তোমার ছেলের সম্বাদ ও ঠাকুরজা-
মাইয়ের সম্বাদ শীঘ্র লিখিব। ইতি
স্বর্গ্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ দ্বিগয়
করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বা
কিয়ান করি? তুমি নিতে পার? না তর্ক
করে?

কমল প্রভাতের লিখিলেন,—

“তুমি পাণ্ডুল হইয়াছ। নচেৎ তুমি
স্বামির হৃদয় প্রতি অর্পিত্বাসিনী হইবে
কেন? স্বামির প্রতি বিশ্বাস, হারাও
না। আর যদি নিতান্তই সেই বিশ্বাস না
রাখিতে পার—তবে দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়া
মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যব-
স্থা দিতেছি, তুমি দাড়ি কলসী লইয়া
জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামির প্রতি
বিশ্বাস রাখিল না—তাঁহার মরই
মঙ্গল।”

উত্তর চরিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহ।

পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জনা করি-
বেন। আমরা আলালকারিক নহি। অল-
ঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ
ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক
নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি না—ইহা রূপক
কি উপরূপক,—নাটক কি প্রাকরণ-কি
ব্যাখ্যেণ কি কোটিক,—ইহার বস্তু, কি,

বীজ কি, বিন্দু কি, পতঙ্ক কোথায়,
কোথায় প্রকীর্তি? কার্য্য কি—এ সকল
তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি।
মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিন্দু, উপসং-
হতি, প্রভৃতি শিখিরাচেনে আমরা অস-
মর্থ। নায়ক ললিত-কি শাস্ত, ধীরো-
দায় কি উদাত্ত—নাটিকা স্রাক্ষী কি
সামান্য, মুক্তা কি প্রোচা—কোথায়

তিনি বাসকসজ্জা, কোথায় উৎকৃষ্টতা, কোথায় বিপ্রলঙ্কা, কোথায় প্রোথিত তর্জুক—তাহার, হাব ভাব হেলা, সীলি বলাস বিখিত বিজয় বিকৃতাদি কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—তাহার বিচার করিয়া পাঠকের দৈর্ঘ্যচাতি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহি। কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কিনা—কোন একে কোন রস প্রধান—কোথায় কোন ভাব,—হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,—নির্ভয় রানি শঙ্কাদি ব্যতিক্রমীভাব—সুস্তম্ভ রোমান্থাদি সাম্বিকভাব;—কৌশিকী, ভাঙতি প্রভৃতি কোন স্বভাব কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে—তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রস-প্রথম করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির স্রষ্টি মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাজ্ঞা না করেন, তবে আমরা দিগের অর্জবর্তী হইব।

অল্পমুখে, রাম লক্ষ্মণ সীতাকে একবার চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে চর্মশূন্যমানা গর্ভবী সীতার বিনোদমুখ্য এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশক্তি পর্য্যন্ত রাম-সীতার পূর্ব হস্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই “চিত্র দর্শন” কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—প্রেম যেন আর ঘরে না। কথায়—এই যে L যখন অগ্নিশক্তির কাণ্ড উপেক্ষা করে রাম, সীতাবাননা ও সীতার

পীড়ন জন্য আশ্রিতরক্ষার করিতেছিল—তখন সীতার কেবল “হোছ অজ্ঞ উত্ত হোছ—এই প্রেক্ষক দাব দে চরিতঃ”—এই কথাতেই কত প্রেম। যখন মিথিলাবর্ত্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল। সীতা দেখিলেন,

অসহে • দলন্তবনীনীলপল্লভামলসিনিহম-
সিগলোহামগমঃসলগে দেহসোহাশগগে বিক্র-
মখিমিলদাদীসম্মলসোমসুন্দরসিরী আনাদর-
কপুড়িনমদ্ররসাগগে সিহঃমুখ্যমুখ্যমগলো
অজ্ঞ-উত্তো আনিহিহো।”

যখন রাম সীতার বধবেশ মনে করিয়া বলিলেন,
প্রথমবিরলৈঃ প্রান্তোঃসীলম্বনোহর কুন্তলৈ
দর্শন মুকুলৈমুখ্যলোকঃ শিশুদধতীমুখমুখ।
বলন্তললিতৈঃসোম্যাপ্রান্তৈরকৃত্তিমবিভুতৈ-
রকুমুদ্রৈররানংগৈঃ কুন্তুলমকটৈঃ।†—
• স্বধন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া
কহিলেন,

কিমপি কিমপি মদমঃমদমঃসরিযোগা
দবিরলিতকপোলং স্পষ্টতোরক্কেমণে।
• আশিলপরিরদ্যাপুতৈঃকোদাম্যো

• আঃ। আর্থ্য পুত্রের, কি সুন্দর চিত্র। প্রমুদ্রপ্রায় নবনলোপলবৎ শ্যামবস্ত্রিত কোমল শোভাযুক্ত কি দেহোপাধি! কেমন অবলীলাক্রমে হস্তমুখ চিত্রিতছেন, সুবর্ণকর কেমন শিখরে শোভিত! শিতা বিজিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন। আশি কি সুন্দর।

† “মাতৃগত তৎকালে বাসা জানকীর অঙ্গ সৌভাগ্য দেখিয়া কি সুখী হইয়াছিলেন, এবং ইহাও অতি সুখ সুখ ও অনতিবিলম্বিত দৃষ্টান্ত, তাহার উভয়শা-
কঃ বনভ্রমের কুন্তল, মনোহার মুখসী, আর সুন্দর চক্র
কিরণ মুখ নিম্নমণ্ডল এবং কপলবিলসি রূপিত কুন্তল
হস্ত পুনর্বার অম্বাচারী ভাবিহরণে আনন্দের একবেশ
করিয়াদিচ্ছলেন।” মুনিঃ বারু অনুবাদ। এই
কবিতাটি বালিকা বর্ণনার হৃদয়।

বরিত্তিগতম্যামা রাগিরে বরংসীং৥১০
• যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া রামভ্রম করিলেন,

অসল্লসিতমুখ্যামগমগমগমগম
দলখিলপরিবর্ত্তে দলমগঃবাহনানি।
পরিবৃত্তিগতম্যামা রাগিরে বরংসীং৥১১
• যখন নিম্নোক্তদ্বারে রাগিকে দেখিতে না

পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,—
তোমু যে কুবিধা করে যে প্রেক্ষামা
অতগো পহবিধা।”†

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই অতি বিজিত কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে। লক্ষ্যণের সঙ্গে সীতার কোচুক, “বহু ইঅং বি অগে কা ?”—মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—“স্মরামি! হস্ত স্মরামি!”—মধুরার কথায় রামের কথা অন্তরিত করণ ইত্যাদি। স্বপ্ননথার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয়, আমাদের প্রতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্ঞ উত্ত এতিঅং দে মংসং
রামঃ। অগ্নি বিপ্রদোঃস্পষ্টে। চিত্রমেতৎ।

• “এক শয়ন করিয়া পরশ্বতের কপোলদেশে পরশ্বতের কপোলের সহিত সান্নিধ্য করিয়া এক উভয়ে উভয়ে এক এক হস্ত ধারণা বাহ্য আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মুখবর্ত্তে ও যদুচ্ছ্রাজসে বহির্গত বস্ত্র পরিত্যাগে আত্মতারে রাগি অন্তরাহিত করিতাম।” এই কথাতো তুমি বর্ণনিত পরিষদে দ্রোহ ইত্যাদি ইহক কল্যাণে তথাপি মনোহর এবং বাহ্য আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দনদ্বারা আর দলিত সূত্রাধীন ন্যাস রান ও দুল্লল হস্তাদি অঙ্গ আলিঙ্গনকালে রাগিয়া নিদ্রা ঘনন করিয়াছিল।” এই বারু অনুবাদ।
† হোক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না কুলিয়া যাই।

সীতা। যদ্যতঃসোদু দুঃখণো অসুখঃস্পষ্টোঃ
স্ট্রীচরিত্র সন্ধে এটি অতি স্মৃতি ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাসক্তি অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাসক্তি তদুপেক্ষা। হীনা নহে—বরং অনেকাংশে তাহার প্রাধান্য আছে। কালিদাসের বর্ণনা, তাহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনায় বস্ত্র তাহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভা অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটী করিয়া বাছিয়া স্বন্দর সামগ্রী গুলন একত্রিত করেন; স্বন্দর সামগ্রী গুলির সঙ্গে ভদ্রা মধুর ক্রিয়া সকল সন্নিবিষ্ট করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে, আরও কতক গুলন স্বন্দর সামগ্রী আনিয়া ঢাপাইয়া দেন। এ জন্য তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অল্পরূপ, তেমনি মাধুর্য পরিপূর্ণ হয়। সীতাসংবাদ রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হইলেন না। ভরভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না। বাহ্য বর্ণনায় বস্ত্র প্রাধান্যে বসিয়া বর্ণনা করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। এই চারিটা স্থল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া ভুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই ছই চারিটা কথায় এখন একটী রস ঢালিয়া দেন, যে তাহাতে চিত্র

শোভা। হা আইসু, তোমার সঙ্গে এই দেখা।
রাম। রিরেহে এত ভয়—এ যে চিত্র।
সীতা। বাহাই হোক না—দুঃখন হলেই মন ঘটা।

অতান্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে । মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—তুংকটে ভবভূতি । উপরে উত্তরচরিতের প্রথমার্ধ হইতে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পশ্চাদ্ভাগের বর্ণিত বরন্যারূপ । ভবভূতির বর্ণনা শব্দের বিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে জনহান এবং পঞ্চবতী, এবং ষষ্ঠকে কুমারনিগের যুদ্ধ । প্রথমার্ধ হইতে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি ।

এতদ্ব্যসৌ কুমারিকঅশ্রুতরগ্রনবর-
হিমে কিরামহেনো দ্বিতী, জতং, অনুভাবদো-
হগণমেতরপিসমধুরসিরী মুক্তং মুক্তো
এৱ পরুণেণ অখলসিনো তরুণে অজ্ঞউহো
আলিহিসো । ৥

দ্বৈতীমাত্র পবে কবি কত কথাই যাক্ত করিলেন ! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র সজ্জিত করিলেন !

চিত্র দর্শনাতে সীতা নিজা গেলেন । ইত্যবসরে দুর্ধ্বং আসিয়া সীতাপাদ স-
হাদ রামকে শুনাইল । রাম সীতাকে বি-
মর্দন করিবার অভিপ্রায় করিলেন ।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দেশ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, এবং সেই জন্যই ভারতে তাঁহার দেবত্ব প্র-
তিষ্ঠা । কিন্তু বর্ধিত বাস্মীকি কখন রাম-
চন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্বগুণ বিবৃতিত বলি-

১ বঙ্গ, এই যে পর্যন্ত, যুগপৎ কুমারিক কদম-
বন্যেরা পুঙ্খ ধরিষে—উভয় নাম কিংবা দেব-
ত্ব, জটলে আর্ধ্য পুঙ্খসম্বিত—ভীষণ পূর্ণ
সৌন্দর্যের পরিবেশনাত ধূরভীত উগ্রাকে চেনা
নাইবেক । তিনি মুগ্ধতম মুগ্ধ হইতেছেন,
গাঢ়িতে ভূমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ ।

য়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই ।
রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অ-
নেক দোষ ; কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতি-
রেকস্বারা এই জন্য তাঁহার দোষ গুলি
ও মনোহর । কিন্তু গুণাতিরেকে যে স-
কল দোষ, তাহা মনোহর হইবেও দোষ
বটে । পরশুরাম স্তবিত্তক পিতৃতত্ত্ব ব-
লিয়া মাৎস্ক্য ; তাই বলিয়া কি মাৎস্ক্য
দোষ নহে ? পাণ্ডবেরা মাৎস্ক্যের অ-
তিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ
স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপ-
ত্নীক দোষ নয় ?

রামচন্দ্রও অনেক নিম্নদণীয় কথ্য করি-
য়াছেন—যথা বালিবধ । কিন্তু তিনি যে
সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই
সীতা বিসর্জন্যাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরু-
তর । শ্রীরামের চরিত্র কোন দোষে কল্-
ষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে
অপরাধী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা
করা যাউক ।

সীতার রাজ্যাকা শাসনে ত্রুতী হইলেন,
প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহত্বম্ ।
দ্রাক ও রোমক ইতিহাসে ইহার অনেক
উদাহরণ প্রকাশিত আছে । কিন্তু ইহার
সীমাত আছে । সেই সীমা অতিক্রম
করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয় ।
যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অধি-
ভ করেন সে রাজার প্রজারঞ্জন প্রেরিত
গুন । ক্রীষ্ট কৃত আত্ম পুত্রের বধ প্রাণ-
জ্ঞা, এই গুণের উদাহরণ । যে রাজা প্রা-
জার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল
কার্যই প্রেরিত, সেই রাজার প্রজারঞ্জন
প্রেরিত দোষ । নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে
প্রেরিত ইহার উদাহরণ । রোবস্পীর ও

দাঁত কৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর
উদাহরণ ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন
প্রেরিত বশীভূত হইয়া সীতাকে বিস-
র্জন করেন । অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য
প্রজারঞ্জন ছিলেন । কিন্তু রামচন্দ্রের
চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না । স্বত-
রাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জন ত্রুতী
ছিলেন না । প্রজারঞ্জন রাজ্যধিগণের ক-
র্তব্য বলিয়াই, এবং ইহুকু বংশীয়দিগের
কুলধর্ম বলিয়া তাহাতে তাঁহার এতদূর
দার্দ্র্য । তিনি অতীবকের সন্মুখে পুর্বেই
বলিয়াছিলেন,

মেহং স্যাম্য তথাসৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুখতো নাস্তি মে যথা ।
এবং দুর্ধ্বং ধেরুং যুৎ সীতার অপবাদ-শু-
নিয়াও বলিলেন,
সত্যং কেনাপি কার্যেন লোকস্যা রাধনং ব্রতম্ ।
যং পুজিতং হিতাত্মেনা মাং প্রাণাং ক্ষমুদ্যত । ৥

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিবন ভ্রমে ভ্রান্ত
হইয়া কুলধর্ম এবং রাজধর্ম পালনাৎ,
ভাণ্ড্যধর্ম-পরিচয় জানিয়াও তাগ করিলে-
ন । রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন ।
তিনিও জানিতেন যে সীতা পবিত্রা,—

অথরায়া চমে বেতি সীতাং স্বক্কাং যশস্বিনীম
তিনি কেবল রাজকুলস্থলত অকীর্ত্তিশঙ্কা

“প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যেরূপ, যথা, আত্মপদ,
জিহা, জামককে বিসর্জন করিতে হইলও আমি
লোকসম্মত রূপে বোধ করি না ।” নৃসিংহ বাবুর
অনুবাদ ।

“লোকের আরাধনা করা যার যশস্বিন্যের সন্মুখে
সর্বভাষায় বিধেয়, এবং এহাতি তাঁহারের শক্তি
বহুতরতরপ । কার্য পিতা আমাকে এত প্রাণ
পরিভাষা করিয়াও তাহা প্রতিপাদন করিয়াছি-
লেন ।”—এ

বশতঃ পবিত্রা পতিমাত্র জীবিত পত্নীকে
ত্যাগ করিলেন । “আমি রাজা জ্ঞানাম-
চন্দ্র ইচ্ছাকৃতবংশীয়, লোকে আমার মহি-
মার অপবাদ করে ? জ্ঞানী এ অকীর্ত্তি
সহিব না—যেস্তীর লোকপন্যাদ আমি
তাহাকে তাগ করিব ।” এই রূপ রামা-
য়ণের রামচন্দ্রের গর্ভিত চিত্তভাব ।

বাস্তবিক সর্বভাষে, রামায়ণের রামচন্দ্র
হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কো-
মলপ্রকৃতি । ইহার এক কারণ এই, উভয়
চরিত্র, প্রায় রচনার সময়োপযোগী । রা-
মাণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে
উত্তরাকাও বাস্মীকি প্রণীত নহে । তাহা
হউক বা না হউক, ইহা ত্রে প্রাচীন রচনা
তথ্যবয়ে সংশয় নাই । তখন আর্ধ্য জা-
তীয়েরা বীরজাতি ছিলেন—আর্ধ্য রাজ-
গণ, বীরত্ববিশিষ্ট ছিলেন । রামায়-
ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাভীর
এবং ধৈর্য পরিপূর্ণ । ভবভূতি যৎকালে
কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে
চরিত্রের নহেন । ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলস-
দির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃ-
ত হইয়াছিল । ভবভূতির রামচন্দ্রও সেই
রূপ । তাঁহার চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই
নাই । গাভীর এবং ধৈর্যের বিশেষ অ-
ভাব । তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখনও
কাপুরুষ বলিয়া ঘা হয় । সীতাপবাদ
শুনিয়া, ভবভূতির রামচন্দ্রকে প্রকার
বালিকাশ্ললত বিলাপ করিলেন, তা-
হাই ইহার উদাহরণ স্থল । তিনি শুনিয়াই
মুগ্ধ হইলেন । তাহার পর দুর্ধ্বং ধেরু
কাছে অস্বীয় দাক্ষিণ্য করিলেন । অ-
নেক স্বদ্বীয় বন্ধুতা করিলেন । তন্মধ্যে
অনেক সঙ্গরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু

এত বাগাড়ম্বর করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ্য করিলে, বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা—শব্দের বড় ঘটা, কিন্তু অন্তঃশূন্য—

“হা দেবি দেবযজ্ঞন সম্ভবে। হা স্বজ-সাহ্যগ্রহণবলিতবৃন্দকরে। হা নিমিষ-নকবংশনদ্দিন। হা পাবকবশিষ্ঠাক্রুদ্ধতী-প্রশস্তশীলশালিনি। হা রামযজ্ঞবি-ভে। হা মহারণুবাশপ্রিয়গণি। হা প্রি-য়স্তোত্রবাদিনি। কথমেবং বিধায়াস্তবায়-নীদৃশঃ পরিণামঃ”।*

* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় মুহূর্ত্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন, এই রূপ কি আমাকে বলে?” সকলে ক্রমিতে মন্তক নত করিয়া অভিদান ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এই রূপে বটে—শব্দ শব্দ নাই।” তখন শত্ৰুরসন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বরষা বর্ষায় করিয়া দিলেন। বহুবর্গকে বিদ্যাক্রিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করিয়া সম্মোহে আদীন দোহারিককে এই কথা বলিলেন যে শুভলক্ষণ সুমিহা নন্দন লক্ষণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাধিত শত্ৰুকে শীঘ্র আমি: . . . তাঁহার রামের মুখ, রাহুগুপ্ত চন্দ্রের ন্যায় দেখিলে। ধীমান রাহুগুপ্তের নয়নমুগল বাস্পপূর্ণ এবং মুখ চক্রেপিত পঙ্কজের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহার আরিত তাঁহার অভিদান করিয়া এবং তাঁহার পদমুগল মন্তকে ধারণ করিয়া সকল সম্মোহিত হইয়া রহিলেন।

এই রূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহা-কবির অযোগ্য—কেবল আধুনিক বিদ্যা-লঙ্কারদিগের যোগ্য। এইরূপ হলে রা-মায়েণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত

রাম অক্ষপাত করিতে লাগিলেন। পরে বা-জুযুগলের দ্বারা তাহারিগকে আলিঙ্গন ও উপাখান পূর্ব্বত মহাবল রামচন্দ্র তাহারিগকে “আমনে উপবেশন কর;” এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ষষ তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদি-গের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবহত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরি-মার্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া বাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধা-ন পরায়ণ ভূতগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিয়া উদ্ভিগুদিত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই নীনচেতা উপবীত ভাতৃগণকে পরিপশ্ব মুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমার নীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে বেরূপ কথা বড়িয়া-ছে, তাহা শ্রবণ-মন অনুযায় করিও না। জন-পদ এবং পৌরজন মধ্যে আমার মুমহান অপবাদ রূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহারে মর্শ্বক্ষেণ করিতেছে। আমি মহাশা-ইলাকুদিগের দুলে জগিয়াছি, নীতাও মহাশা-জনকরাগী জনকদুলে জগিয়াছেন। আমার অ-ন্তরাঙ্গও জানে যে, যশস্বিনী নীতা শুদ্ধচরিত্রা।

তখন আমি ইন্দেবহীকে গৃহণ করিয়া অযো-ধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান অপবাদে আমার দ্বন্দ্বের শোকে বর্তিতেছে। পৌর জন মধ্যে—এজন পদে মুমহান অপবাদ হইয়াছে। লোকে বাহার অকীর্ণগান করে বাহ্য সেই অকীর্ণ লোকে প্রকীর্ণিত হইবে তাহৎ, সে অধম লোকে পতিত থাকিবে। দে-

কাদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্র-কৃত শ্রীরাম সভ্যগণে নীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভ্যদুর্গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে-মন সকলে কি এই রূপ বলে?” সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কহাকে কিছু না বলিয়া সভ্যহইতে উঠিয়া গেলেন। মুখাও গেলেন না,—

বতারা অকীর্ণির নিন্দা করেন, এবং কীর্ণিই সকল লোকে পূজনীয়। সকল মহাত্মা ব্যক-তির যন্ত্র কীর্ণিরই জন্য। যে পুরুষবর্ষণ, আমি অপদাম্বরে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি তোমাদিগের ত্যাগ করিতে পারি, নীতার ত কহাই নাই।

অতএব তোমরা দেখে আমি কি শোক-মাগুরে পতিত হইয়াছি। আমি ইহার অ-খিত দুঃখ গুণতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিহঃ! তুমি কল্য প্রভাতে সুমুখাধিগত রথের নীতাকে আরোপণ করিয়া যয় অরো-হণ করিয়া, টাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। আমার অপরা পদে তুমি নার-ভীরে মহাশা বালুণীক মুনির ঘণ্টত্ব আশ্রয়। হে যমুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইচ্ছা-ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—নীতাপরিহাতিগণ। বিবাক্য তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছু করিও না। অতএব হে সৌ-মিহঃ! যাও—এ বিবাক্য আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বা-রণ কর, তবে আমার পরমাধীশ্বরিক হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের ঘোরে তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি—যে ঘোই হাতে আমাকে অনুময় করিবা তাহা কোন-রূপ কোন কথা বলিলে, আমার অভীষ্টানি হেতুক আমার শব্দ থাকিবে নিত্য মুক্তি। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিবা, তোমরা আমাকে সমান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অন্য নীতাকে লইয়া যাও।

মাতাও কটিলেন না—ভ্রমেও গড়াগ-ড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, স্বা-ভরতাশূন্য ভাষাভা তাত্বগণকে ডাকি-লেন। ভাতৃগণ আসিলে, পর্ব্বতবৎ অবচলিত থাকিয়া, তাহারিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি নীতাকে পাবি। জানি—সেই জানাই এখন কুরিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকপরিবাদ! অতএব আমি নীতাকে কণা পরিবাদ।” শ্রিরপ্রতিভা হইয়া, ল-ক্ষ্মণের প্রতি রাজ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, “তুমি নীতাকে বনে দিয়া আইস।” যো-মন অন্যান্য নৈতানৈমিত্তিক রাজকারণে রাজাচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেই-রূপ লক্ষ্মণকে নীতা বিনিক্ষেপে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষু জল কিন্তু একটুও শোকা-হুত্ব কথা ব্যবহার করিলেন না। “মর্দা-নি কৃষ্ণতি” ইত্যাদি বাক্য নীতাখিযোগ্য গাশ্বাঙ্গ্য নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তাপনি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আবার অস্বস্তি করিতে পারি। রামায়-ণে যুল সচরার পঠিত হয় না, এবং এতদংশের অস্ববাদও আমরা কোথাও দেখি নাই। অতএব এই স্বল উত্তরকাও হইতে উদ্ধৃত এবং অস্ববাদিত করিলাম। তদ্যাবৎ ভাষিতঃ স্কন্ধাশ্রাব্যঃ পরমার্থবৎ। উবাচ মুদ্রাঃ সর্ষষঃ কথমেতদ্বদন্তি মাং। সর্ষষঃ শিরসস্ছ্রীবিভাবান প্রণয় চ। প্রত্যুত রাঘবঃ নীনমেঘমেতদঙ্গঃ শয়ঃ। কণাক্রবাক্যঃ কাকুঃ সর্ষষঃ সন্মুখিরিতঃ। বিসর্গামাস তদা বয়সান শত্ৰুসুদনঃ। বিস্কৃতঃ সুস্বর্ণঃ শূক্ৰাশিক্ষিতা রাঘবঃ। সমীপে রাঘবানীনন্দনঃ বচনমব্রবীৎ। শীঘ্রমপ্যে সৌমিহঃ লক্ষ্মণঃ শ্রুত লক্ষ্মণঃ। ভরতঃ চ মহাভাগঃ শত্ৰুঘ্নঃ চ পরাজিতঃ।

দ্বৈতং দৃষ্ট্য। মুখং তস্য সপুংঃ শশিনং যথা ।
সন্ধ্যাপরিমিত্যং প্রভাত্যপরিমিতং ॥
বাৎসপূর্ণ্যে চ মরুতে দৃষ্ট্য। রামস্য ধীমতঃ ।
হস্তশাভং যথা প্পদ্যমুখ্যাক্য চ তস্য তে ॥
ততোভিরাট্যজরিতাঃ পাদৌ রামস্য মুখ্ৰিতঃ ।
হস্তঃ সমাধিতাঃ সর্গে রামস্থজ্ঞানার্যয়ঃ ।
তানপরিবৃজ্য বাহুভ্যামুপাশ চ মহাবলঃ ।
আনন্দমাস্তেত্যুক্ত । ততোভাভ্যং জগাদহ ॥
ব্রহ্মব্রহ্মেয় সর্গব্যং ভবভোক্তাবিতং মম ॥
ভবভিত্তকৃত্যং ব্রাহ্মণ্যং সালগ্রাম্য নরেশ্বরঃ ।
করকৃত্যশাস্ত্রার্থবুদ্ধ্যাক্য পরিমিত্তিতাঃ ।
সংস্কৃত মনোরমমহেচ্চক্যোনরেশ্বরঃ ॥
তথা বদতি কাকুৎস্থে অর্থদান পরায়ণাঃ ।
উষিধমনসঃ সর্গে কিমুরাজাভিধাম্যতি ॥
তেষাং সমুপকিতানাং সর্গবর্ষাঃ দীনচেসাম্য ।
উভাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিষ্রুত্যা ॥
সর্গে শৃণুত ভঁসুরোমাকুলুপং মনোনাথ ।
পৌরাণাং মম সীতার্য বাচুশী বর্ষতে কথ্য ॥
পৌরাণবাসঃ সুবাহনং তথাজনপদস্য চ ।
বর্ষতে মরিদীভংস্য মম মর্ঘাণি কৃষ্যত ॥
অহং কিল কুল জাত ইচ্ছানুনাং মহাশ্বনাম্ ॥
সীতাপি সৎকলজাত্য জনকানাং মহাশ্বনাম্ ॥

অন্তরাষ্ট্রা চ যে বেদী সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ॥
ততো গুহীজ্য বৈদেহী মনোবাৎসল্যমাগতা ॥
অহং কুমে মহাশ্বাসঃ শোকস্ত জ্বলি বর্ষতে ॥
পৌরাণবাসঃ সুমহাশ্বং তথ্য জনপদস্য চ ।
অকীর্তন্যগীর্ষেতে লোকে ভূতস্য কমাচিৎ ॥
পততোবাধমালোক্যনাং যাবচ্ছ পূকীর্ষতে ।
অকীর্তন্যগীর্ষেতে লোকে ভূতস্য কমাচিৎ ॥
কীর্ত্যং জু সমারভঃ সর্বব্যং সুমহাশ্বনাম্ ॥
কীর্ত্যং জীবিতং জগাং যুগ্মাশ্য পুণ্ড্রবর্ষাঃ ॥
অপবানভ্যাত্যতীতঃ কিং পুনজনকাত্মজাম্ ॥
তন্মাহুত্বঃ পশ্যত পতিতঃ শোকসাগরে ॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতকিঞ্চিৎখমতোপিকং ॥
মজঃ পুভাতে সৌমিত্রে মুদ্রাশ্রিতিং রথং ॥
অন্তরাষ্ট্র সীতারোপ্য বিবরণপদেৎসংস্কৃত ॥

গদায়াস্তপরে পারে বালীকেন্ত মহাশ্বনাম্ ॥
আশ্রমোদিসনস্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ ।
উভোনামিহজনে দেশে বিস্তুত্ব রমুনন্দন ।
শীতুম্যাগচ্ছ মৌমিত্রে করুণ বচনং মম ॥
নান্যন্থং প্রতিক্রিয়াং সীতাং প্রতি কথংখন ॥
তন্মাজ্যং গচ্ছমৌমিত্রে নীতা কাব্যিকারণা ॥
অপূতিধিঃ পরামহ্যং অয়েতং পুতিবারিতে ॥
শাপিতা হি ময়ামুদ্রং পানীত্যাং জীবনেন চ ॥
যেহাং বাহ্যাক্ষরে ত্রুয়ুননেতুং কথংখন ॥
অহিতানামতে নিত্যং মদভিক্ত বিহাত্যনং ॥
মানসস্তবভোয়া মম যদি মজ্জাশনেদ্বিতাঃ ॥
ইত্যোনীয়তাসীতাং করুণ বচনং মম ॥

এই রচনা অতি মনোমোহিনী । রা-
মায়ণের রান, ককীয়, মহোজ্জ্বলকুলসমু-
দ্র, মহোক্তক্কী । তিনি পৌরাণবাস্য প্র-
বণে, হৃদ্বিক্ত সিংহের ন্যায় রোষে ছুট্বে
গর্জন করিয়া উঠিলেন । ভবভূতির রা-
মচন্দ্র তৎপরিবর্তে জীলোকের মত পা-
ছড়াইয়া কান্দিতে বসিলেন । তাঁহার ক-
ন্দনের কিয়দংশ পুর্বেই উক্ত করিয়াছি ।
রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য
বশিকীরাংশও উক্ত করিলাম ।
রাম । হা কটমবিতীতকর্ম্মকর্ম্ম দৃশং মোক্ষ-
সংস্কৃতঃ ॥

শৈশব্যং প্রভৃতি পোহিত্যং প্রিরাং
সৌভদানপূর্ণাশায়াম্যাম্ ॥
জ্ঞান্য পরিব্রাজ্য হৃতাবে
মৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ।
তংকিন্দন্যশ্রীমঃ পাককী দেবী দৃশয়ামি ॥
(সীতার্যঃ শিরঃ স্বৈরমুমময্য কায়মাকরন)

• হা দেবি যজ্ঞকুসিদ্ধকর্তা । হা জগদ্রহণ পরিক্রি-
তবাহুধরে । হা নিমি এতং জনকবংশের আনন্দবাধি ।
হা অর্ঘ্য বশিক্তবের এবং অরুণতী সূর্য্য প্রাণসংযম
চিরকো । হা রামস্য জীবিতো । হা হাব্যনন্দসুপ্রিয়-
সহচরি । হা মদুরভাবিনি । হা নিভাসিনি । এইরূপ
হৃদয়ও শেষে তোমার অশ্রুতে এই ঘটিল ।
নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ ॥

অপূর্ণকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুখে বিমুগ্ধমাম্ ॥
উপাসিচন্দনভ্রাত্য দূর্বিশাখং বিষক্রম্য ॥
প্রিত্য । হস্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্পূতি জীবলোকে
পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং ॥ রামস্য শূন্য-
মধনা জীর্ণাবরণ্যং জগৎ অনারঃ সন্মারঃ
কটপ্রায়ঃ শরীরম অশরৎশাশ্বি কিংকরোমি
কা গতিঃ । অথবা ॥
দৃশংনং বেনদানৈব ॥ কামেইতন্যমাহতিম্
মর্মেপমোহিত্তিঃ প্রাণৈবজ্ঞ কলীমিত্তিঃ ॥
হা অশ অরুণতী হা ভগবন্তো বশিক্তবিশা-
মিত্তো । হা ভগবন পাপক হা দেবি জুহবা
হা তাত জনক হা তাত হা মাতরঃ হা পরমো-
পকাসিন লঙ্কাধিপতে বিভীষণ হা প্রিয়মুগ্ধ সু-
প্রীত হা সৌম্য হনুনন হা শশি জিজ্ঞাটে মুখি-
ত্বাং পরিজুত্ব শরমহতকেন । অথবা কশ-
ত্রেমামহমিতানীমাহনামে ॥

চেহি মন্যো মহাশ্বানঃ কৃত্যনেন দুরাশ্বনা ।
মহাগৃহীতান্যমানঃ স্পৃশ্যত ইব পাণ্ডানা ॥
যোহম্ ॥
বিনুভাদুরসি নিপত্য লরুনিদা
মুদ্রতা প্রিয়গুণীনাং গৃহস্য শোভাং ॥
অভাবক্ক দ্বিতকটোরগর্ভগর্ভী ॥
জ্যোত্বাৎ বসিমি নিমুগ্ধং কিপামি ॥

সীতার্যঃ পাদৌ শিরসিস্কৃষ্টা দেবি দেবি অয়ং
পশিমাত্রে রামস্য শিরসীপাদপদজ্ঞানার্শঃ
ইতি রোদিতিক ॥
ইহার অনেক গুণিন কথা সক্রন
বটে, কিন্তু ইহা আর্থাবিত্যপ্রতিম ম-
হারাজ্য রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত
না হয়, আধুনিক কোন বাঙ্গালী বাবুর
মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত ।
কিন্তু ইহাতেও বিন্দ্যাসগণ মহাশয়ের
মন উঠে নাই । তিনি সীতার বনবাসের
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রায়কি কিছু

• অলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে কাব্য বলেন না-
ইতিহাস বলেন ॥

বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠ কালে
রামের কাম্য পড়িয়া প্রাশাদিগের মনে
হইয়াছিল যে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা
শামী বা পুঙ্ককে বিনেশে চাকরি করিতে
পাঠাইয়া এই রূপ করিয়া কান্দে ॥
ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য, যে উ-
ত্তর চরিত নাটক ; নাটকের উদ্দেশ্য হু-
জিত্ব ; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কা-
ব্যের • উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার । সে উদ্দেশ্য

• হায় কি কট । নিষ্ঠুরের মত, কি মুগ্ধ-
জনক কর্ম্মই রামকে প্রবৃত্ত হইয়াছে । বাল্য-
বধ হইতে কালোতে প্রবৃত্ত মহা বক্রিা প্রতিপা-
লিত করিয়াছি । যিনি গাঢ় প্রণয় বশত কোন
রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ
করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়কর্ম্ম মাংস
বিক্রী যেমন গৃহপালিত্য পক্ষীকে অনা-
য়াসে বধ করে, সেই রূপ চলক্রমে করাল
কাল গুণে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ।
এতএব পাতকী মৃতরাং অস্পৃশ্য আমি বে-
দিকে আর কেন লক্ষিত করি ? (কোম ক্রমে
সীতার মস্তক আপনার বক্ষস্থল হইতে নামা-
ইয়া বাহ আকাশপূর্ণক) অগ্নি মুখে । এ অ-
ভাগ্যকে পরিণতগা কর । আমি অদৃষ্টের এবং
অন্তপূর্ণ পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালস্ত প্রপু-
র হইয়াছি । হায় । তুমি চন্দনবৃক্ষভূমি এইভরা-
নন বিষকুলে (কি কুণ্ঠেই) আশ্রয় করিয়া
ছিলে ? (উক্তি) হায় এক্ষণে জীবলোকে উদ্ধার
হইল । রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্র-
য়োজন নাই । এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ
অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে । সন্ধ্যা
অমার হইয়াছে । জীবন কেবলমাত্র ক্রেশপ
নিবানরূপ বোধ হইতেছে । হায় । এতদিনে
আশ্রয়দেহীন হইলাম । এমন কি করি (কো-
থায় যাই) কিছুই স্থিরকরিতে পারিতেছি না
(চিন্তা করিয়া) উঃ । আমার এমন কি গতি
হইবে ? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে) ॥

কার্যপরাশরায় সরস বিরতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাঁদের বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাট্যকারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত যাবজ্জীবন মুখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতাশা) রাসের বেছে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইরাছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যায়ন্ত কেন বন্ধুর ন্যায় মর্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মায়া অকলঙ্ক। হা ভগবৎ বশিষ্ঠদেব! হা মহাশয় বিশ্বামিত্র! হা ভগবৎ অগ্নে! হা নিখিল জুত থাকি ভাবিতে বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)। হা কোশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিণী লজাপতি বিজয়লক্ষ্মী! হা প্রিয়বন্ধো সুগৃধী! হা সৌম্য হনুমান! হা মধু বিক্রান্তে! আজি হতাশা পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্বনাশ (সর্বযায়নহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা ক-

চিহ্ন চাহি। স্তবরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তর চরিত্রের প্রথমদিকের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথা গুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমযুগ্ম অসারবান যুবকের কথা।

রিয়া) অথবা এই হতাশা এখন তাঁহাদিগের নামোচ্চারণ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃত্য পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাশাস্ত্রিগের নাম গৃহণ করিলেও পাপস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি নৃত্যবাহন বশুঃ বৎসহলে নিমিত্ত প্রায় সীতাকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্ধরণ বশতঃ ঐযৎ কলিঙ্গ গভর্ভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচনপূর্ব্বক নির্দয় জনরে মাংশী রাজসদৃশগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইরাছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকস্বারা গৃহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই ঘেষ স্পর্শ হইল। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

জান ও নীতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে বলেন যে, মহুঘোর জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই। বিজ্ঞান দিন দিন কত সূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন সূতন কথা কহিতে পারে না। দূরবীক্ষণ সহযোগে গগনচর অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ড-

• সুপ্রসিদ্ধ পুরাণবিশেষ "বাল্মুকী" সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই মত সর্বত্র করিতে দেখা গিয়াছে।

লের আকৃতি প্রকৃতি নির্ণীত হইতেছে; অনুবীক্ষণ সহকারে জলবিস্তৃষ্টিতে কোটি কোটি কীটাদিগের জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে; উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈসর্গিক নিয়মনীতিগণদ্বারা সমুদয় বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধ ঘটনামালা বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আড়াই শত বৎসরের পূর্বে রিজটনের যৎপরনায় অবস্থা ছিল, ঐক্ষণে তাহা হইতে কত বিভিন্ন হইয়াছে। গতি, আলোক, তড়িৎ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি

পদার্থ নবীন ভাব ধারণ করিয়াছে; জ্যোতিষ, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, ও সমাজ তত্ত্ব কত অভিনব সত্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন হাজার বৎসর পূর্বে অপেক্ষাকৃত অসত্য বিশ্বদী ব্যাবস্থাপক যুগা যে সকল নীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন, সভ্যতাভিনানী ইউরোপ বাসীরা তাহা অপেক্ষা কি অধিক দিতে পারেন? আর যে ভারতবর্ষকে উপধর্ম্ম-সঙ্কল বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা করেন, সে ভারতবাসী মহু ও বুদ্ধ প্রাচীনকালে বৈরূপ স্বনীতির নিয়ম সংস্থাপন করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহারা কি জানেন? যদি মত পারিতোষ্য করিয়া চারিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ইদানীন্তন কালীন সভ্যজাতিদিগকে অন্যোপেক্ষা সম্ভরিত বোধ হয়? বাহারা ইউরোপ ও আমেরিকার মদ্যপানিতা, অর্থলোভ, ইন্দ্রিয়মুখাশক্তি ও স্বার্থপরতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই একথা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা বর্তমান কালস্থ সভ্যনামগণকিত সমাজ সমূহে ভীষণযুক্তি দরিদ্রতার প্রবলতা ও দীন হীন, নিরুপায়া অবলা-কুলের দুরবস্থা দেখাইয়া উন্নতপন্থী-বিশিষ্ট শুদ্ধকান্তি মহাত্মাগণের নৈতিক অমূল্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বলেন, যেখানে একদিকে কর্তব্য-গুলিন লোকে অভুল ঐশ্বর্য্যভোগে জগ-ভিতস্ত সমস্ত উপাদেয় পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, আর অন্য দিকে "হা অম! হা বস্ত্র" করিয়া অসংখ্য বুদ্ধিজীবী জীবিত কষ্টপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎকরণে দিনপাত করত অকালে কালের করাল কবলে

কবলিত হইতেছে; সেখানে কখনই সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কর্তব্যজ্ঞান অনাদেশীয়-মাত্রিগের অপেক্ষা অধিক নাই।

মহুঘোর নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে কি না এবং সভ্যতারদ্বিতীয় সঙ্কে সঙ্কে কি নৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, আমরা এই প্রশ্নে মীমাংসা করিতে যত্ন করিব, কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মহুঘোর আদিমকালের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। জুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন অস্থান লক্ষ বর্ষ নরজাতি অবনীমণ্ডলে প্রাচুর্য্যত হইয়াছে; কিন্তু এই বিশ্লেষণময়ের মধ্যে আমরা কেবল কোন কোন দেশের শেষ মৃত্যু চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র অবগত আছি। যদি এই অপেক্ষাকৃত মধ্যে বিশেষ নৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে নীতিবিষয়ে লক্ষ বৎসরে কিছুকাল উন্নতি হয় নাই, এ প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রায় সকল দেশেই জনপ্রভুত্ব আছে যে, পূর্ব্বকালে লোকে ভগ্নপঙ্কজত-ধার্মিক ছিল, আবাদিগণের দেশীয় সভ্য-যুগ এবং যখন ও রোমের জাতিজ লুণ্ঠন প্রাচীনদিগের নীতিপ্রোত্তা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও বল প্রথমে মহুঘা নিষ্পাপ ছিল, পরে সময়তানের ক্রুদ্ধে পড়িয়া পাতক-পঙ্কে পতিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি পুরাতন গ্রন্থপাঠে প্রতীত হইতে পারে যে, কালসহকারে নরজাতির নৈতিক অবনতি হইতেছে। এ

বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে সভা-বস্ত্র পিতা মাতা এবং রক্ষণের প্রতি মানবগণের যথেষ্ট ভক্তি আছে, আপ-মানিগণের সমবয়স্ক চপল সভাব্যেবোনা-মাত্র ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে সঁচরিত দেখিয়া প্রাচীনদিগকে অপেক্ষা-কৃত ধার্মিক বলিয়া অনেকের অম জগিতে পারে; বিশেষতঃ সমকালীন লোক-দিগকে যেমন পাণে লিপ্ত দেখিতে পায়, অতীতকালের বিষয়ে জান না থাকিতে পূর্বকালস্থ লোকেরা সেরূপ পাণে লিপ্ত ছিল, পুরাতনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারিতে পারে না। আমরা বর্তমান কাল ও নবোপস্থ পদার্থের প্রতি অসম্ভব, কারণ তাহাদিগের দোষ পদে পদে লক্ষিত হয়; কিন্তু দূরত্ব ও অজ্ঞাত বস্তুসমূহ আ-নাদিগের নিকট রমণীয় মূর্তি ধারণ করে। এজন্যই আমরা পদতলস্থ শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট বিজ্ঞ বস্তুর তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করি। এজন্যই আমরা স্বপ্ন-ছায়া-মিথি বর্ত-মান জীবন প্রবাহ পরিহারার্থে স্থতিপথে বাল্যকালানিভুথে গমন করি, এবং আ-শার সাধন্যে অন্ধের ভবিতব্যবস্থা ধা-বিত হই। এজন্যই লোকে অক্ষতসম-সারত অলক্ষ্য অতীত প্রদেশে সভ্য বা ধর্মগুণ বিরাজমান দেখে। এজন্যই দ্রু-তময় স্বর্জনর অবস্থানে ভারতবাসীগণ পুনরায় সভ্যগুণের আবির্ভাব এবং যি-হুদী ও খ্রীষ্টান সম্ভ্রদাগীরা “মিলিনিয়ম” রূপনা করিয়াছেন।

অতীত প্রাচীন কালে মহুঘোর যে অতীব হীনাবস্থা ছিল, বীহারী “ডারউইন ও ওয়ালেস” দূরেবের সভ্যবলী উহার

অবশ্যই বীকার করিবেন। ১০ খ্রি নর ও বানর উভয় জাতিই এক বংশ জাত হয়, তাহা হইলে মানব কুলের যে নীতিবি-ষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানবেত্ত্র প্রিয় দিগন্তপ্রসারী মত সভ্য হউক বা মিথ্যা হউক, পুরাতন জন-প্রতি, অসভ্য জাতিদিগের বর্তমানাবস্থা, এবং বিনত-ব্রিহত্ত বর্ষের ইতিবৃত্ত প-য়্যালোচনা করিলে সভ্যজাতিগণ যে অ-পেক্ষাকৃত স্মৃতিসম্পন্ন হইয়াছে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

৩। সমুদয় পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব-কালে আমাদের দেশে নরবলি প্র-চলিত ছিল। পরে যখন বিবেচনা

• ডারউইন ও ওয়ালেস উভয়েই পরিণাম-বাদী। ইহাদিগের মতে অসভ্য ভেদে ক্রমে ক্রমে অস্প অস্প পরিবর্তন ঘটিলে কাল সহ-কারে-ইহর জন্ম হইতে উচ্চতর জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

† বালকগণ রামায়ণ, ১১ ও ১২ সর্গ, সন-শেপের উপাখ্যান দেখ। কয়েকটি লোকমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

এতদ্বিষয়ে কালেজ অসোধ্যোপতি র্মান। অদ্বীয় ইতি খ্যাতো যদু-সমুপচক্রমে ॥ তস্য ইব যজমানস্য পত্রমিল্লোজহার হ। প্রকোষ্ঠে পশ্মে বিপ্রো রাজানসিদ্দয়ব্রতীঃ ॥ পরব্রাহ্মতো রাজান প্রণতস্ত্র দোহগং ॥ প্রায়শ্চিত্তঃ রাজানঃ স্রুতি ভোম নরেশ্বর ॥ প্রায়শ্চিত্তঃ মহোত্তমরঃ বাপুরুষভিঃ ॥ আনয়র পশুং শীশুং বাবৎ কর্ম প্রবর্ততঃ ॥

এই কালে অদ্বীয় নামে খ্যাত মহান অ-মোধ্যোপতি যজারুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যজরূপ পুত্র ইন্দ্র হরণ করিলেন। সেপশু অপছত হইলে বিপ্র রাজাকে বলিলেন। “রাজন তোমার দুর্নীতি নিমিত্ত সংঘটিত পশু অপছত হইয়াছে। যে মরেশ্বর, রক্ষাকার্য্য প-

হইল যে অসভ্যসমূহ পরম ধর্ম,” তখন কি আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নীতি-বিষয়ে উন্নতির পথে একটা অগ্রসর হন নাই? মহাত্মার তে একটি শাছে আদিমকালে ইন্দ্রিয়ভোগসংক্রান্ত যেষ্টা-চারিত্র্য সংকার্য্য বলিয়া পরিকীর্তিত কৃ-ইতঃকোন বজ্রাভীর্ন পুরুষে বাসনা প্র-কাশ করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই না-র্য্যালোচনা করিলে প্রমাণ দর্শ ছিল। পরে যখন শ্বেতকেতুর ধর্মবুদ্ধি প্রভাবে সভ্যত্বের সৃষ্টি হইল, তখন কি আর্য্যগণ নৈ-তিক উন্নতিসোপানে কিয়দূর উন্নতিলাভী হন নাই?† শত্রুবিনাশের অনেক প্রশং-

রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রকে দোষ সকল নষ্ট করে। কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, যে পুরুষযত্ন, হয় সেই পশুকে নতুবা মহৎ প্রাচীকৃত স্বরূপ কোন নরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

† অসভ্যতা কিংবা পুরা স্মিৎ আসন্ন ক্ষুণ্ণনে-কাম্যায়ুজরমহানামকোমারসংস্কৃতপত্নী ন। ধর্মোদ্ভবদ্বারাওহে সর্বিধর্মঃ পুরাতনঃ ॥

প্রমাণদ্বয়ী ধর্মোদ্ভব পুত্র্যতে চ বহুবিভূঃ। উত্তরতঃ চৈভোক্ত ব্রহ্মস্বাপি পুত্র্যতে ॥

খ্রীষ্মানুগৃহকঃ স হি ধর্মঃ সাংমানঃ ॥

অস্মি-স্বলোকো ন স্তিরাধর্ম্যাদোঃ স্তিচিহ্নিতো

স্বাপিতা যেন যজ্ঞজ তমে সিন্ধুরতঃ শূন।

বজ্রোক্তব্রাহ্মণো নাম মহর্ষিরিতঃ নঃ ক্রতুং ॥

শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্বয়্য ভবমুনিঃ ॥

মর্য্যাসেয়ঃ কৃত্য তেন ধর্ম্যো ইব শ্বেতকেতুনা।

কোপাঃ কমলপত্রায় যদর্শৎ ৩০ নিবোধ মে ॥

যেবেলোভোঃ কিংবা পুত্রা সমকর্ম্মমাতরঃ পিতৃঃ ॥

গুণাঃ ব্রাহ্মণঃ পাণো লঙ্ঘ্য ইতি চাত্রবীঃ ॥

ধর্মপুত্রস্তঃ কোপঃ চকারাম্যোক্তোদিতঃ ॥

মাতরঃ ত্যং তথা দুর্নী শ্বেতকেতুঃ স্যুতঃ ॥

মাতা তাত কোপঃ কাব্যোপেয়ঃ ধর্ম্যঃ সাতনাতঃ ॥

অনাবৃত্তা হি সর্বেশ্বরাঃ বর্ণানামননা ভূবি ॥

স। রামায়ণ মহাত্মার প্রাচীতে দেখা যায়; কিন্তু “যেমন চন্দন রক্ষ জ্বলন-কালে ও ছেদনকারীকে স্বগন্ধদান করে, তেমনি সাধুব্যক্তি মরণকালেও প্রাণপ-হারক অপকারকের উপকার করেন,” এই মহাবাক্য মন্থন সভ্য বলিয়া পরিগৃ-হীত হইল, তখন কি পূর্বকালে কি-কি-মাত্র স্মৃতিবুদ্ধি হয় নাই?

যথা গাভঃ দ্বিত্যন্ত্যত্ব য়ে বৈ বর্ণে তথা প্রজ্ঞাঃ ধর্মি পুরোধত্ব তৎ ধর্মঃ শ্বেতকেতুঃ চক্রমে চকারটৈব মর্য্যাদা মিমাত্ত্রীপুং সন্যোক্তুবি ॥ মানুসেযু মহাত্মগে নমস্কাবনোযু জঘ্ৰু ॥ তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা দ্বিতে মিতি নঃ সন্তুষ্টঃ ॥ যুজরত্যাঃ পতিঃ মর্য্যঃ ৩০ অদ্য প্রভৃতি পাত্রকঃ জনহত্যাসমং যোরং ভবিষ্যত সুখাবহম ॥ ১২১ অধ্যায়। আদিপর্বে। মহাত্মার।

যে সমুখি চারুহাসিনী পূর্বকালে খ্রীলো-কেরা অরুদ্ধ বাদীন ও সঙ্কলবিহারিণী ছিল। পটিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষাশ্রমের উপত্যকা হইলে তাহাদের অধর্ম হইত না, পূর্বকালে এই ধর্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম, ধর্মী এই ধর্ম মান্য করিয়া থাকেন, উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম খ্রীদিগের পক্ষে অ-ত্যন্ত আবশ্যিক। যে ব্যক্তি যে কালের লোক, এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শ্রুত। সন্নিধ্যাচ্ছিন্ন উদালোক নামে মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাঁহার পুত্র ছিলেন। সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম মুকনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা শুনা। এজন্য উদালোক শ্বেত-কেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপ-বিষ্ট আছেন। এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আদিবী শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন এবং এই বাই বলিয়া একান্তে লীয়া গেলেন। ধর্মপুত্র এইরূপে জননীকে নীহারিয়া দৈ-খিয়া শয্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত

প্রাচীনকালে যে সর্বদেশে নরবলি প্রচলিত হইত, তাহার অসুখ্য সংশয় নাই। ফিনিসীয়া, কার্থেজ, গ্রীস, হিব্রু-দী ভূমি, ইংলণ্ড, এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি এতদ্দেশস্থ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে এক প্রথা চলিত আছে। বখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, সেখানেও এই নৃ-শস্য ব্যাপার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। আমদিগের অসুখ্য হইয়া, বাহার নরবলি প্রদান করিত, তাহার কোন না কোন সময়ে নরমাংসাশী ছিল; কারণ নরমাংস অসুখ্য বলিয়া বোধ না হইলে কখনই দেবতাগণের সন্তোষ সাধনার্থে তাহা দিতে প্রথমে প্ররতি হইত না। এখনও অনেক অসভ্য জনপদে নরমাংস-ভক্ষণ চলিতেছে। ঐতদ্দেশীয় গ্রন্থনিচয়ে যে রাক্ষসদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার, বোধ হয়, এই রূপ মানবভোজী ছিল। এই সমুদায়

হইলেন। উদ্ভালক বেতকেতুকু কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোপ করিও না, এ সমা-
তন ধর্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই ক্রী অ-
রক্ষিত। গোজাতি যেমন সজ্জন বিহার করে,
মনুষ্যেরাও সেইরূপ য য বর্ণে সজ্জন বিহার
করে। স্ববিপুল বেতকেতু সেই ধর্ম সত্য
করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে ক্রী পুরুষের
সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। যে
মহাভাগে আমরা শুনিয়াছি তবধি এই নি-
য়ম মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে;
কিন্তু অন্যত্র সজ্জনগণের মধ্যে নহে। অতএব
যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেন, তাহার
জন্ম হত্যার সমান অসুখজনক যোর পাতক
জন্মিবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনুবাদিত।

পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি
জন্মে যে, আমদিগে মহাব্যগণ অন্য-
লোককে আপনাদের আত্ম করিতে পা-
রিলেন- তাহাকে মারিয়া আহার করি-
ত। এই রাক্ষস বংশে বর্তমানকালস্থ
সভ্যজাতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তা-
বিলেই তাঁহারা নীতি বিষয়ে কত উন্নত
হইয়াছেন, কতকদূর অগ্রসৃত হইলে।
ইহাদিগের যে রূপ দূর দক্ষিণ্য, আচার
ব্যবহার, তাহাতে ইহাদিগকে যুক্তকণ্ঠে
ঐদত্যকুলের প্রসাদ বলিতে হয়।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে কেহ
সতীদ্র ধর্ম কাহাকে বলে জানেন না।
বদি বর্তমান কালীয় সভ্যজাতিদিগের
পূর্বপুরুষগণ তাদৃশ দর্শাপণ এক কালে
ছিলেন, এই মতটী প্রামাণ্য হয়, তাহা
হইলে তাঁহাদিগের অনেক নৈতিক উন্নতি
হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ
তাঁহাদিগের ধর্মে বলে কোন নারীর
বিষয়ে মনে মনে অসং ইচ্ছা করাও
পাপ।

অসভ্যজাতিগণ অন্যজাতীয় লোকদি-
গকে শত্রুজ্ঞান করে, এবং শত্রুত্ব করা
পূণ্যভাবে। সভ্যজাতিগণের মধ্যে এই ভাব
অনেক দূর কিস্তাহিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধ-
র্মাবলম্বীগণ অন্ততঃ মুখেও বলিলেন, “সক-
ল মনুষ্যই পরমেশ্বরের সন্তান, আমরা
সকলেই এক পিতার পুত্র, আমরা সক-
লেই ভাতা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি করা
আমাদিগের কর্তব্য।” কার্যে বাহা হউক,
এরূপ যুক্তি কণা শুনিলেও কণ জড়ায়।
এরূপ সত্য প্রকাশ অনেক নীতিবিষয়ক
উন্নতির নিদর্শন। যথার্থপক্ষে ইহাও বলা
উচিত, যে ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে

অনেক শম্ভায়া আছেন, বাঁহারা পরোপ-
কারেতে নিয়ত ত্রুতী রহিয়াছেন, বাঁ-
হারা ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ না
দেখিয়া চিরজীবন মানববংশের মঙ্গল-
চেষ্টা করিতেছেন।

অসভ্যজাতিগণ বাহাদিগকে আহার
না করে বা মারিয়া না ফেলে, তাহাদি-
গকে দাস করিয়া রাখে। প্রাচীন হিব্রু,
গ্রীক, রোমক, প্রভৃতি সভ্য জাতিও দা-
সত্ব অবৈধ জ্ঞান করেন নাই। আরিফ-
টলু ও মল্ল দাসত্বকে নীচ জাতির ষাভা-
বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন। ক্রীষ্ট-
তত্ত্ববর্ষীয় শূত্র, গ্রীসের “হেরট,” রোমের
“প্লাউয়েটর,” সমাজের দাস স্বরূপ
ছিল; তাহারাই উচ্চপ্রণীত জনগণের
সেবাস্বত্বপ্রদ করিত। অন্যের কথা দূরে
থাকুক, সেন্টপল নামক বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম
প্রচারক অসামান্যদীর্ঘজী-প্রভাবের দা-
সত্ব যে নীতি বিবুদ্ধ, ইহা স্মৃতিতে পা-
রেন নাই; কিন্তু জ্ঞানরন্ধির সহকারে
অপমান হইল এই নীতি বিষয়ক প্রা-
চীন সভ্যজাতিদিগের মধ্যে জন্মিয়াছে যে
মহাব্যক দাস করিয়া রাখা অত্যন্ত অ-
ন্যায়; সকল লোকেই সমান, সকল লো-
কেই স্বাধীন, হওয়া উচিত। মানবগণের
সমানতা ও স্বাধীনতা রূপ মহাকাব্য প্র-
থম ফরাসিস্ রাজবিপ্লবে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে
উচ্চারিত হয়। ইহা একটা নীতিশাস্ত্রের
প্রকাশিত। ইহা অতাপকাল মধ্যে অ-
নেকগুলি মহৎকার্য সম্পন্ন করিয়াছে।
ইহার প্রভাৱে আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু-
সংখ্যক লোকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই-

য়াছে, এবং খ্রীষ্টজাতির নীচাবস্থা দূর ক-
রিবার চেষ্টা হইতেছে। পরিণামে যে
ইহা দ্বারা মনুষ্যসামাজ্যের অনেক শ্রীভি-
সাধন হইবে, যিনি মনোযোগে পূর্ব-
ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার
করবেন।

বাঁহারা উপরে উপরে দেখেন তাঁহারা
নরজাতির নৈতিক উন্নতি দেখিতে
পান না; তাঁহারা বলেন, প্রাচীনরাও
যে উপদেশদিতেন, নবোরাও তাহাই
দেন। মিথ্যা কথা কহিবে না, পরজ্ঞা অ-
পহরণ করিবেনা, পরদার হরণ করিবে
না, পরের অপকার করিবে না, এই কথাই
চিরকাল শুনা যাইতেছে; কিন্তু যখন ক্রীষ্ট
বলিলেন যে মনের সহিত ঈশ্বরকে ও লোক
সকলকে প্রীতি করাই সকল ধর্মের সার;
তখন কি জগতীতলো হুতন নীতিপুষ্টি
বিকসিত হইল না? যেমন জগদ্বিখ্যাত
নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার
করিয়া দেখাইয়াছেন যে তদ্বারা ত্রুত-
গুহ সমস্ত জড়পিণ্ড সম্বন্ধে, তদ্রূপ ক্রীষ্ট
প্রকাশ করিয়াছেন যে মনুষ্য সমাজ পু-
থময় করিতে হইলে নীতিবিবন্ধনে মুক-
লের বন্ধ হওয়া কর্তব্য। এই প্রীতির
অর্থ অন্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে
পারে নাই। নরবিবর্তিত সমানতা ও
স্বাধীনতা এই প্রীতির গাঢ় ভাব দিন
দিন উজ্জলতর করিবে; এবং সকলেই
স্বাধীন, সকলেই স্বত্ব ভোগে সমান প্র-
দিকারী, এই ভাবিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই
যখন প্রীতিপূর্ণভাবে সকলের প্রিয়কার্য
করিতে সমর্থ হইবে, তখন অবনীমণ্ডল
শুভন শোভা লাভ করিবে।
পূর্বে বাহা বাহা উক্ত হইয়াছে তদা-

রা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের এমন হইতেছে।—

১। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে পূর্ব-বর্ণনাগে নির্দয় ও অশিক্ষিত ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সভ্য জাতিদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক কম।

২। ঐতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীনদিগের বৈরুপ নৃশংসতা ও খেচ্ছাচারিতার জনশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নব্য

সভ্য জাতিদিগের সেরূপ অশিষ্টাচার নাই।

৩। ঐতিহাসিক কালে ঐতিহ্য, সমা-নতা, ধাৰ্মিকতা প্রভৃতি কয়েকটি স্থলন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া দিন দিন মহা-ব্যসমাজের সংস্কার করিতেছে।

অতএব বলা যাইতে পারে মানবকুলে জ্ঞানেরও যেমন উন্নতি আছে, নীতিরও তেমন উন্নতি আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-মঙ্গল।

অনুষ্ঠান পত্র।

ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যাহীনতা ও সভ্যতা বন্ধনে বাঁধা। প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্য সাদৃশ্য হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের ব্যবহার অল্পকরণ এবং সামান্য শিশু-বোধ অথবা অম্লীল উপন্যাস পরিভাষ্য করিয়া, বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য নাটক, দেশ পর্য্যটনভ্রম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্যকাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছে। অতএব বঙ্গভাষাকে অগ্রগামী বন্ধ করিয়া তাহার একটা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে-প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালীরা দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যভিমান অপরিপাক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত

কতিম শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাঙ্গালীকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইহঁত ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত অশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে, সংস্কার-বিশিষ্ট পাঁচটি প্রধান; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয়, এবং স্প্যানীয়। তত্ত্ব-দেশীয় অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পার্শ্বযোগ্য পুস্তকাদির জন্য, এক একটা পৃথক ও স্থানীয় ভাষা অবধারিত আছে। অশিক্ষিত ইংরাজের ইংলিশের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলজি হইতে আপ্য পর্য্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাব্য হইতে পালানো পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লির্নে হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা, এবং কাটালান গালিসিয়ান আণ্ডালুসিয়ান কাসিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্প্যানীয়েরা, এক এক স্থানীয়

সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা হু-ত্ৰাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, এঁরা সকল ভাষার একা ছিল না। ইংলণ্ডে “হাবলক দি ডেন” লিঙ্কন প্রদেশের স্থানীয়-ভাষায়, “পিয়স্ পৌমান” হালিস্ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সরডেবিড লিগুসে উত্তর প্রদেশীয় ইংরাজি অর্থাৎ “লোলাণ্ড” স্বতন্ত্রাতিথিস গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল প্রকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষার উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্বমান্য কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে ঋণদেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা “লিগুসের” স্বতন্ত্র এবং লাংলাণ্ডের ফোর্ডার্ডায়ার ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সুস্থ হেনরির রাজ্য কালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অসামান্য মহাপ্রভাষীল-ধনগুণবিশিষ্ট মহাজাগণ জনন মহানগরকে শোভিত করিতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজাবেথের রাজ্যকাল অধিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখকচূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্বীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্ষণিক লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার

তুলনা বিরহ জন্ম, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্বায়ত্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তজ্জাজের বৈরুপ ছি-রাবস্থা, ভাষারও তজ্জপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হইয়া সে সকল ভাষাই লাতিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেউ এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেশসুল, অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অজল ভাষা প্রধান। নরমান পিকার্দে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড় লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটি, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেশসুল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার বাহিরেও ব্যবহৃত হই-ত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয়, ও জারমানির ভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একটা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণে বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯-শালে এলিয়ট এবং ১৫৮০-শালে মার্সেল ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একটা বন্ধ করেন।

১৬৩৫-শালে কাদিনাল রিশল ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপন পূর্বক দেশীয় ভাষার সংশোধন ও একটা বন্ধমূল করিয়া-ছিলেন।

জরমানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বি-কৃত। সহজেই তদদেশে ভাষাভেদের আরও অধিক ছিল, এবং জরমানি রোমানজ্যের অধীন না হওয়ায় একটা

লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই। জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্প নাকই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা, ১৫০ খৃস্টাব্দে আলফিলসের মিসোগিকি, ৪৯০ খৃস্টাব্দে ক্যুচকটী শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিয়ানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনামলী হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস আলিয়ানিক এবং বাবেরিয়ান ভাষায় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা প্রায় হইয়া, হাইজরমান নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা এরূপ মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত তাহা “লোজরমান” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খৃঃ “কারল দি গ্রেট” কর্তৃক বিদ্যামূল্যবান নৈর উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অস্পাকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস থাকা জন্য ভাষাও ফ্রাঙ্কিস ছিল। অটুটিউজ এবং চোবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লোজরমানে কতক ফ্রাঙ্কিসে, কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষা ভেদই প্রচলিত থাকে। কখন ফ্রাঙ্কিস কবিতা, কখন হাবিয়ান লেখকেরা, কখন লোজরমান গ্রন্থকররা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহতেজস্বী বহুজ্ঞানাপন্ন লুথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডক এবং বোভেরিয়ায় ভাষার সমাবর্তী সাধকগণ ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি

সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভঙ্গ সমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম পুস্তক অমুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভঙ্গ সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও এই মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভঙ্গ সমাজ শত শত বৎসরাবধি বাটনি ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অমুবাদন করিতে পারা যায় যে সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভাষার একতত্ত্ব ও উদ্ভিদনা সাহিত্যাদির আলোকিতাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া, ষাটশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাব তারার স্বরূপ দাপ্তে এবং পেড্রার্কাত উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণ সকল সমগ্ৰ দেশে মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় “একাডেমি” হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্বাহ্যত্ব প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লোরেন্স নগরের একাডেমি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খৃঃ স্থাপিত হয়। একত্বকালে ইটালীয় ভাষা টস্কান নামে বিখ্যাত ছিল। টস্কান ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থা-

পিত হয়, কিন্তু ফ্লোরেন্সের একাডেমি সর্বপ্রথম সঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েক জন সভা মূলসভা পরিচাল্য করিয়া স্থলন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম “একাদমি দেলা ক্রুস্কা”। চালুনির মত দোষ ছাড়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য এই নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত তাহদের দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাহারা দেশীয় লোকের বিচারশক্তি এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ এই সভা হইতে “বকেবেলিয়া ডিলা ক্রুস্কা” নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গভাদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্পেন দেশে মূর্ত্যভাঙ্গকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাধের অংশ ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজকুলে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাঞ্চিলিয়ানেরা তাহাদের বিখ্যাত নাট্যকাবি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আদ্য বিখ্যাত নাট্য, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারজয়, —সরবন্টিস্, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খৃঃ সর বন্টিস কৃত “ডন কুইজট” প্রকাশ হয়। লোপের নাট্যকাবি তৎপরে “এবং কালদেরণের” পুস্তকাদি তৎপরে

প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চালুন্স এবং তৃতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যেই সভায়া জন্ম গ্রহণ করত, স্বদেশকে নব্যপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন তাহার সকলই কাঞ্চিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাঞ্চিলিয়ান ভাষাতে লুপ্ত। কাঁটালান আরাগণ বিসেক গালিসিয়া ক্যান্টালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাধের প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাঞ্চিলিয়ান স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিব্যক্তি হইয়াছে। সরবন্টিসের স্বদেশস্থও সকল লোকে দেশ প্রথমে অদ্যাবধি অসমলদিগকে স্পানিয়ার্ড বন্টিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখ তাহা “কাঞ্চালো” বলিয়া থাকে। স্পেনে, ফ্রাঙ্কিস একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্বার স্পেনের সর্বত্রোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্ট রূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্ভ্রুতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে দৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাঁহা লিখা যাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত “একাডেমি”।

ফ্লোরেন্সের একাডেমি, এবং তদনুসরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্ত্ব সচরাচর পোত্রাকারি গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাধের প্রধান

কবিদিগের, অর্থাৎ দাস্তে আরিয়ল্ডো এবং তাসো-র রচনা এবং পলসি, বই-মার্দো প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল, পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভজ সমাজের কথা-পঞ্চনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদভিপ্রায়জ্ঞানিত প্রথা ও কর্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যরা মধ্যে একত্র হইয়া প্রধানৎ গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যেরূপ শব্দ নিম্ন সমাজ ও উচ্চ জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রন্থ এবং বাহ্য অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভ্যর সভ্যত্ব প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য হইলে, লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সমুদ্র হইয়াছে কি না তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মসমূহের সংশোধিত করিত একাডেমির সভ্যদের বিরাজ জন্ম করিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদ্যপিও মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং রথা ও কঠোর ভরক সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধির অনেক অলৌকিক কপনা হইত, কিন্তু পরিগণকে যে তদ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরি-মার্জিতবস্থা জন্মিগাছিল তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যরা

কেবলমাত্র শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তুগু হনেন নাই। তাহার। প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে, ফ্রান্সের সর্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট শব্দে কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরব্যপিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভজ সমাজে সাধারণ বাক্যগুলো যে যে কথায় চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রচলিত করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াস-বোধগম্যতা এবং ভাববাক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিপ্রমে এবং বস্ত্রে ১৬৯৪ খৃঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খৃঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমন মান ছিল যে কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাশ্চল্য বহুভাষা মালেকান্শ এবং আর্গল্জ নামক লেখক সকল অতি পরিপূর্ণ গ্রন্থ সমুদ্র লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যম ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজস্ব অভ্যাসম্পন্ন শব্দের আশ্চর্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলজ্ঞা, সেইমত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলজ্ঞা। যেমন পদার্থের স্বাভা-

বিক নিয়মাদি মনুষ্যের, বুদ্ধি কৌশলে স্থূল প্রদায়িনী হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেইমত সাহিত্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতি রোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করহ করিতে সক্ষম নহেন। উক্ত রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থ বোধক এবং সজ্জ হইবেক। কোম গ্রন্থকার বিশেষ গদ্য লেখক আপন মাতৃ ভাষার নির্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্য নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোনমতে সক্ষম নহেন।

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা পদ্ধতি সাধারণের একো ও বস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে ইংলণ্ডে ভাষা জন্মে সমগ্রায়সারি বিধি বিশেষের স্বাধীন চর্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে ভাষা সাধারণের জ্ঞান-কৃত সমুদ্রচর্চায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত। কি প্রকারে জমিল ভাষা হঠাৎ দেখাযায় নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিগত ভাষার প্রতি এখন, দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি “সুস” নিজ কবিতাবলী স্থিতি করণ জন্য অনেক শ্রেণ শব্দ হইতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা আদ্যাপিও প্রচলিত আছে। লিলী আর্থন ইউফিস গ্রন্থে অপ-র এক্সুরে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দশের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্য হইয়াছিল। কিন্তু বা-

* “হাবার্সন ইউরোপীয় লিটেরেচর”, ৪, ২২৩।

হার যে বার্থ নাম তাহা তাকে না দিয়া, প্রকারান্তরে প্রচার শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সামান্য ভাষে রূঢ় শব্দ ব্যবহার কর, ভাষার ব্যভিচার বন্ধিত হইবেক। লিলীর সময়ের ভজ সমাজেরও স্থা-বার্ভা অঞ্জলি ছিল। ইউফিসের প্রাণী-দ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস ১৫৭৯ খৃঃ প্রকাশ হয়, এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এ প্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায়, যে তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সের ফিলিপ সিডনির “আরকেডিয়া,” “বকন-সারবতী ও গভীর রচনা, এবং ছকর ও টেলনের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজ না-মেরই আদরের স্থল। ১৬৩৬ খৃঃ প্রকাশিত মিলটনের “আরোপেজটিকা” বোধ হয় ইংরাজি গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ পত্রাদির স্বাধীনতার স্বাক্ষর জন্য লিখিত হয়, এবং কবির পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্য প্রবন্ধ গাষ্ট্রীয় ও সৌন্দর্য এবং স্থিতি-রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর স্থল-থক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাড়ন আকর্ষণ করে না। প্রাচীন দিগের গাষ্ট্রীয় ও মিষ্টতা অতি যমোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসন কর্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও প্রমসিদ্ধ। কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৭০ খৃঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা

এই হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজি শব্দ এই অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্বায়ত্ত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অনীয় পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাতিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জনসন, তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক ক্রুত শব্দ পরিচয় করিয়া, অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজি শব্দের সংকলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশ বাত্বেই সমাজের আদরণীয় হয়। অদ্যাবধি ইংরাজি ভাষার “স্যাগ্ৰা-চাট” হয়। পূজ্য হয়। রখিয়াছে। জরমানদিগের ভাষার আদ্যোপাত্ত জগৎ রত্নান্ত কলহরশ। তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করিবার আদ্যবধি। এক্ষণে উক্ত সকল তর্ক বিতর্ক বাঙ্গাল ভাষার পক্ষে উচিত কি না তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গাল ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালকে একবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত অভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ পুঙ্খক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা, কখন উচিত নহে। অথচ ক্রুত, স্থানীয়, করুণ এবং অপ্রীতি বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন

কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্রমভাৱে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর যুদ্ধ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গাল ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভব বোধ হয়। বাঙ্গালীরা এমত কোন সর্বজন-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকে রূপ এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জনসন সমূহ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পুঙ্খ সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালী সাহিত্যের ভাব্য স্থিতি বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী সিজিত হইয়া সভা স্থাপন করত উদ্যোগ ভাষার উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, এবং উদ্যোগ ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। দ্বিভাষ দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষাপ্রণালীবদ্ধ হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় একজন সভ্য প্রত্যেক দেশা যায়, কিন্তু দেশে বহু বিভাগ এবং দেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলি-

কাতারাজধানী, অতএব আদি সভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভা তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভাগণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভার সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। স্মারিবেশনের জন্য একটা গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্রেণ্টাইনদিগের ন্যায় সভাগণের মধ্যে কোন এক সভার বাধান বাটীতে একত্রিত হইলে স্বখকার্য হইতে পারে। কলিকাতায় একত্রার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধিবিদ্যা সম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরামর্শদায়ক ও শুভকর হইবেক। স্বখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য সাধারণের চিন্তাকর্ষণ পুঙ্খ দেশের কুশলসাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম। অথচ এই সম্বন্ধে এবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার প্রথা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পুঙ্খ সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্যের রক্ষা করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্মলতা এবং প্রতিভা রক্ষা হইবেক। সম্রাট আলোচনার দ্বারা সভার মনো-রঞ্জনও হইতে পারে। এবং প্রাচীন কবিগণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচনা সহকারে যন্ত্রদ্বয়ের উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথন উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক। ঈশ্বর প্রসাদে সম্প্রতি কলি-

কাতার এবং দেশাভ্যন্তরে পঞ্জীগ্রামেও ইহার অভাব নাই। সভার দ্বারা স্থানীয় এক বিশেষ উপকার এই হইবে, যে প্রত্যেক গ্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন। পঞ্জীগ্রামস্থ পণ্ডিতেরা, মফস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কিনা এবং সংস্কৃত যে যে শব্দ সহজে অর্থ বোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে স্থপারামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষা অপার। ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎকার্য। মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভাগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন তিষ্ঠেও এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অভিযাচ্যক। একক উৎসাহধীরা এবং বঙ্গ তিষ্ঠেই ইংরাজ মহাত্মারা আগ্রহ সহকারে এই বিষয়ে উৎসাহদান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয় সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম পৌরবায়িত গবর্নর জেনারেল বাহাদুর সাহেবের অধিপতি পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।

—○—

যে অনুষ্ঠানপর উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর্গ শ্রদ্ধা করে বীমস্ব মায়েব কলক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পুঙ্খই আমরা তাহার অনুগৃহে বাদানায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীমস্ব মায়েব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাহার কৃত এই প্রস্তাব যে, পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমান দ্বারা আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি

কিছু বাকি রাখেন নাই । আমরা ভরসা করি
যে সকল বরপণ্ডিতেরা দেশের চড়া, তাঁহারা
ইহা প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন । তাঁ-

হাবিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, আমরা
এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব । ইতি ।
— বঙ্গদর্শন সম্পাদক ।

প্রভাত ।

রাত পোহালো, কহসা হলো,
ছুটলো কত জল ।
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
মুটলো অলিকূল ॥
পূরু ভাগে, নবীন রাগে-
উলো লিখাকর ।
সোনার-বরণ, তরুণ তপন,
দেখতে মনোহর ॥
হেরে আলো, চোখ জুড়াল,
কেছিল করে গান ॥
যৌ কথা কয়, কহেয়া বিনয়,
ভাঙতে বড়ের মান ॥
ঘরের ঢালে, পালে পালে,
ডাকচে কত কাক ॥
পুজ বাঁজতে, জোরা-ভাঁটিতে,
বাজতে বেন ঢাক ॥
পতি বিরহে, পক্ষ দহে,
পক্ষ বিরহিণী ॥
করয়ে নয়ন, তিতুর-বসন,
কাটরেছে ঘাসিনী ॥
গেল রজনী, হাসলো ধনী,
পুস্তির পানে যায় ॥
মুখ চুমিতে, আর নিরে,
যাকে উবার যায় ॥
মাথা তুলি, মরাল গুলি,
নদীর কুলে যায় ॥
চরণ দিয়ে, জল কাটিলে,
মাতার দিয়ে যায় ॥
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,

ছোট বোনের কুল ।
মাজে বাসন, বাজে কেমন,
তাবিজ লগ জল ॥
পরসপরে, মধুঘরে,
মনের কথা কয় ।
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধনি হয় ॥
অনেক মেয়ে, গামচা দিয়ে,
ঘসতে কোমল গা ॥
শিশি জলে, মুখে বলে,
নিষ্কার গো মা ॥
উঠে কুলে, এল কুলে,
বসে সুকোচনা ॥
মাটি দিয়ে, শির গড়িয়ে,
কছে উপাসনা ॥
কত কুমারী, মারি মারি,
দুলচে কানে দুল ॥
কানন হতে, কদুর পাতে,
আনতে কুলে জল ॥
আন্তে বাড়ি, ত্বেরে হাঁড়ি,
আধন করে বাস ॥
খসান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাকে চাসার মার ॥
পান্ডা খেয়ে, শান্ত হতে,
কাপড় দিয়ে-গার ॥
গোরু চরাতে, পাঁচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায় ॥
গাঞ্জির পালে, বোয় গোয়ালে,
দূরে কেঁচে করে ॥

গজ গামিনী, গোয়ালিনী,
বসে বাজুর ধরে ॥
হামচে বালা, রূপের ডালা,
মুচকে মধুর মুখ ॥
গোপের মনে, মদের মনে,
উঁছে ফেঁপে মুখ ॥
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে বইম বইম ॥
জুটিশিরে, সন্ন্যাসীরে,

মাছে গাঁজার দম ॥
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায় ॥
পথে গেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খাম ॥
এই বেলা, মকাল বেলা,
পাটে নিলে মন ॥
বৈকালেতে, গোরবেতে,
রবে বাবুদন ॥

গ্রাবু ।

জলতলে একটি মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হই-
লে, সমকেন্দ্রী বীচিচক্র খেলিতে থাকে ।
চক্রের পরিধি ক্রমেই আয়ত হয়, কিন্তু
তরঙ্গ ভগ্নের ক্রমেই ত্রাস হইতে থাকে ;
দূরে ক্রমে নিশাইয়া যায় । কিন্তু প্রবাস
থাকিলে যে সামান্য বিপদের অল্পপাত
একবারে গ্রাসাই করিতাম না, প্রবাসে
দেখ সেই অন্তত সংবাদজনিত চিন্তার
বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ করিয়াছে । বাস
হইতে প্রবাস যত-দূর হইবে, তোমার
হৃদয় কন্দরস্থ ভাবনাপিণ্ড । ততই বেগে
তাড়িত প্রতিভাভিত হইয়া ছলিতে,
চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ভুবিতে, ভা-
সিতে থাকিবে । আবার আকর্ষণী শক্তি-
বলে গৃহভিত্তিতে ধাবিত হও, ভাল বা-
নার কেন্দ্রের হৃদয় নিকটবর্তী হইতে
থাকিবে, তরঙ্গের বেগ ততই বাড়িতে
থাকিবে । প্রবাসে এক দিন এইরূপ ছুড়ী-
বনার আলোড়িত হইতে ছিলাম । চাক-
লা নিবারণ কন্যাছে কাগজাবতার তাঁস !

আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম ।
তুমি নানারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত ক-
রিয়া, আমার মনকে ভুলাইয়াছিলে ।
মন তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
তান্ত্রিক পূজার জন্য মানসিক উপকরণ
আহরণ করিতেছিল । কখন বা ধূপদীপ
নৈবেদ্য রাশি রাশি গন্ধ পুষ্প উৎসর্গ
কুরিতে ব্যস্ত ছিল ; কখন বা মনোমো-
হিনী প্রতিমা সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপ নানা
জ্বলনে অভিনিবিষ্ট ছিল ; কখন বা
বলিদান অবসানে মন সদাঃ নিঃসৃত শো-
ণিত পরিবাণ্ড আশ্রয়ে ঘোর রোল সন্-
ধানকারী চক্কারবে প্রোৎসাহিত হইয়া
সমারোহ মধ্যে ভয়ানক ভাবে নৃত্য ক-
রিতেছিল । কখন বা নিরঞ্জনকে আভি-
বস্ত্রে পূর্ণঘট মস্তকে ধারণ করিয়া, আবার
কবে যষ্টি গণ্ডগী আসিবে ভাবিতে ভাবি-
তে মন, মনে মন ক্রন্দন করিতেছিল ।
হে কাগজাবতার ! দ্বিপক্ষাধন বয়সী
তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তা-
ন্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিরত করিয়া-

ছিলে। তুমি ধনা। তুমি আমার বার্থ উপকার করিয়াছিলে; আমি তোমার সেই উপকার স্বীকার জন্য আজ যুক্ত বলনে তোমার মহিমা বর্ণন করিব।
 যে অশুশাস্ত্রচিত্রচারুটোকোণরূপধারি!
 তুমি আমাকে যে মনোপূজা হইতে বিরত করিয়াছিলে, তাহারি ক্ষুদ্রজ্ঞতা স্বীকার জন্য আমি তোমার গুণগান করিব।
 আমি সামান্য পৌত্তলিকদের ন্যায় ফল মূল গল্পাঙ্কল বিষয়দর্শন “এত গন্ধ পুষ্পে” দিয়া তোমার পূজা করি নাই। আমি মূঢ় পৌত্তলিক নহি, আমি পরম জ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর তোমার মহিমা ধ্যান করিয়াছি। তোমারি গুণতত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি-রূপানু, আমি তোমার প্রসাদে তোমার অগাধতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছি, তোমারি জয় হউক। আমি তোমার মহিমা জগতে প্রকাশ করিব। ইতি প্রস্তাবনা।

তাস খেলা এই জটিল সংসারের অতি সুন্দর অঙ্গলিপি। প্রথম খেলা,— খেলা এই সংসার লীলা। অনেক বলেন যে চতুরঙ্গ ক্রীড়া অতি উত্তম, কেন না প্রতিদ্বন্দ্বী ছই জন্মে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্র রূপ কর্মক্ষেত্রে একটি হইল; বাহার বুদ্ধি বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিলে, সেই জয় লাভ করিবে। এটি সত্য হউক মিথ্যা হউক যোের অদৈসর্গিক। কোথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্মস্থানে হউক, বিলাস ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক কোথায় দেখিয়াছেন, ছই জন্মে সমান উপকরণ লইয়া একটি হইল? কোন ইতিহাসে পাঠ করি-

য়াছেন যে, ছই দল বোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে অভিভাবন করিয়াছে? জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, ছই জন সম বোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না। তা পায় না। বৈষম্যই জগতের নিয়ম; সাম্য তাহার ব্যতিচার মাত্র। তবে কেন, খেলিবাস সময় আসিরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃত শিক্ষা লাভে আমরা যত্নবান হইব? চতুরঙ্গ ক্রীড়া আমাদেরকে অতি ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রদান করে। তাংখেলায় তাসের বৈষম্য সংস্থাপনই নিয়ম, স্বতরাং তাসের একটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গ ক্রীড়ক সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত অথবা সাধী না থাকিলে চল না; খেলাক্ষেত্রে মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার? বার নাই, তার আর খেলা কি? যে কিসের সহায়ী? তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে রাম পার্শ্ব দক্ষিণ পার্শ্ব রহিয়াছে, তাহার তোমার মাত নহে, তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সঙ্গী আছে; তোমার স্বার্থে তাহার বার্থ কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে, হিন্দু সংসারে পণ্ডিত যে একমাত্র সহায়, ছুথের ছুথী, স্বথের স্বথী, ব্যাধার ব্যাধী, আলাদে আলাদিনি, বিবাদে অবলম্বা, সেই সঙ্গিনী, সংসার খেলার সেই মাত, কখনই তোমার নিকট রুইখিনি হইতে তোমার নিজ গোজ হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে না। দুই

বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাস ক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয়; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁথনিই এই রূপ। যদি তুমি সৌভাজ্যহুং আশ্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছা পূর্বক কদম সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার রোগ শান্তির জন্য কিছু দিন রাজি জাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্ট ভোগ কর। যদি প্রাণঘণীর্ণ প্রাণ প্রার্থনা কর, তবে অন্তত কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পচনে প্রৱৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অতিবিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাবে না। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। স্বথ ছুথ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা দাদার স্থিতি এবং তাহারই অঙ্গলিপি সমীর-প্রাণু খেলায়।

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই ঐক্যশা ও সাজান। তাস খেলায় কাহার লক্ষে কি আছে কেহ জানে না, কেহ কোন রূপ ক্রিয়ামিত সাজান উপকরণ পায় না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এই এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি?

তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সময়ক্ষেপে উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলে তুমি নিরক্ষর। তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া এক হাতেই নিজ হাতেই ছল্লা করিতে পার, তখন তোমার উপকরণ ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতিই নাই বরং সেত দ্বারা তখন বিলক্ষণ স্পষ্টকারি কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এক হাতে ছল্লা করা যায়, এমন তাস কয় জন কয় বার এসংসারে পাইতে পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সঙ্গীতই গুণ থাকে। পরিচিত অঙ্গকার এবং ইহলোকে আমাদের পরিকল্পিত লাইয়া ব্যবসায় স্বতরাং প্রাণু উপকরণই গুণ রহিয়াছে; যে গুণ অজ্ঞান করিতে পারে সেই বিষয়; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি না পারিলেই কি? তবে উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহা কি রূপে অজ্ঞান করিবে। তাস খেলায় বাহা কর, সংসারেও তাহাই করা অথবা সংসারে বাহা করিবে হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির উপকরণ আছে, জানিতে হইলে আমরা কি করি? তাহার পূর্ব রসাত্মক স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাহার পূর্বাধিকারী স্বাস্থ্যে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি, স্মরণ করিয়া অঙ্গীমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন ছুটি দেশের উপর ভরপূর্ণ করিলেন না, তখন ইহার স্থানে ভরপূর্ণ নিশ্চয় নাই। ইনি

ইক্ষাবনের দশ দিনেন; আর হাতে ইক্ষাবনের টেক্সার পিটে ইক্ষাবনের টেক্সার পরই দশ ছিল; তবে টেক্সা, এর স্থানেই আছে, আমার মাতের হাতেই নাই। থাকিলে তিনি এমন সময় ফুই ভেঙ্গেও রও খেলিবেন কেন? আমার দক্ষিণ-বিকের দ্বন্দ্বীর স্থানেও নাই, থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তরুণ করিবেন। তবে টেক্সাটা এর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি, চিঁকি তাই করিলাম।

তাস খেলার কাটান ও সংসারের অনুশ্রুতি। কাটান সংসারে প্রবেশ—ব্রাহ্ম জন্ম পরিগ্রহ। এক জন্ম পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে, জন্মই বলুন আর, কাটানই বস্তু একেবারে সম্পূর্ণ অদৃষ্ট-মূলক। আপনার জন্মের উপর কার্য হাত আছে। ভূমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার—জন্ম ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম বৈধরণেই দেখে এক ব্যক্তি শৃঙ্খলবন্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আচল বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উদর পুষ্টি জন্ম, চৌধুরীজীব অবলম্বন করিতে হইত না। আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে নীচ নরাদর্শ উপাধি-দিয়া সম্মান রক্ষি করিতেন না। তাস খেলার এক জন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে সে কি নীচ নরাদর্শ, তা যদি না হয়, তবে চোর কি করিয়া হইল? তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তা কে বলিতেছে? ভিনখানা ভুলপেও অনেক

যে নওনা ধরা দিতেছে। তাস খেলার যেমন বোকা আছে—সংসারে তাহা অপেক্ষা অধিক বোকা আছে। তবে যে পেটের দায়ে নীচ, তাহাকে যে নীচ বলে, সে আরো নীচ।

কাটান যদি জন্ম পরিগ্রহ হইল, তাহলে এখন তরুণ কি তা বোঝাগেল। জাতিগত বৈলক্ষ্য জন্মিত আধানাই তরুণ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তরুণ, এখন ইংরাজই তরুণ, কোথাও অসভ্য জনগণ মধ্যে ক্রিয়াজীব তরুণ, আবার কোথাও শূদ্র তরুণ। প্রাচীন কালে ডুইড, পোপ, পাদরি, আয়িক পারসী, ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম তরুণ ছিলেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন তরুণ এবং বোধ হয় কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তরুণ হইবে।

ধনীরাই রঙ্গ আর সকলেই বদ রঙ্গ। ধনীরা জন্ম পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান কি তা জানাগেল সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধনী কে, তাও জানাগেল, বদ রঙ্গ কি তা বোঝা গেল।

চারি রঙ্গ কি তা কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে সমাজের যে চারিভাগ ছিল ইহা তাহাই মাত্র। যে ইক্ষাবন, সে ইক্ষাপনাই আছে, তবে কাটানর, অন্যই ইক্ষাপনের সাতাও এখন হরতনের টেক্সা অপেক্ষা অধিক বলশালী। যে শূদ্র সে নামে এখনও শূদ্রই আছে, কেবল কয়দণ্ড সে দেখে উচ্চ গৃহের উপর আসীন। সে এখন তরুণ বলিয়াই এ দেখে শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর অভিজিৎ ছতন ও বাল মুন্সেফ দরবেশ তাহারে ছায়াবেরে ছয়গীরা। সে এখন

তরুণ হইয়াছে—বলিয়াই বেগের গা-জুলি শিবের সন্তান এ পাঁচকড়ি গো-মস্তা নীচে মসিগুণ ছিদ্রশপে, বসিয়া বাবুর গোলাল গালাল কাল কোলশালি পদকপরাং ছেলেটিকে কালে করিতেছে। এখন তরুণহয়ছে বলিয়াই ইক্ষাপনের সাতা হরতনের টেক্সার উপর হইল কি না? ছেলেবেলা-ভাবিতাম একগুণ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? এখনও এই সমাজের খেলার কথা ভাবি যে, এ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? উভয়ই সহজ্য করিয়াছে। যখন প্রাবু খেলিতে বসিয়াছে, তখন তরুণের বল মানিতেই হইবে। তরুণ বেশী না পাও বিরক্ত হইও না। বাহা পাইয়াছে তাহাতেই খেলিতে হইবে। খেলাতে কোন চুকছুল না হইলেই হইল। আর খেলিতে না চাও, তাসের কথাই নাই। আর যদি এবার বেশী তরুণ পাইয়া থাক, তাহলে একেবারে গরিত হইও না, হয়ত সাততরুণ হইলেও হইতে পারে। এহাত এই হইল আর হাত কি হইবে, তার গির কি আছে? ছক্কা পঞ্জা-রেখে খেলাভঙ্গে উঠে যেতে পার, তবেই ভাল; কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার ৪ খানা কাগজ ও এক ছক্কা এক হাতেই উঠিতে পারে। অতএব ক্রীড় গরিত হইওনা অতএব ধনী তাস খেলা মনে করে একটু সাম্য অবলম্বন কর।

সাততরুণ আটতরুণে খেলেনা কেন? এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সমতা রাখিবার চেষ্টা মাত্র। বাহা-দশন সর্বদাই ছই পদ ছই হস্ত, ছই চক্ষু ছই কর্ণ

লইয়া—জগৎ খেলার অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু জন্ম বৈলক্ষ্যে এক ব্যক্তি প্রাচীন পুরুষপুরুষগত কন্মরাগস্ত ও নির্ধনী-আর অপর ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান, ইহা-কই পূর্ণ অদৃষ্টের ফলাফল বলিতে পারি না। আমরা মৌলখানা পাইয়াছি তোমারও মৌলখানা পাইয়াছে কিন্তু আমার মৌলখানা এমন কাগজ সেবার প্রত্যেক খানায় যে বল ধারণ করে, তাহা তোমার সকল গুলিতে একত্রে নাই। তাসদেব একটু দয়া করিয়া নির্ধনীর দিকে একটু মুখতুলে চাহিয়াছেন। যদি ধনী ভূমি নির্ধনীর সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস বিধাতা বলিতেছেন, আমি এই নিয়ম করিলাম যে ভূমি সমস্ত ধন (তরুণ) নিজে লইও না, অথবা উদ্বাসর সমস্ত গুণক পরিমিত ধন লইও না।—এত বৈষম্য আমার দেখিতে পারিব না। তাস বিধাতাকে ধন্য বাদ প্রদান করিতে হয়। সমাজ বিধাতৃগণ শাসন কর্তৃপক্ষ যদি সকল সময় এইরূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কত মঙ্গল হয়; অনেক সময় তাহার তাহা করেন না। অনেক সময় মাতে তরুণে এক তরুণে খেলিতে বসাইয়া খেলা দেখিতে থাকেন। হে ফলকাবতার! তাহার তোমার অবমাননা করেন। ভূমি প্রেমারী সৃষ্টিতে তাহাদের লক্ষীর হিড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ কর। আমার প্রার্থনাপূরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন যে, ভাততরুণের পর পুঁতলা ফিরিয়া যায়। তাস খেলার তাহা নিত্য হয় কিনা তাহা আমি চিকিৎসা বলিতে পারি না।

সামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে, বা খণ্ড সমাজে প্রায়ই হয় না—কেননা—শাসনকর্তৃগণ অনেক সময় সাততরুপের আইন মানিয়া চলেন না কিন্তু রহৎ রহৎ সা-জ্ঞা একরূপ সাততরুপ মধ্যে মধ্যেই হয়। থাকে ও পড়াও কিরিয়া যায়। পুরাকালের দৃষ্টান্ত পুরান কথায় কাজ কি, তাতে প্রুকাই বা কে করিতে? আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাততরুপের অথবা আটতরুপের প্রধান দৃষ্টান্ত করায় বিপর্যয়। এটি আটতরুপ, হাতের কা-পজ পর্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আর্য়লও বাসীদিগের দেশভাগ ও আমেরিকায় সূতন পড়াই লইয়া খেলা আরম্ভ করা। তৃতীয় সাততরুপ মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ। চতুর্থ স্পেইনে রাজবিষয়; পঞ্চম এখন চলিতেছে ইংলেণ্ডে প্রমোপজীবীগণের Strike অর্থাৎ এক নতুন অধিক রক্তি প্রার্থনা করা, তাহারায় এক দিন সাততরুপ খেলিতেছেন; হারিতে ও ছিল, আর জাহাজ তরুণ না পাইলে কিছুতেই খেলিতে চায়না। হে লালকাল ফৌজা সম-বিতপপ্পাপতাকা চিহ্ন ধারি! তুমিই তাহাদের মনে এই প্ররতি প্রদান করিয়াছ। আরার তোমাকে স্বতরাং ভক্তি পূর্বক নমস্কার করি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে চারি রঙ্গ সমাজের পূর্বকালিক চারিটি ভাগমাত্র। কোন রঙ্গটি কোন ভাগ ছিল? উত্তর। হরতন রুইতন ইফানন ও চিঙ্গিয়ার এই চারি রঙ্গ। ইহারিগকে ইংরাজিতে (Heart) বা হৃদয়, (Diamond) বা হীরক, (Spade)

বা কুবিক্স ও (Club or dagger) অথবা মুক্স প্রুকে। ভারত বর্ষের জনগণের এখন এরূপ ভাগ এও চিক্ তাই। এখনকার ভাগ চিক্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লইয়া নহে। এখন শূদ্রেরা একটু উন্নতি পদবী প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার্য ক্রীতদাস নহে। রমকরক্তি অবলম্বন করিতে তাহারিগকে এখন কেহই নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্য ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কতক কুবিক্সী, তাহার্য শূদ্র ভাবাপন্ন। কতক কুবিক্সী বা আভান্তরিক বানিজ্য ব্যবসায়ী। ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি রাওজি পশ্চিমে শ্রেণী বা শেটিয়া, আর্য়্যবর্ডে আগর-ওয়াল বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া এবং বঙ্গ বণিক। তাদের ভাগ দেখুন। যে পরের হৃদয়ের উপর বিশ্বাসের উপর আপনায় জীবিকা নির্বাহ করে সে কি? সে ধর্মযাজক বা ব্রাহ্মণ, তিনি হরতন। যে দ্বীরা মনিমুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে সে কি? সে জহুরি বা বণিক, বৈশ্য বা ধনী; তিনি রুইতন। কুবিক্সই যার জীবনের একমাত্র উপায় বা চিহ্ন সে কুবী, শূদ্রই বলুন বা বৈশ্যই বলুন তিনি ইফানন। আর গদা বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন তা কে না জানে। স্বতরাং তাদের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

চারি রঙ্গ যদি এইরূপই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি? সাত্তা হইতে টেল্লা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কোনটি কি তাহা বলিবার পূর্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সংসার আমর্য প্রাধান্য যীকার ছুইভাগে করিয়া

যাকি। একজন প্রুভুত্ব করে, আমরা সেই প্রুভুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই, বলিয়া তাহার প্রাধান্য যীকার করি। আর কতকগুলি লোককে আমরা 'মান' প্রদান। সম্রম গৌরব। আদর ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকি। ভাস খেলাতেও এই রূপ ছুই প্রকার প্রাধান্য গণনা আছে। এক ফৌটা গণনা আর এক উপর্যাপরি গণনা। দওলা তিন খানা তা-সের পর বটে কিন্তু ইহার মর্যাদা বিস্তর। মর্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত কেবল টেক্টার নীচে মাত্র। মাঘেব গণনায় টেক্টার নীচে বটে, কিন্তু তেমন আদর নাই, ফৌটা গণনায় তিন ফৌটা মাত্র। কেন এমন হয় তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি যে সাত্তা হইতে টেক্টা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিক্রিয়া। সাত্তা হইতে টেক্টার ক্রমে বয়োধিক্য জনিতই প্রুকের উপর অন্যের সংস্থান বৃদ্ধিতে হইবে। সাত্তা অবিরাহিতা কন্যা।

আট্টা তাই; তবে বয়োধিক্য বশতঃ সাত্তার উপর বটে। হিন্দু পরিবার মধ্যে ইহারিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই মহাবচন উক্ত করিয়া নারী জাতির উপর আধারিগের সাম্য দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদান করেন। বচনের শেষ ভাগটি এই—

কন্যাগোব পালনীয়া
শিক্ষণীয়াতি যন্ততঃ।
কন্যাকেও পালন করিব, অতি যত্নে শিক্ষা দিব। মহায়া মহুর অবমাননা হয় এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হইতে সহজে বহিষ্ঠত হইতেছে। তবে তাঁহার বচনোক্ত কারকদিগের দোষ তাঁহাকে স্মি-
থারন করিতে হইতেছে। কিন্তু বাহাতে ধর্ম না পতিত হই, এমন করিয়া বলিতে ইহা। ব্রাহ্মণের অধিত ব্রাহ্মণের ভুলনা করিলে আর অবমাননা কি হইল? বঙ্গ-দেশীয় ব্রাহ্মণাভিনা নী ব্রাহ্মণের বাটীতে কখন শূদ্র ভোজক দেখিয়াছেন? মনে করুন, গৃহস্থানী বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষান্ত্র কলেবরে দালালে দণ্ডায়মান, ত্রীবিধ, দালানের ধামে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ছুতো তাঁহাকে পাখা করিতেছে, লেলা সাক্ষ্য ছুতায় প্রহর; পল্লীর নবশাখগণ সূতন ঘাসছোলা তিন বার গোবর দেওয়া প্রাধন্যে উচু হইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর। বাড়ীঘরে মহাশয় পরিবেশক দিগকে বলিলেন 'ওহে শূদ্র-দেরও লাউচিৎছি আর নুঁদে দিও।' এই হল কন্যাগোব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যন্ততঃ স্বতরাং সাত্তা আট্টার কি ক্ষমতা থাকিবে?

নওলা অবিরাহিত বালক; অবশ্য অন্ত্রজা ভগিনীদিগের উপর ইহার প্রুভুত্ব আছে। আর যখন বড় মাঘের ছেলে অর্থাৎ তরুণ হয়, তখন তার কথা পরে বলি। দওলা নবোঢ়া বধু। বাড়ির কনে বো। ঐর গৌরব কেবল দ্বিতীয় গণিত। আছ! বঙ্গ পরিবার মধ্যে নবোঢ়া বধুর আদর দেখিলে কাহার না কনে হতে ইচ্ছা করে? বোমা সর্গদা অলঙ্কারে সু-বিস্তা, ভাল মাটি পরিহিতা, ধনী বৃহে দাম্পত্যগুণি পরিবেষ্টিতা,—কাল্পনিক গৃহে নিভুওদেশে গুণানুরূপা স্থিত। কিন্তু 'লোক যে অবস্থারই হউক না কেন, যোগ্যের আদর কত; পুতের বো, তিনি কোলে কোলে কিরিতেছেন। যদি ক-

ক্ৰীড় ভোজন হইল, তবে এখন বোমার খাবার কি? বৌকে খাওয়ালে, বৌকে শোয়ালে শাঁশুড়ির, প্ররিবারের কতই আনন্দ। “বাছা পেরের মেয়েকে আপনায় করিতে হইবে।” আহা বঙ্গভ্রমণগণ কেন তোমরা চিরকালই কেন বৌ থাকনা? আহা দণ্ডার গোরব কত গোরব।

গোলাম। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। গোলামকে ইংরাজিতে (Slave) এবং (Knav) উভয় উপাধি প্রদান করে (Slave) শব্দে গোলাম (Knav) শব্দে পাজি, সেই জন্য গোলামের আর একটি নাম পাজিও বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে ব্যবহৃতও হয়। পাজি। বাস্তবিক দৃষ্টান্ত গণনা করিয়া ইহার স্থানাবধারণ হইয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে; এক্ষণে সাধারণতঃ গোলাম পুরুষ বলিয়া গোরবে এক কোঁটা মাত্র, স্ত্রীও বলিয়া পুরুষোক্ত চারিভাসের উপর। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম প্রভৃতি কোন গুণ নাই, তবে পোষ্যকাম্য। সে গুণের কি ফল ফলে, পরে দেখিবেন।

বিবি। পৌত্র রঙ্গ মহিলা। বাড়ির বড় বেশ। যখন কমে বৌ তখন ইহার গোরব দশ কোঁটা ছিল এখন ছই কোঁটা মাত্র। বাড়ির পুত্ৰিণী—বয়সে তৃতীয়া তিনি সর্দাই বৈষ সংসার লইয়া ব্যস্ত, কে তাঁহাকে আদর করিবে। তাঁর সময়ে আহার হয় না, পাজিতে শোবার অবকাশ নাই, দিবসে কপার অবকাশ নাই; কতই বটেন কিন্তু দাঁশী। বাহাকে সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইল, সেকেন্দ

লের দাঁশী বই আর কি বলিব? তবে তিনি ধনশালীর বনিতা হইলে তাঁহার কোন বিশেষ গোরব, কখন কখন হয়, কিন্তু সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ মহিলা, কতী গোরবে কেবল পাজি হইতে অর্থৎ গোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক।

সাধেব। বয়সী রুতী পুরুষ। তাহাতেই ইহার নাম সাধেব। সাধেবেরাই রুতী। ইনি ক্রীড়ার অর্থে ভোজন করিতে পান কিন্তু কমে বৌ দণ্ডার পরে। “এই যে বোমাকে খাওয়াইয়া আদিয়া তোমাকে ভাত দি।” সাধেব ছয়ভাসের উপর কিন্তু গণনে তিন কোঁটা।

স্টেক্স। বাঁড়ীর কতী। সাধারণতঃ ইহার মান, সমাদ্দা, সন্ত্রম, প্রভৃদ্ধ সমস্ত অধিক, সর্বাঙ্গোচ্চা অধিক। এমন কি আচরণে কমে বৌকেও ইহার পরে গণনা করিতে হয়। প্রভৃদ্ধে রুতী সাধেবকেও ইহার অধীনে থাকিতে হয়। ইনি ক্রীড়া, ইহার চিহ্ন এক। কতী কি একজন স্ত্রী দুই জন হয়? গণনায় ইনি একাদশ। এক পাজির এগার গুণ।

তবে ভুরুপের সময় এমন বিপর্যস্ত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। সে হইতেছে নাকি ধনীদিগের কথা, সাধারণ নিয়ম হইতে একটু বিপর্যস্ত হইবে বই কি? যে ধনী অথচ পাজি, পুত্ৰবীতে সেই বড় লোক। সে রঙ্গের গোলাম। সেই কতী সেই রুতী, ব্রিষ্ট অথচ পাজি বলিয়া সে রুতী হইতে কত গুণ; রুতী হইতে কত গুণ অধিক। গোলাম গোরবে স্টেক্স প্রায় দ্বিগুণ, প্রভৃদ্ধে কতীর উপরি দ্বিগুণ। অমুক যুগ্ম্যে বড় লোক।

কেন জানেন? তিনি ধনী আর পাজি। তাঁর মত ধনীও বিস্তর আছে, পাজিও বিস্তর আছে, কিন্তু তাঁর এত প্রশংসা কিসে? না তিনি ধনী পাজি। রঙ্গের গোলাম। বাপ রে। তাহাতেই রঙ্গের নওলা দ্বিতীয় ভাস। বড় মাছুয়ের ছেলে অপ্রাপ্ত বয়স, কাজেই উদ্ধত স্বভাব; প্রভৃদ্ধ বিজ্ঞানশাসী ও সমধিক গোরবাব্যস্ত। গোরবেও দ্বিতীয় প্রভৃদ্ধও দ্বিতীয়। বাইরণ ছেলেবেলা কোন প্রশংসা করেন। গ্রন্থের নাম পত্র লিখিত ছিল “এই কাব্য লর্ড বায়রণ নামক কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বিরচিত” সমালোচক ক্রম সাধেব এই কথা উপর নানা উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? না বালগের, লেখা বলে? না লর্ডের লেখা বলে? না—নাথলক লর্ডের লেখা বলে? আমরা উত্তর দিতেছি। না বালগ লর্ডের লেখা বলে। এক জন নওলা শ্রেণীর লোকের লেখা বলে। সংসারে সকলেই হাতা করে, বাইরণের গ্রন্থ প্রকাশক তাহাই করিয়াছিলেন মাত্র, ক্রমের এতটা উপহাস করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা ভাসভক্ত লোক, নওলার নিন্দা আমাদের সচ্য হইবে কেন? এ যে অমুক কুমার বড় ঘোঁড় গওয়ার হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? অর্থ যে তিনি বড় মাছুয়ের ছেলে ঘোঁড়ায় চড়ে, আর ধূম্রীর লোককে চাবুক মারেন, কেননা তিনি বঙ্গভ্রমণের ছেলে স্বতরাং উদ্ধত স্বভাবাব্যস্ত। তিনি এক জন নওলা। ছোট বাবুর আদরের কথা সকলেই জানে। ছোট বাবুর দৌ

রায়া উপদ্রব সকল অধিক স্বতরাং নওলা গোরবে ও প্রভৃদ্ধে কেবল পাজি গোলামের অপেক্ষা কিঞ্চৎ স্থান মাত্র। এক্ষণে ভাস খেলায় আরো একটি অতি সম্বন্ধ উপদ্রব পাওয়া যায়। ভাস খেলায় বিস্তি আছে, পক্ষাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে। তিন খানা ভাস একত্র হইলে এক কুড়ির কার্য করে, পাঁচ খানা একত্র হইলে একবারকার খেলাসম্পন্ন হয় ও খেলা শেষ হয়। তিন খানা ছই কোঁটা প্রজ্ঞায় আর্জনাদ করিলে কি—রাজার এক বিন্দু অগ্রপাতও হইবে না, ভা কখনই নহে। একতাই উমতির সুল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তি। এক জন অপ্রাপ্ত বাবুসার নওলা ও দুই জন বঙ্গকুমারী সাতা আট একত্র মিলিত হইলে, কতী কতী ও রুতীর সহিত তলা বল ধারণ করে। একতাই এই রূপে পদার্থ বটে, যে তিন ভাসের কিছু মাত্র গোলাব নাই, একত্র হইয়াছে বলিয়া তাহার এখন গোরবে তিন ভাস ভাসের সমকক্ষ হইল। বঙ্গবাসীগণ ভাস খেলিবার সময় যখন বিস্তি বলিয়া ডাকিবে, তখন একবার তোমার ভাতার সহিত যে মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহা এক বার স্মরণ করিও। যদি গোঁড়া হিন্দু হও, তবে এক বার আধুনিক নব্য সম্প্রদায়কে—নব্য বলিয়া ব্রাহ্ম বলিয়া রুশ্চিন—বলিয়া নব্য শ্রিতিক বলিয়া,—অত্যাচার ভোজী জাতিয়া যে আধুনিক হিন্দুয়ানির সারমর্ম বুঝা অপদ্রব কর, তাহা একবার স্মরণ করিও। নব্য ভাটগণের নব্য নব্য আরও একবার বিদ্যামন্তার সারভক্ত ভূত যে অপ্রাণ বিদেহ

ভাবটী বুড়ে বোকা পৌত্তলিকদের প্রতি
প্রদর্শন করেন, তাহা একবার স্মরণ করি-
বেন। তাহা হইলেই, তাহারাত্তরের
কার্য সিদ্ধ, আর আমি এই অবতারের
অষ্টমত প্রকৃতিভিত্তিক রূপী মোহন, আ-
মারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

ইন্তরূপে একতার গুণের পরিচয় প্র-
দান করে। কিন্তু এবার দম্পতি মিলন।
ধনবান রুতী যদি ধনশালিনী কর্তীর স-
হিত একযোগ করেন, তাহা হইলে সা-
ধারণের তিন জনের মিলনের ন্যায় গো-
রবাবিত হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য
কি? সাধারণের দম্পতি মিলনের গো-
রব কি? সেও হইতে পারে। বাহ্যের
মধ্যে সচরাচর হয় না, তাহাদের মধ্যে
হইবে না। গৌরব? আমাদের যুগল রূপ
দেখিয়া কে ভূপ হইবে? তবে দম্পতি
প্রণয়ের কথা? সমাজ বিশেষতঃ আধু-
নিক বঙ্গসমাজ কবে দম্পতি প্রণয়ের গো-
রব করিয়াছে? সে তোমার দ্বারের কথা।
তুমি তাহাতে স্বধী হও, আমায় সমাজ,
তাহার জন্য কিছুই করিতে পারি না—
তবে বড়মহাবীর প্রীতুস্বয়ের মিল। হাঁ
গৌরব করা উচিত বুটে। ইন্তরূপে এক
কুড়ি দেওয়া গেল।

যেমন প্রৌণিক পাঁচজনের মিলে এক
শত হয়, তেমনি চারিবারের এক রূপ
লোক এককিত হইলে সেই শত গৌরব
পায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি-
বারের এক স্বর্গাক্রান্ত লোক একত্র হই-
লে যে গৌরবের কথা? হইবে, তাহার
আর আশ্চর্য্য কি? তবে চারিজন কবে
কোয়ে, নবোত্তর বধু এককিত হইয়া কি
করিতে পারে? তাহারই আশা দের

যে চল্লিশ সংখ্যার গৌরব আছে, তাঁহারা
যদি নিজ কুলে থাকিয়া যান, তবেই সে
কুলের গৌরবের রক্ষা করিলেন। নতুবা
তোমার কুল ভঙে করিয়া তাহাদিগকে
লইয়াগিয়াছে, খেলার শেষ গবনায়
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীই গৌরব বাড়িল।
সেই রূপ চারিজন অগ্রাণ্ড ব্যবহার
বালক বা বালিকা একত্র হইয়া কি করি-
তে পারিবে? এই জন্য চারিমাভায়,
চারি আচারি, চারি নওলায়, চারি দশে
শ হয় না।

হাতের পাঁচ। কোন সংগ্রামে যে
পক্ষ শেষ মুহুর্ত্তে জয়ী হয়, তাহার কিছু
অতিরিক্ত গৌরব করিতেই হয়। শেষ
জয়ের স্বখ্যাতির নামই হাতের পাঁচ।
কিন্তু যেমন খেলায় নির্দোষ আছে, তেমন
নি সংসারে তদপেক্ষাও নির্দোষ আছে।
সংসারের রূপ লোক দেখিতে পাওয়া
যায়, কেবল হাতের পাঁচ রাখিবার জন্যই
যাবজীবন ব্যস্ত, কিন্তু হাতের পাঁচ রাখি-
লেন অথচ গুণিয়া দেখেন যে ব্রহ্মচি-
দ্রাশ্রিত নাই। আগেপ্রাণ রাখ, তার পর
হাতের পাঁচের চেষ্টা কর। তা না করি-
লে তুমি বড় নির্দোষ।

যে হাতের পাঁচ রাখিয়াছে, শেষ
রক্ষা করিয়াছে, অথচ খেলা আছে সে
পরে হাতে কাগজ তামিবে। শেষ মুহুর্ত্ত
আসি গিয়া। একজন আসি যেখানে শি-
বির স্থাপন করিয়াছি তোমাকে আসিয়া।
সেই খানে লড়াই দিতে হইবে। গত
বঙ্গের তোমায় আমায় বিমত রূপে
কারবার করিয়া তোমার চৈত্র মাসের
শেষে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে
বৈশাখের অথমে তোমায় দর লইয়াই

আমাকে কারবার করিতে হইতেছে।
অর্থাৎ তোমার হাতের পাঁচ ছিল, তুমিই
কাগজ দিলে। তুমি কাগজ দিয়াছ,
তোমার কতগুলি স্বধীরা, এখন তো-
মায় আমায় যদি ছই জন এক রকমের
বিস্তি পঞ্চাশ ভাকি, তাহা হইলে আমার
গৌরব অধিক হইবে। বাস্তবিক মধ্যস্থ
হইতে হইলে এই রূপ বিচার করাই
উচিত।

আর কুড়ি খানি কাগজের কথা বাকি
আছে। এ গুলি সামান্যতঃ গৌরবচিহ্ন
মাত্র। যত দিন তুমি গৌরবের পাঁচ-
সাই পাঞ্জা উড়াতে না পারিলে, তত দিন
তোমার গৌরব ঢাকা থাকাই বিধেয়।
অর্থাৎ চারি বা না পর্য্যন্ত কাগজ উপুড়
করিয়া ধরিও। সংসারের একটি রীতিই
এই যে তুমি চারিবার অনেক কষ্ট করি-
য়া যে খ্যাতিপাতি টুকু সঞ্চয় করিলে,
তোমার এক বার খেলা না হওয়াতে
তাহা ভৎসনায় লীন হইয়া গেল। তবে
যদি তুমি এক বার পাঞ্জা জাহির করিয়া
থাক, তাহা হইলে পাঁচ হাত অন্ততঃ
না গেলো তুমি আর একবারে হীনগো-
রব হইবে না। পাঁচ হাত নাছিল পাঞ্জা
উঠে না। ছল্লা বড় বাড়। পাঞ্জার উপর
এক কোঁটা। হুতোম বাহাদিগকে সহ-
রের হঠাৎ অবতার বলেন, তাহাদেরই
চিহ্ন এই তাঁদের ছল্লা। তাঁহার ভোগ-
ইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিয়া যান।
যুগকতুর ন্যায় গগণপথে উদিত হইল;
শিখায় গগণের একদেশ উজ্জ্বলীভূত
হইল, কত লোকের মনে কত অন্তঃ
ভাবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল।
কিন্তু কত কাল যে স্থায়ী হইবে, তাহা কে

বলিতে পারে? যখন গেল, হঠাৎ চলিয়া
গেল। এই জন্য ভাল খেলওয়ারে ছল্লা
ব্যবহার বড় আশ্রয় প্রদর্শন করে না।
খেলাত পাঞ্জা, ছল্লা কেবল রণাঙ্গীক
জ্ঞানক মাত্র।

তাস খেলা-যে, সংসারের অবিসল
প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক প্রকার দে-
খাইলাম। কিন্তু অতি পৃথু কথা এখনও
বলি নাই। সংসারের অতি পৃথু বিদ্যা
কি? জুয়াচুরি। তিনি বড় পালা লোক
বলিলে কি বুঝায়, যে তিনি এক জন
জুয়াচুরি। তোমার হাতে কিছুমাত্র
তাস নাই, কিন্তু তুমি এমন রুখভঙ্গী
করিতেছ যে সকলেই মনে করিল, তুমি
এক জন আচল লোক। তুমি তোমার পালা
খেলোয়ার হইলে, সংসারে তুমি পলা
লোক হইলে। যখন “খেলার শুরু কেন
নাই” আমরা বলি তখন মনে মনে
থাকে, যে তিনিই এই লোকখান্ডার
গুরু। তবে তাস খেলার সময় আমরা
যীকার করি, ভুবার খেলাতে যীকার
করাটা বড় প্রথা নয়।

সকল কথাই বলা হইল। এখন কে
তাসদেব! তোমার বাওয়ায় পাঁচ মুর্ত্তিতে
একবার আবির্ভূত হও। হইয়া তোমার
উনপঞ্চাশ মুর্ত্তি আমার উনপঞ্চাশ অব-
য়ে ভর কর; আর তোমার প্রধান
তিন মুর্ত্তি আমার লেখনী মসী ও কাগ-
জে আশ্রয় করে, আমি এক বার,—
“কথাঙ্কলেন বাল্যনাং নীতিস্বধীহ কথ্যতে।”
সাতা আট। কুমারীপ্রাণ! তোমাদের
গৌরব কি এক্ষণে স্থিরিতে পারিলে ত?
নওলা ভাই! যদি তরুণের হও ত
মনে করিও যে বিপদের গোলামে তো-

মাকে লইয়া যাইতে পারে।

দণ্ডা ভগিনী! কুলে থাকিলেই কুলের গৌরব; কিন্তু বাস্কাঙ্কায় যত দিন কর্ণে থাকিবে, তত দিনই তোমাদের স্বথের দিন, অতএব শীঘ্র ঘোড়াটা খুলিও না।

অহে গোলাঁলি! অসুখক্রমে এবার তুরূপের হয়েছ, মনে থাকে যেন, বদ রত্নের বেল। তোমার গৌরব সর্গাপেক্ষা কম।
বিবি, সাহেব। কর্তা! ও কুতি!—
তোমাদিগকে আমার আর কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু ধনী! ও ধনশালিনী!

রসিকতা।

অনেক কবি, দার্শনিক, এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ “স্বথ কি?” এতদ্বিষয়ের নীমাংসার জন্য বিশেষ মন্ত্র করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, রসিকতা প্রকাশ করিতেই মনুষ্যের স্ব। নচেৎ রসিকতা করিবার জন্য লোকে এত অস্থির হইবে কেন? ধনের চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমরা স্থিরপিত্ত করিয়াছি যে, রসিক বলিয়া নাম কিনিবার জন্য লোকে যেমন উদ্যোগী, ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য কেহ তত নহে। অনেকেই স্বীকার করে, “আমি নির্ধন।” “আমি গরিব—আমি দরিদ্র কোথায় পাইব?” “আমি কাম্বাল, আমার উপর এ দৌরাণ্ডা করিও না,” এই রূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাও

যেন ইস্তকটা কি তাহা মনে থাকে।

টেক্সা কর্তা মহাশয়! বদ রত্নের সময় আপনাকে রত্নের সান্তা দলন করে বলে, আপনি ক্ষুধা হইবেন না। ফিরে হাতে কি হয় দেখিবেন?

ভাই খেলওয়ারগণ তুরূপ পাইবার সময় যেন সাত তুরূপ মনে থাকে, আর হাতের পাঁচ রাখিতে গিয়া যেন খেলা খোয়াইও না। মহাশয় তাস! যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুরু, কিন্তু তুমি ভাবাবতার তোমাকে নমস্কার কর।

যা যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে কাহার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে “মহাশয়, আমি অরসিক।” কে কোথায় কবে বলিয়াছে, “মহাশয়, আমি অরসিক, আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবেন না,”—কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে, “আমার কথায় রস নাই—আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না?” কে না উপযুক্ত লোক দেখিলেই আপনাদের রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কেহ কাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনাদিগের বা বিদ্যাবতার, বা বস্তুত্বের বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জল্প তাড়ন ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।

অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার

অত্যন্ত দৌরাণ্ডা আরম্ভ হইয়াছে। “তা-মাংসা ঠাউ” “ইয়ারকি” “রং” মজা” ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধ বিরুদ্ধ লোকের কাছে, বা শোকাবৃত্তির সময়ে, বা বিবাহ কর্ণের সময়ে, অনেকে বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। স্বসময়ে, অসময়ে; সংকথায়, সুকথায়; যেখানে সেখানে; যখন তখন, রসিকতা করা আজি কালিকতক গুলিন লেখকের ব্যবসায়।

এমত বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় আগ্রহ। তাঁহাদের ধারণা আছে, যে পুত্র শোকাবৃত্তির ন্যায় অনবদ্য সুখ দীর্ঘায়িত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম প্রামাণ্য। সে পাণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক লেখক এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

আপর সম্প্রদায়ের অন্য কাজ নাই; কেবল প্রাণপণে রসিকতা করাই কাজ। প্রথম সম্প্রদায় কৃষ্ণাভার মুনি গোঁ-নাই, দ্বিতীয় বাসদেব। এক সম্প্রদায় খেতশূদ্র, জটা, এবং বিজ্ঞতা লইয়া ব্যস্ত, রসিকতায় বড় বিরক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা মান না; নিমিত্ত রসিকতা করিবার জন্য অস্থির, স্বতরাং মুনি গোঁসাইয়ের বিরক্ততা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বাসদেবদিগের রসিকতা সর্বল সময়ের সরস হয় না,—না হউক—রসিকতা করিতে হইবে। রচনা সরস হউক বা

নীলস হউক—তাঁহাতে কেহ হাস্য বা না হাস্যক—তাঁহারা রসিকতা করিবেন। রসিকতার কথাই অল্পবোধে সত্যক মিথ্যা করিতে হয় তাঁহাও স্বীকার, নির্দীন্যকে পূজা করিতে হয়, বা পূজাকে নিন্দা করিতে হয়, তাহাও কতি নাই। রসিকতার প্রোঁতাঃ না মন্দ পড়ে। পূর্বে এ প্রেণীর লেখক এদেশে সচরাচর দেখা যাইত না। পাঁচালি এবং কবিগোলাও যাত্রার দলেই ইহার আত্মভাব ছিল। কৃষ্ণে ছতমর্পেচার নকশা এদেশে প্রচার হইল। সেই পর্য্যন্ত এই লেখক গুলির রসিকতায় দেশ ধ্রাবিত হইতেছে। রসিকতা, বাচনিক হউক বা লিখিত হউক, সর্বত্র সমান প্রকৃতি দেখা যায়। প্রচলিত রসিকতা নানা প্রকার।

প্রথম, প্রাচীন রসিকতা। কেহ কাহাকে সম্বন্ধ নিমিত্ত কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন। এই প্রকার রসিকতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আদৃত। রক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়, যদি কোন প্রকারেই ইচ্ছিত করিতে পারিলেন, যে রায় খাশুকে, কি যত্ন বউও তবেই তিনি সে দিনের মত রসিকতার জয়পাভা বাঁধিলেন।

ইহারই সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার স্থিতি। কেহ কাহাকে যে কোন প্রকারের পালি দিলেই মনে করেন যে আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম। পরের মাতৃ পিতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধে কদম্ব কথা বলিতে পারিলেই এক্ষণ রসিকতার চরম হইল। স্বতরাং প্রামাণ্য বালকেরা এই রূপ রসিকতায় সর্গাপেক্ষা সুপণ্ডিত!

হুতোমপেঁচার অহু করণে ত্রী লেখকেরা
প্রায় তাহাদের কাছে যান।

‘তৃতীয় শ্রেণীর রসিকেরা, রসিক চড়া-
ননি। অশ্লীলতাই তাহাদের কাছে রসি-
কতা।’ কোন ক্রমে অহুচার্য্য, কোন কথা
বাক্য করিতে পারিলেই, তাঁহারা রসি-
কতার একশেষ করিলেন। বাহা ভদ্রের
অপ্রাণ বা অপাঠ্য, এবং স্বনীতির বিনা-
শক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা।
কথা গুলি স্পষ্ট বলিতে পারিলেই তাঁহা-
দের মনের মত রস ছড়ান হয়, কিন্তু
আইনের দোরায়ে কেবল ইঙ্গিতে রসি-
কতা করিয়াই অনেককে কান্ড খাটিতে
হয়।

আর এক প্রকারের রসিকতা কেবল
চাপলাসাত। প্রায় ইতর ভাষায় তাহার
নাম “স্টালাই যোডা।” অনবরত মুখ-
ভঙ্গী, নিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন, রাস্তাদিবা

হাসিবার এবং হাসাইবার নিফল উদ্যম,
এই রসিকতার সামগ্রী। যাহার, “ভুলু-
য়া” এবং “মটরু” এই সকল শ্রেণীর
রসিকদিগের আদর্শ। যেব্যক্তি মুখেই এই
রূপ রসিকতা করিবার জন্য কট করে,
তাহার হুংখ দেখিয়া হুংখ হয়, রাগ হয়
না। কিন্তু যে সকল লেখক একুগ ভুলুয়া
গিরিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের রসিকতা
অসহ্য। আধুনিক নাটক লেখকদিগের
মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদা-
য়ের মধ্যে অনেকে, এই শ্রেণীর রসিক।
রসিকতা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত
অস্থির; দস্ত সর্দমাই বহিষ্কৃত; অঙ্গ
ভঙ্গীর বিরাগ নাই; চক্ষুর নানারূপ
বিকৃতি; কিন্তু রসিকতার উপকরণের
মধ্যে কতকগুলি নীরস, অসংলগ্ন, অর্থ-
শূন্য, ইতর কথা। তাঁহাদের এতদে একটু
তাড়িখানার গন্ধ থাকে।



কোমৎ দর্শন।

১। ওপ্তত কোমৎ।

মহাত্মা ওপ্তত কোমতের ভূলা দর্শন-
বিৎ অতি দুর্লভ। অনেকে তাঁহাকে অ-
দ্বিতীয় দার্শনিক বলিয়া মান্য করেন।
সে বাহা হউক, তিনি যে অসাধারণ ধীশ-
ক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ
নাই। পণ্ডিতপ্রবিনী ক্রাস ভূমিতে
তাঁহার ভূলাব্যক্তি জন্মে নাই। কোমৎ
দর্শন, কাপিল স্থত্রের ন্যায় নিরাশ্রয়;
কিন্তু নিরাশ্রয় বলিয়া অনেক ঐশ্বর্যপরাধ
ব্যক্তি ঐ দর্শনের কোনই অংশ জগন্মাক
বিবেচনা করিয়াও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা
প্রকাশ করেন না।

২। বহির্বিসয় জান।

বস্ত্ততত্ত্ববিষয়ে কোমতের মত এক্ষণে
ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমাত্রেরই
অজান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা
বস্ত্ত সকলের গুণ জানি এবং বিশেষ
অবস্থায় তদীয় বিশেষ কার্য জানি। কিন্তু
বস্ত্তসকল যে কি, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও
ইঞ্জিয়ের অগোচর। তাহাদের মূল
প্রকৃতির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে
পারি না। চম্পক পুষ্পের এই গুণ যে
তাঁহা হইতে অণুউথিত হইয়া তোমার
নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে গন্ধ বোধ
হয়। ঐ গন্ধগুণের বিষয় তুমি জানি-
তেছ। চম্পকের আর এক গুণ যে তাঁহা
হইতে জ্যোতিঃ প্রতিকলিত হইয়া তো-
মার চক্ষুতে লাগিলে তুমি চম্পক পীত-
বর্ণ দেখ। ঐ বর্ণগুণের বিষয় তুমি
জানিতেছ। চম্পকের আর এক গুণ

এই যে তাহা স্পর্শ করিলে কোমল বোধ
হয়। তুমি ইহার কোমলতা গুণ জানি-
তেছ। চম্পক চর্চণ করিয়া তিল্লরস
বোধ করিতেছ। স্পর্শজিয় ও দর্শনে-
জিয়ের দ্বারা চম্পকের বিস্তৃতি জানি-
তেছ। গন্ধ, বর্ণ, রস, কোমলতা ও বি-
স্তৃতি গুণ ভাগ করিলে, চম্পকের বিষয়
কি জানি? কিছুই না। মল্লধোর প্রকৃতি-
মূলক সংস্কার এই যে, যেস্থলে গুণ জা-
নিতে পারে, সে স্থলে গুণের আধার
বস্ত্তর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

বাহার মায়াবাদীদিগকে বাতুল বলি-
য়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা নিত্যন্ত স্থল-
দর্শী। বস্ত্তত মায়াবাদীরা সাধারণ
লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী। তাহাদের
ভ্রম এই যে তাঁহারা গুণ হইতে গুণা-
ধার বিষয়ের সত্ত্বোপলব্ধি অমূলক বিবে-
চনা করেন। যদি কোন মায়াবাদী আ-
দিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “গুণ হইতে
গুণাধার বিষয়ের উপলব্ধি কেন কর?”
ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে,
“এ সংস্কার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।”
মায়াবাদীদের মতের ঐক্যোক্তিকতা প্র-
তিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নাই।

৩। কারণ জান।

কারণ শব্দ প্রয়োগ করিতে কোম-
তের বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি
বলেন, বাঁহারা তত্ত্ববিজ্ঞানের অল্পশীলন
করেন, তাঁহারা যাহাকে কারণ বলেন,
যে কারণের বিষয় আমরা কিছুই জা-
নিতে পারি না। কেবল প্রাকৃতিক

ঘটনা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

সূর্য্যের তাপ জলরাশিতে পড়িলে জলরাশির কিয়দংশ বাষ্প হয়। ঐ বাষ্প জলরাশির উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ জন্য আকাশ দার্শনিক উভিত হয়। উক্ত বায়ুর দৈর্ঘ্যতাপ বাষ্প সঞ্চিত ও দ্রবীভূত হইয়া জল হয়। এই রূপে রুচি হয়। তাপে জলাদি জড় বস্তুর বোগাকর্ষণের হ্রাস হয়, তাহাতে উত্তপ্ত বস্তুর পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এই রূপে উত্তপ্ত বস্তু ক্ষীত ও অসারিত হয়। কিন্তু তাপ কেন বোগাকর্ষণের হ্রাস হয়? কেন জল বাষ্প হয়? এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না।

শ্বেত বর্ণ পারদ ও পীত বর্ণ গন্ধক রাসায়নিক যোগে রক্ত বর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন করে; কিন্তু শ্বেত বর্ণ, পীত বর্ণ অথবা অন্য বর্ণের দ্রব্য উৎপন্ন না হইয়া কেন রক্ত বর্ণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রাকৃতিক ঘটনা কিরূপে হয়, আমরা জানিতেছি; কেন হয়, জানি না। কোমং বলেন, “কেন হয়,” না জানিলে কারণ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। অমুক ঘটনা হইলে অমুক ঘটনা হইবে, ঘটনা নির্দিষ্ট নিয়মে হইবে, ইহাই আমরা জানি, এপর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের সীমা। যাহাকে লোকে কারণ কার্য্য সম্বন্ধের নিয়ম বলে, তাহা কোমংয়ের মতে প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্ণতাব ও উত্তরতাবের নিয়মসমূহ।

বিনি কারণজ্ঞান সম্বন্ধে সাধাভীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদি কারণজ্ঞান

মহাব্যোম সাধাভীত বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার মতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় সম্বন্ধে কখনই জানিতে সম্ভব হইবে না। অন্তরংগ এ বিষয়ের আলোচনা স্বাভাৱিক।

৪। দৈববলবিশ্বাস।

পুরাকালে মানবজাতি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দৈববলবিশ্বাস বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক্ষণেও ঐ রূপ বিশ্বাস ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে আছে। বায়ু বহিতেছে; অতএব বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। স্রোতঃ চলিতেছে; অতএব নদীর অধিষ্ঠাতা দেবী আছেন। রুচি হইতেছে; অতএব মেঘ দৈব বলের ফল ও চালিত হইয়া বারি বর্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যত অংশীদার হইতেছে, তত সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে এ প্রকার দৈববলে বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে। কোমং বলেন, এখন মহাব্যোম প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ভলরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন দৈববলে বিশ্বাস একবার অন্তহিত হইবে। মহাব্যোম প্রথমতঃ জড়োপাসক হয়, পরে বহুদেবোপাসক হয়, তৎপরে একে স্বরাবাসী হয়; পরিশেষে নিরীশ্বর হইবে। বিশেষ যে নিয়ম আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইতে বিশ্বনিয়ম উপলব্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না।

৫। কোমং নাস্তিক কি না?

ইহাতে অনেকের মনে করিবেন, কোমং নাস্তিক; কিন্তু তাহাতেও অন্যান্য নাস্তিকে অনেক প্রভেদ আছে। তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য দর্শন

নের প্রথম অধ্যায়ের ২২, ২৩ বা ২৪ স্বত্রের ন্যায় কোন স্বত্র নাই। মহর্ষি কপিলের ন্যায় তিনি কোন স্বত্বে “ঈশ্বরাসিদ্ধে” বচন প্রয়োগ করেন নাই। বরং তিনি স্বরচিত এক স্বত্বে কহিয়াছেন, “আমি নাস্তিক নহি; যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নৈমিত্ত্যাদি প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি মানে, তাহারা ইহা নাস্তিক। (১) তাহাদের মত হইতে ঈশ্বরবাদীদের মত অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।” কিন্তু যদিও তিনি কোন স্থলে ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এমন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীত হইবে।

৬। কোমং দর্শনের দোষ।

কোমং দর্শন নিরীশ্বরত্ব দোষে দুর্ভিত না হইলে সর্বাদেশব্দের হইত, সন্দেহ নাই—এমন কি, সর্বদর্শনশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। কোমং মহাব্যোমাত্মক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দৈববলে বিশ্বাসের ক্রমে হ্রাস হইতেছে, আরও হইবে। ইহাতে তিনি অজ্ঞান করেন যে, পরিশেষে ঐ বিশ্বাস একবার অন্তহিত হইবে।

বিশ্বনিয়ম দৃষ্টে বিশ্বনিয়ম উপলব্ধি কেন অসম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোমং এ বিষয় সম্বন্ধে পুরোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু ঐ প্রমাণ কোন ক্রমেই প্রচুর বলিয়া স্বীকার করা হইতে

পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঈশ্বরবাদীদের মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নিয়ম হইতে নিয়ম উপলব্ধি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ও বিশ্বাসের সীমা সর্বতোভাবে সমান হইতে পারে না। কালের আদি আছে বা অন্ত আছে, ইহা কেহই অজ্ঞত করিতে সমর্থ নহে; এ জন্য সকলেই বলে, কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু অনাদি ও অনন্ত বিষয় মনে ধ্যান বা ধারণা করা কঠোর সাধা ও কাহারও সাধা নাই। আকাশের সীমা আছে, ইহা কেহ অজ্ঞত করিতে পারে না; এ জন্য সকলেই বলে, আকাশ অসীম। কিন্তু অসীম পদার্থ মহাব্যোম পরিমিত বৃত্তিতে কখনই ধারণা করিতে পারে না।

অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থ আমরা মনে ধারণা করিতে অক্ষম, হইয়াও বিশ্বাস করিতেছি—কাল অনাদি ও অনন্ত, এবং আকাশ অসীম। এ স্থলে আমাদের বিশ্বাসের সীমা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই রূপ। তাঁহার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ ও অপরিস্কৃত; কিন্তু এ কারণে তাহাকে বিশ্বাসের মাধ্যম হওয়া উচিত নহে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঘনান্বিত হইলেও তিনি অস্পষ্ট হন নাই বুঝিতেছি।

৭। কোমং কপিল।

সাংখ্যদর্শন ও কোমং দর্শন নিরীশ্বর হইলেও এই দুই দর্শনে উচ্চ স্থলভার লেশমাত্র নাই। মহাব্যাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে বুদ্ধ করাই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। গত

(১) যথা:—

প্রকৃতিবাসনেন পুরুষসাধ্যাসিদ্ধিঃ। সাংখ্যপ্রবচন ২য় অধ্যায়, ৪৯ স্বত্র।

শাস্ত্রাঙ্গীরা অধিকাংশ নাস্তিক চার্বাক ছিলেন; এফনেও। জর্মন দেশের প্রসিদ্ধ নাস্তিক লুডউইগ হুএলবার্গ এবং ডাল্ডর বুকনমসের শিষ্যেরা চার্বাক। ইহাদের অধিকাংশের মতে ইন্দ্রিয় সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু কোমৎ ও কপিল ইন্দ্রিয় সংযমের বৈপর্য্য নিয়ম করিয়াছেন, একপ কঠিন নিয়ম ঈশ্বরপরায়ণ দার্শনিকদের গ্রন্থেও ছুপ্পা। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, “ঈশ্বর আছেন বলিয়া কর্মফল হয়, এমন নহে, তিনি থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে।” (১) এই বচন মাংখ্য দর্শন, কোমৎ দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র বলিলে বলা যায়। এ পর্যন্ত কোমতে ও কপিলে একা আছে।

৮। পুরুষার্থ ।

কপিলের মতে তিন প্রকার ভ্রুণের সম্পূর্ণ নিরুত্তিই পরম পুরুষার্থ। দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ ঐশ্বর্য ভোগে, ইন্দ্রিয় ভোগে, বাহ্যভোগে ভোগে নিরুত্তি হয় না। বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে প্রাপ্ত হইলেই অপবর্ণ লাভ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই পুরুষার্থ (২)।

পুরুষার্থ লাভের জন্য বানপ্রস্থ হইবার প্রয়োজ্য নাই; আপন আপ্রমে

(১) মেঘদূতবিহিত্তি, কপিলম্পতিঃ কর্মধা তৎসিদ্ধিঃ।

৫৪ অধ্যায়, ২৫ সূত্র।

(২) অথ দ্বিধে দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যপুরুষার্থঃ।

১ম অধ্যায়, ১ম সূত্র।

নস্তুকাংখনিক নিবৃত্তিরপ্যনুর্বিবর্ননং। ঐ, ২য় সূত্র।

মহোদ্যেবকরসম্য চৌদান্যনামপবর্গঃ। ৩য় অঃ ৩৫ সূত্র

যথা তথা শুদ্ধজিহ্বা পুরুষার্থঃ শুদ্ধজিহ্বা পুরুষার্থঃ।

৩৬ অধ্যায়, ৭০ সূত্র।

থাকিয়া আশ্রমবিহিত কর্ম্যাহুষ্ঠান কর্তব্য। আভাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হইবে। (৩) গুপ্ত কোমতের মতে আপনার মুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্তব্যাহুষ্ঠানই পুরুষার্থ। “কর্তব্যাহুষ্ঠানেই মানবান্ধিকার,” ইহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্তব্য সাধনে অন্যদের সুখ হইতে পারে; কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।

৯। পরমসৎ

কোমতের আর এক বচন “পরোপকারার্থে জীবনধারণ।” সমস্ত মানবজাতিকে সাফল্য প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবার ত্রুতী হওয়া কর্তব্য। এই দেবের নাম তিনি “পরমসৎ” (৪) রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, কালে সকলে অন্যাদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরমসতের উপাসনা করিবে। যে পরিমাণে উপঢৌকিয়ারিত্তি স্বার্থপরতাকে জয় করিবে, যে পরিমাণে মহত্ত্বজাতি স্বার্থবিত্ত ও আত্মবিত্ত হইয়া পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, এই পরিমাণে পরম সতের সেবা হইবে ও পুরুষার্থ লাভ হইবে। কেবল উপঢৌকিয়ার দ্বারা সম্যক উন্নতি লাভ করা ছুসাধ্য। বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির একপ্রধান সোপান। কোমতের মতে ভক্তিরূপা মাতা, ঐতরীকুপা ভাৰ্য্যা, এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ হৃদয়দেবতা।

(৩) মুকর্ম্য বাসনে দ্বিহিত্ত কর্ম্যমুদ্যান। ৩য় অধ্যায়, ৩৬ সূত্র। ইতরাপ্যদ্যাসাংক ঐ, ৩৭ সূত্র।

(৪) Grand Etre পদের প্রকৃত অর্থবলি “মহা সৎ”। পাঠ্যকার মহাসৎ পদের বিপর্য্যার্থ “মহা অসৎ” করিতে পারেন; এমন পরমসৎ প্রয়োগ করা পোষ।

১০। প্রেম।

নারীকুলের ভ্রুণ্য মান্দ্য দেখেচল কহিয়াছেন, “পৃথিবীতে প্রেমের নায় পদার্থ নাই।” কোমৎ এই বচনের সম্পূর্ণ অস্বোদন করেন। পূর্বে তাঁহার কেবল পরিমিত ও পারম্যেয় পদার্থে বিশ্বাস ছিল; বুদ্ধিমত্তির দ্বারা বাহ্য কিছু বুঝিতে পারা যায়, কেবল তাহাই তিনি মানিতেন। থেরে মাদ্য ক্রোভিলদ দেভো নানী এক গুণবতী রমণীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্যপ্রবৃত্তি বৃদ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই সংস্কার জমিল, “বুদ্ধিরত্তি ধর্ম্যপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দি নহে।”

১১। বিবাহ।

পুরুষ ৩৫ বৎসর বয়সে, নারী ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করিবে; অবস্থ্য বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে, এবং নারীর ২১ বৎসরে বিবাহ হইতে পারে। জীবদশায় ব্যভিচার দূরে থাকুক, দম্পতীর একের মরণান্তেও জীবিত ব্যক্তি অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোমৎ বলেন, মৃতভর্তৃকা নারী অথবা মৃতভাৰ্য্যা পুরুষ পুনর্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং প্রাক্কর কাঁচাত হয়।

১২। শ্রাদ্ধ।

অনেকে অর্থাৎ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নাস্তিকের আবার শ্রাদ্ধ কি? বস্তুতঃ কোমতের মতে শ্রাদ্ধ আছে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে প্রন্ধার কাঁচা করা যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। ঐ প্রন্ধে খোল, ডোঁসা বা ভুজুর প্রয়োজন নাই। প্রণয় ও স্নেহের পাজদের মত হইলে সম-

য়েৎ তাহাদের স্মরণ করা, ধ্যান করা, ও উপাসনা করাই শ্রাদ্ধ। কোমৎ এইরূপে মাদ্য ক্রোভিলদ দেভোর শ্রাদ্ধ করিতেন। শ্রাদ্ধ মৃত ব্যক্তির কোন উপকার নাই বটে; কিন্তু তাহাতে শ্রাদ্ধকারীর চিন্তোৎকম্ব হয়, তাঁহার সন্দেহ নাই। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁহার প্রাচীন হিন্দুদের সমস্ত আচার ব্যবহারের প্রতি উপহাস করেন, তাঁহাদের একবার এ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কেবল আপনার উপাসনা না করিয়া মধ্যে ভক্তিজাজন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয়; অবনত হয় না।

১৩। বৈরাগ্য।

কোমতের মতে যে ভ্রব্য আহার করিলে আমাদের বলাধাম ও স্বাস্থ্য বন্ধন হয়, তাহাই আহার করা উচিত। স্বাস্থ্যে কেবল জিজ্ঞা ও ভালু পরিভুক্ত হয়, তাহা একবারে আহার করা উচিত নহে। শরীরের বলাধানের এককম্ব উদ্দেশ্য পরমসতের সেবা। তিনি স্ত্রাপাণের দোষ দিয়া স্ত্রাপাণ প্রতিবেদকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কুশরিপু মধ্যমে বলিয়াছেন, “এই রিপুশকল রিপু অপেক্ষা দুর্দান্ত; এবং ইহার শাসন বহুকাল পর্যন্ত চিত্তশাসনের প্রধান উপায় থাকিবে।” তিনি ভরসা করেন, ক্রমশঃ সংযত হইয়া ঐ রিপু একবারে নির্মূল হইতে পারিবে। ক্রমশঃ নির্মূল হইলে মহুবা জাতিও নির্মূল হইবে। তাহাদের রক্ষার উপায় কি? কোমৎ বলেন, “স্বাভাব প্রীতিভির পুরুষসংযোগ ব্যতীত উপায় উপাদানের কসত হওয়া সম্ভব নহে।” আমাদের এই বক্তব্য যে

বিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানব-জাতির ইতিহাসের উপর আপন দর্শনশাস্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন, এ-নীমাংসা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তিনি বাহা সত্ত্ব বলিয়াছেন, শরীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব অল্পস্বারে তাহা অসম্ভব। মানবজাতির ইতিহাস অল্পস্বারেও তাহা অসম্ভব। “না শকো-পদেশে বিদিক্রপদটিতে ব্যাপ্যুপদেশঃ।” সাংখ্যাদর্শন ১ম অধ্যায়, ২ম সূত্র।

উপদেশ্যের পক্ষে বাহা অসম্ভব, সে উপদেশ উপদেশই নহে। কোমৎ যদি কামরিপু সংখ্যের উপদেশ দিয়া দ্বান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যখন কামোচ্ছের বিধি দিয়াছেন, তখন ভারতবর্ষের দার্শনিকশ্রেষ্ঠের বচন দ্বারা ইউরোপীয় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের যত খণ্ডন করিতে হইল। (১)

সঙ্গীত।

তৃতীয় সংখ্যা।

প্রচলিত সঙ্গীত লিখিবার ইউরোপীয় প্রণালী কঠিন। আমরা বন্দনীয় কোন ইউরোপীয় বন্ধুর সাহায্যে নিম্ন লিখিত কতিপয় গীতাবলী সঙ্কলন করিয়াছি, পাঠকদিগের মনোরঞ্জন জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রকাশ্য করিবার তাৎপর্য্য দুই, প্রথমত, এতৎপ্রণালীর দ্বারা সঙ্কেত স্তম্ভে কোমল তীব্র প্রভৃতি কঠিন ইরোপীয় পরিভাষ্য করত গীত লেখা সহজসাধ্য বোধ হয়। দ্বিতীয়ত, “হার মোনিয়মের”র অল্পস্বারে লিখিত হওয়াতে রাগিণীগণের ব্যত্যয়ও দৃষ্ট হইবেক, এবং হিন্দু হারমোনিয়ম হইবার আবশ্যিকতার প্রমাণাণ্ডিয়া হইবেক। সহজেই নিম্নলিখিত গীতসকল বে উচিতমতে আদর্শিত হয় নাই, তথা বলা বাহুল্য। ছয়টি দেশীয় গীত দেওয়া গেল, সপ্তম গীত বহুলিখিত সামান্য দৃষ্টান্তমাত্র। ভাল হইয়াছে, এমনত বলা যায় না, কে-

বল পঞ্চদশক স্বরূপ হইয়া সমাজে থুহীত হইলে, আমরা চরিতার্থ হইব এবং উদ্দেশ্যের মূল ফল প্রাপ্ত হইব।

(১) কোমৎ যে এমন কথা বলিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেককেই বিচ্যাস করিবেন না। পরিত্রিষ্ট পলিটিক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ অনুবাদ অধ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। অতএব আমরা মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম :-

“Si l'appareil masculin ne contribue a notre generation que d'après une simple excitation dérivée de sa destination organique, on conçoit la possibilité de remplacer ce stimulant par un ou plusieurs autres, dont la femme disposerait librement. L'absence d'une telle faculté chez les espèces voisines ne saurait suffire pour l'interdire à la race la plus éminente at la plus modifiable. Ce privilège s'y trouvait en harmonie avec d'autres particularités relatives à la même fonction, où la menstruation constituait surtout une amélioration décisive, éliminée chez les principaux animaux, mais développée par notre civilisation.”—Comité Système de politique positive, Tome IV, p. 68.

লিখন প্রণালীর সঙ্কেতের অর্থ।

খরজ

১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১২	৩	৪	৫	
প্রাচীন নাম গা			মা	ভা	পা	ভা	ধা	নি	ভা	মা	ভা	রো	ভা	গা					
তীব্র = তীঃ কোমল = কো			কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো	কো					

মধ্যম

সপ্তম

এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, অতএব ৭ সহজ সুর এবং ৫ কোমল সুর লইয়া ১২টি মাল অঙ্ক দেওয়া গেল। প্রত্যেক অঙ্কে এক তাল এবং তালের বৈষম্য অর্থাৎ সময়ের তারতম্য প্রকাশ্য জন্য (০) শূন্য দেওয়া হইল। এক শূন্য (০) এক তাল, অতএব

(১০) অঙ্ক দুই তালী (১০০) তিন তাল (১০০০) চারি তালের সময় নির্দেশ করিবেক। সনের (০) এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এক এক অঙ্ক একু স্তম্ভ অথবা দুই স্তম্ভের মধ্যে লিখিত হইলে অঙ্ক তাল অথবা দ্ব্যঙ্ক তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক যথা—

৫	৫	৬	৫	০	৬	৬	৩	৮	১	৫	৮	১	৬	০	৮
= একতাল	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
ইত্যাদি।															

গীতাবলী।

(১ সংখ্যা)

রাগিণী মূলতানী।

৬	৮	৮	৬	৩	৩	১	১	১	৪	৬	৮	৮
আর	যাব	না	লো	সই	য	রু	না	রি	জলে			
৫	৫	৫	৮	১২	১	১	৮	৮	৬	৬	৫	
ভরিয়া	এনেছি				কুন্ড				নয়ন	সজলে		
৬	৬	৬	৮	১২	১	১	১	১	১	১	১	১
কি	হেরিলাম	রূপতার	যরে	আমি	হলে							
১	১	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
ভার,	নাম	যে	জানিনে	তার	সেখাকে	গোহুলে						

(২) বারোয়া ।

১১২ ১১৪ ২২১ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬
 ঘরে রহিতে নাদিকে শ্যামের বাঁশরী কিণ্বণ
 চ ৪ ১ ১২ ১১৪ ৬ ৬ ৬ ৮ ৮ ৪ ৪
 জানে ঘরে ইত্যাদি একত চিকন গলে
 ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৪
 শোভে বনমালা হাতে শোভে মোহন বাঁশরী
 (৩) ঠৈরবী ।

১১১ ১২ ১১ ১০৮ ৮ ৮ ১০ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩
 কাজল নয়নে আর দিও না, কখন প্রাণ
 ১ ৩ ৫ ৬ ৮ ১০ ১২ ৮ ১১ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩ ৪
 শরে কেবী নাছি মূরে বিষ বোণ তাহে কেন,
 ১ ১ ১২ ১১ ১২ ১০ ৪ ৪ ৪ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৬
 সবে মাত্র এক প্রাণ উপায় তা কহি শুন
 ১৩ ৫ ৬ ৮ ১০ ১২ ১২ ৮ ১১ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩ ৪
 সুখা হলহলি স্বরা নয়নের তিন গুণ

(৪) পরজ ।

১২ ১ ৩ ৫ ৬ ১ ১ ২ ০ ৫ ৫ ৫ ৫ ৬ ০
 কেনরে প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়
 ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ ০ ৬
 তপন সবারে দহে নাদহে কমল
 ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ১০ ৮ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫
 তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বালায়
 ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ৫ ৬ ৬ ৫ ৩ ১ ১ ২ ১ ০ ৮ ৬
 তব কেশ ঘন ঘন পীড়ন করিত প্রাণ
 ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৬ ৮ ৬ ৬ ৫ ৫ ৫
 এখন তা নয় প্রেরে ফণিময় হেরি কাতর
 ৬ ৭ ৬ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৮ ৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ৬ ৫
 পরাণ নিকট না হুত পারি বংশে পাছে ভয়

(৫) স্থহিনী ।

২২ ২ ২ ২ ২ ৬ ০ ৩ ২ ০ ১০ ১০ ২ ০ ৬ ০
 তোদের কাষ কি শ্যামের কথা কয়ে
 ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৬ ৬ ৫ ৬ ৬
 শ্যাম জানে আমি জানি তোরা পরের মেয়ে
 ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৮ ৬ ৫ ৫ ৬
 আপনি করেছি মান আপনি বুঝিয়ে
 (৬) বসন্ত ।

১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১০ ১০ ৩ ৫ ৬
 বিহরতি হরিরিহ ময়ম বসন্তে
 ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৫ ৫ ৬
 নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং
 ৩ ৩ ৫ ৫ ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬
 সখি বিয়হি জনস্যা ছুরন্তে
 ৬ ৬ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ১ ৮ ৩ ৩
 ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন
 ১২ ১২ ১২ ২২ ২ ৩ ২ ১০ ১০ ২২
 কোমল মলয় সমীরে যধু কর
 ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ২
 নিকর কর যিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে

১ সংখ্যা । মূলতানী রাগিণীর বহু মিলনের বখাসাধা উদাহরণ ।

সপ্তম	৬ ৮ ৬ ৪ ৩ ১	১ ১ ৪ ৬ ৮ ৮
মধ্যম	৩ ৩ ৩ ১ ১ ১ ৮	১ ১ ১ ১ ৪ ৪
ধরজ	১ ২ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ৮ ৪	৫ ৭ ৮ ৯ ১ ১ ২
	আর যা ব না লো মোই	যমুনার জলে
	৫ ৫ ৫ ৫ ৮ ১ ২ ১ ১	৮ ৮ ৮ ৬ ৬ ৫
	২ ২ ২ ২ ৩ ৮ ৮ ২	৩ ২ ১ ২ ২ ১ ২
	১ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ১ ১ ২ ৪ ৫	১ ২ ১ ১ ১ ০ ১ ০ ১ ১ ৫
	ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ	নয়ন সলিলে
	৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১ ২ ১	১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
	৩ ৩ ২ ২ ৫ ৮ ৮	৮ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬
	১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৪	৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২
	কি হেরিলাম রূপ তার	ঘরে আসা হলো
	১ ১ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯	৬ ৬ ৬ ৬ ৭ ৫
	১ ০ ১ ০ ২ ৩ ৪ ২ ২ ৩ ৩	২ ১ ১ ২ ২ ১
	৭ ৫ ৮ ১ ১ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
	তার নাম যে জানিনে তার	সে থাকে গোহুলে

আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র অতি বিস্তৃত । অসাধারণ কল্পনা ও তরুণবিশিষ্ট প্রাচীন পুরুষগণ কর্তৃক বহু পরিপ্রসঙ্গে নির্মিত হয়, কালক্রমে তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে । নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই, মাথায় তাজ, কাল দাড়ি, বড় পেট, বড় তানপুরা, ধরজ শব্দ, এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে । বিবেচনা করা উচিত যে উৎসাহ

ব্যতীতই এবং সময়ের গতিতেই এই সকল গায়ক ঐশ্বর্য বঁচাইতে গিয়া রাগ রাগিণীকে দম্ব করেন । সভ্যতার প্রধানচিহ্ন সঙ্গীতাহরণ । ভরসা করি, বাঙ্গালীগণ এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন, এবং অসাধারণ সৌষ্ঠব সম্পন্ন পূর্ণসংকীর্ণ ভারতসঙ্গীতপ্রণালী পুনরুদ্ধার করিবেন ।

ব্যাস্তাচার্য্য বহলাঙ্গুল ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

সভাপতি মহাশয়, বান্ধিনীগণ,
এবং ভক্ত ব্যাগ্রিগণ !

আমি প্রথম বক্তৃতায় অলীকার করি-
য়াছিলাম যে; মানুষের বিবাহ প্রণালী
এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব ।
ভক্তের অলীকার পালনই প্রধান ধর্ম ।
অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে
প্রবেশ করিলাম ।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সক-
লেই অবগত আছেন । সকলেই মধ্যে-
অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন ।
কিন্তু মহাবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে ।
ব্যাস্ত প্রভৃতি সভা পশুদিগের দারপরি-
এহ কেবল প্রয়োজনান্বিত, মহাব্যাপ্তির
সরুপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেরই
এক কালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া
রাখে ।

মহাব্যবাহা দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈ-
মিত্তিক । ভ্রমধ্যে নিত্য অথবা পৌরো-
হিত বিবাহই মান্য । পুরোহিতকে মধ্য-
বর্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া
থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ ।
মহাদংষ্ট্রী ।—পুরোহিত কি ?

‘বহলাঙ্গুল’—অভিধানে লেখে, পুরো-
হিত চালকভাষ্যে বর্ণনাব্যবসায়ী ম-
নুষ্য বিশেষ । কিন্তু এই ব্যাখ্যা ছুট ।
কেমনা সকল পুরোহিত চালকভাষ্যে
নহে; অনেক পুরোহিত মধ্য মাংস খা-
ইয়া থাকেন ; অনেক পুরোহিত সর্প-
ভুক্ত । পক্ষাঘুরে, চাল কলা খাইলেই

পুরোহিত হয়, এমত নহে । বারানসী
নামক নগরে অনেক গুলি ঘাঁড় আছে
—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে ।
তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ,
তাহারা বঞ্চক নহে । বঞ্চকে যদি চালকলা
খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয় ।

পৌরোহিত বিবাহে এই রূপ এক জন
পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তী হইয়া
বসে । বসিয়া কতক গুলি বকে । এই
বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে । তাহার তর্ক
কি, আমি সরিশেষ অবগত নহি, কিন্তু
আমি যে রূপ পণ্ডিত, তাহাতে এ সকল
মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনু-
ভূত করিয়াছি । বোধ হয়, পুরোহিত
বলে,

‘হে বরকন্যে ! আমি আজ করি-
তেছি, তোমরা বিবাহ কর । তোমরা
বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল কলা
খাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর । এই
কন্যার গর্ভধানে, সীমন্তোন্ময়নে, সূতি-
কাগারে, চাল কলা খাইব—অতএব
তোমরা বিবাহ কর । স্ত্রীতনের যক্ষীপুত্রায়,
অমপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপ-
নয়নে—অনেক চাল কলা খাইব, অতএব
তোমরা বিবাহ কর । তোমরা সংসার-
ধর্মে প্রৱৃত্ত হইলে, সর্গদা ব্রত নিয়নে,
পূজা পার্শ্বণে, গ্রাণ যজ্ঞে, ব্রত হইবে,
স্তুতরাং আমি অনেক চাল কলা খাইব;
অতএব তোমরা বিবাহ কর । বিবাহ কর,
কখন এ বিবাহ রহিত করিও না । যদি

রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে একে চপেটাদিতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের এই রূপ আদেশ।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত্যবিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে 'নৈমিত্তিক বিবাহ' বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে একগুণ বিবাহও সমরাস্তর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই, যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপনে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আশার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহার চাল কলা 'পায়' না—স্বতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকরিত্বকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই, যে অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আশার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্য-

লয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহার আমাদিগের ন্যায় সুসভা, স্বতরাং পশুপত্ত, তাঁহারাই এই বিষয়ে আমাদিগের অস্বকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভা হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্য পণ্ডিত তৎপক্ষে প্ররতিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেন। তাঁহারাজ্ঞানহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মান বন্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাভ্র সমাজের অনরারি সেধের নিয়ুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করে, তাঁহার সভা হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেননা তাঁহার আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌক্তিক বিবাহ বলা হইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্প্রদায় মনুষ্য মুন্ডার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌক্তিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হয়। হই। মুন্ডা কি?

রহস্যজ্ঞান। মুন্ডা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতুক থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকার। স্বপ্ন রোপা এবং তাহে ইহার

প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ তিন এবং কাঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইহার সিন্ধাসন রচিত হয়। মনুষ্যগণ রাতি-দিন ইহার ধ্যান করে, কখন কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্দদা শশবাস্ত হইয়া দাঁড়ায়। যে বাড়ীতে চাঁকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়েন না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্দদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে শুষ স্তুতি করিতে থাকেন। যদি মুন্ডাদেরই অধিকারী এক ব্যক্তির তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিতার্থ করেন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অঙ্গপ্রস্থে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে এই দেবীর ঘরে পাওয়া যায় না। এমন দুর্লভই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে ইহার অসুখস্বাস্থ্য চাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অঙ্গপ্রস্থ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যমাজ্জে অতিপাণ হইতে পারে; যাঁহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাঁহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন; তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যমাজ্জে মুন্ডাহাদেবীর অঙ্গপ্রস্থীত ব্যক্তিকেই ধর্মিক বলে—মুন্ডা-হীনতাহা হইবে অর্থহীন। মুন্ডা থাকিলেই ধীনতাই হইল। মুন্ডা যাহার নাই, তাহার

বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রজ্ঞানসারে সে মূর্থ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি 'বড় বন্ধা' বলি, তবে অমিতোদর, মহাদণ্ডী, প্রভৃতি প্রকাণ্ডকার মহাব্যাগধকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যলয়ে 'বড় মানুষ' বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাঁহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই 'বড় মানুষ' বলে। যাঁহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে 'ছোট লোক' বলে।

মুন্ডাদেরই এই রূপ নানাবিধ গুণগান প্রশংসা করিয়া আমি এখানে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে মনুষ্যালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাভ্রালয় স্থাপন করিবে। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুন্ডাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাভ্রাদি প্রধান পশুরা কখন যুক্ততির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্দদা আম্রজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুন্ডা-পূজাই ইহার কারণ। মুন্ডার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্টের ঝোঁপ রত। অথম বুদ্ধতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহজেই প্রান্তর মধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরের হনন করে। মুন্ডাই গুণ বলিয়া মনুষ্যমাজ্জে অতিপাণ হইতে পারে; যাঁহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাঁহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন; তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যমাজ্জে মুন্ডাহাদেবীর অঙ্গপ্রস্থীত ব্যক্তিকেই ধর্মিক বলে—মুন্ডা-হীনতাহা হইবে অর্থহীন। মুন্ডা থাকিলেই ধীনতাই হইল। মুন্ডা যাহার নাই, তাহার

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃত্যেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্বদাই পারস্পরের অসম্মল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও ভাসার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় রুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতু-
কারক, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ শত্ৰুতা করিলে, আপনাদি-
গিরের বিষয় কর্ণের সময় পুনরপস্থিত
হয়, এই জন্য অন্য এই খানে সমাধা
করিলাম। ভবিষ্যতে বহিঃস্বাক্ষর হয়,
উভে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।”

এই রূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া প-
ণ্ডিতবর ব্যাভাচার্য রহস্যমূল, বিপুল
লালচট্টাচার্য মধ্যে উপবেশন করি-
লেন। তখন দীর্ঘনিশ্বাস নামে এক স্থি-
ফিত ঘ্রা ব্যাভ গম্ভীরত্বান করিয়া,
হাউ হাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস মহাশয় গর্জনাতে বলিলেন,
“হে ভ্রাতৃ ব্যাভরণ! আমি অন্য বক্তার
মুদ্রভূতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার
অন্তর্য করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্তব্য
যে বক্তৃতাটি, দিতান্ত-মন্দ, মিথ্যা কথা
পরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গওমুখ।”

অমিতোদর। “আপনি শাস্ত হউন।
সত্যানুভূতিয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি
দেয় না। অজ্ঞানভাবে আপনি আরও
গুরুতর গালি দিতে পারেন।”

দীর্ঘনিশ্বাস। “যে আজ। বক্তা অতি
সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার
মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত ইহা-
লেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়।

তিনি অতি স্থপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই
মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃত্যের
মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা
যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া
উচিত। তবে, বক্তৃত্যের সকল কথা
সম্মতি প্রকাশ্য করিতে পারি না। বি-
শেষ, আমাদের মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে
বলে, বক্তা তাহাই অর্থগত নহেন।
ব্যাভ জাতির কুল রক্ষার্থ যদি কোন
বায় কোন বাহিনীকে আপন সহচরী
(সহচরী, সম্মত চর) করে, তাহা-
কেই আমরা বিবাহ বলি। মাহুয়ের
বিবাহ সেরূপ নহে। মাহুয়, যতাবৎ
দুর্ভল এবং প্রজুত। স্বতরাং প্রত্যেক
মনুষ্যের একই প্রজু চাহি। সকল
মনুষ্যই একই জন স্ত্রীলোককে আপন
প্রজু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই
তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা
কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রজুনিয়োগ করে,
তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত্য বিবাহ
বলা যায়। সাক্ষির নাম পুরোহিত।
ইহাঙ্গামূল মহাশয় বিবাহ মন্ত্রের
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অর্থার্থ।
সে মন্ত্র এই রূপ;—

পুরোহিত। “বল, আমাকে কি বিষয়ের
সাক্ষী হইতে হইবে?”

বর। “আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি
এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার
প্রজুদে নিযুক্ত করিলাম।”

পুরো। “আর কি?”

বর। “আর আমি জন্মের মত ইহার
শ্রীচরণের গোলায় হইলাম। আমার
যোগ্যদের আর আমার উপর;—খাই-
বার ভার উঁহার উপর।”

পুরো। (কন্যার প্রতি) “তুমি কি
বল?”

কন্যা। “আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভূতা-
টিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা
হইবে, চরণ সেবা করিতে দিব। যে দিন
ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া
তাড়াইয়া দিব।”

পুরো। “শুভমস্ত।”

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে।
যথা যুদ্ধকে বক্তা মনুষ্যপ্রজুত দেবতা
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক
ইচ্ছা দেবতা নহে। যুদ্ধ এক প্রকার
বিষমক। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষমপ্রিয়;
এই জন্য মচরাচর যুদ্ধসংগ্রহে অন্য যত্ন-
বান্। মনুষ্যগণকে যুদ্ধাত্ত জাতিয়া
আমি পূর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে
না জিনি যুদ্ধ কেনাই উপদেষ্টা সামগ্রী;
আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইতে।
একদা বিদ্যাপরী নদীর তীরে একটা
মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার
সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা যুদ্ধ
পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করি-
লাম। পর দিবস আমার উদরের পীড়া
উপস্থিত হইল। স্বতরাং যুদ্ধ যে এক
প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?”

দীর্ঘনিশ্বাস এই রূপে বক্তৃতা সমাপন
করিলে পর অন্যান্য ব্যাভ মহাশয়েরা
উত্তীর্ণা বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভা-
পতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগি-
লেন;—

“এক্ষণে রাজি অধিক হইয়াছে, বি-
ষয় কর্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ,
হরিণের পাল কখন আইল, তাহার
খিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া

কাল হরণ করা কর্তব্য নহে। বক্তৃতা
অতি উত্তম হইয়াছে—এবং রহস্যমূল
মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হই-
লাম। এক কথা এই বলিতে চাহি, যে
আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিবলেন,
তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে,
মনুষ্য অতি অসত্য পশু। আমরা অতি
সত্য পশু। স্বতরাং আমাদের কর্তব্য
হইতেছে যে আমরা মনুষ্যগণকে আমা-
দের ন্যায় সত্য করি।” বোধ করি,
মনুষ্যদিগকে সত্য করিবার জন্যই জগ-
দীশ্বর আমাদেরকে এই স্বন্দরবন ভূমিতে
প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মাহুয়ের
সত্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও
কিছু স্বস্বাদ হইতে পারে; এবং তাহারাও
আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন-
না সত্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে
যে, ব্যাভদিগের আহার্য শরীরের
করাই মনুষ্যের কর্তব্য। এই রূপে সভা-
পতি আমরা শিখাইতে চাই। অতএব
আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।
ব্যাভদিগের কর্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অস-
ত্য করিয়া পশুচাং ভোজন করুন।”

সভাপতি মহাশয় এই রূপে বক্তৃতা
সমাপন করিয়া লালচট্টাচার্য মধ্যে
উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতি
ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্যাভদিগের মহাসভা
ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে থায়া পারিলেন,
বিষয় কর্মে প্রায়গ করিলেন।

যে ভূমিধণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হই-
য়াছিল, তাহার টারি পূর্বে কতক গুলিন
বক্স গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর,
তত্পরি আরোহণ করিয়া, রক্ষণক্রমে
একদা থাকিয়া, ব্যাভদিগের বক্তৃতা

শুনিতেছিল। ব্যাভার্চাধ্য সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি, ভায়া ডালে আছ ?” দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি। প্রথম বানর। “আইস, আমরা এই ব্যাভার্চাধ্যের বক্তৃতার সমালোচনায় প্ররক্ত হই।”

প্র, বা। “কেন ?”

প্র, বা। “এই বাঘেরা আশাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।”

দ্বি, বা। “অবশ্য কর্তব্য। কাজটা আশাদিগের জাতির উচিত বটে।”

প্র, বা। “আজ্ঞা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?”

দ্বি, বা। “না। তথাপি আপনি একটু প্রহ্মণ থাকিয়া বলুন।”

প্র, বা। “সেই কথাই ভাল। নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের স-মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।”

দ্বি, বা। “বলুন কি দোষ !”

প্র, বা। “প্রথম, বাক্যের অসঙ্গত। আমরা বানরজাতি, ব্যাভার্চাধ্য বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁছুরে ব্যাকরণের মত নহে।”

দ্বি, বা। “তার পর ?”

প্র, বা। “ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।”

দ্বি, বা। “হী; উহারা বাঁছুরে কথা কয় না।”

প্র, বা। “এ যে অমিতোদর বলিল, ‘ব্যাভার্চাধ্যের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সভা করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,’ ইহা

না বলিয়া যদি বলিত, ‘অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভা করেন,’ তাহা হইলে সম্মত হইত

দ্বি, বা। “সন্দেহ কেন—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কি—?”

প্র, বা। “কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কথা বলিতে হয়; তাহা উহারা জানেন না। বক্তৃতায় কিছু কিচিৎ করিতে হয়, কিছু লক্ষ লক্ষ করিতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।”

দ্বি, বা। “আশাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাভার্চাধ্য হইত না।”

একই সময়ে আরো কয়েকটা বানর সম্মত পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদোষ এই যে, রহস্যমূল আপনার জান ও বুদ্ধির দ্বারা আবৃত্ত কর অনেক গুলি নৃত্য-ভন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন প্রহ্মণে পাঠায়া যায় না। যাহা পূর্ণলব্ধকদিগের চর্চিত চর্চণ নহে, তাহা নিতান্ত দুয্য। আমরা বানর জাতি, চিকিৎসা চর্চিত চর্চণ করিয়া বানরলোকের ঐরিক্তি করিয়া আসিতেছি—ব্যাভার্চাধ্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে স্মৃতিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যা বুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি ?”

আর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়াম রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অতীত পালিগলাক দিয়া আপন সভাতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।”

এই রূপে বানরেরা ব্যাভার্চাধ্যের

নিন্দাবাদে প্ররক্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থলোদর বানর বলিল, যে “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে রহস্যমূল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।” আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।”

উত্তরচরিত।

তৃতীয় সংখ্যা।

প্রথমাব্দ ও দ্বিতীয়াব্দের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটা দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইল্টস্টেইল নামক লেখকপীয়ার-কৃত বিব্রাভ নাটকের সম্বন্ধে উহার বিশেষ সাধুশা আছে।

এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাস্কিরি স্থানে প্রতিপালিত এবং অশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পুত্রপ্রদত্ত বরে দিব্যান্ত তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এ দিগে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্ব রক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবদেবেশে জ্ঞানিলেন যে শত্রুক নামক কোন নীচ জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে তপস্চারণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র এই শত্রু তপস্কীর

শিরশ্ছেদ মানসে সমুদ্রে তাহার অঙ্গস্থান্যে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুক পুণ্ড্রবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াব্দের বিষ্ণুক্রে মূনিপুত্রী আ-জ্যেয়ী এবং বনদেবতা বাসকীর প্রযুথাস এই সকল রক্তান্ত একীকৃত হইয়াছে। যেমন প্রথমাব্দের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেই রূপ অন্যান্য অব্দের পূর্বে একটি বিষ্ণুক্রে আছে। এ গুলি অতি মনোহর। কখন রিছুবী ঋষিপুত্রী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলী নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্যময়ী স্মৃতির দ্বারা ভবভূতি বিষ্ণুক্রে সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াব্দের আরম্ভই স্বন্দর। যথা:—

“অঙ্গদবংশে তাপসী। অতঃ বন দেবতায় ফলকুমুদপল্লবায়ৈ মামুপস্থিতভে। (১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আজ্যেয়ীর কথা বড় স্বন্দর—

“বিতরতি গুরুপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈবতয়া জ্ঞেয়ং নতবলু তরোজনে শত্রুক্রেতরোতাপহৃদিত। (২) এ দেব, এই বনদেবতা ফলকুমুদপল্লবায়ের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

এই রূপ মর্ম মধ্যে রক্ত সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম; পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম-চ্ছ্যতান করিতেন। রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তদনুশ বাহু প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চদশীতে আসিয়া রামের ঐর্ষ্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদেই সীতাসহবাসের চিরপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রক্ত শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই পোদাবরী প্রোত্যাক্ষ-লিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়-পাথর আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাত্র্যাবিতা নদী গুলন দেখিল যে আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, “ভগবত! সাধনান থাকিও—আজ রামের বিপদ। দেখিও, রাম যদি মুছাঁ যান, তবে তোমার জল-কাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে যুহুঃ তাঁহার মুছাঁ ভঙ্গ করিও।” রমুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসস্বাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্বসম্পাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার নিকটায় অসীম ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছেন “ছায়া।”—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণ দেহসাবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমল্ল-সোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগিরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাম্বীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে সহস্র-চরিত কুম্ভমাঞ্জি দিয়া পতিকুলদায়কুশ স্বর্গতদেবের পূজা করিতে ভাগিরথী এই জনস্থানে পড়াইলেন। এবং আপন ঐবশক্তিপ্রভাবে রমুকুলবধুকে অদর্শ-নীয়া করিলেন। ছায়াব্রহ্মণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কি রূপ? তাঁহার মুখ “পরিপাণ্ডুরূপ-কপোলমুন্দর”—কবরী বিলাল—শূরভাতিপসঙ্গ কেকতী কুম্ভ-মার্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিশলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার পড়ার প্রেম। পূর্বস্বপ্নের স্থান দেখিয়া বিমুগ্ধিত জমিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান বনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল। তখন সীতা একটী কিশোরীকে যথেষ্ট শলকীর পল্লবগ্রাণ্ডা ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই কিশোরী বড় ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গ জলপানে গিয়াছে। এক মন্ত-যুগপাত আসিয়া অক্ষয়্যে তুংপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যজন্মিতা বাসন্তী দেখিতে

পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “সর্দনাশ হইল, সীতার পালিত, করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চদশী। সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার জাতি জমিল। পুঞ্জীকৃত হস্তীশাবকের বিপদে বিলম্বনিত হইয়া তিনি ডাকিলেন, “আর্য্য পুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!” কি জম! আর্য্য পুত্র? কোথায় আর্য্য পুত্র? আজি বাব বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মুছাঁ তা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এ দিগে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আশ্রান্নস্বারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চদশী বিচরণ করিবার মানসে সেই থানে বিমান রাখিতে বলিলেন। সে কবার শব্দ মুছাঁ তা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মুছাঁ ভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আত্মদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, “একি এ? জলভরা মেঘের স্তম্ভিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার স্বর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আশা হেন মন্দভাগিনীকে সমসা আচ্ছাদিত করিল?” দেখিয়া, তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, “কেন বাছা একটা অপরিষ্কৃত শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে মন্থীর মত চমকিয়া উঠিলি?” সীতা বলিলেন, “কি বলিলে ভগবত? অপরিষ্কৃত? আমি যে স্বরেই চিনিছি। আমার সেই আর্য্য-পুত্র কথা কহিতেছেন।” তমসা তখন দেখিলেন, আর লোকান রথা—বলিলেন, “শুনিয়াছি মহারাজা রামচন্দ্র কোন

মুদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বাব বৎসরের পর স্বামী নিকটে, ময়নের পুতলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বাব বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আচ্ছাদিত প্রশংসা করিলেন না—“কি স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক? বলি যা দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

“দীর্ঘিচিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কু সো রাআ।” “সৌভাগ্যক্রমে সেরাজার রাজধর্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।” যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌভাগ্যে তাহার তুল্য, সম্মেহ নাই। “দীর্ঘিচিআ জাপ-রিহীনরাঅধম্মো কু সো রাআ।” এই রূপ বাক্য কেবল জেকপীরেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আচ্ছাদিত কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সেরাজার রাজধর্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রসংলগ্নে আকার দেখিয়া, “সখি, আমার ধর।” বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চদশী দেখিতে, সীতা বিরহ প্রদীপ্তা-নলে পুড়িতে, “সীতে! সীতে!” বলিয়া ডাকিতে, মুছাঁ তা হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্ত পুড়িত হইয়া ডাকিলেন, “ভগবত তমস! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার ধানিকে বাঁচাও!”

তমসাবলিলেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন ।” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব !” এই বলিয়া সীতা রক্ষকে স্পর্শ করিলেন । (১) রাম চেননা প্রাপ্ত হইলেন ।

পরে সীতার পূর্বকালের প্রিয়সখী,

(১) “যা হউক তা হউক ।” এই কথার কত অর্থগোচর্য্য ! বিদ্যাসাগর মহাশয় এর বা-
ক্যের চীৎকার লিখিয়াছেন যে “আমার পাণি-
স্পর্শে অর্থাৎ পুস্ত্র বাচিলেন কি না, জানি না ;
কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ
করিব ।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে
পানিস্পর্শে ফল হইবে কি না, এই মনেহেই
সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক !” বিদ্যা-
সাগর মহাশয়কে উত্তরচরিতের অর্থ বুঝাইতে
প্রবৃত্ত হওয়া পুস্ত্রের কার্য্য মনেহই নাই। কিন্তু
কবির গৌরবাহ আমাদিগকে সে দোষও ধী-
কার করিতে হইল । সে মনেহে সীতা বলেন
নাই যে, “তাহা হবার হউক !” সীতা ভাবিয়া-
ছিলেন, “রামকে স্পর্শ করিবো আমার কি
অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,
তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিনশ্রদ্ধ করিয়া-
ছেন—বিশ্রদ্ধ করিবার সময়ে এক বার
আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে আমি
তোমাকে ত্যাগ করিলাম—” আজি বার বং-
সর আমাকে ত্যাগ করিয়া সখ্য রহিত করি-
য়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পক্ষীর
মত তাঁহার গায়স্পর্শ করিব কোন সাহসে? কিন্তু
তিনি ত সূত্রদ্বারা, যা হউক তা হউক,
আমি তাহাকে স্পর্শ করিব ।” তাই ভাবিয়াই
সীতাস্পর্শে রাম চেননা প্রাপ্ত হইলেন, সীতা
বলিলেন “ভগবদী তমসে! অসুখরোগ জই
নাহং যং পেলখিচ্ছিত্বো অসুখরোগীমসি-
ধাণেণ অহিঅনরং মম যিহারাঅো কুব্ধমিহি”
তবু “মম যিহারাঅো।”

বনদেবতা বাসন্তী, সীতার পুত্ৰীকৃত করি-
শাবকের সহায়দেবণ করিতে সেইখানে
উপস্থিতা হইলেন । রামের সঙ্গে তাঁহার
সাক্ষাৎ হওয়ার, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ
গেলেন । সেই হস্তশিশু স্বয়ং শত্রুজয়
করিয়া করিবার সহিত কীড়া করিতে
লাগিল । তদ্বর্ণনা অতি মধুর ।

যেনো দাক্ষিণ্যবিশিষ্টগরমিত্ত দস্ত্যসুপ্তেণ
ব্যাকুলেস্তে সুতনুলবলীপলবঃ কর্ণপূরাং ।
দোহঃ পুস্ত্রস্তব মনমুচ্যং বারচানাং বিজ্ঞেতা
যং কলানং বরসিতরূপে ভাজনং তস্য জাতঃ ।
স্মৃতি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুগুচিকার্য্য
মর্পি শিক্ষিতং বৎসেন ।

লীলোৎখাতমুগালকাত্তবলক্ষেদে মস্পাদিতাঃ
পুস্ত্রং পুস্ত্রকরাসিতয়া পরসো গরুতসক্রান্তয়াঃ
সেনাঃ শীকরাসি করেণ বিহিত কাম্যং বি-
রামে পুনর্যংয়েহরানরালনিলনলিনীপত্রাভ্যং
পুত্ৰঃ । (১)

এদিকে পুত্ৰীকৃত করী দেখিয়া সীতার
গর্ভজপুস্ত্রদিগকে মনে পড়িল । কেবল
স্বামীদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,—পুস্ত্রমুখ
দর্শনেও বঞ্চিতা । সেই মাতৃমুখনির্গত
পুস্ত্রমুখস্থতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্য
বিরত হইব ।

(১) যে নবমূল মুখাল পল্লবের ন্যায় দ্বিত
হুগাঙ্করে তোমার কর্ণেপন হইতে ক্ষুদ্র লক্ষণপলব
চীনিয়া দৃষ্ট, সেই তোমার পুস্ত্র মদমত বারং-
পনকে জয় করিল, সূত্রদ্বারা এখনই সে মুখাবয়বের
কল্যানভাজন হইয়াছে ।

স্মৃতি
বিস্মিত দেখে, বাছা জরাম রম্যভিতে পশিয়াযাকে ।
বেশা করিতে মুখাপসার উৎপাদিত করিয়া তাহার
প্রাণের আশ্রয় মুখনিগম্যমুখনিগম্য জলের গম্ভ
মিশ্রিয়ায় দিতেছে ; এবং শত্রুর দ্বারা পথ্যাত্ত জগ-
কবার দ্বারা তাহাকে নিক করিয়া, বেহে অকল্পত
নদীনিপতের অশ্রুতপ দরিতেছে ।

মমপুত্রকণাং ইসিবিবলকোমলবল্লভমুগল
কবোলাং অণুবন্ধমুক্তকালবিহসিং নিবন্ধ-
পরিচুসিং অজ্ঞউত্তেগং । (১)

কামহিংস্রাং অমলমুখপুত্রীভ্রাতৃভ্যং
পরিচুসিং অজ্ঞউত্তেগং । (১)

বিবরুদ্ধ ।

উল্লাস ।
একাদশ পরিচ্ছেদ ।
অঙ্কুর ।

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগরের
সরল চরিত্র পরিবর্তিত হইতে লাগিল ।
নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নি-
দাঘ কালের প্রদোষাকাশের মত, অক-
স্মাৎ সে চরিত্র মেঘারত হইতে লাগিল ।
দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনীর
অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন ।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, “স্রাসি কমলের
কথা শুনিব । আমি চিত্তপ্রতি কেন
আবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অ-
চলম্পত্ত—আমিই জান্তাম । বোধ হয় তাঁ-
হার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে ।”
সূর্য্যমুখী বালির বঁধ বাঁধিল ।

বাড়ীতে একটী ছোট রক্ষ ডাক্তার
ছিল । সূর্য্যমুখী গৃহিণী । অন্তরালে থা-
কিয়া সকলের সঙ্গেই কথা করিতেন ।
বারেবার পাশে এক চীক থাকিত ; চী-
কের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন । বা-
রেবার সোধাদিত ব্যক্তি থাকিত ; মধ্যে
এক দামী থাকিত ; তাহার মুখে সূর্য্য-
মুখী কথা করিতেন । এই রূপে সূর্য্যমুখী
ডাক্তারের সঙ্গে কথা করিতেন । সূর্য্য-
মুখী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন,

“বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও
না কেন?”

ডাক্তার । “কি অসুখ, তাহা ত আমি
জানি না । আমি ত অসুখের কোন
কথা শুনি নাই ।”

হু । “বাবু কিছু বলেন নাই ?”
ডা । “না—কি অসুখ?”

হু । “কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার,
তুমি জান না—আমি জানি,?”

ডাক্তার স্তবরাং অপ্রতিত হইল ।
“আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,” এই
বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করি-
তেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন,
বলিলেন, “বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও
না—ঔষধ দাও।”

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে ।
“যে আচ্ছা, ঔষধের ভাবনা কি,” বলিয়া
পলায়ন করিল । পরে ডিস্পেন্সারিতে
গিয়া একটী সোড়া, একটী পোটা ওয়াইন,
একটী সিরপকে রিমিউরেটিস, একটী মাতা
মুণ্ড নিশুইয়া, সিসি পুরিয়া, টিকিট মা-
রিয়া, প্রত্যহ ছই বার সেবনের ব্যবস্থা

(১) আমার সেই পুস্ত্রপুত্রের অমলমুখপুত্রমুগল, যা-
হাতে কোণাগ্রন্থ ইখারুলএক কোমল বলল মদমত
উজ্জল, যাহাতে সুসুন্দর স্রাসি অকল্পিত অবিবল
মণিরা রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবন্ধ আছে,
তাহা অর্থাৎ পুস্ত্রকর্ণক পরিচুসিত হইল না !

লিখিয়া দিল। স্বর্য়ামুখী ঔষধ খাওয়া-
ইতে গেলেন; নগেন্দ্র সিন্ধি হাতে লইয়া
পড়িয়া দেখিয়া একটা বিভ্রালকে নিসি
ছুড়িয়া মারিলেন—বিভ্রাল পলাইয়া
গেল—ঔষধ ভাঙ্গার লাজ দিয়া গড়া-
ইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

স্বর্য়ামুখী বলিলেন, “ঔষধ না খাও—
তোমার কি অসুখ, আমাকে বল?”

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কি
অসুখ?”

স্বর্য়ামুখী বলিলেন, “তোমার শরীর
দেখ দেখি কি হইয়াছে?” এই বলিয়া
স্বর্য়ামুখী এক খানি দর্পণ আনিয়া নিকটে
ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে
দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।
দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

স্বর্য়ামুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল।
দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া উ-
চ্চিয়া গেলেন। বহির্লীকী গিয়া এক জন
ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন।
সে প্রহার স্বর্য়ামুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতি পূর্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতল-
সুভাব ছিলেন। এখন কথায় বর্ণ রাগ।

শুণু রাগ নয়। এক দিন, রাতে আ-
হারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি
নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। স্বর্য়ামুখী
প্রতীক্কা করিয়া বসিয়া আছেন।
অনেক রাজি হইল। অনেক রাজে নগেন্দ্র
আসিলেন; স্বর্য়ামুখী দেখিয়া বিস্মিত
হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু
আরক্ত; নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন।
নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না।
দেখিয়া স্বর্য়ামুখী বিস্মিত হইলেন।

দেই অবধি প্রত্যহ এক্রপ হইতে লা-

গিল। এক দিন স্বর্য়ামুখী, নগেন্দ্রের
ছুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদগ্ধ কোন
রূপে রক্ত করিয়া, অনেক অশ্রু নয় করি-
লেন; বলিলেন “কেবল আমার অসু-
রোধে, ইহা ভাণ কর।” নগেন্দ্র জি-
জ্ঞাসা করিলেন, “কি দোষ?”

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হ-
ইল। তথাপি স্বর্য়ামুখী উত্তর করিলেন,
“দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না।
তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি
না। কেবল আমার অসুখের।”

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, “স্বর্য়ামুখি,
আমি মাতাল। মাতালকে প্রত্কা হয়,
আমাকে প্রত্কা করিও। নচেৎ আবশ্যক
করে না।”

স্বর্য়ামুখী ঘরের বাহিরে গেলেন।
ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে
আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতীক্কা
করিয়াছিলেন।

দেওয়ান জী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,
“মাঠাঙ্গুরানীকে বলিও—বিষয় গেল,
আর থাকে না।”

“কেন?”

“বাবু কিছু দেখেন না। মদর মফ-
স্বলের আমলা যাহা ইচ্ছা তাহা করি-
তেছে। কর্তার অমনোযোগে আমাকে
কেহ মাদনে।” শুনিয়া স্বর্য়ামুখী
বলিলেন, “স্বাধার বিষয়, তিনি রাখেন,
ধাকবিলে। না হয়, গেল গেলই। আমি
আপনার বিষয় রাখিতে পারিলে বাঁচি।”

ইতি পূর্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বা-
বধান করিতেন।

এক দিন তিন চারি হাজার প্রজা
নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় ঘোড়-

হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। “দো-
হাই হজুর—নাএব গোমস্তার দৌরায়ে
আঁর বাঁচি না। সর্ব্বশ্ব কাড়িয়া লইল।
আপনি না রাখিলে কে রাখে?”

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, “সব হাঁকা
দেও।”

ইতি পূর্বে তাঁহার এক জন গোমস্তা
এক জন প্রজাকে মারিয়া একটা টাকা
লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন
হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়া-
ছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন,
“তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করি-
তেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না।
তোমার পত্র ত পাই-ই না। যদি পাই,
ত সে ছত্র ছই, তাহার মানে মাতা যুও
কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে
না। তুমি কি আমার উপর রাগ করি-
য়াছ? তা বল না কেন? মোকদ্দমা
হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর
কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ
কি না বল।”

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, “আমার
উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে
হাইতেছি।”

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে-
বলিলেন; “কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধু বি-
চ্ছেদ? দেবজ, দত্ত? না কিছুই নয়—এ
প্রথম?”

কমলমণি স্বর্য়ামুখীর আর একখানি
পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই, “এক
বার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি
বই আর আমার স্বপ্নই কেহ নাই। এক
বার এসো।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
মহানিমন্ত্র।

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি
থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণী-
রত্ন। অননি বামির কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের
আয় ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতে
ছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া
এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরাজি
সংবাদ পত্রখানি অধিকার করিয়াছিল।
সতীশচন্দ্র সংবাদপত্র খানি প্রথমে ভো-
জনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে
কৃতকার্য হইতে না পারিয়া একদল পা-
তিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি বামির নিকটে গিয়া গলগ্র
কৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম ক-
রিলেন। এবং করবোড় করিয়া কহিলেন,
“সেলান পৌছে মহারাজ!”
(ইতিপূর্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকা-
রির যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, “আবার শশা
চুরি নাকি?”

ক। “শশা! কাঁড় নয়। এবার রত্ন
ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।”

শ্রী। “কোথায় কি চুরি হলো?”

ক। “গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদার
একটি সোণার কোঁটায় এক কড়া কাণা
কড়ি ছিল, তাই কে নিয়ে গিয়েছে।”

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,
“তোমার দাদার সোণার কোঁটা ত স্বর্য়ামুখী—কাণা কড়ি টিকি?”

ক। “স্বর্য়ামুখীর কড়ি খানি।”

শ্রী। “তাই লোকে বলে যে, যে খেলে
সে কাণা কড়িতে খেলে। স্বর্য়ামুখী ঐ

কাণা কড়িতেই তোমার শ্বাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই তোমার হাত ছাড়া হলো। তা কাণা কড়িট চুরি করলে কে?”

ক। “তুমি জানি না—কিন্তু তার পত্র পত্রিয়া বুঝিলাস যে সে কাণা কড়িট খোঁওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগি এমন পত্র লিখবে কেন?”

শ্রী। “পত্রখানি দেখিতে পাই?”

“কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হস্তে স্বর্গমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, “এই পত্র। স্বর্গমুখী তোমাকে এসকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না রহিলে, ততক্ষণ আমার প্রাণ থাকিবেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে, আমার আহার নিদ্রা হবে না—ব্রূণী রোগই বা উপস্থিত হয়।”

শ্রীশচন্দ্র পত্র চলে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, “যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না, কথাটা কি তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল?”

ক। “করিতে হবে এই—স্বর্গমুখীর বুদ্ধি হুঁই গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি বা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মানী লিখে পাঠিয়েছে।”

সতীশবাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুল সমেত উলটাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, “উপযুক্ত বুদ্ধিমানা বটে। তা যা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাস—আজের বাড়া

মশাইয়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই স্বতন্ত্র কমলমণিও যাবে। আর স্বর্গমুখীর কাণা কড়িট না হারালে আর এমন কথা লিখবে কেন?”

ক। “সুখ কি তাই। সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ, আর তোমার নিমন্ত্রণ।”

শ্রী। “আমার নিমন্ত্রণ কেন?”

ক। “আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যাব কে?”

শ্রী। “এ স্বর্গমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বিবাহের জন্য যদি ঠাহুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি ছুঁদনের জন্য একটা ঠাহুর জামাই দেখিয়া দিতে পারি।”

কমলমণির বড় রাগ হইল। তিনি জবুটি করিলেন, শ্রীশচন্দ্র ভেদাইলেন, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজ খানায় লিখিত ছিলেন, তা ছাড়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, “তা লাগতে এসো কেন?”

কমলমণি ক্রুদ্ধি কোপ সহকারে কহিলেন, “আমার খুশি, লাগবো।”

শ্রীশচন্দ্রও ক্রুদ্ধি কোপ সহকারে কহিলেন, “আমার খুশি বলবো।”

তখন কোপযুক্ত কমলমণি শ্রীশকে একটি ফুল দেখাইলেন। বৃন্দদত্তে ক্ষণের টপিয়া, ছোট হাতে একটি ছোট ফুল দেখাইলেন।

কি দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়াছিলেন। তখন বক্তিত রোবো কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রাগে শ্রীশচন্দ্র ক্রতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুষন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুষন করিলেন।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় ক্রোধিত জন্মিল। তিনি জানিষ্টেন যে মুখচুষন ঠাহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জার ধরিয়া কাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া উঠেঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কণ্ঠে কিম্বদন্তি বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ফোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি বড় মুখচুষন করিলেন। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলমণির ফোড় হইতে তাহাকে লইলেন, এবং ভূরি বড় মুখচুষন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া, যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার স্মরণার্থ পেন্সিলট দেখিতে পাইয়া পূর্বহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্সিলট মুখে দিয়া লেহন করিতে প্ররক্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে ভগদত্ত এবং অর্জুনকে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জুনপ্রতি অনিবার্য বৈক্যবান্ন নিক্ষেপ করেন; অর্জুনকে তরবারে প্রদম্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই সেতু গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেই রূপ, কমলমণিও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষয় বুজিল, সতীশচন্দ্র মহান্ত সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের একরূপ শাস্তিগ্রহ

বাদলের বৃষ্টি, মত—দণ্ডে হইত, দণ্ডে হইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, “তা সত্য, সম্ভাবি কি তোমার গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি একাকারে?”

ক। “তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধুতেছি। জ্বামিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাপ, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেবি কর ত, সতীশে আমাতে ছদ্মগে লুজনে কীদেত বসবো।”

শ্রী। “আমি যাই কি একাকারে? আমাদের এই তিনি কিনাবার সময়। তুমি তবে একা যাবে।”

ক। “আয়, সতীশ! আয়, আনরা লুজনে ছদ্মগে কীদেত বসি।”

মার আদরের ডাক সতীশের কানে গেল—সতীশ অমনি পেন্সিলভোজন ভাগ করিয়া লহর তুলিয়া আলাদার হাসি হাসিল। স্বতন্ত্র কমলমণির এবার কীদা হলো না। তৎপরিবর্তে সতীশের মুখচুষন করিলেন—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনাব বাহাছরি দেখিয়া আর এক লক্ষ তুলিয়া হাসিল। এই সকল রহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে, কমল আবার কহিলেন,—

“এখন কি হুসুম হয়?”

শ্রী। “ভূমি যাও, মানা কর না। কিন্তু তিসির সৌম্যগাঁও আমি কি একাকারে যাই?”

শুনিয়া, কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথ কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কদম লইয়া পশ্চাৎ হইতে

গিয়া কমলের কপালে একটি টীপ কাটি দিলেন।

• তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক, আমি তোমায় শ্রুত ভাল বাসি।” এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা বেঁধেন করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলে, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এই রূপে এবারকার যুদ্ধ জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, “যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দবস্ত করিয়া দাও।”

কি। “কিরিবে করে?”

ত। “জিজ্ঞাস্য করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?”

• শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমার নিশ্চিত সহ্যদ রাখি যে সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা ভিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হোসের কর্তৃত্বাধীনা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে সে শ্রীশ বাবুর ইচ্ছা। তিনি ঐ সময়টুকু কাজ করিতে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। একথা শ্রীশচন্দ্র এক দিন শুনিয়া বলিলেন, “হবেই ত! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।”

শ্রোতার শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, “ছি! বড় দ্রুত।” কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃৎকম্পে ভূত। দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে, ভাল করিয়া আহারের উপদেষ্টা কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।”

জয়োদশ পরিচ্ছেদ।
ধরা পড়িল।

গোবিন্দপুরে দণ্ডভিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসি মুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী বেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, “ছুটে ফুল গুঁজিয়া দিব?” সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। “না! না!” বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া ছুটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, “দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাতায় ফুল পরে।”

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখ-মণ্ডলের মেঘের ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি চিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, “কমল কোথা থেকে?” কমল, মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মাঝেবের মত বলিলেন “আজ্ঞে, খোঁকা ধরিয়া আনিলাম।” নগেন্দ্র বলিলেন, “বটে! মার পাঞ্জি কে!” এই বলিয়া খোঁকাকে কোলে হইয়া দণ্ডমুগ্ধ ভাষায় মুখচুম্বন করিলেন। খোঁকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর পোঁপ ধরিয়া টানিল।

• কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐ রূপ আলাপ হইল “ওলো হুঁদী—হুঁদী হুঁদী হুঁদী—ভাল আছি ত হুঁদী?”

হুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভারি-চিন্তিয়া বলিল, “আছি।”

“আছি দিদি—আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ ত খুঁসিয়া থাকিবি আর ভোর

চুলে আগুন ধরিয়া দিব। আর নহিলে গায়ে আরমুলো ছাড়িয়া দিব।”

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি, চিরশ্রমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহারে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা হুতন হইয়া রুদ্ধ পাইতে লাগিল।

প্রথম গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি আশির গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সূর্য্যমুখী বলিলেন, “না ভাই! আর ছুদিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সবল কথা বলাও সোয়াস্তি।” কমল বলিলেন, “তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।” সূর্য্যমুখী বলিলেন “আমার কি কাজ করিবে!” কমলমণি মুখে বলিলেন “তোমার প্রাক,” মনেই বলিলেন, “তোমার কটকোদ্ধার।”

কুন্দনন্দিনী কমলের বাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। কুন্দনন্দিনী বালিশে—মাতা দিয়া কাদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাতা ভুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার

চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছুদি কাদিতেছিল কেন?”

“কুন্দ বলিল, “ভুনি যাবে কেন?” কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু কোঁটা ছুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

কমলমণি বলিলেন, “তাতে কঁদিস্ কেন?”

কুন্দ। “তুমিই আমায় ভাল বাস।” কম। “কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না?”

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল। কম। “কে ভাল বাসে না? বড় ভাল বাসে না—না? আমায়, লুকুসনে।” কুন্দ নীরব।

কমল। “দাদা ভাল বাসে না?” কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, “যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?”

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, “যাবে?”

কুন্দ খান্দা নাড়িল। “যাও না।”

কমলের প্রকৃত মুখ গভীর হইল। মনে মনে ভাবিলেন, “ভাল কথা নয়। ইটটি মারিলেই পাটিখেলটি খেতে হয়। দাদা ইট খেয়েছেন—হুঁড়ি পাটিখেল খেয়ে বসে আছে। আমার শ্রীশচন্দ্র মজবুরী কাছে নাই—নাহাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি?”

তখন, কমলমণি সঙ্গেহে কুন্দনন্দিনীর

মস্তক বঁকে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সুস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “কুম্ভ, সত্য বলিবি?”

কুম্ভ বলিল “কি?”

কমল বলিলেন, “যা স্ক্রিজাস করিব? আমি তোরা দিদি—আমি তোকে বোনের মত ভাল বাসি—আমার কাছে লুকুনে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।” কমল মনে মনে রাখিলেন, “যদি বলিতে রাজমন্ত্রী খ্রীশ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।”

কুম্ভ বলিলেন, “কি বল?”

ক। “তুই দাদাকে বড় ভাল বাসিস।—না?”

কুম্ভ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয় মধ্যে মুখ লুকুইয়া কাদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, “বুঝিয়াছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সন্দেহ অনেক মরে যে?”

কুম্ভমণিনি মস্তকোত্তলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, “পোড়ারমুখী চোকের মাতা খেয়েছে? দেখিতে প্রভুনা যে দাদা তোকে ভাল বাসে?”

বুঝিয়া সেই উত্তর মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পাড়িল। কুম্ভমণিনির অশ্রুজলে—কমলমণির হৃদয় ধ্রাবিত হইল। কুম্ভমণিনি অনেক কণ নীরবে কাদিল—বালিকার ন্যায় বিবশ। হইয়া কাদিল। সে কাদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃ-

করণ মধ্যে, কুম্ভমণিনির হৃৎথে, দুইখী, স্বথে স্বখী হইল। কুম্ভমণিনির চক্ষু মুছিয়া কহিল, “কুম্ভ?”

কুম্ভ আবার মাতা তুলিয়া চাহিল। ক। “আমার সঙ্গে চল।”

কুম্ভের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল,

“নহিলে নয়। চক্ষুর আড়াল হইলে, দাদাও জুলিবে, তুইও জুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছার-খার গেল।”

কুম্ভ কান্দিতে লাগিল। কমল বলিলেন, “যাবি? মনে করিয়া দেখ—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?”

কুম্ভ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “যাব।”

অনেকক্ষণ পরে কেন? কমল তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, কুম্ভমণিনি পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনাতর প্রাণের প্রাণ বলি দিল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনাতর মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে কুম্ভমণিনি আপনাতর মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

হীরা।

এমত সময় হরিদাসী বৈকুণ্ঠী আসিয়া গান করিল।

“কাঁটা বনে তুলেও গেলাম কলঙ্কের জল, গো মখি, কালকুলঙ্কের জল।

মাথায় পরেলাম মালা ধোঁখে, কাণে পরেলাম হুল।

মখি কলঙ্কের জল।”

(১) রাণিকী শঙ্করা—আজ যেমটা।

এ দিন সূর্যামুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুম্ভকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈকুণ্ঠী প্রায়তে লাগিল।

“মরি মরব কাঁটা ফটে, মুলের মধু খব লুটে, খুঁজে বেড়াই কোথায় ফটে, নবীন মুল্ল।”

কমলমণি জড়ঙ্গী করিয়া বলিলেন, “বৈকুণ্ঠী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?”

হরিদাসী বলিল, “কেন?” কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, “কেন? একটা বাবলার ডাল আনত রে—কাঁটা ফোটা কত স্বথ মাগিকে দেখিয়ে দিই।”

সূর্যামুখী মুহূর্ত্তে হরিদাসীকে বলিল, “ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—বৃহস্পতি ডাল গান গাও।”

হরিদাসী বলিল “আচ্ছা” বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল, “মুতিশাল্য পড়ব আমি ভট্টাচার্য্যের পাতে ধোঁরে।

ধর্ম্যধর্ম শিখে নিব, কোন বেটী বা নিন্দে করে।”

কমল জুটুকি করিয়া বলিলেন, “ভাই, বউ—তোমার প্ররতি হয়, সোণার বৈকুণ্ঠীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্যামুখীও মুখ অগ্রসর করিয়া উঠিয়া গেলেন। আরও স্ত্রী লোকের আপনুৎ প্ররতিমতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুম্ভমণিনি রহিল। তাহার কারণ, কুম্ভমণিনি গানের মর্ম কিছুই

বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্য মনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেই থানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এ দিক সেদিক বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুম্ভ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সম্ভেদ। তখন কুম্ভকে বিরলে পাওয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুম্ভ কতক বা শুনিলা; কতক বা শুনিলা না।

সূর্যামুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথা বার্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্যামুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, “কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না।

মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।”

সূর্য। “মেয়ে কি পুরুষ তার চিক কি?”

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সে কি?”

সূর্য। “আমর বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই আমি—কিন্তু কুম্ভ কি পাঠি।”

কমল। “রসো? আমি একটা বাবলার ডাল আনি। নিম্নে কটাটা ফোটার স্বথটা দেখাই।” এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেল। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দুরকোটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—এই সিন্দুর লইয়া, পোপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পোপের বিলম্ব করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈকুণ্ঠী বাবলার ডাল

কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ছুলিয়া গেলেন।
তখন স্বর্গামুখী হীরা দাসীকে ডাকা
ইলেন।

‘হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে’।
তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।
মুগ্ধব্রত এবং তাঁহার পিতার বিশেষ
যত্ন ছিল যে গৃহের পরিচারিকারি বিশেষ
সম্ভ্রমভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উ-
ভয়েই পর্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া,
একটু ভয় ঘরের স্ত্রী লোকগণকে দাসীদে
নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাঠতেন। তাঁহা-
দিগের গৃহে পরিচারিকারি স্মৃতি ও স-
ম্মান থাকিত, স্বতরাং অনেক দরিদ্র-
ব্রত ভয় লোকের কন্যারা তাঁহাদের
দাম্যস্তিক স্বীকার করিত। এই একার
বাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা
প্রধান। অনেকগুলিন পরিচারিকা
কায়স্থ কন্যা—হীরণ্ড কায়স্থ। নগেন্দ্রের
পিতা হীরার মাতামহীকে প্রায়শ্চর্য্য হই-
তে আয়তন করেন। প্রথমে তাহার
মাতামহীই পরিচর্য্যা নিযুক্ত হইয়া-
ছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর
সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থ
হইলে প্রাচীন দাসিগণের ভোগ করিয়া
আপন সক্ষমত ধনে একটি সামান্য ঘৃহ
নির্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল
—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্ররত্ত
হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর।
বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক-
্ষা করিত। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে
এবং চরিত্রগুণে প্রায় দাসী মধ্যে শ্রেষ্ঠা
বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে

পরিচিত। কেহ কখন তাহার ধামির কোন
প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও
কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা
অত্যন্ত মুখুরা, সধবার ন্যায় বেশধি-
ন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসের বিশেষ
প্রিয় ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শা-
নাক্ষী, পদ্মপল্লবলোচনা। দেখিতে
স্বর্ধ্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘ ঢাকা
চাঁদ; চুল গুলি যেন সাপ কণা ধারিয়া
ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে বসে
গান করে; দাসীতে দাসীতে বকড়া
বাধাইয়া তামাসা দেহে; পাচিহাকে
অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবা-
হের আদ্যকার করিতে শিখাইয়া দেয়;
কাহাকে নিম্নিত দেখিলে চুপ কালি দিয়া
সং সাঝায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা
ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া
রাখি হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই
চুরি করে।

স্বর্গামুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন,
‘এ বৈষ্ণবীকে চিনিস?’

হীরা। ‘না। আমি কখন পাড়ার
বাহির হই না—আমি বৈষ্ণব ভিখারী
কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের
ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। কল্পনা কি শী-
তলা জানিতে পারে?’

হু। ‘এ ঠাকুর বাড়ির বৈষ্ণবী নয়।
এ বৈষ্ণবী কে, তাকে জানতে হবে।
এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা
কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাব
বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক
জেনে এসে বলিতে পারিস তবে তোকে

মুতন বাণারসী পরাইয়া সং দেখিতে
পাঠাইয়া দিব।”

মুতন বাণারসীর কথা শুনিয়া হীরার
পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, ‘ক-
খন জানিতে যেতে হবে?’

স্বর্ধা। ‘তোরা যখন খুসি। কিন্তু এখন
ওর পাছুর না গেলে চিকানা পাবনা।’

হীরা। ‘আচ্ছা!’
স্বর্ধা। ‘কিন্তু দেখিস যেন বৈষ্ণবী কিছু
বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বু-
ঝিতে না পারে।’

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল।
স্বর্গামুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব
বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসী হইলেন।
হীরাকে বলিলেন, ‘আর পারিস ত
মাগীকে—ছুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে
দিবে আসিস।’

হীরা বলিল, ‘সব পারিব, কিন্তু শুধু
ঢাকাই নিবনা।’

হু। ‘কি নিবি?’

কমল বলিল ‘ও একটি বর চায়।
ওর একটি বিয়ে দাও।’

হু। ‘আচ্ছা তাই হবে—ঠাকুরজা-
নাহকে মনে ধরে? বল—তা হলে কমল
স্বাক্ষর করে।’

হী। ‘তবে দেখবো। কিন্তু আমার
মনের মত ঘরে একটি বর আছে।’

হু। ‘কে লো?’

হী। ‘যম।’

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
‘না।’

সেই দিন প্রদায় কালে, উদ্যান, স-
ধ্যস্ত বাপীতে বসিয়া, কুন্দনন্দিনী। এই
দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃত; তাহার জল

অতি পরিষ্কার, এবং সর্দনা নীলপ্রভ।
পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্ক-
রিণীর পশ্চাতে পুষ্কোদ্যান। পুষ্কো-
দ্যান মধ্যে এক খেতপ্রান্তর চিত্তবিন্ধ-
লভাসম্পন্ন ছিল। সেই লভাসম্পদের
সম্মুখেই, পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার
সোপান। সোপান প্রান্তরবৎ ইচ্ছাকে নি-
শ্চিন্ত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তা-
হার দুই ধারে, দুইটি বহুকুলের বড় ব-
হুকুল গাছ। সেই বহুকুলের তলায়, স্রো-
তানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্র-
দোবে একাকিনী বসিয়া, স্বচ্ছস্রোতের হৃ-
দয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদি সহিত আকা-
শ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।
কোথাও কতকগুলিন নাল ফুল অন্ধকারে
অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার
অপর তিন পাশে, আড়, বাঁ, ডান, জাম,
লেবু, বাঁহু, নারিকেল, কুম্ভ, বেল, প্র-
ভৃতি ফলবান ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ
হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ণ প্রাচীরবৎ
দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিত তাহার শা-
খায় বসিয়া মড়াড় পাখি বিকট রব
করিয়া স্রোতবরের শব্দহীনতা ভঙ্গ করি-
তেছিল। শীতল বায়ু, স্রোতবর প্লাব
হইয়া, ইন্দ্রাবরকাকরকে ঈষৎমাত্র বিধৃত
করিয়া, আকাশচিত্রকে রূপসমূহ রূপিত
করিয়া, কুন্দনন্দিনীর শিরঃ বহুলগদ-
মালায় সর্ধরশব্দ করিতেছিল। এবং নি-
দাশব্রুত বহুল পুষ্কোর গন্ধ চারি
দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল—বহুল পুষ্ক-
সিক নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং
চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ
হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যুক্তিকা, এবং
কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারি-

দিগে, অন্ধকারে, খন্দোতমালা স্বহৃদ-
বির উপর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফটি-
শেছে, নিবর্তিতেছে। দুই একটা বাজড়
ঝাঁকিতেছে, দুই একটা শৃগাল অর্থা
পশু ওড়াইবার তাহারিগের যে শব্দ
সেই শব্দ করিতেছে—দুই এক শব্দ
সেই আকাশে পথ্য হারাইয়া বেড়াই-
তেছে—দুই একটা তারার মনের চক্রে
খলিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের
চক্রে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবি-
তেছেন? এইরূপ। “ভাল, সবাই আগে
মলো-না মলো, দাদা মলো, বাবা মলো,
আমি মলেন না কেন? যদি না মলেন
ত এখানে এন্না মলেন কেন?” ভাল, মাছ
কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?” পিতার পরলোক
যাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল,
কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না।
কখন মনে হইত না; এখনও তাহা
মনে হইল না। কেবল আত্মসমাজ মনে
আসিল। এই মাত্র মনে হইল, যেন সে
কবে মাতাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার
মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়া-
ছিলেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, “ভাল,
মাছের মরিগে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে
ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হয়েছেন?
তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্র গুলি? ঐটি?
না ঐটি? কোন্টি? কে? কেমন করিয়া
জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায়
ত দেখিতে পেতেছেন? আমি যে এত
কাঁদি। তা দুই হউক ও আর ভাবনা না
বড় কাণা পায়। কেঁদে কি হবে? আ-
মার ত কপালে কোমাই আছে—ন-
ছিলে মা—আবার ঐ কথা! দুই হউক—
‘ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া!

জলে ডুবিয়া? বেশ ত? মরিলে নক্ষত্র
হব—তা হলে—হব ত? দেখিতে পাব
—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে?
কাকে, মুখে বলিতে পারিলেন কি? আচ্ছা
নাম মুখে আনিতে পারিলেন কেন?
এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে
না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই
—মনের সাথে বলি করি। ন—
নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র,
নগেন্দ্র, নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার
নগেন্দ্র! আ মলো! আমার নগেন্দ্র?
আমি কি? স্বর্ঘ্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই
নাম করিতেছি—হলেন কি? আচ্ছা
—স্বর্ঘ্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি
আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—জুইই
মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলেন—কাল
ভেসে উঠে—তবে সবাই শুনে, শুনে
নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র
—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র!
নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা
হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিত
রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন,
ত বিধে যেতে মরিতে পারি? কি বিধ
থাবে? বিধ কোথা পাব—কে আমায়
এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব
কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার
আকাশে ডরিয়া মনে করি—তিনি আ-
মায় ডাল বাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি
সত্য! কমল দিগন্তে বলিল—কিন্তু কমল
জানিল কি? আমি গোড়ার মুখী
জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল
বাসেন? কি সে ভাল বাসেন? কি দেখে
ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?”
(এই বলিয়া কালমুখী সজ্জ সরোবরে

আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু
কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব-
স্থানে আসিয়া বলিল। “দূর হউক
যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে
স্বর্ঘ্যমুখী স্বন্দর, আমার চেয়ে হরমণি
স্বন্দর; বিশু স্বন্দর; মুক্ত স্বন্দর; চন্দ্র
স্বন্দর; প্রসন্ন স্বন্দর; বামা স্বন্দর; প্র-
মদা স্বন্দর; আমার চেয়ে হীরা দামীও
স্বন্দর। হীরাও আমার চেয়ে স্বন্দর?
হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার
চেয়ে স্বন্দর। তা রূপ ত গোলাই গেল—
গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—
কই, মনে ত হয় না। কমলের মন
রাখা কথা—আমায় কেন ভাল বাসি-
বেন? তা, কমল মন রাখা কথা বলবে
কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ
কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছেই কথাই
ভাবি। ‘মিছে কথা’কে সত্য বলিয়া
ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে
যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে
পাব না যে। আমি যেতে পারব না।
পারব না—পারব না। তা না গিয়াই
বাকি করি? যদি ‘কমলের কথা সত্য,
তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে,
তাদের ত অস্বখী করিতেছি। স্বর্ঘ্য-
মুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি।
সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই
আমায় যেতে হবে। তা পারিব না।
গেঁবে ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা
ঠোঁ! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার
জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে?”

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁ-
দিত লাগিল। সহসা, অন্ধকার গৃহে
প্রদীপ জ্বালায় ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন

রাস্তা সম্পট মনে পড়িল। কুন্দ তখন
বিদ্যাসম্পটকার ন্যায় গাভোথান করিল।
“আমি সকল জুলিয়া গিয়াছি—আমি
কেন জুলিয়া য়? মা আমাকে দেখা-
দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লি-
খন জানিতে পারিয়া আমাকে ঐ নক্ষত্র
লোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি
কেন তাঁর কথা শুনলেন না—আমি
কেন থেলেম না—আমি কেন মলেন
না! আমি এখনও বলি করিতেছি
কেন?” আমি এখনও মরিতেছি না
কেন? আমি এখনই মরিব।” এই
ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর
সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ
নিভান্ত অবলা—নিভান্ত জীর্ণভাবস-
ম্পন্ন—প্রতি পদাৰ্পণে ভয় পাইতে ছিল
—প্রতি পদাৰ্পণে তাহার অঙ্গ শিহরি-
তেছিল। তথাপি অশ্রুজিত সংকল্পে
সে মাতার আঁখি পালনার্ণ ধীরে ধীরে
যাইতেছিল। এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে
কে অতি ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি
স্পর্শ করিল। বলিল, “হৃদয়!” কুন্দ
দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবা স্নাত
চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর
মরা হলোনা।

আর নগেন্দ্র? এই কিতোমার এত
কালের স্বচরিত্র! এই কিতোমার এত
কালের শিক্ষা! এই কিতোমার স্বর্ঘ্য-
মুখীর আর্পণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি
ছি! দেখ, তুমি চোর! তুমি চোরের
অপেক্ষায়ও ছি। চোর স্বর্ঘ্যমুখীর কি
করিত? তাহার স্বর্ঘ্য চুরি করিত,
অর্থ হানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার
প্রাণ হানি করিত আসিয়াছ। চো-

রকে স্বর্গ্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই ; তবু সে চুরি করিলে চোর হয় । আর সর্গ্যমুখী তোমাকে সর্গ্য দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসি- য়াছ ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয় । যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর !

আর ছি ! ছি ! কুন্দনন্দিনি ! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন ? ছি ! ছি ! কুন্দনন্দিনি—! চোরের কথা শুনিয়া তোমার পাঁচো কাঁটা দিল কেন ? কুন্দনন্দিনি—দেখ ! পুঙ্খরিণী জল পরি-ষ্কার, স্নানীতল, স্বাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারী কাঁপিতেছে । ডুবিবে ? ডুবিয়া মর না ? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না ।

চোর বলিল, “কুন্দ ! কালিকাকাতার বাইতে ?”

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না ।

চোর বলিল, “কুন্দ ! ইচ্ছাপূর্বক বাইতেছে ?

ইচ্ছাপূর্বক ! হরি, হরি ! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না ।

কুন্দ—কাঁদিতেছে কেন ?” কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল ! তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,

“শুন কুন্দ ! আমি বহুকষ্টে এত দিন নড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারি-লাম না । কি কষ্টে যে পাঁচিয়াছিলাম

তাঁহা বলিতে পারি না । আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হই-য়াছি । ইতর হইয়াছি । মদ্যপ হইয়াছি । আর পারি না । তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না । শুন কুন্দ ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তো-মাকে বিবাহ করিব । তুমি বলিলেই বিবাহ করি ।”

কুন্দ এবার কথা কহিল । বলিল “না !” আবার নগেন্দ্র বলিল, “কেন কুন্দ ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র ?” কুন্দ আ-বার বলিল “না !”

নগেন্দ্র বলিল, “তবে না কেন ? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না ? আমায় ভাল বাসিবে কি না ?”

কুন্দ বলিল, “না !”

তখন নগেন্দ্র যেন সহজ মুখে, অপ-রিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্মভেদী কত কথা বলিলেন । কুন্দ বলিল “না !”

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন পুঙ্খ-রিণী নির্মল, স্নানীতল—কুম্মবাসস্থবা-সিত—পবন হিল্লোলে তন্মধ্যে তারী কাঁপিতেছে—ভাবিলেন “উহার মধ্যে শয়ন কেমন ?”

অন্তরীক্ষে কুন্দ বলিতে লাগিল “না !” বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে । তাহার জন্য নয় ! তবে ডুবিয়া মরিল না কেন ? স্বচ্ছ • বারি—স্নানীতল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন ?

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব ।

প্রথম সংখ্যা ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন । প্রাচীন রোসক এবং গ্রীকগণ পুরাতত্ত্ব রচনায় অতীত নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু হিন্দুরা কাব্য-প্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমূহ অ-লৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সার ভাগ উদ্ধৃত করা দূরপারাহত । ইতিহাস নিচয় গদ্যে রচ-না করাই বিষয় । পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূ-ষিত করিতে হয়, স্বতরাং তাহা অ-ভুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে । হিন্দু-রা অভিনিয়, চরিত্রসাধন, ইতিহাস, প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকের রচনা করিয়া গিয়াছেন । গদ্যে যে সকল বিষয় সর্গসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না । পুরাণনিয়ম আমাদিগের প্রাচীন ভা-রতবর্ষের ইতিহাস । তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাপ্পনিক বিবরণে পরি-পূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুগাছ মতা, পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের গুরুত্ব মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্র-যুক্ত, তাহাতে কোন একারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই । হিন্দুরা প্রকৃত ইতি-হাস রচনা প্রবালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর, ও গুণ্ডিতগণের জীবন চিত্রিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই । চৈ-

তন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গোড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কণ্ঠ-শত বৎসর হইল বর্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবন চরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি ।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও “সাম্রাট্‌সার ধরনীশ্ব-রের অধীশ্বর” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বেদবাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজী বিকটোরিয়া ও ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না ।

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা ক-রিতে হইলে, প্রথমে ঋগ্বেদসংহিতার উল্লেখ করা কর্তব্য । ঋগ্বেদের নায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূষণ্ডলে নাই । বেদে মানব-জাতির রচনাকর্ম প্রথম প্রকৃতি হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্বেদ চতু-র্গুণ স্বাক্ষর রচিত বলিয়া যথোচিত স-ম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই অর্ধদশ দেশোক্ত বর্গসাম্রাজ্যদর্শী মহামহোপা-ধ্যায়গণ একবারে বেদাধ্যয়নে জীবন অতি-বাহিত করিতেছেন । ঐবদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—কুন্দ—মন্ত্র—ব্রাহ্মণ এবং সুহ । ইউরোপীয় ভাষান্তরিত মাক্সমুলার স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দে ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ

* জয় ভারত । কদাচিত্তাস : ১১২ খণ্ড । প্রীত-বিশ্ব কাঞ্চ দিয়াভূষণ প্রণীত । বোয়ালিয়া ও তদন্য-মধ্যে মুদ্রিত ।

১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্র ভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাঙ্গনার বিবিধ অস্ত্র, প্রোক্ত, এবং সূত্রভাগে বৈদ্য প্রকাশক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ ঋগ্বেদ নামে প্রসিদ্ধ—মন্ত্র ভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আখ্যোরা মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিবাসী দক্ষ্য, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি ক্লেশবর্ণ বর্ধরাজ্যাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীত—মহাস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সঘর নামক তাহাদিগের জৈবিক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরস্বখে পার্শ্বভূমি প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্য মালা অগ্নি, সংযোগদ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে কৃষি কার্য্য দ্বারা উদ্বার পোষণ করিতেন, এবং বে-

ছুইন আরবগণের ন্যায় দেশেই পর্য্যটন করিতেন। তাহাদিগের কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেঘ পালন ও পশুপালন তাহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং বৈদিক কার্য্য সমাধা করণাত্মক কিংবা অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বস্তুকল ৫-৬ গুণমাত্র পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ধরাজ্যের সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্মাণ আরম্ভ হইল। তাহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণ ঋষদপূর্ণ অরণ্যানী সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তম অষ্টক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে, ভূপ্রাণিজ ছীপবাসী কোন শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ তৎপূজ্য ভূজ্যকে সসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন; কিন্তু এবল ব্যতিক্রম পোত সমুদ্র বগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভূজ্য সহাক্ষে প্রাণধারণ করিয়া উপকুলে নীত হয়; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্বে পোত নির্মাণ কৌশল অবগত ছিলেন। তাহারা প্রথমে সপ্তসিন্দু অর্থাৎ গঙ্গার রাজ্যে বাস করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাহারা তথায় অবস্থিতি

করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্বাধিক বাত্মা করিয়াছিলেন; এই সময় তাহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্বং আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রাহ্মণ দেশে বাস করত মধ্যদেশান্তিত্যুৎখাত্মা করিলেন, এবং ক্রমেই ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার রক্ষি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, কষিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ভূষণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিধি সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্য শাসন প্রণালী কিছুই উভয়রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারত কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধরত্নাশু ও বজ্রাশ্বপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময়

হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাশ্রমে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন প্রণালী, শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের শত্ৰু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবাসগৃহ বর্ণিত, সকলোই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক, যবন, কাষোজ, পারদ, পুহ্লব, প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ সন্নিবিষ্ট ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পূর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে বোধ হইতেছে—

“ভীষ্ম দ্রোণকর্ণদীপ্তে কৈ জানিত সুদৃষ্টিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানেন।”

উষা ।

অদিতি নন্দিনী, উল্ল বিনোদিনী,
প্রহ্লাদ বন্দনা, মধুর ভামিনী,
আলোক রসনা; কুসুম মালিনী,
এস তুমি, দেবি, অবনীতলে,
হাসিতে হাসিতে, নহন ভগ্নিতে
আনন্দের ধারা ঢালিতে-ঢালিতে,
স্বর্গীয় সৌরভ শ্রীঅঙ্গ হইতে
বর্ষিতে বর্ষিতে করুণাবলে;

যথা স্বর্ণবরে নবীনা যুবতী,
রূপের আভার পুরিয়া জগতী,
চলে ধাতু তলে মৃদু মন্দ গতি,
নানা অলঙ্কার পরিয়া অঙ্গে;
কিন্ধা রে যেমতি পতির মিলনে
যায় রূপবতী সাধায়া বদনে,
নাড়াইয়া দেহ বিবিধ জ্বরণে,
ভাসিতে ভাসিতে সুখ তরঙ্গে;

অথবা যেরূপ সলিল হইতে
স্রোতাবর কুল শোভিতে শোভিতে,
উঠে একাকিনী সুন্দরী নিভুতে,
রম্যতরু কঠিন সরসী মানে;
কিন্ধা যথা আশা সাহস নন্দিনী,
অঙ্গের আলোকে উজ্জল হেরদীনী,
ধায় তাড়াইতে দুখের যামিনী,
মোহিতা সকলে মধুর গানে।

প্রণয়ের রাগে রঞ্জিত তপন,
মধুরতাম্র, গতেজ দর্শন,

ছুটে পিছে পিছে উৎসুক লোচন,
চুম্বিতে তোমার বিকট মুখে;
ভরসার ভরে আসিতা সন্মরে,
অঙ্ঘরে তোমার প্রেমানন্দে ধরে,
প্রাণের মিস্ত্র-হেমে ফলেবরে,
মিশ্র অমনি পরম সুখে।

৫
দেখেছ যদিও যুগ যুগান্তর,
অনন্ত যৌবনা তুমি নিরন্তর;
প্রতাহ নবীনা নববেশ ধর,
সাজাতে নিরন্ত নূতন অঙ্গ।
রাশি চক্রে ঘুরি উঠি প্রতি দিন,
দেখিতেছ ক্রমে কত জাতি ফলিণ,
কত বংশাবলী ক্রমশঃ বিলীন,
অবনী মণ্ডলে কালের রঙ্গ।

৬
বিচক্ষণ বুদ্ধি বৃদ্ধ শ্রেয়কেশ
কৃতান্ত করলে করিছে প্রবেশ;
উঠি তার স্থলে যুবক বীরেশ
নবদণ্ড ভরে পাগিছে ধরা;
যেও লুকাইছে কিছু দিন পরে,
তার পূর্বে আসি উঠিছে অপরে;
এই রূপে ভাসি কাল স্রোতোপরে
চলিছে বৈশম্য, যৌবন, জর।।

৭
প্রতাপে প্রমত্ত কত নরপতি
ভুলি জয়কেতু যুগ্মর সংঘতি,
সমরে অমর, কীর্তির সম্ভতি,
তোমার সমক্ষে পাইছে ক্ষয়;

বৃহৎ সাম্রাজ্য বীর-বিভূষিত
ধরনী মণ্ডল করিয়া কম্পিত
তোমার সম্মুখে কত বিগলিত,
হেরিতেছ তুমি কালের জয়।

৮
কিন্তু নারে কাল জিনিতে তোমারে,
আদি হৈতে তুমি আঁজ একাকারে,
হাসিতে হাসিতে প্রতাহ ধরারে
নব নব বেশ দিতেছ তুমি,
অমর মাদুরী, অচল যৌবনা,
নূতন বসনা, নূতন জুযগা,
নিরন্ত নবীনা, প্রহ্লাদ বদনা,
অটল-বিসল-লাবণ্য-জুমি।

৯
নক্ষত্র-কুসুম নীলাম্বর-শিরে,
শ্যামাকী যামিনী লুকাই অস্তির
তোমার প্রভার, যবে ধীরে ধীরে
উকি তুমি দাও উদয়ালয়ে।
ধরণীয়া দেহ করি পরিহার
পলাইয়া যায় ঘোর অন্ধকার,
নূতন সৌন্দর্য্য ছুটে অনিবার,
মুক যেন শশী রাছ-কবলে।

১০
জীবের জীবন তুমি অবনীতে;
তব আগমনে উঠে আচলিতে
মৃত্যু-সংহানরা-নিশ্বাস হইতে
জাগি জীব-কুল মুখ-হিলোলে।
বসি তরু-ডালে বিহঙ্গমগণে
সংগীত বরষে নিকুঞ্জে, কাননে;
মনের বাসনা পূরিতে যতনে
মিশে গিয়া লোকে কর্ম-কলোলে।

১১
অর্থের আকান্দ, পদের লালসা,
জয়ের প্রত্যাশা-প্রেরণের ভরসা,
কীর্তির কামনা, সড়মের ভূষা,
আনন্দের বাণী, ত্রিস্যানুরাগ,
এই রূপ কত বাসনার বশে,
মারার বাজারে নরগণ পশে,
জাগি উঠি সবে তোমার পরশে,
তব বাক্যে করি আলসা ত্যাগ।

১২
তোমার প্রসাদে ছুটে নববল,
উঠে কর্ম স্থলে করম সকল,
ছুটে কাম্যবনে আকান্দ কমল,
জগতে নূতন শোভা বিরাজে।
তোমার কৃপার করিতা উদিত,
মনোহর শিশু রঙ্গে বিকশিত;
বিজ্ঞান নির্যত নব পল্লবিত,
ধরম নূতন জুযগে সাজে।

১৩
উদয় অচলে উঠিতে উঠিতে
পুরাকালে তুমি পাইতে দেখিতে
উৎসুক উল্লাসে তোমার পূজিতে,
আমাদের পূর্ণ পুরুষগণ।
চাহি দেখ, দেবি, এখন আবার,
তোমার চরণে দিতে উপহার,
আনিয়াছে নব করিতার হার,
এই দীন দীন অধম জন।

১৪
পুরাকালে তুমি যেমন হাসিতে,
এখনো হাসিছে ভারত জুমিতে,
পুরাকালে যথা সৌন্দর্য্য বর্ষিতে,
এখনো বর্ষিছে প্রতাহ আসি।

এখনো তেমনি সুমধুর, স্বরে,
গায়, তব গুণ দিহর-নিকরে,
গাইত যেমন ভারত ভিতরে,
পুরাকালে সুখ সাগরে ভাসি।

১৫

সেই হিমালয় তুষার মণ্ডিত,
অলংঘ্য প্রাচীর উত্তরে শোভিত,
সেই সুখ-সিন্ধু পশ্চিমে বাহিত,
পুরাকালে যাহা দেখিতে তুমি।
এখনো তেমনি ভীষণ সাগর,
রুক্ষিতে দক্ষিণ দিক নিরন্তর,
পূর্বে ব্রহ্ম পুত্র তেমনি প্রবাহর,
পূর্বেতে তেমনি ফেরিতে তুমি।

১৬

পুরাকালে তুমি যেমন দেখিতে,
প্রকৃতি তেমনি আছে চারি ভিতে,

ভারত-নিবাসী আর্যগণ চিতে
নাহি কেন তবে পূর্বের বল?
কেন দীন-ভাবে পড়ি কর্মস্থলে,
অচেতন প্রায়, কি পাপের ফলে,
কি মিস্তার বশে, কি মায়ার বলে,
শুর-কুসোদিত হিন্দুর দল?

১৭

এ মুখ নিস্তেজ অবস্থা হইতে,
পারিবে গো উষা করে জাগাইতে,
পারিবে কি উষা কহু জাগাইতে,
বীর্যবান আর্য সম্মানগণে?
কবে ভারতের এ দুখ শরীরী,
হবে অবসান, হে সুরসুন্দরি?
পূর্বের মহিমা কখনো কি স্মরি,
ধাবে হিন্দুসুত কীর্তি মনে?

স্বভাবানুবর্তিতা।

মহুয্যাক্রান্তির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম এই যে,
স্বপ্ন কথাটি বুঝিতে পারিবার অগ্রে
স্বপ্ন কথার গুলি বুঝিয়া লয়। পরের
দ্রব্য অপহরণ করা অসুচিত, একথা সক-
লেই জানে, কিন্তু কি কারণে অসুচিত,
তাঁহা লইয়া অদ্যাপি অনেক বিতণ্ডা
চলিতেছে। প্রত্যহ “প্রাতে গৃহ মার্জনা
করাইবে, এবং আপনি দস্ত্র ধাবাদি
প্রান্তঃকৃত্য সমাধা করিবে”—যত বোকে
এই নিয়ম প্রতিপালন করে, তাঁহারা

সকলেই কিছু পরিষ্কার থাকার মাছায়া
বুঝিতে পারে না।

ফলতঃ সভাতার প্রথমাবস্থায় সামান্য
লোকে সদাচরণ করিবে, এ জন্য অনেক
নিয়ম নিবদ্ধ থাকে। তখন তাহারা সে
সকল নিয়মের নিগূঢ় মর্ম অজ্ঞত করি-
তে পারে না। দণ্ড কি লোকনিদ্দা
ভয়ে তাঁহা প্রতিপালন করিতে থাকে,
এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিরতির চালনা সহকারে
তাঁহার নিগূঢ় তাৎপর্য অহসন্ধানে

প্রবৃত্ত হয়। তখন, পরদ্রব্য অপহরণ করা
অন্যায়—পরকে আঘাত করা নিষিদ্ধ,
ইত্যাদি নিয়মের পরিবর্তে—পরের ক্ষতি
করা অন্যায়, ইত্যাকার ধারণাই প্রবল
হইয়া উঠে। তদ্রূপ প্রান্তঃকৃত্য সমা-
ধানের নিয়ম গুলি অভ্যস্ত হইলে ততঃ-
পরিবর্তে লোকে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে
চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

এই রূপে সভাতার উন্নতির সঙ্গেই
বহুসংখ্যক বিশেষ বিধির পরিবর্তে এক
একটা সাধারণ বিধি প্রচলিত হইয়া
উঠে। ইহাতে সমাজের সম্মল হয়, কারণ
যে সকল বিষয়ে বিশেষ বিধির অভাব
থাকে, সাধারণ বিধি প্রবল হইলে তাহা
দূরীকৃত হয়। বাহারা শৈল্পিক বিষয়
নিয়ম এত অভ্যাস করিয়াছে যে, শুচি
বায়ুগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়; এবং পরের
ক্ষতি সংক্রান্ত নিষেধ গুলিও যথার্থোপা-
য়ে মতে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাঁহা-
রাও একথাটি বুঝেনা যে জলপানার্থ-
অভিপ্রেত-পুষ্করিণীতে দেহ বস্ত্রাদি ধৌত
করা অন্যায়। এবিষয়ে বিশেষ-বিধি প্র-
চলিত না থাকাতো এই রূপ হইয়াছে।
স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান না জমিলে ইহার প্র-
তিবিধান হইবেক না।

এতদ্বিধ দেখিতে পাওয়া যায় যে,
ভিন্ন দেশে অথবা ভিন্ন ধর্মে বিশেষ
বিধিগুলি অনেক স্থলে বিভিন্ন থাকে,
কিন্তু অহুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকাশ
হয় যে, সকলের মধ্যে এক এক সাধারণ
বিধি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সর্বত্র
সমান।

আমাদিগের দেশে যবাদি ধর্মশাস্ত্রের
বিধান অদ্যাপি এত দূর প্রবল আছে

যে, সাধারণ লোক এই সকল নিয়ম প্র-
তিপালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাঁহার
নিগূঢ় মর্মের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না।
কিছুকাল পূর্বের যখন ইউরোপ খণ্ডে
খৃষ্টানদিগের মধ্যে সর্বত্র রোমান ক্যা-
থলিক মত প্রচলিত ছিল, তখন তথায়ও
বিশেষ বিধির প্রাদান্য দৃষ্ট হইত।
পরে প্রটেস্ট্যান্ট মত প্রচার হইলে এই
সকল বিধি লইয়া এবং অব্যাহা নানা
বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়।
পরিশেষে ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিধির
সময় হইতে ইউরোপে এক প্রকার মহা
প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন
নিয়মই হউক, তাঁহার নিগূঢ় মর্ম না বু-
ঝিলে চিন্তাশক্তি-বিশিষ্ট একজন মহাত্মাও
তাঁহা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইয়া
না।

খৃষ্টানদের আপনাদিগের ধর্ম ঈশ্বরা-
দিষ্ট বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন,
সুতরাং স্বভাবতঃ এই ধর্মাবলম্বী কেহই
পূর্বে আপন শাস্ত্রীয় কথার যুক্তি লইয়া
আন্দোলন করিতেন না, কিন্তু ইহানীং
উঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে প্রতিপক-
গকে নিরস্ত করণোদ্দেশে ঈশ্বরদেশের
নিগূঢ় মর্ম প্রচার করিতেছেন। উঁহারা
বলেন যে, আমাদিগের ধর্মবিধিগুলি সর্ব-
তোভাবে যুক্তিসঙ্গত। তবে যেন যুক্তি-
সম্মত না হইলে ঈশ্বরদেশ অবহেলা
করাতো দোষ নাই। একথা বিচার করা
আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু
ইহারদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে,
এইধর্ম সকল কার্য ও নিয়মের যুক্তি
অবধারণ করা অত্যাশঙ্ক্য হইয়াছে।

আবার বাঁহারা কোন ধর্মকেই ঈশ্বরা-

দ্রিষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না, তাঁহাদিগের কর্তব্যাকর্তব্যের নিয়ম নির্দেশার্থ কতকগুলি মূল কথা স্থির করা আবশ্যিক। সেইগুলি সর্ববাদীসম্মত হইলে যিনি যেক্রপ বিশেষ বিধি প্রতিপালন করেন, মৌলিক কথার সহিত সম্মত হইলেই তাহার প্রতি কেহ অঙ্গপত্তি করিতে পারিবেন না।

এই প্রকার সর্ববাদীসম্মত কতকগুলি মৌলিক নিয়ম স্থির করা যে অতীব কঠিন তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ অদ্যাপি এমত একটা নিয়মও স্থির হয় নাই যে, তদন্তসারে সকলেই স্বতঃকর্ত্যের কর্তব্যাকর্তব্যতা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিবেন।

উপস্থিত প্রস্তাবে এই রূপ একটা মৌলিক নিয়মের আলোচনা করিতে সংকল্প করা গিয়াছে। ইহা ত্রিযুক্ত জ্ঞান ইয়ার্ট মিল কর্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার অভিপ্রায় আমরা অবিক্রম ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব এত দূর সাহস হয় না, তবে যৎকিঞ্চিৎ বাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহা মূল গ্রন্থের অল্পরূপ বর্ণনা, প্রাধা হইলেই আনাদিগের গ্রন্থ মার্গ হইবেক।

সকল মনো-ধর্ম-জনসমাজে কোন ব্যক্তির যেস্বাচ্ছন্দ্যের নিবারণের প্রস্তাব হইলে কেবল এই বিচার করা উচিত যে, কথিত আচরণের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় কি না। ক্ষতি হইলে তাহা নিবারণ করা আবশ্যিক। নতুবা তাহার নিজের স্বখ্যালাক্ষ্য বা পুণ্য রক্ষির উদ্দেশ্যে দণ্ডবিধির দ্বারাই হউক, বা গুরুতর লোক নিন্দার দ্বারাই হউক, তাহার

যেস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিবন্ধন করিবার অধিকার অন্য ব্যক্তি যাহারই নাই।

মিল আপন মত সমর্থন জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম, এবং স্থল বিশেষে এতদেশের পুরাতন ও ব্যবহার প্রণালী সহযোগে প্রতিপাদন পূর্বক প্রকাশ করা যাইবেক।

মচারচর সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে বুদ্ধিই মনুষ্যের পরম পদার্থ; যে ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করে না—কেবল অনের অহংকরণ করিয়াই কার্য করে, তাহাকে ভাবেতেই হয়ে জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি এতোকেরই নিজের আয়ত্ত থাকা আবশ্যিক। বুদ্ধি চালনাতে জন্ম উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দোষ ঘটিলেও লোকে মার্জনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষতি কর্তা না বুঝিয়া দেশাচার প্রতিপালন করিতে কোন প্রশংসা নাই। পরন্তু বুদ্ধি চালনার প্রতি লোকে যেমন প্রশংসিত, মনের বাসনা পূরণ বিষয়ে তাদৃশ নহেন। প্রভূত, বাসনা তীব্র হইলে সকলেই নানা বিপত্তির আশঙ্কা করেন। কিন্তু বুদ্ধি যেমন, বাসনাজনিত প্ররক্তি গুলিও ভদ্ররূপ, মনের অঙ্গ বিশেষ। তাহাভয়ের মনে সর্বপ্রকার স্পৃহারই মূল আছে, তৎসমুদায় তুল্যরূপে পরিবর্তিত না হইলেই তন্মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটয়া বিপদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, ব্যক্তি বিশেষে যে সুকর্মান্বিত হয়, ব্যক্তি হইতে এই যে, তাহাদিগের সমুদয় বিচারের ক্ষমতা দুর্বল, নতুবা স্পৃহার আভিভাষ্যেই যে তাহা ঘটে, এরূপ বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তির বাসনাগুলি অপেক্ষা-

কৃত সতেজ হইলে, যদিও তৎকর্তৃক কোন কোন অহিত ঘটনা হইলেও হইতে পারে, তথাচ তাহার দ্বারা অনেক বিশেষত্ব হিত সাধন হওয়াও সম্ভাবিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাহার ভেজ থাকে, সে সকল বিষয়েই আপনার স্পৃহার স্থল দেখিতে পায়, বাহার কোন বিষয়ে স্পৃহা হয় না, তাহার ভেজ নাই। স্পৃহার তীব্রতা ভেজের লক্ষণ। তেজী-মান পুরুষ মর্মে কি অসংখ্য কথারই অর্থ-ধান করেন, তাহাতে নিশ্চয়ই নিস্তেজ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাধান্য অর্জন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কার্যের সময় আপন-নার ইচ্ছার অগ্রগামী হইতে অক্ষম, সে ঘড়ির ন্যায় জড় পদার্থ বিশেষ, তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।

মিল এতদ্বিষয়ে উইলিয়াম হম্বোল্টের একটা বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন। তাহার মর্ম এই—মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক গুণসমূহের মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্বক তাহারিগের সমুদয়িত করাই জীবনের প্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। হম্বোল্টের মতে ইহা আমাদিগের ফণভঙ্গুর অভিলাষ বিশেষ মাত্র নহে—ইহা মনুষ্যের বিবেক শক্তির আভিভাষ্য প্রসব স্বরূপ, কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

মনুষ্যকে স্বভাবতঃ স্বেচ্ছা পরিপূরণ জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিধি পরম্পরা দ্বারা তাহার প্রতিরোধ হইয়া থাকে; এই জ্ঞান মিল বলেন যে, মনো-ভার উত্তীর্ণ সাধন অভিপ্রায়ে হইলে এরূপ বিধি পরম্পরা যত সংক্ষিপ্ত হয়,

ততই ভাল। কেননা পদে পদে ইচ্ছাকে বাধা দিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া যাইবেক।

মনুষ্য একটা নিয়মানুসারে কার্য করিতে তাহা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তদ্বিপরীত ইচ্ছা আর মনে উদয়ও হয় না। নিয়মের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই তদন্তসারী ব্যক্তিগণের বিভ্রান্ততা হ্রাস ও সাদৃশ্য বৃদ্ধি হয়। তখন লোকে নিয়ম গুলির মর্ম ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল তাহার বাহ্যিক অঙ্গগুলি প্রতিপালন করিতে থাকে। যেমন এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজিকালে যুদ্ধের প্রত্যেক কূটরিতে দীপ রক্ষার নিয়মের স্থলে, এই ক্ষণ, এক ব্যক্তি একটা অদীপ লইয়া একবার তাবৎ কূটরী জলম করিলেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

অন্তঃপ্রবৃত্তি বলেন-যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্পৃহাগুলি স্বপ্রাণী মতে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে সকল মনুষ্যই বিভিন্নপ্রকৃতি এবং স্বতন্ত্র প্রাণী হইবেন। অন্যের পক্ষে এক একটা স্বতন্ত্র আদর্শ স্বরূপ হইবেন। সামান্য ব্যক্তির তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বপ্রকৃতি পরিপালনের জন্য যত্ন করিতে এবং তাহার উন্নতি সাধনের উপায় করিতে পারিবে। অর্থাৎ, সকলে এক নিয়মান্বলীর অধীন না হইয়া প্রত্যেকের ভিন্ন পক্ষে স্বতন্ত্র প্ররক্তির অনুসরণ করিলে রাজ্যের শাসন প্রণালীর অত্যাচার নিবারণ হইবে।

কোন দেশে রাজাই সর্বময় কর্তা, কোথাও সম্প্রদায় বিশেষ অপর লোককে বলপূর্বক আপনাদিগের মতের অনুগত করিয়া রাখেন। কোন দেশে

রাজ্যের অধিক সংখ্যক লোক বাহা বলিবেন, অল্প সংখ্যক ব্যক্তিগণের পক্ষ তাহা সহজ প্রকারে অনুভূত হইলেও তাহার অনুশা ইহার উপায় নাই। এক্ষণে রাজস্বসংগ্রহী ব্যক্তি বা সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেদ না করিলে তাঁহাদিগের অভ্যাসের ইয়াত থাকে না। কিন্তু সত্যে প্রকৃতি না থাকিলে ক্ষেদ করা যায় না, আর আপন প্রকৃতিকে পরিপালন না করিলে প্রকৃতি সত্য হয় না। অতএব, স্বত্বস্বাধীন অধিবাসী হওয়াই আপন প্রকৃতি পরিপালনের এক মাত্র উপায়। এই রূপে, আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্দ্রিয়জ্যামিতি অর্থাৎ স্বত্বভাবানুবর্তিতা কহে।

অনন্তর মিল এই প্রকার স্বত্বভাবানুবর্তিতার একটা দোষ দেখাইয়াছেন। এই গুণ বশতঃ ইন্দ্রিয় স্থানমে দনা হয়না, তাঁহারা অন্যের সমকক্ষতা সহ করিতে পারেন না। তাবৎ লোকের উপরে শ্রেষ্ঠতা লাভের ইচ্ছা করেন, এবং পারিলে নিকট ব্যক্তি গণকে আপনাদিগের ক্ষমতাবীন করিয়া ফেলেন। এক্ষণে লোককে কক্ষিৎ নিবারণ না করিলে নিকটস্থ-মান্য ব্যক্তিরা আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে পারে না; সুতরাং যে গুণের বাহ্যিক্য এক্ষণে লোক জগতের রস হইয়া উঠেন, তাহাতেই মান্য ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইয়া উপক্রম হয়। অতএব স্বত্বভাবানুবর্তিতা সহজে এই নিয়ম আশাশ্রমকে, আপন বাসনা পূরণের জন্য অন্যের স্পৃহা বাধা করিয়া দিতে নাই।

মিল কহেন যে, ইহার দ্বারা প্রত্যেকের মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতি হইবেক বটে, কিন্তু তাহা নিয়মে দ্বিগুণ প্রত্যাশার দৃষ্ট হইতেছে।

এক, স্বত্বভাবানুবর্তী সনামেন্দব ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক। অপর, বাহ্যিক পদের সাধ মিটারিবার জন্য আপনাদিগের স্পৃহা দমন করিবেন, তাঁহাদিগের পরোপকারিতার উন্নতি চালাই হইবেক।

নিয়মের দাস হওয়া অপেক্ষা স্পৃহা সেবা যে শ্রেষ্ঠ, মিল এমিয়া এবং ইউরোপ খণ্ডের পরস্পর তুলনার দ্বারা তাহার এক প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, চীন ও ভারতবর্ষে সকল কার্যেরই এক একটা বিশেষ বিধি নির্দিষ্ট আছে। কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজদ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইহার ক্ষতি এই যে, যে ছই রাজ্য এই ক্ষণ নিশ্চিন্দীপ হইয়াছে। এইরূপে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এক সময়ে সভ্যতার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল, অতএব তাহার উদ্ভাবন কালে অবশ্যই অধিক মহাপুরুষ ও এখানে জগিয়া থাকিবেন। কিন্তু এইক্ষণে আর সেরূপ লোক হয় না। সেই মহাত্মারা নিজঃ ক্ষমতাতে যে সকল কার্য বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখনকার অন্ধদিগের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। চীন ভারতের ঋষিরা ইউরোপের মহাপুরুষগণ অপেক্ষা কিছুতেই নিকট ছিলেন না; তবে কেন ইউরোপের এত প্রাধান্য? মিলের বিবেচনায় ইহার এক মাত্র হেতু এই যে;—

ইউরোপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের

ভিন্ন জাতিই বল, কি এক জাতির ভিন্ন ব্যক্তিই বল, প্রত্যেকেই অন্যের সম্বন্ধ নানা প্রকারে বিভিন্ন। প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়া সংসার বাহ্য নির্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু চীন ভারতবর্ষে শাস্ত্র ও দেশাচারের এক্ষণে প্রবলতা যে, তাবৎ লোকে প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের অনুসরণ। ইউরোপে যে সকল মহৎ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে অনেক সময়ে পরস্পরের মধ্যে, এবং তাঁহাদিগের শিষ্য পরস্পর মধ্যে, নানা বিরোধ ও এক দল কর্তৃক অন্যের গতি রোধের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদেব কেহই অতিক্রম প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই, বরং 'সমুদায় লোক বিভিন্নতাবলবধী' হইয়াছেন। অতএব এই রূপে বিভিন্ন পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করিতেই ইউরোপীয়রা জগতে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

মিল বলেন যে, মতের একা বাঙ্কনীয় বটে, কিন্তু যেখানে লোক সকল প্রকার বিভিন্ন মত পরীক্ষা করিয়া একটা অবলম্বন করে, সেই খানেই এক মত ভাল। কারণ, একই বিষয়ে দেশকালপাত্র ভেদে মতের বিভিন্নতা হইতে পারে। অতএব যত কারণে কোন মতের বিভিন্নতা হওয়া সম্ভব, যে গুলি যত দিন দুখা না যায়, তত দিন অসম্ভব অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কোন মতের প্রতি দোষারোপ করা অবিধেয়। তত দিন বিভিন্ন মত-

সমূহ প্রকটিত হইলে, কেবল মতেরই ত্রিরাঙ্কি হয়, এবং অবশ্যম্ভাব্যে কত প্রকার কথা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কেবল তাহাই প্রকাশ্য হয়।

এইক্ষণ মিল আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইউরোপেও স্বত্বভাবানুবর্তিতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ইংরাজ ফরাসি জাতির মধ্যে পূর্বে যত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যাইত, এইক্ষণে আর সে রূপ দৃষ্ট হয় না, বরং অনেক বিষয়ে অনেকের মধ্যে সাদৃশ্যই দেখা যায়; ইহার হেতু এই যে, ইদানীন্তন লোকের অবস্থা বিষয়ে অনেক সমতা হইয়াছে। এইক্ষণে বড় সহরে শ্রেণী বিশেষের বাসস্থান পৃথক রূপে নির্দিষ্ট নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাধনে সকলে একই পুস্তক মুদ্রাবাদপ্রতিপাদি পাঠ করেন—সুতরাং সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্মশাস্ত্র আদি বিষয়ের আলোচনা সকলের মনে একই প্রকারের হইতেছে। রেলরোড ক্রীমার আদির দ্বারা সকলে অন্যায়সে সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে—সুতরাং দেশ ভ্রমণ জন্য পূর্বে লোকের জন্য বুদ্ধির যে ইতর নির্দেশ হইত; এই ক্ষণ তাহাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। বাণিজ্য ও কারখানার ত্রিরাঙ্কিতে ছোট বড় তাবৎ লোক নির্বিশেষে একই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তুল্য রূপ ফলভোগী হইতেছে। অতঃ প্রসঙ্গে মিল আর একটা কারণকে অতি প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই ক্ষণ উল্লিখিত ছই দেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় সর্বোচ্চ-শ্রেষ্ঠ-পদ পাইয়াছে। গোপনে যে বাহা বলুক, যখন কোন বিষয়ে অনেক লোক একাশ্রয়ভাবে একটা অভি-

প্রায় ব্যক্ত করে, তখন ভাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। এই দুর্গতি নিবারণের কোন উপায়ও হয় না, কারণ এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে, কেবল এই অত্যাচার নিবারণ জন্য সর্বপ্রকার বিরুদ্ধতাবলবধীদিগকে আশ্রয় দান করে।

প্রাপ্ত দশদশমে যেমত কার্য বিষয়ে, ঐরূপ মতামতের বিষয়েও লোকের বিভিন্নতা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমান রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট মত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাবৎ লোকেই তর্কপ্রিয় এবং বিবেচক হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণ ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে আর সে রূপ মতভেদ নাই, ইহাতে সাধারণ লোকে কেবল মতটী জানিয়া ক্ষান্ত হয়, ভাহার স্বপক্ষ বিপক্ষের কথাই প্রতি অহ্বাধন করেন, এবং কেহ তর্ক করিতে উদ্যত হইলে ইচ্ছায় আপন মতের যথার্থোপায় পোষকতা করিতে ও পারে না।

ফলতঃ সভ্যতার উন্নতি সহকারে উল্লিখিত একা অবশ্যই পরিবর্তিত হইবেক। মিল তাহা অস্বীকার করেন না; তিনি কেবল এই মাত্র কহেন যে, ঐ-

কোর বহুবিধ মঙ্গলের সহিত এই দোষ অনিবার্য এবং মতভেদের সহস্র দোষের সহিত এই মঙ্গলটী স্বীকার করা উচিত যে ঐক্যের হ্রাস রুদ্ধিতে স্বত্বভাবাবলুপ্তিগণের ইতর বিশেষ হয়, এবং ততৎ কারণে আবাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেপেও ব্যাঘাত অথবা তদ্দিপারীত ফল হয়। সভ্যতাজনিত এই অমঙ্গলের প্রতিকারার্থ মিল পূর্বোক্ত ব্যবহার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরের ক্ষতি ভিন্ন অন্য কোন কারণে, কোন উপায়ের দ্বারা কাহারও স্বত্বাচার প্রতিরোধ করা অস্বচিত। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। যথা;—

১। লোকের মতামত সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম করাই দুঃশীল। সকলে স্বং জ্ঞান ও বিবেচনানুসারে যে মত ইচ্ছা তাহাই অবলম্বন করিবে, তাহাতে প্রচলিত মতের বিরোধীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা অনায়।

২। লোকে স্বং মতানুসারে কার্য করিলে যে পর্যন্ত অন্যের ক্ষতি না হয়, তদবধি কোন প্রকারে তাহাদিগের কার্য রোধ করা কর্তব্য নহে।

উত্তরচরিত।

চতুর্থ সংখ্যা।

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটীর বনে, রাম, বাসন্তীর আলানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগম্বীরগত গোদাবরীর, বরিশারশির গলাদ নিম্নান্দ শুনান গাইতেছে। সমুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কল উত্তালতরঙ্গ স্রিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামছবি অনন্তকাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্ণসম্বাস চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায়, একটি কদলীবনমধ্যবর্তী শীলাতলে, পূর্ণপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেই খানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে খুণ খাওয়াইতেন; এখান হরিণেরা সেই প্রেমে সেই বাদনে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেই খানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ণপঞ্চবটী বাসকালে একটি মন্থরশিশু প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। একটি কদম্বরক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্রগং বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন। রাম দেখিলেন, যে সেই কদম্বরক্ষ দুই একটি নবকুশুমোৎকাস হইয়াছে। তল্পপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই মন্থরটি নৃত্যান্তে মন্থরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই মন্থরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালী দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তা-

নের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবনন্দে মুরিত। এই রূপে বাসন্তী রামকে পূর্ণস্মৃতিপীড়িত করিয়া, সখীনির্দীপনজনিত রাগেই এই রূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষণ ভাল আছেন ত?” কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না—তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্তিত রক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ ভূগে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষণ কেমন আছেন?” এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বলিলেন, বাসন্তী “মহারাজ!”। বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিশ্চয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনরহস্য জানেন। রাম একাশ্যে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী ভখন বুককটা হইয়া কহিলেন, “দেব! এত কঠিন হইল কি প্রকারে?”

অং জীৱিতং অমসি যে জন্ময়ং দ্বিতীয়ং
অং কোয়দী নয়নযোরমৃতং জন্ময়ে।
ভূমি আমার জীবন, ভূমি আমার দ্বিতীয় জন্ম, ভূমি নয়নের কোয়দী, অঙ্গ ভূমি আমার অমৃত,—এইরূপ শতং প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে তাহাকে—” বলিতেই সীতাস্থতিয়ুগ্ম।

বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়া একাক্ষ করিলেন?”

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, “নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, ক্ষেত্রল বশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।”

এই কথাপকথনের প্রশংসা করা রথ। সীতাবিসর্জন জন্য বাসন্তী রাম-প্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণাযন্ত্রণ সেই অপরাধের দণ্ড প্রদান করিলেন; সহজেই রামের শোকসাগর উলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শৌক্যোপশমের উপায় ছিল—আশ্রয়প্রাপ্ত, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে তিনি প্রজ্ঞারঞ্জনরূপ কুলপর্ষের রক্ষার্থে সীতাবিসর্জনরূপ মর্ষক্ষেদী কার্য্য করিয়াছেন।

—মর্ষক্ষেদ হউক, ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখাইলেন যে সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখাইলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবর্ত্তী হয় নাই। তিনি এক প্রকার যশের লাভ লালসায় পল্লীধর্ম্মরূপ গুরুতর অপবশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল,

তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপবশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মুহূর্ত্তমৃণালকম্প দেহলভিকা কোন হিঃ পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম “সীতে! সীতে!” বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা, যে কলঙ্করূপসাকারক পৌরজনের কথাই সীতা বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।” বাসন্তী, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন,

“সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বর্ষদর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পৎসল লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশে দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখী-বিসর্জন দ্রষ্টব্য জলিতেছিল—কিছুতেই ছুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

অগ্নিসেব লতাগুহে জমতবন্ত্যার্গঙ্গদেবকঃ
সং হংসৈঃ কৃতকৌতুক্য চিরমভ্যুক্ষোদাবরীঃ

সৈকতে।

আর্য্যাত্মা পরিদূর্নয়িতমির জ্ঞানং বীক্ষ্যবদন্তয়।

কাতর্য্যদরবিদকটুলানিভামুগ্ধঃপ্রণাবাপলিঃ (১)

(১) সীতা গোদাবরী সৈকতে বসন করিয়া কৌতুক করিতে করিতে বিদগ্ধ করিলেন, তখন তুমি এই লতাগুহে বাক্সিয়া তাঁহার পদ চাহিয়া রহিতে। সীতা

আর রাম সখী করিতে পারিলেন না। জাতি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃশ্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জলিতেছে; অশ্রমের বিরল অন্তরাত্মা অবসর হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?” বলিতেই রাম মুচ্ছিত হইলেন।

ছাত্রাঙ্গুপিণী সীতা তমসার সম্মে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিল—কতবার রামের রোদন শুনিয়া—আপনি মর্ষপীড়িতা হইতেছিলেন, আবার সীতা রামক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত করণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মুচ্ছিত দেখিয়া সীতা কাদিয়া উঠিলেন, “আর্য্য-পুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া ব্যস্ত সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেন!” এই বলিয়া সীতাও মুচ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন—“রামকে বাঁচাও” বলিয়া উঠাইলেন। সীতা সমস্তমুখে রামের ললাটস্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন,

তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দমণিমীলিতলোচনে স্পর্শস্বত্ব অল্প-ভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরপাণ্ডু অন্তরে বাহিরে অমৃতস্রব প্রলেপ যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি বাসন্তী! আমাদের রূপাল ভাল।”

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। আমি স্পর্শস্বত্বই জানিয়াছি। দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না?

বাসন্তী। এমনতর সম্মুখে দারুণ প্রলাপে কি ফল? আমি এখনে প্রিয় সখীর দ্রষ্টব্য জলিতেছি, আবার এ হত-ভাগিনীকে কেন জ্বালাইলেন?

রাম বলিলেন, “সখি, প্রলাপ কি? বিবাহকালে যে হাত আমি করণসহিত ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃত-শীতল যক্ষোজল স্পর্শস্বত্ব চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই বর্ষাকরকতুলা শীতল ললিতলবঙ্গকন্দলী-নিভ হস্তই আমি পাইয়াছি।

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাট শীতার অশ্রুহাস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্বেই রামের আনন্দমোহে দেখিয়া অপমত্ত হইবেন রিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসন্তোষসৌম্য শীতল-স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধ হইলেন। অতি যত্নে সেই রামমল্যচিহ্নিত-হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁ

আমিও তোমাকে বিশেষ দুর্নয়মান দেখিত, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পশুকলিকা তুল্য অশ্রুধারি ছায়া কি সুন্দর অঙ্গলবদ্ধ করিতেন!

পিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বখন রাম, সীতার হস্তের চিপরিচিৎ অমৃতসীতল স্বথস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!” শেবে বখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রার্থিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি এক বার ধর।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়িয়া লইলেন। লইয়া, স্পর্শস্বথজনিত যেন রোম্যাক্ষম্পিতফলেবরা হইয়া গবন-কম্পিত নবজলকধানিক্ত ক্ষুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, “কি লজ্জা, তমস্যা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহার প্রতি এই অচুরাগ।”

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কুই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দিক্‌গু চুটিল। কোন কোনরা, ক্রমে শীতল হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, “আর কত ক্ষণ ভোমাকে কাদাইব? আমি এখন যাই।” শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবত তমসে! আর্য্যপুত্র কেন চলিলেন?” তমসা বলিলেন, “চল, আমরাও যাই।” সীতা বলিলেন, “ভগবতি প্রসাদ! আমি কণকাল এই দু-

র্ভজ জনকে দেখিয়া লই।” কিন্তু বলিতে এক বজ্রতুলা কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকটে বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—” সহধর্ম্মিণী। সীতা কাম্পিতকল্বেবরা হইয়া মনে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! কে সে?” এই অসমের রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার হিরণ্যমী প্রভিকৃতি।” শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; “বলিলেন, আর্য্যপুত্র। এখন তুমি তুমি হইলে। এত দিনে আমার পরিত্যাগ লজ্জাশ্রম বিনোদন করিলে!” রাম বলিতেছেন, “তাঁহারই দ্বারা আমার বাস্প-দিক্ষিতকুর বিনোদন করি।” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “তুমি যার এত আদর কর, সেই ধনা। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধনা। সে জীবলোকের আশা-নিবন্ধন হইয়াছে।”

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা কর-ঘোড়ে, “গমো গমো অথুক্ষপুয়জগদমৎ-সমগং অজুউত্তরচরকলাপং” এই বলিয়া ঐগম্য করিতে মুহুর্তিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘান্তরে কণকালজন্ম পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা যাই!”

তৃতীয়ঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের বাহ্য কার্য্য, বিষয়সম্বন্ধে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সম্মুখে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিভ্রাজ হইলে নাটকের কার্য্যের কোন

হানি হয় না। সচরাচর একপা একটী সুরীষ নাটকাক্ষ নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। বাহ্য কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইলে, তাহা উপসংহৃত্তির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তজ্জগ পড়ে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পোশপণ্য অসহ্য। তাহাতে রচনা-কৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু অনেকই যুক্তকণ্ঠে বলিবেন, যে অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকৃত্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াক্ষ ত্যাগ করা যাইতে পারে না। নাটক্যাংশে ইহা যতই দূষ্য হউক না কেন, কাব্যার্থে ইহার তুলা রচনা অতি চুল্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে, যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে। এতএব অবশিষ্ট কাব্য অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাণীকি প্রচার করিলেন যে তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদধনার্থ বশষ্ঠ, অরুদ্রাভী, কৌশল্য। জনক, প্রভৃতি বালীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত উৎসুকপূর্ব্বক হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। হৃদয়বিয়োগে জনকের শোণক্লিষ্টদশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ; লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ই-

তাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাণীকির অপশ্রম সম্বন্ধে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন, এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আগিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্ররুত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সম্ভাবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভাতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময় ভারতবর্ষেরা সামাজিক ব্যবহার সুযুদ্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেইরূপ কবিত্ব-রত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে ছই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আস্থান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, “শুন যিহু রবাবিহাবলী! মমধর্ম্মদিব দৃশুনিষংহাব।”

(১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন,

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃষ্ট নিতঃশিখর হরি বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ।

কল্পায়ে রুচি জনক, একথা কেহই অ-
স্বীকার করিবেন না। কলিত এচলিত
মৃতের বিরুদ্ধ কথা যুক্তি সিদ্ধ হওয়া
অসম্ভাবিত নহে। মৃত দিন মল্লখা দেব-
ভূনা না হয়েন, তত দিন কেহই এমন
স্পদ্ধা করিতে পারেন না যে, আমার
ভুলি নাই এবং আমার জাতি প্রশ্রম
করিতে কি আমার বিরুদ্ধ হস্তন কথা
প্রকাশ করিত কাহারও মাথা নাই।

বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেরই আপনাদিগের মতি স্থির করিবার অগ্রে বিবেচ্য বিষয়ে বহু প্রকার ভর্তুক উপস্থিত হইতে পারে, তৎ সমুদায়ের প্রতি অল্পধ্যান করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথার প্রতি যত্ন পূর্বক কর্তৃপক্ষের অত্যাশঙ্ক্য। কারণ এ সকল মত-স্থাপকেরা বর্তমান থাকিলেও ঐ রূপ করিতে ন।

এতদ্বিধে মিল জন্মসমের একটা
আপত্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন।
আপত্তি। মৃতনমস্তের উচ্চাবকদিগকে
বতই যন্ত্রণা দেও, তাহাদিগের কথা সত্য
হইলে কালসহকারে তাহা অংশাই প্রসন্ন
হইবেক। কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ কথা উপাধিত
হইলে পীড়নের দ্বারা সন্দ্বয়ই সমাজ হ-
ইতে বহিষ্কৃত করা যায়; অতএব বিরুদ্ধ
মত নির্ধার্তনের দ্বারা এক প্রকার মঙ্গল
হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিতে
হইবেক।

খণ্ডন। যদি একথাটি সত্য হয়, তবে
মল্লিকা সমাজের বড়ই ছুরদুটে। যে ব্যক্তি
স্বতন মত প্রকাশ করিয়া তাবতের
মঙ্গল সাধন করেন তাঁহাকে, কষ্ট দিলেই
কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবেক? কোথায় এরূপ

বাঞ্ছা জগন্মান্য হইবেন; না অগ্নি-পরী-
ক্ষার দ্বারা তাঁহার মত সাবাস্তব করা
আশংক্য! বাস্তবিক তরুণী সত্য নয়।
কোন মতের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করা কেবল
তৎপ্রতি অল্পরাগের লক্ষণ। যে মতের
প্রতি সত্যিক প্রকারে বিশ্বাস ও মায়াজ
জন্মে, সভাই হউক বা মিথ্যাই হউক তাহা
সমর্থন জন্য অন্তরে প্রাণভাণ্ডার পর্যন্তও
যিকার করিয়া থাকেন।

ইহার প্রমাণ এতদেশেও পাওয়া যায়। যথা, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মের বিরোধ। বৌদ্ধধর্ম এতদেশে হইতে দূরীকৃত হইয়া চীন ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিলেন। আবার মুসলমানদিগের প্রাচুর্যকালীন কত বিজ্ঞানসাহিত্য ধর্মও ভাঙা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি বৌদ্ধ ধর্ম সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষে শাক্যমুনির নাম লোপ হওয়া আশ্চর্য ঘটনা। যদি মিথ্যা হয়, তৎকালে যে যেসমের আদিপিতা হওয়াও ভ্রূষণ। আবার যদি বৈদিক ধর্ম সত্য হয়, তবে মুসলমান ধর্ম কিরূপে অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে? যদি মিথ্যা হয়, তবে বৌদ্ধ মতকে কি প্রকারে পরাস্ত করিল? এই জন্যই গিল বলেন, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বলপূর্ব্বক কোনও মত রক্ষিত করা কর্তব্য নহে।

২। যখন বিরুদ্ধমত অনায়াস হয়।—
মনে করা যাউক যে, প্রচলিত মতই
সর্বোত্তমভাবে ন্যায্য এবং স্বাধীন-নির্দিষ্ট
অথবা বিশ্বাসদায়ক; আর মূলত মত নিত্য
জান্তিস্থলক। এরূপ স্থলেও বিরুদ্ধ মত
প্রকাশ করিতে নিবারণ করা মিলের
বিবেচনায় অকর্তব্য।

প্রথমতঃ । প্রকাশ করিতে না দিলে

বিরুদ্ধ কথা জাতি' কিনা, তাহা জানা যায় না। যদি বল যে, যে সকল কথা ঐশ্বর্য-
দিক্ত, তাহার বিরুদ্ধ কথা যে জাতি,
ইহাতে মনেহ কি? অতএব তাহা ব্যক্ত
করিতে দেওয়া অসুচিত। কিন্তু কোন ক-
থাটি ঐশ্বর্যদিক্ত এবং তুমি ঐশ্বর্যদানের
যে অর্থ বুঝিয়াছ, তাহা সত্য কিনা, সে
বিষয়ে ত মত বিনোদ প্রবশাই ইহাতে
পারে। ঐশ্বর্যদানের মধ্যে ভুল থাকিতে
পারে না বটে, কিন্তু তোমার মতের ভুল
প্রকাশ হইলে তাহা ঐশ্বর্যদিক্ত নহে,
একথাই প্রতিপন্ন হইবেক; সুতরাং
প্রচলিত মতানুসারে যে কথা গুলি ঐশ-
্বর্যদিক্ত বলিয়া গণ্য, তাহাবির বিপরীত
কথা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে; অতএব
যত দূর প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা
নায়াসম্মত হইবার পক্ষে বিমুখ্যাত সম্ভা-
বনা আছে, তত দূর কোন এতাদৃশ কথা
একটনের প্রতি দৃষ্টি করণও প্রতিবন্ধক থাকি-
মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না।

মিল লিখিয়াছেন যে, এতদ্বিষয়ে কোন কোন প্রতিপক্ষেরা বলিতে পারেন যে-
মৃতকণার বিচার করিবার জন্য পণ্ডিত
নিযুক্ত করা কর্তব্য, এবং উহাদিগের
বিবেচনায় আশঙ্কি হইলে ইহা সাধা-
রণের গোচর করা উচিত; নতুবা একদ্বারা
অনর্থক সামান্য ভোক্তার চিত্তচাপল্য
জন্মিবেক। একথাটি মিলের মতে উপ-
স্থিত প্রস্তাব সম্বন্ধে গোণে কথা। কারণ,
ইহা বিরুদ্ধমত একশের প্রবালী বিঘ-
ণ বিচার হইতেছে, এবং ইহাতে মত
একশের প্রতি আপত্তি না থাকিই
বোধগম্য হয়। ফলতঃ ইহার বিবে-
চনায় এই উপায়ের দ্বারা উভয় দিক রক্ষা

করাও হুসাধা। যদি পণ্ডিত ভিন্ন কক্ষ
লোকের নিকট ব্যস্ত করিতে না দেও
তাহা হইলে স্তম্ভনমতাবলম্বী এবং
পণ্ডিতগণের মধ্যে ব্রাদার্সহাউস ভালরূপে
হইবেক না, সকল কথার পুষ্টিমাফক
উত্তর প্রত্যুত্তর চলিবেক না। এবং
দুর্বলপক্ষ বলবানের নিকট অনায়
মতে নিরস্ত হইবেন। আবার যদি এই
সকল দোষের প্রতিবিধান করা যায়,
তাহা হইলে উভয় পক্ষের কথ সঙ্গ-
মাধারের নিকট অধিক কাল গুপ্ত থাকি-
বেক না।

দ্বিতীয়াংশ। আন্তিমূলক ন্যায়ত প্রকাশ
হইলে কোন না কেহ অবশ্য তাহার পণ্ডন
করিয়া দিবেন, এবং এই প্রকারে যত
কথা অসম্ভব বলিয়া মিত্তাক্ত হইবেক
ততই প্রচলিত এবং ন্যায়াবলম্বিত মত
উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মনে দৃঢ়ী-
ভূত হইবেক। নাস্তিকবর্ণিকগণ সমাজ
হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলে ঈশ্বরের
অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের যে প্রকার
বিশ্বাস থাকে, তাহাদিগকে প্রান্তর
করিতে পারিলে, সেই বিশ্বাস প্রাচ-
ন্তর হয়, সম্ভেদ নাই। অতএব যখন
কোন বিষয়ে দুই জন অধ্যাপক ভিন্ন
বিষয় ব্যবস্থা দেন, তখন হীনবল ব্য-
ক্তিকে উপহাস বা অরুদ্ধ না করিয়া
বরং উভয়কে সুপ্রণালীমতে তর্ক করিতে
দেওয়াই চমক; কারণ একটী মত প্রকাশ-
রূপে অপসারিত না হইলে অন্যটীর
প্রতি লোকে সমস্ত প্রত্যয় করিতে পারে
না। সুতরাং মত মিথ্যা ভেদনই প্রায়
তুল্য রূপ ধারণ করে। যেমন কোন নৈয়া-
য়িক দিগ্‌বিজয়ী হইতে বাসনা করিলে

এতিপক্ষদিগের নিকট তাঁহার গৃহদ্বার সর্বদাই মুক্ত রাখা কর্তব্য, নতুবা তাঁহাকে রিচারে পরাজয় বলিয়া সম্ভেদ জন্মিতে পারে। সেইরূপ বিরুদ্ধমতের পথ মুক্ত না রাখিলে সত্য কদাচ দিগ্‌জয়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বিজয়ী না হইলে মত্তের মাহাত্ম্য নিম্নসংশয় হয় না। অতএব মত্তের জয় হউক, এই উদ্দেশ্যে ভ্রান্তমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করা অতীব কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ ভ্রান্তচিত্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করা পদ্ধতি থাকিলে চলিত-মত সমর্থন জন্য তাৎপকে সর্বদাই জাগরুক থাকিতে হয়; সর্বদাই আত্মপক্ষের ঈর্ষ্য কণা গুলির আন্দোলন করিতে হয়; নতুবা কূতর্কীরা সত্য মতকেও ঐরাজিত করে।

আমরা দেখিতেছি যে, এতদ্দেশে খ্রীষ্টানদিগের সমাগম হইলে প্রথমতঃ কেবল হিন্দুধর্মের দোষই প্রকাশ হইয়াছিল। অনেক বিষয়ে মত্তের আশয়ে তৎসংযুক্ত অপরিভ্রাজ্ঞা কতিগুলি অগত্যা বহন করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের কোন কোন স্থলে ক্রীকি গুণের সহিত কিং দোষ মিশ্রিত আছে, তাহা যত দিন বুঝা না যায়, তত দিন ধর্মযুগলের মধ্যে কাহাকেও অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় না। গোঁড়া এবং ছিদ্রানুগ্ধাঘ্রী উভয়ই মন্দ; কিন্তু ছুই না থাকিলে প্রকৃত কথা ব্যক্ত হয় না। অতএব ন্যায়সম্মত কথা কালসহকারে জীনবল না হয়, এ জনোও কূতর্ক ও কূতর্কীদিগকে আশ্রয় দান করা কর্তব্য।

৩। উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধমত সম্পূর্ণরূপে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত। কিছু গুণ না থাকিলে লোকে কখনই মৃতন মত অবলম্বন করে না। অতএব সেই কণামাত্র সত্য প্রদর্শনের জন্যও বিরুদ্ধ মতকে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যিক। বিভিন্ন মতের উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ন্যায্য কথা থাকে, নতুবা, সর্বমতাবলম্বী অমূলক হইলে তাহা অপকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ সময়, বুদ্ধির পরম সহকারী; অতি মূর্খ ব্যক্তিও কালবিলম্বে কাম্পনিক কথার হেয়তা বুঝিয়া লয়।

একটা মৃতন কথা প্রচার হইলে প্রথমকল্পে নব্য ও প্রাচীনমতাবলম্বীদিগের মধ্যে যোরাতির বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা অল্প দিন পরেই শান্তিলাভ করে। তখন উভয় পক্ষই আপনাপন জয় ও প্রতিপক্ষের গুণ দেখিতে পান। মনুষ্য সর্বদাই নিজের জয় সংশোধনের জন্য সচেষ্ট। এই গুণ না থাকিলে আমরা অদ্যাপি আর্য্য বর্নরাজস্বাস্থ্যতেই থাকিতাম। অতএব প্রচলিত মতের জয় সংশোধন জন্য তাহার বিরোধিদিগকে উৎসাহ দেওয়াই কর্তব্য।

বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু বোধ হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্যভাবেই বৈদিকধর্মের যজ্ঞকালীন-হত্যাকাণ্ড এবং জাতিগণের অনেক দূর খণ্ড হইয়াছিল। এবং শাস্ত্র বৈধবদের বিরোধেই বাম্যচারিদিগের মত প্রায় অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ মিলের বিবেচনায় বিরুদ্ধমত ভ্রান্তই হউক বা অভ্রান্তই হউক, ইহাকে আশ্রয় দিলে সকলেই তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। তদর্থে য য বক্তব্য কথা গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয়। এই রূপে তর্কাতর্কীজননে পট্ট হইলে সকলেই আপন বুদ্ধির এতি নির্ভর করিতে শিখে। কেহ পক্ষের বুদ্ধিতে চলে না, কেহ নিষ্কল্যাণে নিয়মের দাস হইয়া থাকে না। সকলেই য য প্রধান হইয়া থাকে। ইহাতে মনোবৃত্তির উন্নতি ও মানব প্রকৃতির বিভিন্নতা সাধন, ছুই উদ্দেশ্যই বিলক্ষণরূপে সম্পন্ন হয়।

এই স্থলে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সহিত কি প্রণালীতে বিচার করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে কয়েকটা কথা লেখা আবশ্যিক। যুগে বিচার করাই এতদ্দেশের পদ্ধতি। অন্যত্র মনুষ্যবস্ত্রের সাহায্যে লিখিত-বিচারও বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

যুগে বিচারের দোষ এই যে, কোন পক্ষ আপনমত সমর্থন জন্য জেদ্ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে মহসা আন্তরিক বিরোধ এবং ক্ষুব্ধিত বচসা হইয়া উঠে। আমরা সকলে তর্কক সময় মনোপাত কণা গুলি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি না, স্মরণ্য মত্তেরও পরাজয় হইয়া যায়।

আদালতের উকিলদিগের বাদানুবাদ বাচনিক বিচারের আদর্শস্বরূপ। কিন্তু কত সময়ে এক পক্ষের চাতুর্য্যে অপর পক্ষ অকারণ নিরস্তুর হইয়া যান এবং বিচারপতিও অমূলক কথা গ্রাহ্য করেন। পরন্তু উকিলদিগের সহৃদয় গুণ এই যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বচসা কি

আন্তরিক বিরোধ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের ভূট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পক্ষে এই গুণটী অতিশয় বাঞ্ছনীয়।

ইহার কৌশল এই যে, প্রতিপক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবল সেই দোষটীকে বিক্ষিপ্ত করতঃ তদ্বিষয়ে বক্তব্য কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। আদালতে বিচারপতি, ইংরাজি প্রণালীর সভাতে সভাপতি এবং লিখিত বিচারে সর্বসাধারণ সেই তৃতীয় ব্যক্তির পদে অভিমুখ হইয়েন। নতুবা কেবল প্রতিপক্ষকেই সম্বোধন করিয়া বলিলে তিনি এবং বক্তা উভয়েরই মনোমোহিনী বুদ্ধি হইতে পারে। ইহার উদাহরণ এতদ্দেশীয় দলীলদিগ বিচার। এই জন্য একজনকার ভদ্রমণ্ডলী দলদলির বিচারকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজি দলদলির বিলক্ষণ গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা দলদলির স্থলে কেহই আপন মত প্রকাশ করিতে আশঙ্কা করেন না। আমরা গুরুজন, সাহেব, কি স্বজাতীয় উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে সমীহা করিয়া থাকি। এই জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে মূলক বক্তব্য কথা প্রকাশ করিতে পারি না। ইহার এই কারণ অস্বাভাবিক হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যেই এই রূপ সংস্কার আছে যে মতভেদ প্রকাশ করিলে শত্রুতাচরণ করা হইবেক। ফলতঃ ইহাকে ভীরুতার লক্ষণ মনে করা অন্যায্য।

সমগ্রিত বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের অস্বকরণ পূর্বক যে সকল সভা করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদিগের যতাবলিঙ্গদোষ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। সভাতে বিভিন্ন

মত হইলেই যাঁহার। হীনবল, তাঁহার। কোন কথা না বলিয়া কিছু কালের মধ্যে সভ্যপ্রাণী হইতে অসমর গ্রহণ করেন। এত কাল এক বাক্যে শ্রাস্ত পালন করিতে আমরা-কখনই মতভেদ জানিতাম না। একদা অনেক স্থলে বর্তমান-অবস্থাপ্রণে নানাপ্রকার মতভেদ হইয়া উঠিয়াছে; স্বতরাং এতাদৃশ স্থলে কি কর্তব্য, তাহাও শিথিতে পারি নাই। কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজ সংসর্গের আধিক্য বশতঃ মতানত বিষয়ে লোকের স্বতন্ত্রতা পূর্বে-এদেশে অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে। কিন্তু দলবদ্ধ করিলে যে বল হয়, তাহাতে পূর্বেদশবাসিরা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।

বাহাদিগের উদ্দেশ্য এক নহে, তাহার। স্বখনই একত্রে কার্য করিতে পারে না। অতএব সভাপতি বা দলবাহির্যাবর অগ্রে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থির করা কর্তব্য। এবং তাহাতে অবশ্য করিবার পূর্বে আপনাপন মনোগত অভিপ্রায় গুলিও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। উদ্দেশ্য বিষয়ে একা হইতে না পারিলে, সভার দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হইতে পারে না। উদ্দেশ্য মধ্যস্থ মনের গোচরযোগ্য না থাকিলে তাহার সাধনোপায় লইয়া বড় একটা মতভেদ হয় না। উপায় স্থির করিবার সময় স্বত্বভাবানুবর্তিতা কথঞ্চিৎ দমন করিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। বাঙ্গালিদিগের প্রকৃতি এই যে, এক বল-কার্য উপস্থিত না হইলে আপন মত রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে না—কিন্তু জন্মিলে তাহাকে শাসন করিয়া রাখিতে পারে না।

এতদ্বিষয়ে ইউরোপের যুদ্ধ ব্যবসায়ি-দিগের এক মহৎগুণ আছে। যুদ্ধের সময় বিপদ উপস্থিত হইলে প্রধান সৈনিক কর্মচারিরা সমবেত হইয়া পরামর্শ করেন। তৎকালে নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতই প্রকাশ হয়, কিন্তু পরিণামে যে মত স্থির হইয়া যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বিরাও তাহা স্বীকার্য বলিয়া গণ্য করেন এবং একান্তিক-চিত্তে তাহার সম্পাদন করেন। এরূপ স্থলে বাঙ্গালিরা কেহ বা প্রথমতঃ “দাদার মতে” সম্মত হইয়া পরে কার্য সম্পাদন কালে গুণ্ড ভাবে তাহার ব্যাখ্যা জন্মান এবং কেহ বা শিথিলচিত্ত হইয়া বেগার দেন। স্বতরাং আমাদেরিগের কখনই সম্মত হয় না।

উদ্দেশ্য স্থির করিবার সময় অথবা উপায় সংক্রান্ত পরামর্শ কালে স্বতন্ত্রা ধর্মরক্ষাপূর্বক মতকর্ষণ যথ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্তব্য; কিন্তু উপায় স্থির হইবার পরে কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত হইলেও তজ্জন্য জ্ঞান না করিয়া তৎপ্রতি কায়মনোবাক্যে যত্ন করা উচিত; তখন আপন মতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিলে কেবল অনর্থের মূল হয়।

আমাদিগের দলাদলির কার্যবিধান এই যে, তাবতে এক বাক্য না হইলে কোন কর্ম করা হইবেক না। ইংরাজ-দিগের দলাদলিতে অধিকাংশের মত ভাঙতে হয় না। মিল ইংরাজি নিয়মের এক দোষ দেখাইয়াছেন যে, এতদ্বারা অধিকাংশ সংখ্যার অসম্মত প্রাধান্য হইয়া উঠে। আমাদিগের নিয়মে তাহা হইতে পারে না বটে, কিন্তু কার্য

চালান দ্রুত হয়। অথবা পদে পদে দল ভাঙ্গিয়া সকলেই হীনবল হইয়া যায়।

লিখিত বিচার, ইহার গুণ এই যে, অনেক লোকের সহিত একবারে বিচার করা যায়, বক্তব্য কথা গুলি মনে করিবার অনেক সময় পাওয়া যায় এবং গুরুতর বিরোধ জন্মে না। দোষ এই যে, মনের ভাব গোপন করিবার অনেক সুযোগ হয়, স্বতরাং ফাঁকির সমূহ প্রাচুর্য্য ঘটবে। এবং পরস্পরের মুখ দেখিলে মনোনিবেশ পরিষ্কার রূপে অভিপ্রায় গুলি বুঝা যায়, লিপিতে তাহা হইতে পারে না। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত লোকের অভিজ্ঞ জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে লিপিত্তিম উপায়ান্তর নাই। যুজ্জায়ন্তর না থাকিলে লিখিত বিচার চলিতে পারে না, এবং লোকের পাঠ্যরূপে না থাকিলে যুজ্জায়ন্তরের দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে না। আমাদিগের দেশে এখনও যুজ্জায়ন্তরের সম্যক উন্নতি হয় নাই। কেহ এক খানি লিপি লিখিলে সম্মত অভাবে তাহা ছাপান হয় না। ইউরোপে অঞ্চলেও পূর্বে ঐ রূপ হইত। না জানি, কতই কাব্য কবির দারিদ্র্য বশত কীট পতঙ্গের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। দনবান ব্যক্তিরা যশঃ লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। যদি দরিদ্র লেখকদিগের গ্রন্থ ছাপিয়া ভীহার প্রার্থী প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইলে বোধ হয়, কাব্য সহকারে এ দেশেও যুজ্জায়ন্তরের দ্বারা বাসায়ুবাদ চলিতে পারিবেক। ফলতঃ ইংরাজেরা এই রূপ যশকে মা-

মান্য জ্ঞান করেন বলিয়া আমাদেরিগেরও সেইরূপ করা কর্তব্য নহে।

অনন্তর মিল বলিয়াছেন যে, লোককে কেবল মত একাধারে স্থায়ীতা দিলেই হয় না—তদনুসারে কার্য করিতে দেওয়াও অতাবশ্যক। যেখানে অন্যের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ স্থলে কার্য বা মত-প্রকাশ উভয়ই নিবারণ করা উচিত। কিন্তু বাহাতে কেবল কর্তব্য বা মত প্রকাশকের নিজেরই ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে এরূপ করা অন্যায়া।

সকল লোকের অভিক্রিতি সমান নহে, একটা কার্য কাহারও মনে ভাল এবং কোন ব্যক্তির মনে মন্দ, দুই প্রকার বোধ হইতে পারে। ইহা ত, উভয়ের মধ্যে এক জন একটা দোষ এবং অপর ব্যক্তি প্রস্তুতিতে বিষয়ের একটা গুণ দেখিতে পান নাই। যদি সকল দোষ গুণ প্রকাশ হইবার পরে উভয়ে একমতঃ বলয়াই হইয়া, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এক জন যে আপন বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রবৃত্ত হইয়া গিয়াছেন, ইহা কষ্ট দায়ক বাস্তবিক নহে।

কার্য বিষয়েও ঠিক এই রূপ। কেহ এক প্রকার, কেহ অন্য প্রকার স্বত্বকামনা করে। না চৌকিলে কেহই আপনাদিগের দোষ গুণ বুঝিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃতির কিছুই স্বেচ্ছা কর্তব্য নহে, কোন প্রকৃতির ‘লোকের দ্বারা’ পৃথিবীর কি সম্মত হইতে পারে, কি প্রকার আচরণ করিলে লোকের মুখ বৃদ্ধি হইবেক, তাহা কেহই বলিতে পারে না—অতএব ক্ষমারও ক্ষতি না হইলে কোন ব্যক্তির আচরণ গঠিত অথবা তাহার প্রকৃতি

মন্দ বলিয়া, তাহার ইচ্ছারোধ করা কর্তব্য নহে।

এতদ্বিধয়ে ইংরাজদিগের অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলও আমেরিকা এত যে সভ্য, কিন্তু তথায় যদি এক জন মুসলমান কোন রাস্তাতে দাঁড়াইয়া খ্রীষ্টীয়মতের কুৎসা করেন এবং তাৎসলোকিক নমস্কারের অঙ্গুমারী হইতে বলেন, তবে তাঁহার বস্ত্রাদি দূরে থাকুক, হস্তপাদাদি অকৃতভাবে প্রত্যানয়ন করা দৃষ্টরূপ হয়। এতদেশে ইংরাজদিগের আদিপত্তার পূর্বেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা আনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই। আমরা শুনিয়াছি যে এক বার দৈশাখ ঠৈল্লাঠ নামে এখানকার একজন সাহেব কোর্ট পেটলুনের পরিবর্তে ধৃতি চান্দর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা এত দূর সাহস না করিয়া তাঁহার উপরিস্থ সাহেবকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমন করিলে দোষ আছে কি? তিনি বলিলেন, “দোষ আর কি, তবে তোমাকে লুট সাহেব পদচ্যুত করবেন, কি পাগলা গারদে পাঠাইবেন, আমি তাহাই ভাবিতেছি।”

খেজাচারমতে কার্য্য করিবার প্রসঙ্গে মিল বলিয়াছেন যে, ইহাতে কিঞ্চিৎ স্মৃতিযোগ্য হইয়া থাকে, অতএব যদি কার্য্যের ক্ষতি না হয়, তবে লোকে কেনই সেই স্মৃতি বঞ্চিত হইবেক? বেকন বলিয়াছেন যে, কোন স্বীলোক আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শ অস্বীকার পূর্বক বিবাহ করিলে কদাচ দুরভি কি অপূর্ণ পতির

নিন্দা করে না। কথাটা মিথ্যা নয়। অতএব যদি এমনই সমুদায়ের প্রকৃতি, তবে লোককে কেবল পরামর্শ দিয়া দ্বন্দ্বিতা থাকাই কর্তব্য। অজান ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক; কিন্তু যে স্থলে কোন ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে, সেখানে এই বিবেচনা করিতে হইবেক যে, উপদেশপোষ উপদেশক অপেক্ষা দূরদর্শী, অথবা নিভান্ত অদূরদর্শী। দূরদর্শী হইলে কোন কথাই নাই। কিন্তু অদূরদর্শী ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ না দেখিলে জান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানের অভাব থাকিলে পরের সাহায্যে কত দিন চলে? স্বতরাং বল পূর্বক সমুদায়ের দুরভিলায় দ্বন্দ্বিতা রাখা অসম্ভব। যে জন পরামর্শ বুকে না, তাহাকে যেহেতুচাটী হইতে দেওয়াই ভাল। কারণ স্বকর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিলে, পরিণামে তাহার জ্ঞান জন্মবে।

অনন্তর মিল ইউরোপীয় পুরাতত্ত্বের উদাহরণ দিয়া অকারণ আত্মসংযমের দোষ দেখাইয়াছেন।

এতদেশেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, আত্মসংযমই জীবনের সার কর্ম্ম। আমার অম ভাল লাগে, তবে আমার অধীন থাকা ভাল নহে; পীড়া-নাশক না হইলেও আমার আত্মতাগ কর্তব্য।—কেহ বলেন, গুরুসেবার ন্যায় মন্দ নাই; গুরু বাহি বনে, তাহাতে দ্বন্দ্বিতা করা অকর্তব্য। যদি কেহ গুরু অনু-রোধে অশ্রমচারণ করিতে অসম্মত হয়, তবে এরূপ লোকের নিকট তাঁহার অপবশের সীমা থাকে না।—কত সময়ে আত্মীয় অন্তরঙ্গের অনুরোধ ন্যায়বিরুদ্ধ

হইলেও তাহারিগণকে স্পষ্ট বাক্যে “না” বলা অসাধ্য হইয়া উঠে। অনুরোধের স্থলে “আমার ক্ষতি হইবেক,” একথা বলিলেও অব্যাহতি পাওয়া যায়—কিন্তু “অনভিপ্রেত” বলিলে আর রক্ষা থাকে না। যদি বাঙ্গালিরা কেবল কুপ্রভুত্তি ও গুলি ইচ্ছাপূর্ণ মনন করিতে পারিতেন, তবে স্বভাবাবুর্জিতাণ্ডের অভাব জন্য তাদৃশ লুপ্ত থাকিত না। কিন্তু ভাল মন্দ কোন ইচ্ছাই আমাদের সম্পন্ন করিতে পারি না। কত অসন্তোষজনক বস্তু মন্দ হইলেও আমরা তাহা সহ্য করি। এত জন্য রাজদ্বারের আমরা হতদার হইয়াছি।

ফলতঃ মিলের মতে সমুদায়ের মনো-রত্তি গুলি স্বল্পবৎ অসার নহে; তৎসমুদায়ের পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করিলে মঙ্গললায় পরমেশ্বরের মনে অসন্তোষ না জন্মিয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতে পারে।

মোক লাভের জন্য অসৎ কামনা ত্যাগ করা কর্তব্য, ইহাই বলিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অসন্তের সঙ্গে সংগ্রস্তি গুলি-কেও নির্লিপ্ত করেন; তাঁহার প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু শাস্ত্রে মায়াজালের অনেক নিন্দা আছে, কিন্তু সংসারের তাৎসবৃত্তকে মায়াজ্ঞান জান করিলে মুক্তিতে-ছাড়েও জন বলিতে হয়। তুমি যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও রিপু সংযম করিয়া, পরিশেষে পরোপকার ধর্ম্মে পরিণত হই, তোমাকে আর থাকিবে কি? তুমি মুক্তিতে থাকিবে, তোমার পুনর্জন্ম হইবেক না। হে পরমহংস, যদি ইহা সভ্য হয়, তথাপি তুমি নিভান্ত স্বার্থপর। তোমার সঙ্গে আনিগের কোন মঙ্গ-

কই নাই। তুমি মহাপুরুষ; কিন্তু আনি-দিগের পক্ষে তোমার জীবন মৃত্যু দুই ভুলা। আমরা দুর্দহ জীবনভারে ক্লান্ত হইতেছি, কিন্তু তোমাকে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বাহুনির্লিপ্ত কর না। তোমার অঙ্গুণারী-হওয়া সা-মান্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। “এং আমি যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতেও পারি, তবে কেবল আনিই তোমার ন্যায় সেন্দ্রনা শূন্য হইব; কিন্তু আমার পীড়িত জাতি-বর্গের কি হইবে? হে পরমহংস, তুমি ও তোমার উপদেশক উভয়েই অতি নিষ্ঠুর।

হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা ভার। যে ধর্ম্মে একটা পিপিলিকাকে দয়া করিতে উপ-দেষ্ট দেয়, তাহাতেই বলে যে তোমার শ্রীপুত্র কেহই নহে; ইহাদিগের মঙ্গলভুর জন্য উৎকর্ষিত হইও না। কিন্তু যদি অনুপ্রাণ সন্তানগণকে প্রতিপালন করা কর্তব্য হয়, অবলা স্ত্রীভগিনীকে আশ্রয় দেওয়া সমুদায়ের লক্ষণ হয় এবং রক্ত পিতা মাতার সেবা করা মানবজাতির গৌরবের স্থল হয়, তবে আত্মাকে সর্ব-ত্যাগী করা কদাচ কর্তব্য নহে। আত্মাকে পার্থক্য রাখিতে হইলে আত্ম-প্রীতির পরিশীলন করা অত্যাৱশ্যক। এবং বাহ্যতে সংসারের মঙ্গল হয়, সর্বদা সেই চিন্তাতে মগ্ন থাকা কর্তব্য। ভূমণ্ডল মানবজাতির আবাস। যেমন গৃহমস্তার না করিলে লোক বাস করিতে পারে না, সেই রূপ সমুদায়জাতির মঙ্গলার্থ পার্থক্য বিধানে মনোনিবেশ করা অত্যাৱশ্যক। উহা পরিণত্যাগ করিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। অতএব

বিশিষ্ট কারণ বিনা আত্মসংযম করিলে, কোন পুণ্য হয় না।

প্রাণ্ডুক্ত বিষয়ে মিলের পরামর্শ এই যে, সকলকে স্বং মত প্রকাশ করিতে এবং তদনুযায়ী কার্য করিতে দেওয়া উচিত। এতদ্বারা ভ্রাবং লোকের জীবন সার্থক হইবেক।

অনন্তর এই আপত্তি হইতে পারে যে, এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের সীমা কোথায়? মিল ইহার প্রতি উত্তর এই ভাবে দিয়াছেন।

লোকালয়ে থাকিলে সকলেই পরস্পরের নিকট অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। পৃথিবীতে জীবিকা নির্ভাহের তাবৎ পদার্থ বিনিময়ের দ্বারা ই সংযুহীত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মূল্য ও পণ্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। যে দ্রব্য হইতে সহস্রের যত পরিমাণে স্বেচ্ছাং পণ্ডি হয়, তাহাই এ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য। টাকা যে কখনই ধান্যের তুল্য মূল্য হইতে পারে না, তাহা কেবল ছদ্মধর্মের সময়েই জানা যায়। যে মহর্ষি লোকালয় ভাগ করিয়া একাকী গিরি-শৃঙ্খলের ফলমূলদ্বারা করিয়া প্রাণধারণ করেন, তিনিও সহস্র জাতির নিকট অকণী হইতে পারেন না। যত দিন দেহ মধ্যে অন্তরেস্ত্রি ধারণ করিবেন এবং ভিত্তি কল্লীন ভাষ্য প্রয়োগ করিবেন, তত দিন তাঁহাকে অন্তঃত ভাষ্য-প্রণেতা পূর্ণপুরুষধরণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক। শুকদেব গোপস্বামী পৃথিবীর কিছুই জানিতেন না, কিন্তু পৈতৃক ভাষ্য পাইলেন কোথায়? তাহা এক জনের হৃদি নহে,

এবং পুরুষাবুর্জনে সজীব না রাখিলে কেহই তাহা অভ্যাস করিতে পারেন না। অতএব যাহারা ভাষার সৃজন, প্রতিপাদন এবং উন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা সকলেই জনসমাজের স্বগদাতা। যাহারা সমাজে থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই রূপ বহুতর স্বং গ্রহণে বাধ্য হইবেন। সেই স্বং, পরিশোধ জন্য ভাবভেদে, সমাজ রক্ষার চেষ্টা করা কর্তব্য। এবং সমাজ রক্ষার্থ যে সকল ক্ষতি স্বীকার করা আবশ্যিক, তাবৎ লোকেই তাহা সহ্য করিতে বাধ্য আছেন।

এই জন্য মিল বলেন যে, বাহ্যতে অন্য কাহার স্বেচ্ছের ব্যাঘাত হয়, অথবা সমাজ স্বয়ং অধিকাংশ লোকের অস্বস্তি জন্মে, অথবা যেখানে এতোকের কিছু কিছু ক্ষতি বা ক্ষতি সহ্য না করিলে, সমাজ রক্ষা হয় না, এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার এবং স্বয়ভাবাবুর্জিতা নিবারণ জন্য বল-প্রয়োগ করা অনায়াস নহে।

মনে কর, যেন শত্রুজাতির হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষার্থ কোন রাজ্যে বিংশতি বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর ব্যয় তাবৎ অরোগী পুরুষের অন্ত্রধারণ করা আবশ্যিক হইয়াছে—এমত স্থলে প্রাণের আশঙ্কা কিবা পতিপুঞ্জের প্রতি স্নেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক মন্য করা শুভজনক হইতে পারে না।

সর্ব সাধারণ কর্তৃক ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচার প্রতিষেধ বিষয়ে মিল তিনটী স্থল দর্শাইয়াছেন—

১। যেখানে একজনের কার্যের দ্বারা অন্য এক কি অধিক লোকের ক্ষতি হয়।

এরূপ স্থলে মিলের মতে দণ্ডপ্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে।

২। যেখানে এক জনের কার্য এরূপ হয় যে, তাহা দুষ্টি করিলে অন্যের মনে বিরক্তি, ঘৃণা অথবা দয়াবশতঃ তদবিবারণ ইচ্ছা উপস্থিত হয়।

এরূপ স্থলে সকলেই স্বেচ্ছামতে তাহার সংসর্গ ভাগ্য করিতে পারেন এবং তদার্থে অনাকে অস্বরোধও করিতে পারেন অথবা দয়া করিয়া তাহাকে সং-পরামর্শ দিতেও পারেন; কিন্তু দ্বন্দ্বারা তাহার প্রাসিদ্ধান অথবা বসবাসের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এরূপ কোন কার্য করা কর্তব্য নহে।

৩। যেখানে কোন রূপ কার্যের সম্ভাবিত ফল, অপর ব্যক্তির পক্ষে অনর্থকর বলিয়া আশঙ্কার বিষয় হয়।

এরূপ স্থলে সেই সম্ভাবিত দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে পর তাহারই ঠৈত্ব বলিয়া সেই ব্যক্তির স্বেচ্ছাযোগ্য দণ্ডবিধান হইতে পারে। নতুবা অন্য কোন কার্যকে সেই ঘটনার মূল অনুমান পূর্বক এ কার্যকে মুখ্য দোষ গণ্য করা এবং তজ্জন্য সেই ব্যক্তিকে নিগ্রহ কৃত্য কর্তব্য নহে।

এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্বে তাহা অনিশ্চিত বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। এবং এসম্মে মিল জনসমাজের একটী দোষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে কোন অপরাধী হউক, সে তরুণবয়সে অপরাধী সর্বতোভাবে সমাজের কর্তৃত্বশালীন থাকে। তখন অন্যান্য লোকের স্বেচ্ছামত তাহার চরিত্র সংস্কারের চেষ্টা করা হয়; সেই চেষ্টা বিফল না হইলে সেই ব্যক্তি কখনই সমাজ বহির্ভূত আচরণ করে

না। অতএব যদি সম্ভাবিত ফলের জন্য কোন প্রকার আচরণ দৃশ্যগীয় হয়, তবে সেই সমাজনির্দ্দিত আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দেখি।

সমাজ আশ্রয়কার জন্য অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিয়া থাকেন। 'দৈবনির্দ্দ্য-তন করা দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য নহে; অতএব যাবৎ ক্ষতি দৃষ্ট না হয়, তাবৎ কাহারও প্রতি দণ্ডবিধান করা অনায়াস। কারণ ভাবী ক্ষতির বিষয় মনুষ্যের অনুমান নিরূপ্ত অনিশ্চিত। ক্ষতি বল যে, কল্যাণকালে বিবাহ না দিলে ব্যাভিচার দোষ ঘটিবেক; আনি দিলে যে, তাহা নহে, বরং অপ্রাপ্তবয়সে পত্নীত্বপদ পাওয়াতে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটতেছে এবং কল্যাকের শততা না বুঝিতে পারিয়া সহসা কুপথগামিনী হইতেছে। অতএব ইহার সীমাসার উপায় কি? প্রত্যক্ষ ফল নির্ণয়ের দ্বারা যখন কারকের গুণাগুণ নিরূপ্ত হইবেক, তখন স্বেচ্ছামতে আমাতে মতভেদ থাকিবে না। কিন্তু আপাততঃ বলপ্রয়োগ করিলে উভয় দিকেই দোষ। যদি আমি তোমার প্রতি এই জোর করি যে, যৌবনের পূর্বে তোমার কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না—তবে কন্যা কালে বিবাহ দিবার ফল প্রত্যক্ষ হইবেক না। আবার তোমার গতাহুসারে কার্য হওয়াতে জী-জী চিরকাল অক্লবায় শিশুর মায় থাকিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি পরিণত হইলে সমাজের কি কি মঙ্গল হইতে পারে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন প্রকার দণ্ডবিধি না থাকাই ভাল। কিন্তু যাবৎ এক

পক্ষের অম দুরীকৃত না হইবেক, তাবৎ পরস্পরের দোষাশুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে হইবেক।

পরিব্রাজ্যে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, মিল স্বভাবাবলম্বিতা বিষয়ে যে কোন বিশ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সর্বাভ্যাস জাতিগণেরই উপযোগী, এই কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রোণীর মধ্যে গণ্য কিনা, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ হইতে পারে। আর মিলের

মতই যে সর্বস্ববাদী সম্মত, একথাও বলা যায় না; অন্য কি, লেখক নিজেই এই প্রবেশের সকল কথা আন্তরিক অবলম্বন করেন না। কিন্তু মিল অতি প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার মত সর্বসাধারণের গোচর হইলে কোন একরকম অসম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে ভাবে এই বিষয়ের অবলম্বন করিয়াছেন, সেই ভাবেই এই প্রবেশ লিখিত হইয়াছে।

বিবরণ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যোগ্যত্ব যোগ্যত্ব যোগ্যত্ব।

হারদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আশ্রিত হঠাৎ দেবেস্রবাস হইয়া বসিল। পাশে এক দিগে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্য শূন্যলদলমালাময়ী, কলকল কল্লোলনিবিনাদিনী, আলবোলা স্বন্দরী দীপ্ত ওষ্ঠ চুম্বন্যর্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাতার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর এক দিগে ক্ষটিক পাঞ্চে, হেমাক্ষী একশাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার

ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট যুগ্মাঙ্গীর মত, এক জন চাকর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। ছল্লা বলিতেছে, “দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!” একশাকুমারী বলিতেছে, আগে “আমায় আদর কর” দেখ, আমি কেনন রাস্তা! ছি! ছি! আগে আমায় খাও!” প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, “আমি যার, তাকে একটু দিও।”

দেবেস্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাঁহার প্রেম পুঁজিয়া উঠিতে লাগিল। একশাকুমারীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাতায় উঠিতে লাগিল। যুগ্মাঙ্গীর মহাশয়ের নাককে পরিত্যক্ত করিলেন—নাক ছই চারি পেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভূতোরা নাসিকাপিকার

বঙ্গবর্ননের চতুর্থ সংখ্যায় বিবরণের যে কয়টা পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ভ্রম ক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ পর্যন্ত লিখিত হওয়া উচিত ছিল।

রিক “গুরু মহাশয়” করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আগিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেস্রের কাছে বসিলেন, এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, “আবার আঁজি ভুঁমি কোথায় গিয়াছিল?”

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কানে গিয়েছে?

হু। এই তোমার আর একটা ভ্রম। ভুঁমি মনে কর, সব ভুঁমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম! আমি কাহাকেও লুকাতে চাহি না—কোন শালাকে লুকাব?

হু। সেও একটা বাহাছুর মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আগাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর ভুঁমি বৈষ্ণবী সঙ্গে গ্রামে ঢলাতে বাও?

দে। কিন্তু কেনন রসের বৈষ্ণবী, দাদা! রসকলিত দেখে, ঘুরে পড়োনি ত?

হু। আমি সে পোড়ার মুখ দেখি নাই, দেখিলে ছই চারুকৈ বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবীরা ভুঁতে দিতাম।

পরে দেবেস্রের হস্ত হইতে মদ্যপাণ কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, “এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে ছোটো কথা শুন। তার পর গিলো।”

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটা চট্টা দেখি—ইহমতীর বাতাস পায়ে লেগেছে না কি?

সুরেন্দ্র হৃদয়ের কথায় কর্ণপাত না

করিয়া বলিলেন, “বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্বনাশ করবার জন্য?”

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তাহা মাষ্টারের বিদ্যে ইয়েছিল এত দেবকন্য়ার সঙ্গে? সেই দেবকন্য়া এখন বিধবা হয়ে গায়ের দত্তবাকী রেখে যায়। তাই তাকে দেখতে গিয়াছিলাম।

হু। কেন, এত দুরত্বিতেও চট্টা জ্বালান নী যে, সে অনাথা ঝিলিকের অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ, দেবেস্র, ভুঁমি এত পাণ্ডিত্য, এত বড় শূন্যস, এমন অত্যাচারী, যে বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র একপা দাড়া সহকারে এই কথা বলিলেন, যে দেবেস্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে গোষ্ঠীয় সহকারে কহিলেন;—

“ভুঁমি আমার উপর রাগি করিও না। আমার চিহ্ন আমার বশ নহে। আমি সকল ভাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ভাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে ভ্রাতাচরণের মুখে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষু এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণায় রোগিকে দাহ করে, সেই অবধি উহার জন্য লীলাঙ্গ আমাকে সেইরূপ দাহ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এপর্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী সন্ধ্যায় সকল হইয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত দানবী।”

সু। তবে বাও কেন ?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা বহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সভা বলিতেছি—উপস্থান করিতেছি না। তুমি যদি এই ছুপ্রসঙ্গি ভাগ না করিবে—তুমি বলি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। আমি অন্ধকে বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকেও যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কৃন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক! তোমার সঙ্গে আমার এই পর্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া মুরেস্স ছুগথিতচিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেস্স, একমাত্র বন্ধুবন্ধুহেঁদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, কিয়ৎকাল বিবর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, “হুর হউক! এ সংসারে কে কার! “আমিই আমার!” এই বলিয়া পাশ্চাত্য করিয়া, ত্রাণি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তগ্রহ-জ্ঞতা জগিত। তখন দেবেস্স, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদ্রিয়া পান ধরিলেন।

আমার নাম ধীরে মালিনী।

আমি থাকি রাখার কুণ্ডে, কুজ আমার নন্দিনী।

রাখ বসে চন্দ্রাবলি,

তুমি আমার কমল কলি,

শুনেন কীচক মেরে কুজ,

উজ্জয়িনী বাজসেনী।

আর একজন কোথা হতে গায়িল;—
আমার নাম ধীরে মালিনী।

মাতঙ্গ হরে বাচাল হলো, দেখিতে নারি
আমি ধনী।

দেবেস্স জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, “বাহ! তুমি ধনী কে? তুত না প্রেতিভী?”

তখন ঠুন। ঠুন। কখন! প্রেতিভী! আসিয়া রাবুর কাছে বসিল। প্রেতিভীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে মুকতা; কাঁকালে গোড়; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আভর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। দেবেস্স প্রেতিভীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন।

চিনিতে পারিলেন না। চুপিত মদের কোঁকে বলিলেন, “বাবা, কোন্ গাছে থেকে?” আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেই রূপ স্বরে বলিলেন,

“তুমি কাদের পেতনীর গা?” শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন,

“পারলেম না বাপ! আজ ফিরে বাও, অমাবস্যায় লুচি পঁটা দিয়ে গুজো দেব—বাও বাপ! আজ একটু কেবল ত্রাণি খেয়ে বাও,” এই বলিয়া মদ্যপ আগভা

স্ত্রীলোকের মুখের কাছে ত্রাণির গেলান ধরিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল, এবং মুছহাসি হাসিয়া বৃহদন্ত দেবেস্সকে জিজ্ঞাসা করিল;—

“ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি?”

তখন মাতাল বলিল, “বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গায়ের দত্ত বাড়ীর পেতনীর নাকি?” এই বলিয়া আবার আলো

স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিকে আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে হীরাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া পান ধরিল—“তুমি কে বট হে, তোমায় চেনই করি—কোথাও দেখেছি হে!”

হীরা কহিল, “আমি হীরা।”

“Hurrah! Three Cheers for হীরা!” বলিয়া মাতাল লাকাটয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া রাস হস্তে তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল;—

“নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

যা দেবী বটপুংসেবু জ্যায়রূপেব সখ্যিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

যা দেবী দন্তপুংসেবু হীরারূপেব সখ্যিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

যাদেবী পুরুষাটেন চুপ্তিহস্তেন সখ্যিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

যাদেবী ঘরদ্বারেবু পঁটা। হস্তেন সখ্যিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

যাদেবী ময়ূপসেবু পোষ্যরূপেব সখ্যিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ।

তার পর—মালিনী। মাসি—কি মনে কোরে?”

হীরা ইতি পূর্বেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল, যে হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেস্স বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কোন দেবেস্স বৈষ্ণবী বেশে দণ্ডযুগে যাতায়াত করিতেছে। এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনেই অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সন্মুখে স্বয়ং দেবেস্সের ঘূষে আসিল। মনেই হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক,

আগুনে হউক, সে অপরিহার্য সত্যই ধর্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্নত দেবেস্সের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত মুহূর্ত আর, কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, “মনে কোরে আর কি? দস্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিন ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত বধুতে এয়েছি।”

শুনিয়া বাবু পান ধরিলেন।
“আমার আঁটা ঘরে সিধ মেরেছে, কোন ডাকাতির এ ডাকতি।
মৌবনের জেল খানাতের রাখতো তারে
দিবা রাতি।

মন বাকশ তার লজ্জা তুলো।
কল কোরে তার ভাগলে ডালো,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাক্তা বাকশে মেরে নাতি।

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি,
গিয়েছি বাঁপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়,
কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দ কলি!—
Three Cheers for কুন্দনন্দিনী!

বন্দ্যতে মদজাতিকং। কুন্দনন্দিনী-দ্বি-দ্বি-দ্বি-নী! বলিয়াই গীত।

কুন্দকলি মদ বলি নিজে করে ভাল ভু-মরা—

তবে—যেই বনের মেঠো মালিনী
মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাঁঠে থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠিয়েছে? মনে গড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরতি!

হীরা বিখ্যাত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিল;—

“এত দিনের পীরিত, তাহা জানিতেন না। প্রথম পীরিত হেলা কেনন কৈতে?”

দে। জ্ঞারে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, মধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেস্ত তখন একপাখি ট্রাণ্ডি হীয়ার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তার পর।”

দে। তার পর তোমাদের গিল্লীর জুলিয়া দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে বাতায়ত করিতেছি। ছুড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম কুশলে এয়েছি, তাতে ছাড়িয়া না—না হবে কেন—আসি দেবেস্ত।—অহং দেবেস্ত বাবু—হেউ! শিখে হো ছল ভেলা নুট নাগর—তার পর বালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃপ্রণাম।

হীরা প্রাণ্যবরুদ্ধ কহু হইতে দেবেস্তের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। গরে হাসি সহ্য করিয়া বলিল, “রাজি চের হইল, এখন প্রণাম হই।” এই বলিয়া, হীরা মুহূর্ত্ত হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল। দেবেস্ত তখন, ঝিমঝিম মা-রিয়া গাটিতে লাগিল;—

বরষ তাহার বহুর ঘোষ,
দেখতে শুনতে কালে কালে,
পিলে অণু মাসে মোলে,
আমি তখন খানার পোড়ে।

যেহেছিল বলদ একটা,
সেহেঁচো এক মোড়ার চোড়ে।

সে রাতে হীরা আর দস্তবাড়ী গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট, দেবেস্তের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের রত্নান্ত বিরত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেস্ত কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবী বেশে বাতায়ত করিতেছে।

শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাক্ষা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে, শিরা ফুলতা প্রাণ হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন;—

“কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর উপপতি। তুই-যা, তা জানিলাম। আমরা এখন স্ত্রীলোককে বাড়িতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।”

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয্যা গৃহে লইয়া গেলেন। শয্যা গৃহে থাকিয়া আদর করিয়া মাঝুদী করিলেন, এবং বলিলেন, “বউ বাহা বলে, বলুক; আসি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।”

অটোদশ পরিচ্ছেদ ।

অনাখিনি।

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকল নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহভাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশ বর্ষীয়া, অনাখিনি সুংসার সমুদ্রে একাকিনী বাঁপ দিল।

রাজি অভ্যস্ত অন্ধকার। অপ্পং মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দস্তদিগের বাটার বাহির হয় নাই। কোন দিকে কোথা যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর, কোথায়ই বা যাইবে?

অটালিকার রহৎ অন্ধকারময় কায়া, আঁকোনের গায়ে লাগিয়া, বহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেটন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার ন-গেন্দ্রনাথের শয়ন কক্ষের বাতায়ন পথের আলো দেখিয়া যায়। এক বার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু-জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—কিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সান্দী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে অবশেষ করিতে না পারিয়া, কীচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী যুদ্ধ লোচনে সেই গবাক্ষ পথপ্রতিরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের অন্তর্য্যে কতক গুলি দ-বাউ গাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সমুখ করিয়া বসিল। রাজি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে-খোদোতের চাকচিকা মহত্বের ফুটিতেছে, হুদিতেছে, হুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাঁহার পশ্চাৎ আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপ-শ্চাতে আরও কালো। আকাশে ছুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখন মেঘে ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। বাড়ীর চারি দিকে বাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আ-কাশে মাতা ভুলিয়া, নিশাচর পিশা-চের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অন্ধে থাকিয়া, তাহার আপন-বৈশাচী ডাবায় কুন্দনন্দিনীর মাতার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাজির ভয়ে, অপ্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিত বায়ুর শব্দালনে, গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাজ আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কাল পেচা সৌম্যপুত্র বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিত একটা কুকুর, অন্য পশু দেখিয়া, সমুখ দিয়া অতি দ্রুত বেগে ছুটিতেছে। কদাচিত স্বাউ-য়ের পূর্বব অথবা ফল, খসিয়া পড়িতেছে। দূর নারিকেল রক্ষের অন্ধকার, শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ হেলিতেছে; দূর হইতে ভাল রক্ষের পজের তরং মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; মর্দোপরি

সেই বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গমল ফিরিয়াং জ্বলিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকেই চাহিয়া বহিল।

দীপের একটা-গবাকের সান্নিধ্য খুলিল। এক মল্লধার্ম্যুর্জি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি এই ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুন্দমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক পক্ষে দেখিয়া, তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ ছুপ! ছুপ! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতো পাইতে—যদি জানিতো পারিতো, যে তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার স্বপ্ন হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের নিগেপশাখা কুরিয়া দাঁড়াইয়াছে—একবার দীপ সমুখে করিয়া ভাঙাও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় ছুগধিনী। দাঁড়াও—তাঁহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর বহু শীতল বারি—তাঁহার তলে নক্ষত্রস্রোত—তাঁহার আর মনে পড়িবে না।

এ শুন! কাল পেচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিছাও! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। এ দেখ, আবার কালো মেঘ পাবনে ঢাপিয়া যেন যুদ্ধে ছুটিতেছে। বড় রক্ত হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক মূর্ত্ত করিয়াছ, বাকের পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পড়িয়া মরে! কুন্দ তাই

চায়। মনে করিতেছে, “আমি পুষ্করিণী—মরিলাম না কেন?”

নগেন্দ্র সান্নিধ্য বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাজি আগিয়া কাজ নাই—নিজ্ঞা বাও—শরীর অস্থির হইবে। কুন্দনন্দিনী মনে, মরুক। তোমার মাতা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কান্না না এই।

এখন আলোকময় গবাক যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, ঢাকের জল বুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সমুখে যে পক্ষ পাইল—সেই পক্ষে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সরন্ত শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কোথায় বাও?” ভালগাছেরা তরন্ত শব্দ করিয়া বলিল, “কোথায় বাও?” পেচক গুস্তীর নাদে বলিল, “কোথায় বাও?” উজ্জ্বল গবাক শ্রেণী বলিতে লাগিল, “যায় বাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না!” তবু কুন্দনন্দিনী—নির্দোষ কুন্দনন্দিনী, ফিরিয়াং সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

ও স্বর্গ্যমুখি! রথস্রি! ওঠ! দেখ আপনান্নর কীর্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও!

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাজি করিল—বিছাও হালিল—আবার হালিল—আবার! বায়ু গর্জাইল, মেঘ গর্জাইল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জাইল। আকাশ আর রাজি একত্র হইয়া গর্জাইল। কুন্দ! কুন্দ! কোথায় যাইবে? বড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি

উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট পিট!—পট পট!—ছুছ! রক্ত আসিল, একবসনা কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিছাতের আলোকে পথপার্শ্বে কুন্দ একটি সামান্য পুং দেখিল। গৃহের ভিত্তিপার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরে ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া, তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকট বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কানে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, বড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটি কুকুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। মন্দ আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীন স্ত্রীলোক-

মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, “কে গা তুমি?” কুন্দ কথা কহিল না। “কেরে মাগি!”

“কুন্দ বলিল, ‘হৃষ্টিয় জন্ম দাঁড়াইয়াছি।’

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, “কি? কি? কি? আবার বল ত!” কুন্দ বলিল, “হৃষ্টিয় জন্ম দাঁড়াইয়াছি।”

গৃহস্থ বলিল, “ও গল, যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এসো ত।”

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, “বুঝিয়াছ, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এই খানে ছই দিন থাক।”

ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ক্রীমছাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে শূররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের বর্ণিকণ্ড বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, “মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্যবান কুয়ার মহাপ্রজা নন্দির জন্ম হইবে। তাহার সময় হইতে ক্ষত্রীয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের কর কলস হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য

বীর্য্য প্রভাবে একছত্র ধরণীমণ্ডলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভাগবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সম্মুখ প্রভৃতি অটপুত্র জগদ্রথ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কোটিল্য নামক জটনক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নন্দবংশ ধ্বংস হইবে এবং তৎকর্ত্তক ময়ূরীয়া নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। রূহৎকথা নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরধিপতি

হৃদেবের পিতামহীর মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে, চানকা পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে চন্দ্র গুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ক্ষয় এবং রাক্ষসের অশ্রুপরায়ণতার সহিত উভয় বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত মহাদেবের মুরা নামী নীচজাতীয়া দাসী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলীপুত্র নগরী ইহার রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম কুম্ভনপুর লিখিত আছে। বায়ুপুরাণের মতাহুসারে কুম্ভনপুর বা পাটলীপুত্র, অজ্ঞাত শত্ৰুর পৌত্র রাজা উদয় কর্তৃক নির্গত হইয়াছিল, কিন্তু মহাবংশের বর্ণনানুসারে উদয়, অজ্ঞাত শত্ৰুর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদীতীরে স্থাপিত ছিল, শতভায়া আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। অথবা বহায়া চন্দ্র গুপ্ত পঞ্চাবে অবস্থিত করিতেন, ও এই প্রদেশে-তক্ষশিলানিবাসী চানকা পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্ব হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু নৃপতিগণের সহযোগে আলেকজান্ডারের গ্রীক সৈন্যগণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু ভূপালবর্গের একতানিবন্ধন আলেকজান্ডারের নায় দিগ্‌জয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাদিকার করিতে পারেন নাই। কেবল গুপ্তাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্র গুপ্ত পাটলীপুত্রের

সিংহাসনারোহণ করিলে চানকাকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্যো হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিনাক্স সিরিয় হইতে বহু সৈন্য সমভিবাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র গুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সৈন্য আত্মভূমি পরিত্যাগ করেন—এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপিত হয়। তাঁহার একটী রূপলব্যাবধী ছুঁতাতাকে চন্দ্র গুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যখনকন্যা সামরে গ্রহণ পূর্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাণ লেখক স্ত্রাবো ও বিথ্য একান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাথিনিস্ গ্রীক রাজকূট স্মরণ, পাটলীপুত্রে অবস্থিত করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীকগণের সহিত চন্দ্র গুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বন্ধন হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সেল্যাকসের সমীপে সর্বদা বহু মূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যখন ইতিহাস লেখক জস্তিন, প্লুতার্ক, অরিয়ান প্রভৃতি স্বত ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোব্রজরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিম্বসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্য-

কালে গ্রীকরাজদূত দোনিয়স্, নৃপতি টলমিসিলেদেলফস কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিম্বসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবন্ধনকে তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন। তিনি ঋশ্যনামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শায়ন কর্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিম্বসারের মৃত্যু হইল। এবং অশোক রাজ্য লাভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল জাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিষ্ঠুরতর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য করার তাঁহাকে সকলে চণ্ডাশোক বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যহ ৬০০০০ যক্ষি-সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধ যতিগণের সহিত সর্দভা ধর্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতো হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০০০০ যক্ষি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ৬৪০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তি-সহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ক্রমে তিরোহিত এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ সন্মানিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪০০০ বিহার এবং কীর্তিস্তম্ভ চারুকাবয়ের সকল স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা কাশী, অয়্যাপ এবং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করি-

য়াছি। একই খণ্ড অন্তর নির্মিত স্বর্দ্বীপ স্তম্ভের অঙ্কে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ, ধর্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম প্রচার, প্রভৃতি সংকার্য্য করিতে অজ্ঞাতবর্গের প্রতি নৃপতি অশোকের আজ্ঞা, খোদিত রহিয়াছে। অশোককে অজ্ঞান অসীম ভক্তি করিত, এবং তিনিও তাহা দিগকে পূজ্যৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং তাহার দেশ-পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিত পালিভাষা লিপি কারুকে কর্মদাগির নামক অত্রি অশ্ব শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আস্তোকুম্, টলেমিস, অস্তিগোনস এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। ও সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের এক উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈরিরিয়া, চীন, ত্রি, প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক যতিগণকে “যবনধর্ম রক্ষিত” বলিত। ধর্মপ্রচারকগণ অকৃত্যভয়ে স্রষ্টাপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতেন। এই রূপ বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার, হওয়াতে পাণকার্য্য এককালে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল। চন্দ্রগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারত ভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত অন্তর-নির্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে অশোক, পালিভাষায় “দেবানাম পিয়-পয়দশি” অর্থাৎ দেব-

তার গ্রিগ প্রিয়দর্শী এবং ধর্মান্যায়ক নামে খ্যাত ছিলেন। খ্রীপ বংশে এবং মহাবংশে লিখিত আছে, অশোকপুত্র নৃপমহেন্দ্র ইত্যেয়, উভয়ে, সম্ভব, ভাঙ্গ শাল নামক স্থানের সমভিব্যাহারে সিংহল দ্বীপে পৌত্তোরোগে গমন করিয়া তাঁহার পুত্রতাত নৃপতি তিয়া এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে বগদদেশে বৌদ্ধ আচার্যগণের তিনটি সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাকা সিংহের উপদেশ স্বত্বনিয়ম সূচীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধবোধ নামক জৈনে মৌখিক ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকাপালিভাষায় সিংহলদ্বীপবাসীগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৩১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মহাভাষ্য পুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর মগুরীয় গুপ্ত জন বৌদ্ধ নৃপতি স্বত্ববল্লভে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার হীনবল হইয়া আসিলে, সম্ভবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রে সিংহাসনাধিকার করেন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পসিদ্ধ ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবীভূতি সম্ভবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কন্বংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এসময় হিন্দু ধর্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীরণ হইয়া বৌদ্ধ ধর্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারত-

বর্ষের একেধর হইতে পারেন নাই। মগধরাজা কিছুকাল গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১১ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অঙ্গের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর বাট এস্তরে প্রবেশিত লিপি পাঠ্য অবগত হওয়া যায়, “মহারাজ অরিরাজ” সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্ত বংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শক্তবর্ণের কৃতান্ত-স্বরূপ এবং সম্বন্ধের সাক্ষ্য জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম জিজ্ঞাস্যে সিংহল, সোরাট্রি, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এক্ষণ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক রাজ্য ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উল্লান্ধীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকল-কাব্য, নাটক, প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দু নৃপতি আসীন ছিলেন, তাঁহার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম জুবন-বিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়াস সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন জন্ম-বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর স্বত্ব রাজ্য করিয়া ৩৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগর-রাধিপতি ভোজ রাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে “সরস্বতী কঠোরণ” নামক প্রসিদ্ধ অনলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বাল্লাবর্ত “ভোজপ্রবন্ধে” লিখিত আছে, “ধারানগরে কোন মূর্খ ছিল না। শ্রীমদ ভোজরাজকে সতত বরুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বাসুদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিশোদক, কাকিল, তারেঙ্গ প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকেন।” পাল বংশীয়, এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপাল-বর্ষ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ সংস্কৃত কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিচয়-বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্র শাসন, প্রস্তর ফলকে প্রবেশিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীন, দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়াস সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ক্ষেপ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল নিজ মহোদয় তাম্র শাসন পত্র হইতে ক-দ্রিয় প্রেত, “সোম বংশীয়” গৌড়

দেশস্থ সেনরাজাদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্বসাধারণের জন্য নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার জন্ম হইবে না। কলীকিহাঙ্গ ১০৭ খৃষ্টাব্দে সেন বংশোপাধ্যানে, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে রাজতরঙ্গিনী অতীত প্রামাণিক। কাশ্মীর দেশের পুরাণতঃ ইহার প্রথমংশ। ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে ইতিহাস কল্লণ পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়ংশ রাজাবলী যোগরাজ কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়ংশ যোগরাজদ্বারা দ্বিতীয় পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থংশ প্রজাভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর-প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহ আলমের রাজ্য শাসন পর্যন্ত বিবরণ সংগ্রহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীর দেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মুকর্যক সাহেব কাশ্মীর নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আশিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশে একত্রে মুদ্রিত হয়। পারিস নগরীতে ট্রায় সাহেব ও ইহার ক্রিয়দংশ ফ্রেন্স ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কল্লণ প্রণীত প্রথমংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগ্রহীত হইয়াছে। ১১৫৫ খ্রীঃ অব্দে কল্লণ, চম্পকনগর সিংহদেব ভূপ-

তির কাশ্মীর শাসন কালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নীলপুরণ ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ, ধর্ম শাস্ত্র, তন্ত্র শাসন পত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কল্লণ রাজ-তুর্জিনীর প্রবন্ধে পৌরাণিক বিবরণ, তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃপূঃ যোনন্দ ভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৯৯ শকে সংগ্রাম-দেবের রাজ্য শাসন পর্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজ জীহবেব রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিদ-শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতা-দিত্য মধ্যআসিয়া পর্যন্ত জয় করিয়া ছিলেন, এবং গোপাদিত্য নরেন্দ্রাদিত্য

রগাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্তৃক অতি স্বনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানি মাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা-সদ জটনৈক ব্রাহ্মণের রচিত দ্বিতীয় বংশাবলী চরিত। কবিবর ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মানু সিংহ রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তরফলক ও তাম্র শাসনে যে সকল প্রধান ভারত-বর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম।

দেবনিজা ।

কোন মহামতি মানবদ্বন্দ্বান,
বুদ্ধিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল হাসনানলে;—
“অবনী তাজিয়া অমর-আলরে
প্রবেশি দেখিব দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, ছতশশন,
বায়ু, হরি, হর, মহালবাহন,
দেখিব ভাসিছে কারণ জ্বলে।

“দেখিব কারণ মলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া,
পরমাণু-রেণু সমগ্র হয়ে।
দেখিব কিরূপে আয়ুর মঞ্চর,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতখরপ,

নিয়তি-শৃঙ্খল, দেখিব কিরূপ”—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

“আর রে মানব” হলো দৈবজনি,
বাঞ্ছিল দুন্দুভি, ডাকিল অশনি,
গুলিল অমর-আলয় হার;
ভুটিল আলোক ত্রিলোক পুরিরা,
অপূর্ণ দৌরভ জগত ব্যাপিরা
অরুণ রহিল,—প্রবণ ভগ্নিল
অমর-সঙ্গীত সুখার হার।

মানবনন্দন, অমরভবনে,
আসিয়া তখন প্লকিত মনে,
বেশিল চাছিয়া অমরালয়;
গগনমণ্ডলে নিয়ত কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,

দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরিচয়গণ করিয়া অকার,
মাখিছে বাদন মাধুরীমর।

জলিছে তপন গগন-প্রাঙ্গণে,
অনল-সমুদ্র যেন বা কিরণে,
শিখার তরঙ্গ ছুটে বেড়ায়।
দেখিল আনন্দে তাহাতে আসিয়া,
সুবর্ণ-কলম কিরণে পুষ্টিয়া,
দৈত্যমুতাগণ করে পলায়ন,
কিরণরচ্ছ হেঁচু করিয়া ধারণ,
আদিত্য বাধিছে গুহের গায়।

আদিত্য যেহিরা চলেছে ঘুরিয়া,
বিদুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুখার হ্রদ;
সে হ্রদ-মুখাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়বিদুর, অমর ব্যথাতে,
অন্যথা অমর দানবমণ্ডলী,
কুলেতে বসিয়া হয়ে কুঁহুহলী,
ভুঞ্জিছে অমিয়া মধুর মদ।

মুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিশমণ্ডলে দৌরভ বয়।—
অমর নীরব, মাছি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুব
সঙ্গীত স্মরিছে, ত্রিদিব পুরিছে,—
“শান্তি—শান্তি” শবদ হয়।

দেব অটালিকা চন্দ্রাতপ তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা-বদনে ভাতি;
অপূর্ণ শরনে মুখে নিদ্রা যায়,
পদন্তলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ যুগায়,
চৌমক যেহিরা দামিনী বেড়ায়,
গুহুর প্রভৃতি মেঘের পাতি।

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাঙ্কর
যুগায় অকারে, গুলিয়া সুন্দর
নহসু কিরণ কিরীটী ভূষা।
ধরিয়া কিরণ-বরণ সুবমা,
জলধনু তনু জিনিরা উপমা,
শেখত, পীত, নীল, রক্তিয়া মল্লভে,
সুবর্ণ করিয়া পাড়িছে অন্ধেতে—
নিকটে ম্যন্দন; অরুণ, উষা।

খুলে মুগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোমোহন,
শশাঙ্গ ভাসিছে কিরণ জ্বলে।
সে তনু দেখিতে কিরণ-কুমার,
শত শত মল, অপূর্ণ আকার,
রদেছে দাঁড়য়ে দ্বিসায়ে ধুন্দুরা—
সুখার মুগুছে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অমৃত পালে।

শশীতনুহতা পড়িছে উথলি;
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেঘ, মন্দাকিনী, তরু—চূড়ায়;
কুমুদ আকৃতি অঙ্গুরা, কিম্বদী,
কর, বর, ক্রোড়ে, বাসা যন্ত্র ধরি,
শ্রুয়ে সারি সারি লতা গুপ্ত পরে,
বিমল চন্দ্রমা কিরণে বিছরে,—
মন্দারীকুমুদে সচী যুগায়।

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
মহা মানব মণ্ডলে চকিত,
শ্রলিল গদ্যদ্রু জীমুতমান।
দেখিল আতঙ্কে, নয়ন ফিরিয়া
গগন উপাঙ্গে, একত্রে মিশিরা,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি ছাঁদ।

অধঃতলে তার, অনধঃস্থিতার,
কারণ জ্বলি পুণি বীতিহার,

‘উখলিছে রঙ্গে, জড়াবে তরঙ্গে
অনন্ত প্রবাহে বহিছে তার।
গম্বরে গম্বরে, উপকূল ধারে,
ভ্রমণে জলধীর মল্লক প্রধারে,
ছিঁড়িতে বন্ধন শৃঙ্খল তার।

১৪

উপকূল ধারে, অমল কুণ্ডেতে,
শিখর প্রমাণ, শিখর শৃঙেতে,
অমল উঠিছে গগনতালে,
জুটিয়া পর্বনে, গভীর গম্বুজে,
যেন ঐরাবত, কর আকর্ষণে,
জল-স্বত্মরি শৃঙেতে উগরি,
ফেলিছে কুলিছে জলজ্বালে।

১৫

কারুণ্যমাগরে, পরমাশু করে,
অনাদি—পুরুষ বসি ধ্যান করে,
হাতিছে নিশ্বাস—জমিয়া তার,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড জুটিয়া,
অদীম অনন্ত, আকাশে উঠিয়া,
জুটিছে জললক্ষ্মীর প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুধাভী,
বর্গ, মর্গ কত, অক্ষুট মুরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারুণ্য জলে;—
কত বসুধাভী, রবি, শশী, তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপ হারা,
খসিয়া পড়িছে, মলিলে ডুবিছে,
কারুণ্য-বারিষি অরল ভলে।

১৭

সে বারিষি নীরে এসেছে মিশিয়া,
দেখিল দ্যাব পূলকে পুরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুল আশ্রয়;
বহিছে বিধারে, বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা পরে, মানব-আকারে,
কতই পরাণী ভাসিছে তার।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুধারী কেহ, কারো করতলে

দেখনি, পুষ্পক জড়ান রয়।
বিদিশ জড়িয়া দেবতা নিমিত্ত,
মুদ্রি ইহার জগতে জাগৃত,
“মা তৈ—দী তৈ” গভীর উচ্চাসে,
যজ্ঞাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে,—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

দে নরমণ্ডলে মানব কুমার,
যজ্ঞাতি হেরিল কঁঠ আপনার,
পুলকে পুরিল ঘোহিত হয়ে;—
বাছিল দুন্দুভি, মহা রামনি,
মুদ্রি গগনে হলো দৈববাণী,—
“দেখরে, মানব, এ দিকে চেরে।”

২০

দেখিল চমকি কালেনদীতরে,
গভীর চিন্তায় চলে ধীরে ধীরে,
বাছিয়া বিদ্যায় বোধীর ধারা,
“মা তৈ” নিদ্রা শ্রুতিতে শ্রুতিতে,
মানব ক জন, পুলকিত চিত্তে,
বেবতনু-হুটা বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে পশ্চাতে করি জয়ধ্বনি,
চলেছে মানব, মানবনন্দিনী,
তুরি, শঙ্খনাদে পুরিছে অবনী,
মাগর কমলোলে উঠিছে গীত;
উঠিছে শব্দীত নিদ্রা গভীর—
হোক না কেন এ মাটির শরীর,
মানবের জাতি হবে না ত ধীন,
তারা, সূর্য্য, শশী আছে যত দিন—
তবে রে, মানব, কেন ভাবিত ?
ডুকিছে আবার আনন্দ আরবে—
“সময় বিজয়ী আর জীব মরে,”
“গাহিয়া আনন্দে অমর গীত।—

২২

‘দৈব অংশে জঘ, পর দেবমালা,
‘কর মর্গভূমি জগতে উজ্জ্বলা;
‘ননুজারি তেজে অবনী—অক্লান্তে,
‘কর সিংহনাদ বিজয় শেখোতে,

“জাগরু জগতে মানব নাম;
জাগরু ত্রিবিদে দেবতামণ্ডলী,
মানব গরুড় হয়ে কুতুহলী,
দেখুক চাহিয়া, ভবিষ্য শুলকা,
ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম।”

২৩

সে গীতের সহ ঘনি ঘনি যারে,
বাজে শৃঙ্গনার, শুনিল অস্থির,
দেখিল চাহিয়া মরুকারী,
শত শত নলে, মানব সকলে,
করে সিংহমদ, মহা গর্গে চলে,
বলে উজ্জ্বল্যে এ ধরা মণ্ডলে—
“বাহীনতা সম কি আছে আর।”

২৪

“বাহীনতা তরে দেবাসুর যারে
“কোরে ঘোর রণ, অমরা ভিতরে,
“দৈত্য কুলনাশ করে, মুগ মালা
“পরে মহাকালী, ননুজারিবালা,
“নিদ্রিত্য করিয়া অমর বাস।
“বাহীনতা শুনে, এ মর ভরনে,
“কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
“গেল বর্গে চলি, দিগা নরবলি,
“অবনী-মানবে করিয়া নাশ।

২৫

“এ মর্ত্য পুরীতে সেই ধন্য জাতি,
“বাহীনতা—জ্যোতি বদনেতে ভাঙি,
“তেজোবর্ধি ধরি থাকে নিজ বাসে,
“করে গুহ, দারা, প্রাণের হরবে,
“হাসিতে, কান্ডিতে করে না ভয়।
“করে না কখন পাদ্যার্থ দান
“পর পদ-তলে, হয়ে মুরমাণ,
“কৃত-গুলি করে, ভীকৃতার যারে,
“বলে না কখন বাতকে জয়।

২৬

“কার তরে বল এখন সম্বল,
“অরে পরাধীন, পরেরি সকল,
“দারা, পুত্র, গৃহ কি হবে তোরা।
“বাহীনতা বিনে, আলায় বিপিনে,

“জীবনের মুখ, পারিবে পারিবে—
“দিবস, শরৎ, কলি যোর।”

২৭

কুমুদিত তনু, কদম্বের প্রাচ,
মানবনন্দনে দেখে পুনরাত,
সেই জ্যোতির্ময় দেব-আকৃতি;
আবার ক জন, প্রজ্বল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করেছ ধারণ,
করেছ ধারণ বাস, জলধারা,
শনি, কুণ্ড, বুধ, বসু, গৃহ, অরা,
রাহু, রবি, কৈতু, শশীরা পরিধি,
কেহ না পরেছে পৃথিবী, জলধি,—
গাহিছে নিমগ্ন নিয়ম-দীতি।

২৮

“তেজোপিন্দব, ধূম, বাস্প মায়া,(১)
“ছিল এ ধরণী বাত, স্বপ্নালয়,
“করে মুখমর, মীন, কুম্ববাস,
“ত্বন, তরু, মুগ, মনুর আবাস,—
“মাজিল ধরণী অপূর্ণ কার।
“চল চল বাই পৃথিবীর সনে,
“দ্বিবারক পাশে দেখিব গগনে,
“এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
“চারি চক্ষু শোভা যবে রূক্ষপতি;
“জ্যোতি-উপবীত পরে মহোদর,
“লয়ে সপ্ত শর্শা ভূমে শনৈশ্চর,
“ভূমে কেতুম্বালা তপনে বেড়িয়া,
“অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া;—
“তারক-কুমুদ জড়ান যায়।

২৯

“ধরিব গগনে পর্বনের গতি,
“তরল বায়ুতে শব্দ-মুরতি
“রাখিব-রবিধি, দেখিব শুলিকা
“রবির কিরণ গঠন-প্রথা;
“আনিব নামারে ভীষ্ম অশনি,
“পৃথিবী উপরে,—বাসবশিখিনী

(১) একধরকার বৈজ্ঞানিকগণের মতে, আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও স্থির হয় নাই।

“ধর্মের সুন্দর দামিনী-সুতা।
“চল চল বাই পৃথিবীর মনে,
“দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
“তারকা কুমুদ ছন্দে তার।”

গাথিতে গাথিতে চলছে সকলে
এই মহাশীত, ভীম কোলাহলে,—
নিরতি শৃঙ্খল ছিড়িয়া পায়।
(অসম্পূর্ণ।)

বঙ্গদেশের কৃষক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—দেশের ঐতিহ্য।
আজি কালি বড় গোল গুনা যায় যে,
আমাদের দেশের বড় ঐতিহ্য হইতেছে।
এত কাল আমাদের দেশ উচ্চ যাই-
তেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসন কো-
শলে আমরা সজা হইতেছি। আমাদের
দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? এ দেখ, লৌহবয়ে লৌহভুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাক বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। এ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গ-মালায় দিগপঙ্ক ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নি-ময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্রাব আক্রান্ত হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সম্বাদ দিল, তুমি রাগি-মধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুণে ডাক্তার তাহা আরাম করিল। যে ছুনিবংগ, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অটলিগায় হইয়া এখন

হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাধ ভল্লুকের আবাস ছিল। এ যে দেখিতেছ, রাজ-পথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাসিয়া পড়িয়া থাকিত, না হয় দম্য-হস্তে প্রাণত্যাগ করিত; এখন সেখানে গায়েব প্রভাবে কোটিচক্র ঘলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাখি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া মণ ছিঁড়, এখন সেখানে কার্পেট, কোচ, ছাদ, কাগজমালা, বারবেল, আলা-বাটোর,—কত বলির? যে বাবু দুর্বীন করিয়া রহুপতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে, তিনি এত দিন চাল কালা ধূপ দীপ দিয়া রহুপতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগ্য, চোয়ানের বসিয়া হুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া ভুলটনাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছি কি না,

সেই কচিতে মাভা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা আচ্ছ, কাহার এত মঙ্গল? এ যে হাসিম শেখ, আর রামা, কৈবর্ত ছুই গ্রহের মতো, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁট কাদার উপর দিয়া ছুইটা অস্তিত্বেরাবশিষ্ট বন্দে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চসিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাজের রোঁতে মাভা কাটিয়া যাই-তেছে, তুম্বায় ছোঁতে ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজনা অঞ্জলি করিয়া না-ঠের কর্ণন পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ কচা হইবে না, এই চাসের-সময়। সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহার ভাঙ্গা পাতের রাস্তা বড় ভাত, লুন লম্বা দিয়া আঁপ পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাছুরে, না হয়, জুয়ে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পর দিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁট কাদার কাজ করিতে যাইবে—খাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বদাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চণিবার সময় জমীদার জমীদারি কা-ডিয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপ-বাস— বল দেখি, চম্বা নাকে রান্না, ইহার কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধি-

য়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহার! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে, হংস পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কপনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভয়রক্ষা শাও-গুচ্ছ কণ্ডুগিত করিতেছ—তুমি বল দেখি, যে তোমার হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি, অল্পমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হলুদনিম্ব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এড়ি কৃষিকীর কয়জন? তাহাদের তাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহা প্রায় দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকীর। তোমাইতে আমরা হইতে—কোন কার্য হইতে পারে? কিন্তু মকল কৃষিকীর ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের ঐতিহ্য হইতেছে, ধীকার করি। আমরা এই অবশ্যে একটা উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে ঐতিহ্য হইতেছে। পূর্বে দেখা-ইব যে, কৃষকেরা সে ঐতিহ্যের ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকার রাজ্য দখলিগত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহার করিবে, সে দ্বন্দ্বাঙ্ক বাহক হইতে রহিত হইয়াছে। আবার বঙ্গদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পর-

স্পর্শে যে সন্ধিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভাণ্ড অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্তা-ভীতি, চৌর ভীতি, বলবানকর্তৃক চুর্য-লের সম্পত্তি হরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা এজার-সন্ধিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সম্পত্তি অপহরণ করিলেন, সে দিনও নাই। অতএব যত্নি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে মর্যাদা ভঙ্গসারী হয়। যেখানে পরিবার প্রতিপালনশক্তি মধ্যস্থে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসার ধর্ম বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অসুস্থতার ফল প্রজারাজি। অতএব ব্রিটিশ শাসনে প্রজারাজি হইয়াছে। প্রজারাজির ফল, কৃষিকার্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্তৃত্ব হইবে,—কেননা অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিগ্রহ স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি প্রতিষ্ঠিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজারাজি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেননা যে ভূমির উৎপাদে লক্ষ লোক মাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে

দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজারাজি হইলেই চাস বাড়িবে। যাহা পূর্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজারাজি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ণাঙ্গাঞ্চল এক্ষণে অনেক ভূমি কর্তৃত্ব হইতেছে।

আর এক কারণে চাসের রজি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য-রজি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অল্পকে বলিবেন, “টাকা,” তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর জম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের মুদ্রা। কিন্তু সে টাকা, ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্তসামগ্রীর কোন অংশের মূল্য কিনা, সম্ভব। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য মূল্য পাঠাই—বস্ত্র, চাউল, রেশম, কাপড়, পাট, নীল, ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যরজি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিকা আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাসও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাস বাড়িতেছে।

চাস রজির ফল কি? দেশের ধন-রজি—প্রজারাজি। যদি পূর্বে ১০০ বিঘা জমী চাস করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকিত, তবে ২০০ বিঘা চাস করিলে, স্থান্যধিক ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাস করিলে, তিন শত টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিনে দুই চাসের রজিতে, দেশের কৃষিজাত-ধনরজি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহা-চুঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্শ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নিশ্চয় করিয়া অনেককেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় চুঞ্চনীয়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্মান্বিত যুগ—দেশে উচ্ছন্ন গেল। ইহা যে গুরুতর জর্জ, তাহা মুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, ত্রয়ো বর্তমান সাধারণ দৌর্শ্বল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনা এক মন চাউল পাওয়া বাহিত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে এক মন তিন মের হুত ছিল; সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্ত্রত চাউল বা হুত দুর্শ্বল হইয়াছে, টাকা মূল্য হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন

টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সম্ভব নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের রজি হইয়াছে।

আবার পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্তৃত্ব ভূমিরও অধিকা হইয়াছে। তবে দুই প্রকারের কৃষিজাত আয়ের রজি হইয়াছে; প্রথম, কর্তৃত্ব ভূমির আধিক্য, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য রজিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘার মূল্য টাকা, দুই, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর দুই টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ রজি হইয়াছে, বলিলে অতুক্তি হইবে না। এই দেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়, আবার দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০-৭১ শালের ষে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্যাদ্যক্ষ সাহেব লিখেন,

• সুসম্মতবিরোধী কৃষকবন, এখানে “সুসম্মিত” শব্দটি যাহার কৃষিকার্য বিশেষ তাৎপর্য আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠক এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

১৭৯৩ শালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা আয় পাওয়া ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা আয় আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আর রক্তি কি? শত্বে সাহেব রক্তির কারণ সকলই নির্দেশ করিয়াছেন—যথা, ভৌমিক বন্দোবস্ত, লাংবোজ বাজ্ঞাপ্ত, স্তনন “পয়শ্বি” জুমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর রক্তি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, এই সকল রক্তি বাধা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু, শত্বে সাহেব দেখাইয়াছেন, এই রক্তি-নিয়ন্ত্রিতরূপে হইতেছে। পূর্বা-বধারিত করের উপর বেশী বাধা এক্ষণে গবর্নমেন্ট প্রাইভেটছেন—সাড়ে বাথি লক্ষ টাকা—তাঁহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে বাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কটমহোসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শত্বে সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনের অধিকাংশই বণিক এবং মহাজন-দিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, স্তনন মহাজনের ভাতও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের

লাভ স্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, কৃষিজাত ধনের রক্তির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শত্বে সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শত্বে সাহেবের একার নহে। “ইক-নমিক্ট” এই মন্তাবলধী। “ইকনমিক্টর” আ-ই গুয়ান অবজরবের” নিকট প্রংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামিরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্বাধীন; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারেন? স্তনরায় যে বেশী খাজানা বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-সংখ্যা রক্তি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন অংশ নাই বটে, কিন্তু ইহা অস্ত্র-ভরের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজারক্তি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে জুমির আগে-শত জন প্রার্থী ছিল, প্রজারক্তি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রাসা কৈবর্তের জমীদার ভাল, সে এক টাকা হার খাজানা দেয়। হাসিম শেখ, সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হার খাজানা

করিতেছে। জমীদার রাসাকে উঠিতে বলিলেন। রাসার হয় ত, দখলের অধিকার নাই, সে অমন উঠিল। নয় ত, অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিধা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এই রূপে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন স্থানেও না কোন স্থানেও, দেশের অধিকাংশ জুমির হার রক্তি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই—বাজারে যেক্ষণ প্রাহকরক্তি হইলে বিজ্ঞা পটেলের দর বাড়ি, প্রজারক্তিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই রক্তি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরীখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে। আইন—সে একটি ভাসমা মাত্র—বড় মাঝেই খরচ করিয়া সে ভাসমা দেখিয়া থাকে। নিরীখ পূর্ব-বর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম—তাঁহার আর একটি নাম দ্বার্পণরতা। যত দূর স্কু ফিরে, তত দূরে ফেরান। যখন আর ফিরে না, তখন দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়। স্কু ফিরিয়া ফিরিয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্জিত কার্য্য আর ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমীদার

রায় যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুগুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের রক্তির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক পায়েন, মহাজন পায়েন—কুমীর কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। কিন্তু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। বাধা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপাদে তাহার দিন চল না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়াই নধো। যার ধন, তার ধন নয়। বাস্তব মাত্রার কালখাস চুটুটি ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অন্তস্তত্ত্ব ঐরূপ হইয়াছে। অসাধারণ কৃষি-লব্ধী দেশের প্রতি স্পষ্টমাত্র। তাঁহার রূপায় অর্থ বর্ধন হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই ঐরূপে রাজা ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই ঐরূপ। কেবল কৃষকের ঐরূপ নাই। সহস্র লোকের মধো কেবল নয় শত নিরানন্দের জনের তাহাতে ঐরূপ নাই। এমত ঐরূপের জন্য যে জয়সমি তুলিতে চাহে, ভুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানন্দের জনের ঐরূপ না দেখিলে আমি কাহারও জয় গান করিব না।

* আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চিরকালের নহেন। অনেকের ঘরাই দয়া ধর্ম আছে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা।

অনুষ্ঠান পত্র।

“জ্ঞানঃ পরতরো নহি।”

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অস্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইবেছে, তাহা জ্ঞানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যদ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান শাস্ত্র কহে।

২। পূর্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমৃদ্ধির ও চর্চা ছিল, তাহার ছুরি ছুরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অনেকগুলির প্রধান বীজেরূপে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্বেদ, সামাজিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষিপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অস্থলীন নিত্য আবশ্যক হইয়াছে; তদ্বিনিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আস্থান করিয়া বিজ্ঞান অস্থলীন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও শঙ্কমুক্ত করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জাননায়ক প্রাচীনগ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আত্মসিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অল্পরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যিকরূপে গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাহারা এক্ষণে বিজ্ঞানাত্মক করিতেছেন, কিংবা যাহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিনাবী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিনাব পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিগণকে বিজ্ঞানচর্চা করিতে আস্থান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভাভ্যুদয়ী ও উন্নতিস্থ জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা আপন আপন ধনের বিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁ-

হাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাহারা স্বাক্ষর করিতে কিংবা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাধারে গৃহীত হইবে।

অস্থলীন

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।

অস্থলীনপত্রের। সাতটি ধারা ক্রমে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে আমাদেবের বাহা ব্যক্তব্য, তাহা বলিব।

১। “বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অস্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়।”

নিদাহ ঋতুতে নিশানাথহীন নিশাকালে উক্ত প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া—একবার গ্রহ নক্ষত্র, তারকা বিকীরিত মন্দাকিনী মধ্য প্রবাহিত—গগনপ্রাচুর্যে দৃষ্টি উৎকণ্ঠ কর। সেই অমল নীলিমা, সেই অনন্তবিস্তৃত, সেই অসংখ্য জলন্ত বিদ্যুৎপাতাঙ্ঘ্রীকৃত শোভা, সেই অক্ষুট স্বেত কলেবরা স্বর্ণ মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত দিগুলায় ব্যাপী সেই মহাগর্ভ ত্র্যম্বক ও কটাহ ‘দেখিলে বিশ্বায় পরিপূরিত মনে আপনা আপন জিজ্ঞাসা করিবে, এ গুলি কি? কোথা হইতে আসিল? কি নিয়মে আকাশে বিচরণ করিতেছে?

আধুনিক বিখ্যাতনামা দার্শনিকেরা বলেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের অর্থ নাই। ঈশ্বরবাদীরা বলেন, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—‘আস্তিকতার প্রশ্ন হইল।’ তোমার শেষ প্রশ্ন যে বিজ্ঞান পরিত্যাগের প্রশ্ন নাকুর, তদ্বিয়ে ছুই মত নাই।

ভূমি ভাস্কিতে লাগিলে, কি নিয়মে ইহারা আকাশে বিচরণ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে এক দিনে, দুই দিনে, এক মাসে, দুই মাসে দেখিতে দেখিতে জ্ঞাননিতে পারিল যে, ঐ আকাশে ‘সকল নক্ষত্রই অমলশীল; কেবল একটাই স্থির। ঐ স্থির তারটি ধ্রুবনক্ষত্র। সেটি সর্বদাই উত্তরে আছে। এত দিনে ভূমি একটী সামান্য জ্যোতিষ নিয়ম পরিজ্ঞাত হইলে, সামান্য নিয়মপরিজ্ঞানেই কত মহৎ উপকার দর্শিতে পারে! দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের পক্ষে এই সামান্য সভাটি অন্ধকার রাত্রিতে কত উপকার সাধন করে। এক্ষণে জটিল নিয়ম সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে কত ফল দর্শিতে পারে।

কত ফল ফলিতেছে, তাহা ‘আমরা এক্ষণে অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তি বিজ্ঞানবেত্তার সহিত রায় রাজার তুলনা করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষমতার পরিচয় প্রদান’ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ‘মহর্ষি বাম্বীকি দ্বৌ-কং দশাবসের অসীম প্রভাপ বর্ণনয়ক কবিশ্রুতল রূপনাবলে অমরগণকে তাঁহার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া লঙ্কাধিপতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তার প্রভুত্ব এই ‘কম্পনা-প্রভুত্ব’ রাবণের প্রভাপ অপেক্ষা সমধিক শ্রোণীয়। সভ্য বুঢ়ে, দশানন কৈন দেবকে মালাকর কার্যে, কাহাকেও বা অশ্বসবক কর্ণে, কাহাকেও বা গৃহ পরিষ্কারক দাসে, নানা কার্যে নানা দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তা কি করিতেছেন? তিনি বাম্পরুপী ইন্দ্রদেবকে মায়াময়কটাকালে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দেবকন্যা' ক্ষণপ্রভা তাঁহার প্রভা লুকাইয়া বিদ্বানের সম্বাদবাহিনীভাবে অবিরত সম্বাদ বহন করিতেছেন। অসীম-প্রভা প্রভাকর অন্তরীলে থাকিয়া নির্ভর করে সম্বাদবাহিনী ছায়ায় সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমক্ষে লিপিকর কার্যে ব্যাপৃত আছেন। পৃথিবী দেবী, দিকপাল বরুণ, পবনরাজ, সকলকেই তিনি 'দাসদে' আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার কখন বিদ্বানের ক্ষুদ্র-রক্তি জন্য ময়দা ভাঙিতেছেন, কখন শীত নিবারণ জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, কখন কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন, কখন উষ্ম প্রস্তুত করিতেছেন। কভু বা বিজ্ঞানবিৎকে স্নেহে করিয়া ঘর্ণনালোকে লইয়া যাইতেছেন। কখন পুষ্পক মুদ্রিত করিয়া আনিয়া বিদ্বানকে উপলোকন দিতেছেন। কখন বা তাঁহার প্রমোদ-ভবনে, রাজবস্ত্রে 'আলো' খালিতেছেন। কি বিদ্যালয়ে কি গৃহকার্যে কি বিচারালয়ে কি ধর্ম মন্দিরে একাকী, সজন, অমরণ, সকল কালেই সকল অবস্থাতেই বিজ্ঞান বিতরে ক্রীতদাস। হরিদ্বারমাগর প্রবাহিতা ভাগীরথীকে ভগীরথ তাঁহার জন্যই অবনীতলে আনিয়া ছিলেন। সেই ভাগীরথী তাঁহার জল পরিচারিকা, তাঁহার অত্যাধীন জন্য-অগন্ত্য দুনি বিজ্ঞাচলকে অবনত করিয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। হিমালয় বিদ্বানের জন্যই স্বকীয় আগারে তুষার ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন। বনস্পতিগণ তাঁহার জন্য ফল-ভর বনশ করি। খনি তাঁহার জন্য উদরে করিয়া বহু স্ফূট ধাতু ধারণ করে। এখন "রত্নাকর হয়েছেন দাস, কুবের তাঁর আজাকারী"—দর্শনান সময়-

ক্ষেত্রে দেবগণের সহায়তা পান নাই। বিদ্বানের সময়ক্ষেত্রে যখন অগ্নিদেব লোহাগোলক বাহন-বিপক্ষদলে মহামার উৎপাদন করিতেছেন। তাহাতেই বলি কম্পিত বায়ুগোপনা আধুনিক বিদ্বানের প্রভুত্ব অধিকতর প্রাচীন। কবিগুরু রাক্ষসীক কলিকালে পুনঃপ্রভূত হইয়া যখন বিদ্বানের 'নিকটে' রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। ভাষাবিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক মৌলরূপী ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্বার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অবতার। রাবণগৌরবেলোপী, প্রতাপশালী—শিবিক সমুদ্র পরোপকারী পরমযোগীর ন্যায় দৃঢ় নিবন্ধ, সর্বদাই হৃদয় ও সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট।

এই বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপীয়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, বিলাতে খাদ্য সামগ্রী অতি দ্রুত লা, প্রচণ্ডপঞ্জীবীণ "আমার" বলিতে পারে, "আমার পুর্নপুরুষের" বলিতে পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বিলাতে কার্পাসতুলা 'এক ছটাক পরি-লিতে উৎপন্ন হয় না; হয় আমেরিকা নয় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতীয়েরা তুলা আমদানি করেন। অথচ যন্ত্র বিজ্ঞানের এমন ক্ষমতা, মাফেক্টরের তন্ত্বায়েরা লক্ষ্যহীন ভারতের লক্ষ্য নিবারণ করিতেছে। লাক্ষ্যশায়েরে হৃদ্বিক হইল, আর যে দেশে ঢাকা আছে, শান্তিপুর শিলেই কলমে আছে, বাগুচর বাগার আছে, বুকের পাটনা আছে, কাজিকট কাশ্মীর আছে, মহীশ্বর অম্বরসহর আছে—সেই দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মন

তুলা প্রতি বর্ষে উৎপন্ন হয়, যেখানে তন্ত্বায়কে লিপিকর ভাস্কর বা স্থত্ধার অপেক্ষা অধিক প্রভু করে, সেই দেশে, যে দেশের তন্ত্বজ্ঞাত রোম সম্রাটের রাজ পরিচ্ছদ ছিল, যে দেশের সহিত বস্ত্রবিদ্যা ব্যবসায় ত্রুতী থাকিয়া মধ্য-কালে বিনিয়নগর সমৃদ্ধিশালী হয়—সেই দেশে লাক্ষ্যশায়েরে হৃদ্বিক হইল বলিয়া, হা বস্ত্র' যো বস্ত্র শব্দে 'বর্ণ' বস্ত্র হইয়া যাইতে লাগিল।

হা অমৃত! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিদ্বানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজ্ঞে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজ্ঞিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। মনে করুন, কোথাকার অমরকে কোথায় পরিচ্ছদকট হইল। ঐশ্বর্যশালী বিজ্ঞান স্বীয় অমাননা জন্য এই রূপে বৈরসাধন করিল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষা গ্রহণ কর।

অনেকে বলেন, ইউরোপীয়েরা কেবল বাহ্যবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বাহ্যবলেই বলুন, আর যাঁহা বলুন; যে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অনুরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাটিও অত্যুক্তি দোষে দুষিত কখনই বলিয়া যাইতে পারেন না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন। বিজ্ঞানেই সত্য চালনা করিয়াই বিদেশীয় বণিকদিগকে ভারত-ভীত অনয়ন করেন, বিজ্ঞানেই নানা যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন—এখনও বিজ্ঞান সহায়সমকট বাহনে, ভূভিৎ-

তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়ো-গোলক বর্ধনে এই বীরপ্রত্ন ভারত-ভূমি হস্তাগলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রম-শঃই নির্ভর করিতেছে। যে বিজ্ঞান যদেশী হইলে আমাদের 'দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন-দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিশিখারায় আজীবন-বাসী স্রুতিখির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারত-ভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিশিখালা মাত্র। দ্বিতীয় ধারার কথা, এমংগাথ তদু-ল্লিখিত শাস্ত্র সকলের কি প্রকার সমা-লোচন ছিল, দেখা যাউক।

জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বিজ্ঞান শাস্ত্র বটে, কিন্তু প্রাচীন বৈদ্য। পুত্ররাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা দুঃকৃত। ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ব্রহ্ম-দেশীয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ তালিকা পঞ্জি-কার প্রাচীনত্ব-দ্বয়ে স্রাসী ও বিলাতি পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগ্ বিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি স্বীকার কর, যজ্ঞাতীর গৌরব হানিকর বিবেচনা করেন।

হিন্দুজাতি অথবা আর্যেরাই যে জ্যোতিষধর্মের প্রথম পর্যাবেকক, নিয়-মাত্রসম্বায়ক ও তত্ত্বোদ্ভাবক, তাহা ভা-ষাবিজ্ঞানবিৎগণের অবশ্য স্বীকার্য। যে গণ্ডখির উল্লেখ পুর্বে করিয়াছি, তাহাকে ইউরোপীয়গণ উর্ব মেজর বা রহৎ ভুলক বলেন। প্রাচীন বেদেও

সমুদ্র শব্দের স্থলে স্বক (ভল্লুক) শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় যে কচ্ছাভূতর্য অর্থ দ্রুতি। এ ভাষায় কষ্টি অতিশয় উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতা দেখিয়া দ্রুতিবাক্য কোন নাম দিয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্লুক বোধ করা ও আকার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত দ্রুত বোধ হয়। ও এইরূপ করা কেবল অর্য্যগণেরই সম্ভব হইতে পারে। হিন্দুরা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ আলোক-বীক্ষণ প্রভৃতি কাচ বক্সের সাহায্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা করে। যাহা যাহা যেন সকল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামান্য নব-দীপপঞ্জিকা সেই বিজ্ঞানের স্ফুটসংবেশে মাজ।

দিবানন্দ, ব্রাহ্মান, তিথিয়ান নির্ণয়, চন্দ্রসূত্রের উদয়াস্ত নির্ধারণ—এই নক্ষত্র সঙ্গার ক্রিয়া স্থির করা, অয়ন গ্রহণ ও সংক্রমণ গণনা—সে সকল এখন অতি জন সঙ্কল হইক না কেন, লুপ্তবিজ্ঞানের স্ফুট চিহ্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন জীবিতবিজ্ঞান নাই, তাহার স্থানে কৃতকগুলি অকৃতক পিতৃমাতৃশূন্য দুর্লভ সঙ্কেত আছে মাজ। বিজ্ঞান বলে আর্ঘ্য ভট্ট পৃথিবীর অক্ষরেখার তিথ্যভাব অবধারণ করিয়াছিলেন ও তাহার পরিমাণ সাক্ষ্য তেইশ অংশে নির্ধারণ করেন। আর এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানামিতামানীরা সামান্য সূর্য গ্রহণ গণনায় এক দণ্ড বা দুই দণ্ড ভুল করিয়া বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলেন। যদি বাপুদেবশাস্ত্রী না থাকিতেন, ত কি লঙ্কার কথা হইত! ইচ্ছা ছিল, পুন্সৌলিখিত বিজ্ঞান গুলি

ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া একে একে সকল গুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করি, এবং ক্রমে দৈর্ঘ্যভাষ্যে তাহা করিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দুই চারি কথা লেখা যাইতেছে।

বীজগণিত। কিক করা কড়বা, স্থির করিতে না পারিয়া লোকে সম্রাটের বে বনিয়া থাকে, “আমি অস্ত্রিরপক্ষে পণ্ডিত-য়াছি।” সেই অস্ত্রির পক্ষ বীজগণিতান্ত-গত এক প্রকার অস্ত্র। যে অস্ত্র প্রাচীন বীজগণিতে অতি শীঘ্র সমাধা হইতে পারে। আর যে অস্ত্র যুগ্মনী দেশে দো-লক্ষ প্রথম উদ্ভাবন করেন, ও সেই জন্য যাহাকে দ্যোফান্টাস বলে, যাহা সমুদ্র শতাব্দীতে প্রথম সিদ্ধ হয়, তাহাও হিন্দু বীজগণিত মধ্যে আমরা শুনিয়াছি। যে দেশে দ্যোফান্টাসের বহু পূর্বে দ্যোফান্টাস কট সাধ্য হইতে, সেই দেশীয় শৌভক্লরিক বীরগণ সামান্য ভাষ্যে “এক পরিত-প্রমাণ দেউল” দেখিয়া শ্লোকোক্ত বীর তাহা ভাবিতে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হ-য়েন। (১) তথাপি আশা করিবার অনেক স্থান আছে, কেননা আবার সেই দেশেই হইতেছে যে দিল্লী কলেজ সুবিখ্যাত অধ্যাপক রামচন্দ্র স্বীয় অ-পূর্ব গ্রন্থ “গরিমা লম্বিমা” প্রচার দ্বারা বিলাতীয় বিখ্যাতনামা ডিমরগণ বৈজ্ঞা-

(১) আছিল দেউল এক পরিত-প্রমাণ।
কোথ করি তাকে তাহা পবন নক্ষত্র।
অর্ধেক পক্ষেতে তার তোহাই সলিলে।
এখন কোণের ভাগ সেখানেই মলে।
উপরে বায়াম গাছ দেখে বিদ্যমান।
করহ সুবোধ সাব দেউল প্রমাণ।

নিকেরও বিশ্বয় উপাদান করিয়াছেন। ও ক্ষুদ্রা প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভরসা এই, যদি মরুভূমি মধ্যে আমরা একপ বটরূপ দেখিতে পাইলাম, তাহা হইলে কর্তব্য ক্ষেত্রে উৎসাহবারি সেচনে ভারতভূমি কম্প-তর বা কম্পলতাই উপাদান করিবে।

মিশ্রগণিত। মিশ্রগণিতে অজ্ঞাতনিব-দ্ধন কত অনর্থ হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? আমরা উদাহরণ জন্য একটি সামান্য অনর্থের উল্লেখ করিতেছি। মানদণ্ডের (পোলার দাঁ-তির) উভয় নীমা সমান্তর হইতে সমান ব্যবধানে স্থিত না থাকিলে মানদণ্ড জলতলের সহিত সমান্তরাল হইবে না, অর্থাৎ এক দিক অন্য দিক অপেক্ষা কিছু বোকা হইবে। এই রূপ স্থলে যে দিক উচ্চ হইয়াছে, সেই দিকে পাঠে কিছু তার দেওয়া অর্থাৎ পায়ণ ভাঙ্গিয়া ওজন দেওয়ার প্রথা আছে, কখন ফেরে ফেরে অর্থাৎ দুই সের দ্রব্য দিতে হইলে এক সের বোকা দিকে ওজন করিয়া আর এক সের উচ্চ দিকে ওজন করিয়া দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু একরূপ ফেরে ফেরে মাগে সর্বদাই বিকৃতার ক্ষতি হইয়া থাকে। এক্ষণি মিশ্রগণিতের একটি সামান্য মত। সমাজগণ যখন স্বরতি পা-ত্ৰিত শুভি বলিয়া মান স্থানতানির মাধ্যম করিবেন, তখন বিজ্ঞান অবহ-লাকে কিছু অংশ দিলে সভ্যদীর কার্য্যকরেন।

প্রথাগণিত। লীলাবতী গ্রন্থই রেখা-গণিত চর্চায় প্রচুর প্রমাণ। লীলা-

বতী ভারতের গৌরবও বটে, ভারতের কলঙ্কও বটে। কোঙ্কিমুর হীক মুসল-মান সমুদ্রগণের গৌরব চিহ্নও বটে; কলঙ্কমণিও বটে। লীলাবতী শঙ্করা-ল্লোকে আমাদের একটি কথা যেন পণ্ডি-তির, আমরা সেইটাই এই স্থানে বলিয়া পাঠকে হাসিতে বা কাদিতে অস্বাভাব্য করি না। এক দিন; দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটকের কথা হইতেছিল। বাঙ্গালি, যিনি পিরাম গায়ে দেন, তিনিই সমালোচক। এক জন বিজ্ঞ সমালোচক এক জন আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বল-লেন, “এই খনার স্ত্রী লীলাবতী বজ- (Mathematician) ছিলেন; দীনবন্ধু বাবুর উরি বিষয়ে নাটক লিখেছেন। এই পাঁচটা মিষ্ট কথা বার্তা আর কি?” আমরা উপস্থিত ছিলাম; হাসি কাদি নাই। তাহাতেই কাহাকেও হাসিতে বা কাদিতে বলি না। হা দীনবন্ধু! ভাক-রাচার্য্য! লীলাবতী! নাটক! কাব্য! মত! সমালোচনা! তোমাদের এই দশা হইল! কলঙ্কিত লীলাবতী যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কখনই লঙ্কার সমালোচন শুনিতে হইত না।

আর্য্যসংদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব। এ-গুলি সমুদ্রের কেবল শরীরধারণ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন ভারতে এগুলির বিশেষ সমাদর ছিল। অজ-ঠাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের সার্ময়িক আয়ুর্বেদ পণ্ডে তাহার প্রচুর প্রণাম পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ অহুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এত যে অধঃপাতে গিয়াছে—ইয়ুরোপীয় অতি পানদর্শী চিকিৎ-সকের পুরাতন রোগ চিকিৎসায় বৈদা-

দিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না।
তৈল চিকিৎসা যে অতি আশ্চর্য্য পদ্ধতি,
তাঁহাও স্বীকার করিতে হয়। সামান্য
ব্যক্তিবিপণিতে এক পাত অষ্টাদশ মূল
পাঠ্যে দেখিবেন, কত বিভিন্ন ধর্ম্মের
বিচার প্রদেয়ের মূল একত্রিত থাকে।
কোন বিশেষ রোগের প্রতীকার জন্য
সেই গুলি একত্রিত করিতে প্রাচীন প-
ণ্ডিতগণের কত অধ্যবসায় এবং কত
সময় লাগিয়াছে। কিন্তু যেরূপ তাড়িত
গতিতে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ
হয়, এই রূপে চলিলে পরে আর কিছু
দিন কপিতাজ ও করিয়ার শব্দে কেবল
বর্ণগতও নয়, অর্থগতও অনেক সাদৃশ্য
হইবে।

সঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্রিয়াদিক্রমের
উৎকর্ষ দেখিয়া ও স্বস্থরূপে আলো-
চনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস যে,
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সময়ে অতি
উন্নত সঙ্গীতবিজ্ঞান ছিল। সোমেশ্বর,
কগমাঘ ও হুমত প্রভৃতি মতভেদ
দেখিলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সন্দেহে সন্দেহ
হয় বটে, কিন্তু ত্রিরাগে ও তৈরবে কেহই
সাদৃশ্য স্থাপন করেন নাই। করেন
না! কেন? বিজ্ঞান ভাস্কর্য্যমাত্রকে
পৃথক করিয়া দিয়াছিল, বিজ্ঞানবাক্য
অজ্ঞানীয়। বৈজ্ঞানিক ভিন্ন এ প্রেমের
কেহই উত্তর দিতে পারেন না। আধু-
নির্ক সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞানীতামিনাদিগের
মধ্যে আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করি-
য়াছি যে কেন এগুলিকে বিশুদ্ধ
ও অন্যগুলিকে জঞ্জাল বলেন? বাহ্য
স্থম্ভ জ্ঞানী তাহাদের উত্তরের তাৎপর্য্য
এই যে এরূপ ভেদনির্দেশ আশ্রয়

দেখ মূলক মাত্র। ইহা বৈজ্ঞানিকের
উত্তর নহে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ভিন্ন
কাহাকেও ওস্তাদ স্বীকার করেন না।
মানবীয় ওস্তাদের দোহাই দেখিয়া
অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে
হইতেছে যে পূর্ব্বতন অতি উন্নত সেই
বিচিত্র সঙ্গীত বিজ্ঞান একবারে লুপ্ত
হইয়াছে।

আয়ত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান। বেদান্তের স্বস্থ
গূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) ও মাত্ত্বাবাদ-
মূলক অপরূপ সংসারতত্ত্ব (Sensational)
(Cosmology) কাপিল সাংখ্যের বে-
দান্ত বিরোধী প্রকৃতিবাদ (Materialism)
অকপাদ গোতমের আত্মিকী দর্শন
ও ন্যায় শাস্ত্র (Inductive Philosophy
and Logic) এবং কানদের পদার্থ বিচার
(Categorical analysis) এগুলি এক এক
বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বলিলে অত্যুক্তি
হয় না। প্রতিনিধি ডায়েরেক্টর উদ্ভো
সাংকে নবধীপস্থ ন্যায় শিষ্যগণের বি-
তণ্ডায়ের করিয়া লিখিয়াছেন, “আহা,
এই বিচারশক্তি কেবল ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি
অন্যান্যভাবে বিতণ্ডার পরিচরিকা না
হইয়া যে দিন বহুবিশিষ্টের সহধর্ম্মিনী
হইবে, সে দিন কি শুভ দিন হইবে!”
যে মঙ্গলবাঙ্কী আশীর্বাদ করিতেছেন,
তাঁহাকে কে না মমকার করিবে? বিশে-
ষতঃ উদ্ভো সাংকেবকে বাঙ্গালির শুভা-
লুখ্যায়ী বলিয়া সকলেই জানিতেন।
আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

এতদ্বিধা আরো কত বিজ্ঞান ছিল, এখন
লোপ পাইয়াছে। সামান্য ক্ষুত্রে
ওঝারা যে এক স্থানে শব্দ করিয়া, সেই
শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানগত শব্দের ন্যায়

অচ্ছত্বত করাইতে পারে, একপ্রাণ প্রায়
সকলেই জানেন। কতক দূর শব্দবিজ্ঞান
(Acoustics) জ্ঞান ব্যতীত এই শব্দাঙ্কুরণ
বিদ্যার (Ventriculation) আলোচনা
অত্যন্ত দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়। হয়ত
শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থল সত্য উদ্ভাবিত
হইয়া থাকিবে। কিন্তু এসকল ছিল,
চক্ষা ছিল, মহা মহা পণ্ডিত সকল ছি-
লেন, এখন কি? এখন আক্ষেপের
বিষয় এই যে আমাদের আলস্য দোষে,
পরতন্ত্রতা দোষে, নানা দোষে, অনেক
গুলিরই “প্রায় লোপ হইয়াছে, নাম
মাত্র অবশিষ্ট আছে।” জিজ্ঞাসা করি,
তাহার কত কাল এ ভাবে বাইবে?

৩। পূর্ব্বেরই বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান
অবহেলা জন্য আমরা দিনে দিনে দেশীয়
জাতিগণের আয়ত্ত্বাধীন হইতেছি; বস্ত্র-
বিচারে অক্ষম হইয়া কদম ভোজনে,
অপ্যে পানে, অপরিস্কৃত বায়ু সেবনে
দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি। চিকিৎসা-
শাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদেশিক
ঔষধগত চিকিৎসকগণের হস্তে পতিত
হইয়া সর্ব্বদাই স্বর জ্বালায় কাতর থাকি-
তে হয়। বিজ্ঞানের ক্ষয়েই লোপ
সম্ভাবন। “স্বভ্রতাৎ একদে ভাষ্যবর্ষীয়-
দের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অস্থলীন
করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ও-
তসিদ্ধি ভারতবর্ষীয়বিজ্ঞান সভা নামে
একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করবার
প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান
মন্তব্যগণ গণ্য হইরে এবং আশুপাক
মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে,
ইহার শাখা সভা স্থাপিত হইবে।
আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে

অমুসোদন করিতেছি। অচ্ছত্বাতার মঙ্গল
হউক, অচ্ছত্বাতা সফল হউক।

৪। “ভারতবর্ষীয়দিগকে আলোচনা
করিয়া বিজ্ঞান অস্থলীন বিষয়ে দেশ-
সমিতি ও সন্দেহ করা এই সভার প্রাণ
উদ্দেশ্য।” উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ভারত-
সম্পদ কি? “আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে
সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে” বা হই-
তেছে, “তাঁহা রক্ষা করা।” “যথা মনোরম
ও জ্ঞান দায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও
প্রচারিত করা” ইত্যাদি “সভার আত্ম-
বিক্রি উদ্দেশ্য।” কেবল পুস্তক মুদ্রন ব্য-
তীত লুপ্তপ্রায় বিষয়ের আবিষ্কার রক্ষা করা
আবশ্যক বোধে আমরা প্রুচুঠনে পত্রের
অর্থাৎ শব্দের স্থানে যথা ও পত্র ইত্যাদি
শব্দ ব্যবহার করিলাম। উদাহরণ দেওয়া
বাইতেছে; যেমন বারংবীর্য্য মানসদি-
য়ের বৈজ্ঞানিক সংস্কার অথবা প্রাচীন
যন্ত্র সকল বা যন্ত্রগত সকল সংগ্রহ করা,
প্রাচীন মুদ্রা, দানফলক বা আদেশ-
ফলক সকল সংগ্রহ করা, লুপ্ত বিষয়ের
রক্ষার জন্য এগুলি সকলেই আবশ্যক।
কিন্তু এতদ্বিধা আরো অনেকগুলি আত্ম-
বিক্রি উদ্দেশ্য হইতে পারে, ও হওয়া-
শক্তিও বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়-
দিগকে বিজ্ঞানে যত্নশীল করিতে হইবে,
ও তাঁহারা যত্ন করিতেছেন কি না, তাহা
সর্ব্বদা দেখিতে হইবে। আর (কথাটা
বলিতে কিন্তু লজ্জা হয়) তাঁহারা “বি-
জ্ঞানে যত্ন করিয়া কিছু আর্থিক উপকার
পাইতেছেন কি না, তাহাও দেখিতে
হইবে। সে বিষয়ে আমাদের যত্ন
সমাজ স্থাপিত হইলে বলিব।

৫। এই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে

হইলে অর্থই প্রধান আশংকা, অতএব ভারতবর্ষের শুভাভ্যাসী, ও উন্নতীকৃত জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, “উঁহারা আপন আপন ধর্মের স্বীয়-দৃষ্ট অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করেন।”

৭। অসুখীতা মহেন্দ্র বাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরকারিদিগের নাম সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এই অসুখীতা পত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ ৪০ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে এই তালিকা খানি একটি আশ্চর্য্য দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না থাকিতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।

আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গদীনীগণ আপনারা মহেন্দ্র বাবুর ঈশ্বর-স্বাক্ষরিত অবশ্যই

বুঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলঙ্কভার শিরে কেন বহন করেন? সকলেই আগ্রাসর হউন। যিনি একদিনে লক্ষ মুদ্রা দান করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন। পুত্র কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁহারা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন? উড়োসাহেব ভয়ানক বিজ্ঞান-গুণবতীকার্যদোষ বঙ্গসমাজমস্তকে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক বার মুক্ত হস্তে দান করিয়া সমাজ স্থাপন করিয়া ধীর ভ্রম ঘূর করুন। বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। মহাত্মা উড়ো সাহেবকে বলি, তিনি কাম্বল সাহেবকে চিঠিতে যা বলিয়াছেন, তাহার কথায় আমাদের কাজ নাই, তিনি কেন একবার স্বজাতীয়-গণকে এই সম্বলকর কার্যের সাহায্য করিতে বলুন না। যদি তালিকাতে একটিও স্বেচ্ছান্তের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত আক্ষেপের বিষয় হইবে।

বিষয়ক।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার রাগ।

হীরার বাড়ী পাচির আঁটা। দুইটি ঘর ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আল-পনা—পথ আঁকা—পাকি আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাঁশে রাশা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী ভুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামার মাজিয়া দেয়। হীরা কালো, চুড়ি পরা হাত-খানিতে ছঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাজে তাই ভাবে!

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাজে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—গুয়াইল না। পরদিন তাহাকে সেই খানে রাখিল। বলিল, “আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে বেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইও।” কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছা-হুসারে তাহাকে নুকাইয়া রাখিল। ঘরে চারি দিল, আয়ী না দেখে। পরে লবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই এহর ফেরা আয়ী যখন স্নানে যায়, তখন আসিয়া

কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চারি দিয়া চলিয়া গেল। রাজে অসিয়াই চারি খুলিয়া উভয়ের শয্যা রচনা করিল।

“টিট—কিট—খিট—খিট—খাট—খাট” বাহির ছয়রের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। এক জনমাত্র কখনও রাজে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মগুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নড়িলে, বলে, “কট কট কটা, তোর মাথা মুণ্ড উঠা, কড় কড় কড়াং খিল খোল নয় তান্নি ঠ্যাং।” স্ত্রীত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, “কিট-কিট-কিট, দেখি কেনমন আমার হীরেটি, খিট খাট ছন, উঠলো আমার হীরামন। চিঠি চিঠি চিঠি চিনিব—আয়ের আমার হীরা মাগিক।” হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল। বাহির ছয়র খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। এখানে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—“কে ও, গল্পাজল! একি ভাগ্য!” হীরার গল্পাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেববৎস বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রমিষ্ণ স্ত্রীলোক। “বয়স বড়সর দ্বিশ বত্রিশ, মাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গোরাঙ্গী—একই রোজ পোড়া—বড় ভাঙ্গা, নাক খাঁদা—কপালে উলকী। কঁসে তামার পোড়া টেপা আছে। না-

লতী গোয়ালিনী দেবেজ্ঞ বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অল্পগত—অনেক করমায়েস—যাহা অনুসরণে—অসাম্য—তাহা মালতী সিদ্ধ কর্তে, মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, “ভাই পদ্মাজ্ঞ! অস্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?” পদ্মাজ্ঞ চুপি চুপি বলিল, “তোকে দেবেজ্ঞ বাবু ডেকেছে।”

হীরা কান মাথেক, হাসিয়া বলিল, “ভুই কিছু পারি না কি?”

মালতী ছই অল্পলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, “মরণ আর কি! তোর মনের কথা ভুই জানিস! এখন চ।”

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, “আবার বাবুর বাড়ী যেতে হইল—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?” বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশ ভূষা করিয়া, মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। ছই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

“মনের মতন রতন পেলে যতন করি তার। সাধার হেঁটে তুলব নাগর, পতন করে কায়।

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেজ্ঞের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেজ্ঞ দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন; কিন্তু আজি সর কাটিতে ছিলেন। জ্ঞান টনটনে। হীরার সঙ্গে আজি অন্য প্রকার সন্ধ্যাও করিলেন। স্তব জুটি কিছুই নাই। বলিলেন, “হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া

পাঠাইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, কুন্দ-মন্দিরী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া য়াও নাই। বেশ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে সকল কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।

হী। কুন্দমন্দিরী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।

দে। তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে? হি। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেজ্ঞ হাসিলেন। বলিলেন, “তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুদ্ধিলাস, কুন্দমন্দিরীর কথা ছল মাত্র। তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্ত-বাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা, এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছে। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।”

মহাপাপে নিমগ্ন বাহাদিরের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেজ্ঞ, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ফ্রোমে, হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরঞ্জে অগ্নিরষ্টি হইল। হীরা আশোখান করিয়া কহিল, “মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া একুণ কথা বলিলেম।

ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মূনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।”

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেজ্ঞ কখনকাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া ছই দ্বাস ত্রাণ পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মুহু মুহু গাছিলেন।

এসেছিল বকনা গোত্র পর গোয়ালে জাবনা খোলে—

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

হীরার দেষ।

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দস্তের বাড়ীতে ছই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কুন্দ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাঁহাকে শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ, আমার গৃহে আর থাকি অস্বস্তি বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কল্লের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের হৃৎ সোখা-জ্বর হইয়া রছিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। স্বর্য়মুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু স্বর্য়মুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। প্রাতে পাড়ায় কুন্দমন্দিরীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক বুঢ়া পাঠাইলেন।

স্বর্য়মুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কয়লামণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেজ্ঞ যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কেননা দেবেজ্ঞের সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত ভ্রমণ হইলে কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব হোদ্য হয় না। দেবেজ্ঞ মাতীল, মদুর মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। স্বর্য়মুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অহুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামির বিরাগে আরও মর্গ ব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধান লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—স্বর্য়মুখীকেও অনুরাগ তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, “যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।”

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিছু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে লোভ ময়রু করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ সারিয়া ছই গ্রহের সময়ে, আগীর আনের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাতে আসিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার

মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের স্বত্বদুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও ক্রন্দন নায়া বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—আঁত গোলায়।

“ও হীর! ছি! ছি! হীর! মুখখানিত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে জ্বরযন্ত্রণা এত খলকপট কেন? কেন? কেন, বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যামুখীর আমনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, “না।” হীরাকে হীরার আগনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোকে বলে, “সকলই দুষ্কের দোষ।” দুই বলে, “আমি ভাল মানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুই হইয়াছি।” লোকে বলে, “পাঁচ কেন সাত হইল না?” পাঁচ বলে, “আমি সাত হইতাম—কিন্তু ছবি আর পুষ্টে সাত—বিধাতা, অথবা বিধাতার হাতে লোকে যদি আমাকে আর ছবি দিত, তা হলেই আমি সাত হইতাম।” হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—“এখন কি করি! পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনাদের দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে, যদি ক্রন্দকে দস্তুর রাড়ী করিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, ঘৃণাও কিছু দেবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে ক্রন্দকে দেবেজ বাবুর হাতে দিই, তাহা হলে অনেক টাকা মগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিবে না।

পারিব না। আচ্ছা, দেবেজ ক্রন্দকে কি এত সম্মদী দেখেছে? আমরা গভীর খাট্টে যাই; আমরাও যদি ভাল থাকি, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হইলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন মিনে, ঘ্যান ঘেনে, প্যান পেনে, সে দেবেজ বাবুর স্বর্ঘ্য বুঝিবে কি? পাক নইলে পক্ষ ফেল ফোটে না, আর ক্রন্দ নইলে দেবেজ বাবুর পীরিত হয় না। তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল। আর সকলকে চোখ ঠায় কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটি প্রহসন আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করেছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। ঠাকুর বলে, রহ; তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগাবরে দৌলতে গল্পাশান। পরের চোর ধরতে গিয়া আপনাদের আঁটা চুরি গেল। কি মুখ খানি! কি শাড়ি! কি গলা! অন্য মানুষের কি এ মন আছে? আবার মিনে সে আমায় বলে, ক্রন্দকে এনে দে। আর বলতে লোক পেলেন না। মারি মিনসের নাকে এক কিল। আচ্ছা, এনই ভাল বাসিতে আরম্ভ করছি, যে তার নাকে কিল মেয়েও মুখ। দূর হোক, ও সব কথা যাক। ওপথে ও ত ধর্মের কাঁটা। ইহজন্মের স্বত্ব দুঃখ অনেক কাল ঠাকুরদের দিয়াছি। তাই বলিয়া ক্রন্দকে দেবেজের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেই গা জ্বালা করে। বরং ক্রন্দ যাহাতে কখন

তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়! ক্রন্দ যেখানে ছিল—সেই থানে থাকিলেই তার হাত ছাড়া। সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাহুদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দস্তুরট হইবে না। তবে সেই থানে ক্রন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু ক্রন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ী মুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মেলে বাপু বাছা! বলে লইয়া যাব, তবে যাইতে পারে। আর একটি আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যামুখীর খোঁতা মুখ ভোতা হয়ে? দেহতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা! সূর্য্যামুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন বলবে? সূর্য্যামুখী স্বথী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট, সে সুনিব, আমি বঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তাঁর হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি থামখা তার মন্দ করিতে চাই। না, কিন্তু যদি তাঁর মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনাদের ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পান না। টাকা

আসিবে কোথা থেকে? দস্তুর বাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দস্তুর বাড়ীর টাকা নেবার ফিকির—এই, সবাই জানে যে ক্রন্দের উপর গেগুন্ড বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন ক্রন্দমস্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যামুখীর জন্যে। যদি ছদ্মবেশে একটা চটাটি হয়, তাহলে আর বড় সূর্য্যামুখীর খাতির কবে না। এখন যাতে একটা চটাটি হয়, সেই তা আমায় করিতে হবে।

“তা হলেই বাবু মোড়শোপাচারে ক্রন্দের পুজা আরম্ভ করিবেন। এখন ক্রন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলুম শিয়ানা মেয়ে; আমি ক্রন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এই মধ্যে তার আর অনেক ঘোঁড়াগু হইয়াছে। মনে করলে, ক্রন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করিতে পারি। আর যদি বাবু ক্রন্দের পুজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন ক্রন্দের আজ্ঞাকারী। ক্রন্দকে করবে আমার আজ্ঞাকারী। স্তবরাং পুজার ছোলাটা কলটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তাহলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে ক্রন্দমন্দিরী দেব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে পড়িলেই বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে ক্রন্দকে বাহির করিয়া দি। তাতে যদি সূর্য্যামুখীর কপাল না ভাঙে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি বসে ক্রন্দকে উঠু রস করান মশক রাই। আগে ক্রন্দকে কাশারঘাটা

পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।”

এই রূপ কল্পনা করিয়া পাণ্ডিত্য হীরা সেইরূপ আচরণে প্ররভ হইল। চল করিয়া, আশীকে কামারবাটা গ্রামে কুটুম্বাভী পাঠাইয়া দিল, এবং কুন্দকে আত্মসম্মোহনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সজ্জনতা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, “হীরার মত মজ্জ্ব আর নাই। কমলও আশায় এত ভাল বাসে না।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার কলহ—বিবরণের মুকুল।

তা ত হোলে। কুন্দ বশ হবে। কিন্তু স্বর্য়মুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিগ্ন না হইলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহারে অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাণ্ডিত্য হীরা মনিব বাড়ী আসিয়া যুগ্ম কার্যে প্ররভ হইল। কৌশল্য নামী আর এক জন পরিচারিকা দস্তযুগ্মে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রজ্ঞাপত্রীর প্রসাদ পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, “কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন করিতেছে, তুই আমার কাজ গুল কর না?” কৌশল্য হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকার হইয়া বলিল, “তা করিব বই কি। সকলেরই তাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মূনবের চাকর,—

করিব না?” হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্য যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মন্তক হেলাইয়া, তর্জনি গর্জন করিয়া কহিল, “কি বা কুশি—তোরা যে বড় আশ্পর্দা দেখতে পাই? তুই গালি দিস?” কৌশল্য চমৎকৃত হইয়া বলিল, “আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?”

হীরা। আ মোলো! আবার বলে কখন গাল দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বদোছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বলবে উনি আশীর্বাদ করলেন! তোরা শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কো। হয় হউক। তা বন রাগ করিস কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন—যম তা আর তোকেও ভুলবে না, আমাকেও ভুলবে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতঃস্নানো কখন না ভোলে। তুমি আমার হিংসার মর! তুমি যেন হিংসাভেই মর! তুমি শীর্ণগিরি অপ্পাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাতা যাও!

কৌশল্য। আর মহা করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যও আরম্ভ করিল। “তুমি দুটি চক্ষের মাতা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে। পোড়ার মুখি! আবাগি! শতৈক ধোয়ারি!” কোদল বিদ্যায় হীরার অপেক্ষায় কৌশল্য পটুতর। অন্তরাং হীরা পাঠখেলটি পাইল।

হীরা তখন প্রজ্ঞাপত্রীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। বাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা, স্বর্য়মুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধ লক্ষণ—এবং সে প্রথমই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল, অর্থাৎ কান্দিয়া দেশ ভাগাইল।

স্বর্য়মুখী নালিশী আরম্ভ যোলা-হেলা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অসুরোধে কৌশল্যকে যৎকিঞ্চিৎ অহযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, “ও মাগীকে ছাড়িয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।”

তখন স্বর্য়মুখী হীরার উপর বড় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “হীরে, তোরা বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল—দোষ সব তোরা—আবার তোরা কথায় ভেঁকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায্য করিতে পারিব না—তোরা যাইতে ইচ্ছা হয়, যা। আমি থাকিতে বলি না।”

হীরা ইচ্ছাই চায়। তখন “আচ্ছা চল্লম,” বলিয়া হীরা চক্ষুর জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্বাসীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকস্থানীয় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কান্দিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “হীরে, কান্দিতো কেন?”

হী। আমার মাহিয়ানা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন।—(সম্মুখে) সেকি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথা বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাতা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সে কায়ের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি, বল।”

হীরা তখন স্বজ্ঞ হইয়া বলিল, “আসল কথা, আমি থাকিব না।”

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হইল—কারে কখন কি বলেন, ঠিকানা নাই।

নগেন্দ্র—জ্ঞপ্তি করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, “সে কি?”

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এই বার বলিল, “সে দিন কুন্দ-নন্দিনী ঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছি—

লেন। শুনিয়া কুন্দ ঠাকুরাণী দেশতাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,—

আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সারিতেছি।”

নগেন্দ্র—সে কি কথা?

হীরা। আপনার মাগীতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাটে অঙ্গকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, “আজ বাড়ী যা। কাল ডাকাব।”

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচনী সজ্জন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া স্বর্ধ্যাযুধীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পক্ষপাত পশপাত গেল।

স্বর্ধ্যাযুধীকে নিহুতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?” স্বর্ধ্যাযুধী বলিলেন, “দিয়াছি।” জনশ্রুতির হীরা কৌশল্যার রূতান্ত সবিশেষ বিবরিত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিতে?”

নগেন্দ্র দেখিলেন, স্বর্ধ্যাযুধীর মুখ শুকাইল। “স্বর্ধ্যাযুধী অক্ষুটস্থরে বলিলেন, “কি বলিয়াছিলাম?”

নগেন্দ্র। কোন দুর্ব্বাসা?
স্বর্ধ্যাযুধী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, “তুমি আমার সর্ধ্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে আমি কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পেরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া, তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। সে অপরাধ মার্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।”

তখন স্বর্ধ্যাযুধী হরিদ্রাসী বৈষ্ণবীর পরচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন।

বলিয়া, শেষ করিলেন, “আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরণে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্ব লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।”

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, “তোমার বিষয়ে অপরাধ নাই। তুমি বৈষ্ণব কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন ভয় লোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু এককক্ষ ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? তুমি তারাচরণের কোন দিনের ঘরের খবর না জানিতে? কুন্দের সঙ্গে যে এক কারে দেবজের বৈষ্ণব শত বৎসরের আলাপ, তাই কোন না শুনিয়াছ? তবে মাতালোর কথা বিশ্বাস করিলে কেন?”

স্বর্ধ্যা। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

স্বর্ধ্যা। আমার মনের ভাষ্টি জন্মিয়াছিল। বলিতে স্বর্ধ্যাযুধী—পতিভ্যাগ সাপ্না—নগেন্দ্রের চরণপ্রস্থে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে এঁহন করিয়া নয়ন জলে সিদ্ধ করিলেন। তখন মুখ ভুলিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?”

নগেন্দ্র বলিলেন, “তোমায় বলিতে হইবে” না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অস্বস্ত।”

স্বর্ধ্যাযুধী নগেন্দ্রের মুখল চরণে মুখ লুকাইয়া কাদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত, কমল ভূলা দ্রুতি মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্দচ্ছাখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া, বলিলেন, “কি বলিব তোমায়? আমি যে হৃৎপথ পাইয়াছি—তাঁহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিবে পাছে তোমার ছুঃখ বাড়ি, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলি, অন্য তোমার হৃদয়প্রাণিহী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। বুকের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ, আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।”

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “স্বর্ধ্যাযুধী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহস্ত। যথার্থই আমি তোমাকে জুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাঁহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমন ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।

স্বর্ধ্যাযুধী আর সহ করিতে পারিলেন না, ঘোঁড় হাত করিয়া, কাতরবরে বলিলেন, “বাঁধা তোমার মনে থাকে, থাক

—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতিকথাই আমার বুকে শেল বিধিতছে। আমার অদৃষ্টে বাঁধা ছিল, তাঁহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অপ্রাণ্য।”

“না। তা নয়, স্বর্ধ্যাযুধী! আরও শুনিতে হইবে।” বলি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেননা অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাঁজী ঘর সংসারে আমার স্থখ নাই। তোমাতে আমার আর স্থখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে রেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এতুহে হৃদহীর্ষা বাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—বাহার স্বামী এরূপ পায়, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পায়ম হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবন্ধনা করিব না। আমি অনাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না? এখন আমি দেশ-ত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে জুলিতে পারি, তবে আবার আমি। নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।”

এই শোভনয়ন কথা শুনিয়া স্বর্ধ্যাযুধী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত অন্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অঘোমুখে শুইয়া পড়িলেন। স্নানীতে মুখ লুকাইয়া স্বর্ধ্যাযুধী কাদিলেন কি? হত্যাকারী

বাস্য বৈষ্ণব হতজীবের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেই রূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, “সেই ত মরিতে হইবে—তার আশ্রয় কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব?” আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতীকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি স্বর্গ্যমুখী বাঁচবে?”

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে স্বর্গ্যমুখী বাঁচবে না, কিন্তু তোমার মরায় ভাল ছিল।

দেওকপরে স্বর্গ্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবীর স্বামির পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—“এক ভিক্ষা।”

উত্তরচরিত ।

পঞ্চম সংখ্যা।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জ্ঞানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন।—কুশল, যুদ্ধ সম্বাদ-শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সম্মুখ আলিঙ্গন এবং পিতৃভাণ্ডে প্রণয় সম্ভাবন করিতে লাগিলেন। পরে

নগ। কি?

হু। আর এক মাস মাত্র যুঁহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে ভূমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করি না।

নগেন্দ্র, মনোভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে যথাকার করিলেন। স্বর্গ্যমুখী তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়াছিলেন। স্বর্গ্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, “আমার ঐর্ষ্য ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি ভুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। ভূমি পাণ্ডা স্বর্গ্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?”

সকলে, বাজীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকানুয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামাচন্দ্রজনে লক্ষণ দ্রষ্টবর্গকে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী, এজ্ঞা, ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে কথিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষণ কর্তৃক যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টবর্গ সম্মুখ হইলেন।

পীতা বিসর্জন রতাস্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীত লক্ষণকর্তৃক

পরিত্যক্ত হইলেন, তাঁহার কাতরতা, গজা-প্রবাহে দেহ সর্পণ, তদ্বাধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গজা এবং পৃথিবীকর্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মুগ্ধ হইলেন। তখন লক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বাজীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবন! রক্ষা করুন! আপনার কার্যের কি মর্ম্ম?” নটদিগকে বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।”

তখন সহস্রাং দেববিকর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল। গজার বারিরাশি মণ্ডিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত, জল মধ্য হইতে উঠিলেন—কে? অয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষণ বিস্মিত এবং আশ্বাসিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, “দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা, অরুদ্রতীকর্তৃক আদিত্য হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, “উঠ, আরা পুত্র।”

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যথা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্বলোক সমারোহ সময়ে সীতার সত্য বৈবরণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে জ্ঞাপন বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভাৰ্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া স্বখে রাজা করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, সম্মুখ নাই। কিন্তু ‘আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিয়া না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিক-

তর মধুর এবং করণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীতার্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাজীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীতা হইলেন। যে ‘হৃদনার’ কথি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বন্ধীর পাঠকমাত্রেই “সীতার ‘বনবাস’ পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সত্য” স্বর্গে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিশ্রাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে, পর, সীতাশপথ দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১১২ সর্গ।

সম্যং রজন্যং বৃদ্ধিত্যাং বজ্রবাটং গতানুপঃ
ধ্বনিং সর্গান মহাতোজাঃ শম্পাপুত্রি রাঘবঃ ॥
বশিতো বাঘদেবশ জাবালি রথদ্রোণঃ ॥
বিশামিত্রোদীর্ঘতা দুর্দ্যামাশ্চ মহাতপাঃ ॥
মূলতোয়াপিতৃশা শক্তির্ভাগবীশ্চর বামনঃ ॥
মাক্ষেয়শ্চন্দীয়ায়ৌকাল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥
গর্গশ্চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মহিং ॥
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চসুপ্রভাঃ ॥
নারদঃ পরশু্রামশ্চ নৌতমশ্চ মহাবশাঃ ॥
এতেভ্যোচ্যোতব্রাহ্মণৈঃ সখ্যং তত্রতঃ ॥
কৌতুহল সমাদিত্য সর্বত্র সমাগতাঃ ॥
বৃদ্ধাশ্রমগোবীর্ষ্য বানরশ্চন্দ্রবাহবাঃ ॥
সর্বত্র সমাগতাঃ মহাত্মানঃ কুতুহলাঃ ॥
ক্ষত্রিয়শ্চৈব শূদ্রাশ্চ ইশাপাশ্রমবাসিনাঃ ॥
নানাদেশ গতাশ্চৈব ব্রহ্মণাঃ সখ্যং তত্রতঃ ॥
সীতাশপথ বিকার্থঃ সর্বত্র সমাগতাঃ ॥
তদ্রামাগতঃ সর্গ মঞ্চজুতিবাহবাঃ ॥
শক্রামুনিরয়শ্চ সখ্যং সমুপাগমঃ ॥
তদ্বিধি পুণ্ডিতঃ সীতা অশ্বচ্ছবাবাহবাঃ ॥
কৃত্যশ্চলিবাণকুলো কুলো রামঃ মনোগতঃ ॥
তাংদুষ্কৃত্যমিত্যাদীং ব্রাহ্মণামনুগামিনীং ॥
বালীকো পুণ্ডিতসীতাং মাধবদোমহানজুং ॥
ততোহলংলাশদঃ সর্গোবলংলাশবাক্যো ॥
দঃখজঘাণিশালেন শোকেনা কুলিতাক্ষনাং ॥

মাধুর্যম্ভেতি কৈচিত্ৰ। মাধুর্যম্ভেতি চাপরে ।
উভয়েভুত জানে প্রেক্ষণ। সংপ্রকৃত্যঃ ।
উভয়েধোজনৌষা প্রধিমা মুনি পুনঃ ।
ঐতিহাস্যঃ। বাল্যিকি রিতিহোতারায়দঃ ।
রাশরথে নীতা মুব্রতা ধর্ম্যাদিনী ।
অপবিত্রাংপুত্রিত্যাক। মমাত্মম সমীপতঃ ।
লোকপদাব ভীতস্য তরারম মহাব্রতঃ ।
প্রত্যয়ঃ নামাতে নীতা তামুজাতুমর্থম্ভিঃ ।
ইমৌক্ত জানকী পুত্রা বুভোচমজ্ঞাতকৌ ।
সুতৌতৈবৈ দুর্ধবৌ সত্যমেতরু দীপিতে ।
প্রোক্তোনাথঃ নশস্য পুত্রাচার্যবন্দনঃ ।
নন্দরামানুভঃ বাক্যমিচ্ছৌ তর পুত্রকৌ ।
বহুবর্ষ নহুসানি তপস্যাঃ। মন্যকৃত্যঃ ।
নোপাশ্রয়ঃ ফলভক্ষ্যাদ্যেযং নিকিষিগ্ধীকী ।
মনসাক্ষণ্যঃ। হাঃ। জুতপূর্ণঃ নিকিষিবঃ ।
তস্যাঃ ফলভক্ষ্যমি আপাপা যৈগিধী যদি ।
অহং পক্ষ্ম জুতবৃষনঃ বটেসু রাঘবঃ ।
বিভিষাণীতাশ্চক্রেতি জগাহঃ বদে নিকরঃ ।
ইয়ংবুদ্ধ সমাচার্য আপাপা পতিভেদঃ ।
লোকপদাব ভীতস্য প্রত্যয়ঃ বদাম্যসি ।
তদানিঃ। নরবরাহঃ শত্রু ভাষিঃ ।
সিহোদন্তি বিহবেদ্যে মহা প্রসিদ্ধাঃ ।
লোকপদাব কলুবীকৃতচেতসায়ঃ ।
তাক্সায়া প্রিতম্য বিসিভাপি শত্রুঃ ।

১১০ মার্গঃ

বাল্যিকেনৈব মুকুতঃ রাঘবঃ প্রত্যভাসতঃ ।
প্রাণলিঙ্গগতো মধ্যে দৃষ্টোত্য দেববর্ধিনী ॥
এবেমতঃষাভাগ যথাবদসি ধর্ম্যদিং ।
প্রত্যমকুমুদব্রহ্মঃ স্বববাকৌরকলম্বয়েঃ ।
প্রত্যমকু পুত্রীভোতা ইন্দেব্যাঃ। মুরগবিধৌ ।
লপঞ্চকৃত্তত্ত্বভেদে বৈশ্ব প্রবেশিতাঃ ।
লোকপদাবদৈবলবানঃ যেন ত্যাক্সিযৈগিলৌ ।
নরঃ। লোকভক্ষ্যানুকুলপ্রতিজ্ঞানতঃ ।
পতিতাক্সা মহা নীতা তদ্বদানু কলম্বহতি ।
জানামিচেমৌপুচ্ছৌ মেঘমজ্ঞাতৌকুশীলদৌ ।
শ্রদ্ধায়াঃ জগতোমধ্যে ইন্দেব্যাঃ। প্রীতিরক্ষ্যম্ভে ।
অভিপ্রাক্ষ্য বিজ্ঞায় রাঘবঃ। মুরগমধ্যমঃ ।
নীতায়াঃ শপথো তদ্বিন সর্গের সমাগতাঃ ।

পিতামহঃ পুরকৃত্য সর্গের সমাগতাঃ ॥
আমিতাঃ বরোহে। রুদ্রা বিধেদেবা মল্লকানীঃ ।
মাধুর্যম্ভেভোঃ সর্গেতে সর্গেতে পুরমহতঃ ।
নাম্যাসুপর্ণাঃ শিদ্ধান্তঃ স্তে সর্গেভ্যেমানসঃ ।
দৃষ্টোহেবানুধীঃ। ইন্দেব্যাঃ। পুনরব্রতীঃ ।
প্রত্যোমোমুমিন্বেষ্টঃ। স্ববিবাকৌরকলম্বয়েঃ ।
শ্রদ্ধায়াঃ। কর্ণভোতা বরোহে। ইন্দেব্যাঃ। প্রীতিরক্ষ্যম্ভে ।
নীতা শপথঃ। মন্যকৃত্যঃ। সর্গের সমাগতাঃ ।
উভোহোমুঃ। যত্নঃ। পুত্রো বিবাকৌরকলম্বয়েঃ ।
তৎ। জনৈবঃ। মুরগোহো। জ্ঞানরাম্যাসঃ। সর্গেতে ।
অন্যতঃ। মিষাভিঃ। নিরৈক্যঃ। সমাধিতঃ ।
মানবঃ। সর্গরাজ্যৌকুমারঃ। কৃত্যমুগে যথা ।
সর্গান সমাগতাঃ। দৃষ্টো নীতাঃ। কাব্যরাম্যাসিঃ ।
অব্রতীঃ। প্রাণলিঃ। বাক্যমোমুমিন্বেষ্টঃ।
যথাঃ। রাঘবাননঃ। মনসাপি নিকরঃ ।
তথা যে মাধবীদেবী বিরহঃ। দাতুমহতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা। রাম্যঃ। সমাগতঃ ।
তথা যে মাধবীদেবী বিরহঃ। দাতুমহতি ।
নথৈতৎ। সত্যমুকুতঃ। মেরেগি। রাম্যঃ। পর্ণঃ। নচ ।
তথা যে মাধবী দেবী বিরহঃ। দাতুমহতি ।
তৎ। শপথপত্ন্যঃ। ইন্দেব্যাঃ। প্রানুদীঃ। বদমহতঃ ।
জুতো। দুগ্ধিতঃ। বিবঃ। সিং। যামনমহতঃ ।
বিষম্যঃ। শিরোভিঃ। নাইরাম্যঃ। বিজ্ঞাতঃ ।
বিবঃ। দিবেদ্যে। বপুয়া। দিব্যকলঃ। বিজ্ঞাতঃ ।
তথিঃ। বদনদেবী। বাহুভ্যাং। গৃহমিষাভিঃ ।
যথাঃ। নানিঃ। দৈবম্যাসঃ। যেন। চোপবেশয়ঃ ।
তামাননতঃ। দৃষ্টো। প্রবিশদীঃ। রম্যভেদঃ ।
পাক্সকুটিকিবিজ্ঞাঃ। দিব্যঃ। নীতাম্যাকিরঃ ।
মাধুর্যম্ভে। মুগ্ধাঃ। যামনঃ। মনোপিতঃ ।
মাধুর্যম্ভে। ইন্দেব্যাঃ। মন্যকৃত্যঃ। শীলমীদুশঃ ।
এবঃ। বহুব্রাব্যঃ। চোহোমদীক গতাঃ। মুরগঃ ।
বাহুভ্যঃ। মুগ্ধাঃ। দৃষ্টো। নীতাঃ। প্রবেশনঃ ।
মজ্ঞাতঃ। গতাঃ। মন্যকৃত্যঃ। মন্যকৃত্যঃ ।
রাজানন্ডঃ। নরবাসু। দিব্যম্যোপবেশয়ঃ ।
অব্রতীঃ। জুতো। সর্গেভ্যে। বদমহতঃ ।
দানদীঃ। মহাকায়ঃ। পাতালে। পদগাধিপাঃ ।
কেচিৎ। দিব্যঃ। মন্যকৃত্যঃ। কেচিৎ। দিব্যঃ।
কেচিৎ। দিব্যঃ। মন্যকৃত্যঃ। কেচিৎ। দিব্যঃ।

নীতাঃ। প্রবেশনঃ। দৃষ্টো। বদমহতঃ।
উভ্যঃ। মিষাভিঃ। মন্যকৃত্যঃ।
শ্রাব্যঃ। অমুগু। অমরা। এই। ছই
সর্গের অম্ববাদ করিয়া দিতে পারিঃ
লাম না। মন্যকৃত্যঃ। পাঠক মহাঃ
শয়েরা মার্জনা করিবেন। এই মন্যকৃত্য
অতি সরল—যাঁহার অত্যন্ত মন্যকৃত্য
জ্ঞানেন, তাঁহারও বুঝিতে পারিবেন।
আমরা উত্তরচরিত নাটকের একুত
সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত
আহুর্গিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানেই
ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিঃ
যাছি। এষ্টের অত্যন্ত অংশ পৃথক
করিয়া পাঠকে দেখাইয়াছি। একুপে
এষ্টের একুত নৌগুণের ব্যাখ্যা হয় না।
একুতানি অন্তর পৃথক করিয়া দেখিলে
ভাঙ্গমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায়
না। একটিই রকম পৃথক করিয়া দেখিলে
উপাধানে শোভা অম্বভূত করা যায় না।
এক একটি অংশ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মন্যকৃত্য
যামুর্জির অনির্গতনীয় শোভা বর্ণন করা
যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায়
মাগর মাহাত্ম্য অম্বভূত করা যায় না।
এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাঃ
হার সর্গাংশের পর্ব্যলোচন করিলে
একুত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।
যেমন অটীলিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে
গেলেন, সমুদ্রায় অটীলিকাটি এক কালে
দেখিতে হইবে, মাগর গৌরব অম্বভূত
করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার
এক কালে চক্ষে এগন করিতে হইবে,
কাব্য নাটক সমালোচনও সেই রূপ।
মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ

এমত অপকৃত্য, যে তাহা কেহই পড়িতে
পারে না। যে আধুনিক সমালোচনা
য় এরূপ হইবে, সে কখনই এই ছই
ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করবে না।
কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে ন
লিতে হইবে, যে এই ছই ইতিহাসের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর
নাই।
অতরাপ উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের
উপর ছই চাটুটি কথা না বলিলে নয়
অধিক বলিবার স্থান নাই।
কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিকর্মতা। যে
কবি সৃষ্টিকর্ম নহেন, তাঁহার রচনায়
অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ অঃ
শংসা নাই। কালিদাসের ক্ষুদ্রসংহার,
এবং উমসনের ভদ্রিঙ্কয় কাব্যে, উৎকৃষ্ট
ব্যাক্যকৃত্তির বর্ণনা আছে। উভয় এষ্টই
আদ্যোপান্ত স্বমধুর, অসাদৃশ্য বিশিষ্ট,
এবং সত্যসাহসকারী। তথাপি এই ছই
কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে
পারে না—কেননা তদ্ব্যতীত মন্যকৃত্য
চাটুর্ঘ্য কিছুই নাই।
সৃষ্টিকর্মতা মার্জ্জই প্রশংসনীয় নহে।
সেইরূপ কাব্যএষ্টের। এস্থান ভাল রচনা,
এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাঃ
হার সর্গাংশের পর্ব্যলোচন করিলে
একুত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।
যেমন অটীলিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে
গেলেন, সমুদ্রায় অটীলিকাটি এক কালে
দেখিতে হইবে, মাগর গৌরব অম্বভূত
করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার
এক কালে চক্ষে এগন করিতে হইবে,
কাব্য নাটক সমালোচনও সেই রূপ।
মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ

উভয়গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধানপদে অভিষেক করা যায় না। আরব্য উপ-
ন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের
প্রচার হইয়াছে, তুল্লেককের সৃষ্টির
ইন্দীরাহারিণী আছে, দেখে নাই। কিন্তু
তাঁহাতে স্বভাবাকারিতা না থাকায়
“আলেক, লয়লা” পৃথিবীর অতুল্যকৃত
কাব্যগ্রন্থ মধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবাকারিণী সৃষ্টিরও বি-
শেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দে-
খিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই
অবিকল প্রতিরূপ দেখিলে কবির চিত্র-
নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তা-
হাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচা-
তুর্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি
উপকার হইল? বাহ্যি বাহিরে দেখি-
তেছি, তাঁহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে
আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতি-
রূপ দেখিয়া আনন্দ আছে বটে—কে-
বল স্বভাবসম্মতি গুণ বিশিষ্টা সৃষ্টিতে
সেই আনন্দ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু
আনন্দ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই,
সে কাব্য মান্য না বলিয়া গণ্য হইয়।

অনেকে এই কথা বিশ্বাসপূর্বক বলিয়া
বোঝ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভা
ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অনেক পাঠ-
কেরই এই রূপ সংস্কার যে, কবিক চিত্র-
রঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই।
বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য
কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্র র-
ঞ্জন এরূপই লক্ষিত হয়—তাহাতে
চিত্ররঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য
থাকে না; এবং তাহাতে চিত্ররঞ্জনোপ-
যোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না।

কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া
গণ্য হইতে পারে না।

যদি চিত্ররঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল,
তবে বৈষ্ণবের তর্কে দোষ কি? কাব্যেও
চিত্ররঞ্জন হয়, শতরূপ খেলায়ও চিত্ররঞ্জন
হয়। বরং স্নানকেরই ঐবান্ধো অপেক্ষা
এক বাজি শতরূপ খেলায় অধিক আনন্দ
হয়। তবে তাঁহারের পক্ষে কাব্য হইতে
শতরূপ উৎকৃষ্ট বস্তু? এরূপ স্ট্রী কালি-
দাসাদি অপেক্ষা এক জন পাকা খেলায়-
য়ার বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে,
কাব্যে প্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—
সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য।
শতরূপের আনন্দ অবিশুদ্ধ কিমে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে
চিত্ররঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর
কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?
অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা”।
যদি তাহা সত্য হয়, তবে, “হিতোপ-
দেশ” রথবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য।
কেমনা বোধ হয়, হিতোপদেশে রথবংশ
হইতে নীতি বাহুল্য আছে। সেই হি-
মাবে, কথামালা হইতে শকুন্তলা কা-
ব্যংশ অপেক্ষ।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন
না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কা-
ব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরূপ
খেলা ছেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?
কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু
নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই
উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের
চিত্তাঙ্কুর সাধন—চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান।

“বৈষ্ণব বলেন, আনন্দই সত্য হইলে কাব্যের
এক ‘পুণ্যল’ খেলায় একই দর।

কবির জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নী-
তিনির্দ্বাচনের দ্বারা তাঁহার শিক্ষা দেন
না। কথাগুলোও নীতিশিক্ষা দেন না।
তাঁহার সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ স্বজনের
দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।
এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের, সৃষ্টি কা-
ব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ
উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উ-
ত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর
অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই,
তথাপি প্রস্তাবের গৌণবাহুরোধে আমরা
তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে ব-
লিলেন, “তুমি চুরি করও না; আমি
তাঁহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।”
চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত
হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না।
সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা
জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি
করিবে।

তাহাকে ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি
চুরি করও না—চুরি ঐশ্বরাজ্য বিরুদ্ধ।”
চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু
ঐশ্বর যখন আমার আইনের অপ্রভুল
করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই
খাইব।” ধর্মোপদেশক বলিলেন, “তুমি
চুরি করিলে নরকে যাইবে।” চোর ব-
লিল, “ভবিষ্যৎে প্রমাণভাব।”

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, “তুমি চুরি করিও
না, কেননা চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট,
যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা
কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বলিবে,
“যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত,

আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভারিতে
পারিতাম। লোকে আমার খেতে দিক,
আমি চুরি করিব না। কিন্তু যে খানে
লোকে আমার কিছু দেয় না, সে খানে
তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি
করিব।”

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি
করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি
এক সর্বজন মনোহর পরিজ চরিত্র সজ্জন
করিলেন। সর্বজনমনোহর, তাহাকে
চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্ব-
ভাব, যে তাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ
চিত্তপ্রীত হইয়া তদালোচনা করে।
তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেননা লা-
ভাকাঙ্ক্ষার নামই অস্বাভাব। এইরূপ
পরিবর্তার প্রতি চোরের অস্বাভাব
জন্মে। সুতরাং চুরি করিতে “অপরিজ
কার্যে” সে বীতরাগ হয়।

“আত্মপরায়াণতা মন্দ—তুমি আত্ম-
পরায়াণ হইও না।” এই নৈতিক উক্তি
রামায়ণ নহে। কথাগুলো এই নীতি
প্রতিপদ করিবার জন্য রামায়ণের প্র-
ণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে
পৃথিবীর আত্মপরায়াণতা দোষ মতদূর
পরিহার হইয়াছে, ততদূর, ঐশা এবং
বুদ্ধ ভিন্ন কোন নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা,
সমাজকর্তা, বা রাজা বা রাজকর্মচারী-
কর্তৃক বোধ হইবে না। সুবিবেচক পাঠকের
এতকণ স্বপ্ন হইয়া থাকিবে, যে, উ-
দ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা
করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক,
সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেশক, নীতিবেত্তা,
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্বাঙ্গোপেক্ষাই কবির
শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যে রূপ মানসিক

কমতা ভাবশ্যাক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেই রূপে প্রাধান্য। কবির জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকার-কর্তা, এবং সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক মান-সিকশাস্ত্রসমগ্র।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? বাহা সকলের ভিতরে আকৃষ্ট করিলে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সেকি? সৌন্দর্য্য; অন্তর্বে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই মহাযের মুখা উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে চাইবেক। বাহ্য স্বভাবাকারী নহে, তাহাতে কৃষ্ণাঙ্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবাকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবাকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবাকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতি-রূপিত মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, বাহ্য প্রকৃতির প্রতিরূপিত-মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, যে কেবল প্রতিরূপিত—অল্পলিপি মাত্র—তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না। বাহ্য সত্ত্বের প্রতিরূপিত মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। বাহ্য স্বভাবাকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বি-

শেষ রূপে আকৃষ্ট হয়। বাহ্য প্রাকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংশ্লিষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাহার যথোচিত—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূণ্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এই রূপ যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবির সর্গ-প্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবাকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাঙ্গালীকি প্রাধান্য। তৎ পরেই মহাভারতকারের নাম নির্দিষ্ট হইবে। এক এক কাব্যে ঐদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে ছিল। মহাভারতের পর, বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিতে হয়। তৎ পরে শকুন্তলার প্রণেতা। ভারতবর্ষের আর কোন কবিকে এ সম্বন্ধে অভ্যুত্থা-শ্রেণী মধ্যে গণ্য যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাহার তিন খানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারণ করা যায় না। তাহা আমাদের উদ্দেশ্যও নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চমান দেওয়া যায় না। উত্তর চরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালিকর অতুল্য হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিরূপিত মাত্র। রামের চরিত্র,

রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিরূপিতও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্ছিন্ন যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দূর পাইয়াছেন। তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে,

উত্তর চরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাস্তবী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎ সম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরলুপ্ত কাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বন-চরিত্রী যে অবশিষ্ট প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবশিষ্ট তাহার অতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তন্মিহ চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সচতুর। ওমসা, বুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানব রূপিনী। সেই রূপ গুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে বাহ্য দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্র স্বজনের কমতার

পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাহার স্বজনকোশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তর চরিতে তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিগ্রহ যদি নিখল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনীশক্তি অল্পভূত করিয়াছেন ন ঐদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি চুল্লত।

সৃষ্টি-কোশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের, কেবল নিয়ম গুলিই অগ্রাহ্য এমত নহে, তাহাদিগের ব্যবহৃত শব্দ গুলিও পরিহার্য্য। ব্যবহার উচিত বিপদ ঘটে। আমরা সাধার্ম্যসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটা ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি রস নয়, কিন্তু সত্ত্বযুক্ত চিত্তরত্ন অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্বাধীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যতিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্বাধী, না ব্যতিচারী,—কিন্তু একটি কাব্যোপযোগী কর্ম্ম মানসিক রত্ন আদিরসের আকার স্বরূপ স্বাধীভাবে প্রাপ্ত যে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিগের পরিচয় রস নাই; কিন্তু শাস্তি একটি রস। সুতরাং এবিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা বাহ্য বলিতে চাই, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণয় করি।

সত্ত্বযোজ্য কার্যের মূল তাহাদিগের

চিত্তরত্তি। সেই সকল চিত্তরত্তি অবস্থাসমূহের অভ্যন্তর বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত্ত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্যের স্বজন, কবাবের উদ্দেশ্য। স্বস্বদেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোরত্তিগণকে “হুম্মীভাব” নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলঙ্কারিকেরা জাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাঁহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাহার লেখনী মুখে যেহে উচ্ছলিত থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ব কুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তি-প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রাসের শরীর ভাঙিতেছে; “মর্থ ছিড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, নীতা কখন বিশ্বাসস্থিতিভা; কখন আনন্দোপিতা; কখন প্রেমাসক্তিতা; কখন অভিমান-কুটিভা; কখন আশ্রয়বাননা সন্মুখিতা; কখন অসুখ তাপ বিবশা; কখন মহাশোক ব্যাকুল। কবি যখন বাহা দেখাইয়াছেন, একবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন নীতা বলিলেন, “অশ্রু—কলভ্রমসেহ ধনিদগম্ভীর সংসলো ক্রদোৎপন্নো ভাস্করী নিগম্যোমো! ভরিস্ক্রম্যাক্ষরবিবরণং মং বিমন্দভাইবিং স্বতি উন্মাদেবি!” তখন বোধ হইল, জগৎসংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শ-

ক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটী মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোরত্তির সমুদ্রতৎসীমামুশ্বাতা চিত্রিত করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাবণ্য হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কংখানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তাঁরতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানানুভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য ছয়স্তরের বিলাপ, দেশদিমোহনার জন্য গুণেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিগের নাটকে আনকেন্সথের জন্য আদমিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহুপ্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে বাহা অসুখ, অসুখ, বা অসুখ, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধান করেন কিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে হৃদয়ং কুমুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডল রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ হৃদয় বস্ত্র অবকীর করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে অসুখা বৃক্ষ, প্রকৃষ্টকুম্ব, সুসীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উজ্জ্বল পর্জত, মৃদুনিমাদিনী নির্ঝরনী, শ্যামল কাঁদন, তরঙ্গসমুদ্রা নদী—যেখানে হৃদয় বিবল, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরল স্তম্ভ—সেইখানে কবি নীড়াইয়া

একবার তাহার সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাহার রচনা সমাসবহুলতা ও দ্রুদগীর্ধাতা দোষে কলঙ্কিত। বলিয়া বিদ্যাগার মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দাসমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা

একানবর্ষী পরিবার।

যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথক অথচ সংযুক্তরূপে নভোমণ্ডলে পরিজন্ম করিতেছে, তদ্রূপ নম্রবাগন পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্রে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। অনেকই সময়ে সময়ে মনে করেন যে, “একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে ছইবেক,” অতএব “পার্থিব সম্পর্ক নিভৃত্ত অকিঞ্চিৎকর;” পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্যপি পার্থিবসম্পর্ক রহাই হয়,

এবং মৃত্যু কর্তৃক তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে বিরাগযন্ত্রণা এত অসহ এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কেন? মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী আদি নিরুচ্চ জন্তু এবং নদী বৃক্ষ গৃহ পুষ্করিণী আদি নির্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহু দিন হইল পিছু নাড় হীন হইয়াছি, তথাপি “মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, পিতা এইখানে একবার ভৎসনা করিয়াছিলেন এবং এইখানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অগ্র বিসর্জন

করিয়াছি।" এই রূপ কথা মনে হইলে কত সময়ে চক্ষু বাম্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কি রূপে বলিব যে, তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সদ্যোপ্রস্থত সন্তানই হউক, অথবা অতি দীন দুঃখী কিম্বা নিতান্ত দুঃখিত চুরাচুরাই হউক, কেহই মৃত্যুমান্র সম্ভার হইতে সর্গভাভাবে অপমারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চদ পায়, জীবাণী কোথায় থাকুক, তদ্বিশেষ অনেকের মতি স্থির নাই; তাখাপি কোনেদ জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিছুকাল থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই, যে কোন মৃত ব্যক্তিকেই স্মরণ করেন না অথবা আপনি বলিয়া স্মরণ করিবার চলাক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্বুত মায়াজাল কেহই তাগণ করিতে পারে না, কাহারও তাগণ করিতে ইচ্ছা হয় না—এং পণ্ডিতেরা ঘাছাই বলুন, আমাদিগের বিবেচনায়—ইহা তাগণ করা কর্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যে প্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়, সেই রূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। বাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই মায়াজাল বন্ধিত হওয়াই উচিত। এং বাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আব্রুহস্তিক দোষ দূরীকরণ পুঙ্খ লোকের হিত চেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

মনুষ্য জাতি যে পশুগণের ন্যায় বহুশ্রমচিহ্নিতরূপ না করিয়া একত্র বস বাস করেন, তাহার আদি কারণ, বিবাহসং-

স্কার। শুদ্ধ নিজেস্বরূপ আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পণ্ডের চিন্তান্তেই নিতান্ত ব্যস্ত। পরিবারের ভরণ পোষণ, এং সন্ততিগণের ভাবি অবস্থা সকলের মনেই নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে। তন্নিমিত্ত কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল, এং কেহ বা বৃন্দেশবাসিনীগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের শুভাচ্ছাদন সর্বদা মগ্ন থাকেন। জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই সম্ভাবনা মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রী-পুরুষের পূর্বকালীন স্বাধীনতা নির্মূল হইয়া যায়, এং উভয়ের মনেই আত্ম-চিন্তার পার্শ্বে পরচিত্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সপ্তদ্বয় তই তাচ্ছল্য থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এই রূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সংকর্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুর্কর্ম করে, তাহার জন্য 'মহামায়া'কে নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্য নিবারণের উপায় চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার বিবাহের পর সন্তান উৎপত্তি হইলে, পতি পত্নীর মধ্যে স্তন্যদেহ একটা শৃঙ্খল-নিবন্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা নাই, এং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই এতদ্বিধে যৌগ্ধচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণপক্ষে অস্বত্ব করিতে পারে না। জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনান

ভিন্ন অন্যের প্রীতি নির্ভর করেন না; সুতরাং সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়রন্ধি-কারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহ সংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যুক্তি-বিশেষ বলিয়া জন্ম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কেমনই সে রূপ বোধ হয় না; অতএব ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বিবাহের নিগূঢ় মর্মবোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বৈতকেতু পিতৃ সমকে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবেন না। এই গম্পটী বিবাহ প্রথা সম্ভ্রান্ত-পণ্ডের রূপকমাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, পুত্রই মাতার যৌগ্ধচারী নিবারণ করেন এং পিতাকে তাঁহার প্রতি অহরন্তু করিয়া রাখেন। অতএব পতি পত্নী সম্বন্ধ শিথিল করা কর্তব্য নহে বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই উদ্বলয় এং পুঞ্জের পক্ষে মঙ্গল। আর এই মঙ্গলে সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতি পত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই শ্রেয়ঃ। একথা স্বীকার করিলেও আর একটি পুঙ্খ নীমাত্মক প্রয়োজন হইতেছে যে, পুঙ্খ কন্যারও পিতৃসংসারে মাতার ন্যায় সংযুক্ত থাকিবেন কি না? কিন্তু যখন (নানাবিধ বিশিষ্ট কারণে) ভাতা-ভগিনীভিত্তি বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবাহান্তে পুঙ্খ কন্যা উভয়েই কখন পিতৃ-আবাসে থাকিতে পারেন না; হয় কন্যাকে পতিগৃহে যা-ইতে হইবেক,—নতুবা পুঙ্খ পিতৃ গৃহ

তাগণ করিয়া আপন স্বশ্রমালয়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমাদিগের দেশে কেবল কন্যাই পিতৃগৃহে তাগণ করেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পুঙ্খ কন্যা উভয়েই বিবাহিত হইলে স্বাধীনভাৱে কাল-যাপন করেন। এই নিয়মে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল বুদ্ধি হয়? তাহা স্থির করা কর্তব্য। ফলতঃ ইহাই একাদশর্ভী পরিবার বিধয়ক বিচারের মূল কথা।

বিবাহের সময়ে পুঙ্খ-জন্ম হইলে কু-হত্যাপ্রজনি কবির দোষ বোধ হয় না। কিন্তু বিবাহ করিবার পরে পিতৃভবনে বাস করিলে স্বভাবতঃ পিতা পুঙ্খ এং ভাতৃগণের মধ্যে একাদশর্ভী পরিবার নিবন্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর বাঁহারা পুঙ্খ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নান্য-মতে যুগ্মবিচ্ছেদের নিমিত্তক বলিয়া গণ্য হইবেন। অতএব যদ্যপি পুঙ্খগণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বিবাহের সময়েই তাহার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য।

১। একামে থাকার এক মহৎগুণ এই যে, যুগ্মস্থামির মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাতা, তদভাবে পুঙ্খ অথবা ভাতৃপুঙ্খ, কেহ না কেহ পরিবার রক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারেন। ইহারা পুঙ্খকালয়ে বাস করিলে, তাহার অনেক অনুরোধ জন্মে। বাম্পালির সংসারে পুঙ্খ অতিভাবক না থাকিলে, নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্গজ বাতায়াত করিতে পারেন না।

একামে থাকিলে সকলেই সময়াস্তরে বা ঘটনা বিশেষে পরস্পরের সাহায্য

করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্যগতিকে এক জনের দ্বারা অন্যর হিতসাধন হয়, এবং তাহা হইতে কখন কখন কার্য কার্যের বিপর্যয় ঘটয়া—স্নেহ হইতে যত্নের পরিবর্তে, অগত্য যত্ন-করিতে—লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হয়। থাকে। পিতা মাতার ত কথাই নাই; একাদশবর্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখনও এতদৃশ মমতা জন্মে যে, পৃথকভাবে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণ-নির্ধিত রজুর ন্যায়, একাদশবর্তী পরিবারের বল তুল্য সংখ্যক পৃথক সংসারের সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একাদশবর্তী পরিবারের অনেক গুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহু পরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। একাদশবর্তী পরিবারদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া যেমন রুদ্ধ, তেমনই হ্রাস হইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অধিক। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাম্যধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জাতি-বিরোধ জন্মে। পূর্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃতুল্য মান্য করিতেন, স্বতরাং সকল কার্যেই পরস্পরের মধ্যে আত্মগতা এবং মঙ্গলচেষ্টার লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না।

কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছাগুলি পূর্বাপেক্ষা এতাদৃশ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠেরা কোন মতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে অথবা তদনুসারে কার্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্বে শ্রীকে তাচ্ছল্য করাই স্বামির সন্তুষ্টিভার লক্ষণ ছিল; এক্ষণে পতি-পত্নীর প্রণয় দেখিলে কেহই দোষ দিতে পারেন না; অথচ এরূপ প্রণয় হইতে যে সকল কার্য উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রকাশ হইলে সামান্য লোকের পারহাস করেন আর গৃহস্থের মনোবেদনা হয়। সকলেই জানেন, পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর বিশেষ যাত্রা কালীন সস্ত্রীক গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্থানী কথঞ্চিৎ অস্বস্তি করেন। ইহা অভিভাবকের পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

একাদশবর্তী পরিবারের জাতিদিগের মধ্যে বয়োধিকারমতে প্রাধান্য জন্মে, কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্তা; গৃহস্থানী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটা গুরুতর হানি হয়। বালক বালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বতরাং এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গৃহস্থানী আংশিক রূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন না; এবং উহারাও সন্তুষ্টিবীরের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্বকালে বয়স কেবল গৃহস্থানীকেই

সর্বাঙ্গাঙ্গিক বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্য প্রণয়ের অধিকাংশ বশত উহার পতি এবং স্বস্তর অথবা ভাস্কর, ছইজন কর্তার অধীন হইয়া অনেক স্থলে নিতান্ত খেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

জাতুলস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার জাতার যত্ন বাহ্য বলিয়া মনে হইলে সে ক্ষেত্রে কদাচ নিরন্তর হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও স্নেহাংগুষ্ঠি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিমুগ্ধ মাত্র ক্রটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ মনুষ্যের মনে একটা প্রান্তিক বলপ্রাপ্ত হইলে অন্য গুলি সহজেই ধ্বংস হইয়া যায়; পতি পত্নীর মধ্যে প্রাণচ্যুত স্নেহ এবং গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব একাদশবর্তী পরিবারের দিশৃঙ্খলা স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক।

২। এতদেদর্শে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে; তৎকালে পুত্র বা পুত্রবধূ কেহই আশ্রম রক্ষার নিয়ম শিক্ষা করিতে পাটন না। স্বতরাং তজ্জন্য কিছুকাল গুরুজনের আশ্রমে থাকা প্রয়োজন। আবার, পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, বিবাহের অব্যবহিত পরে পৃথক হইবার নিয়ম প্রচলিত হইলে, বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত কতিমসমুদয় যুগপৎ নিবারিত হইতে পারে।

৩। পৃথগঙ্গ হইলে সম্পত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয়, এবং তৎকারণে ব্যয় বা-হুলা হইয়া উঠে। একাদশবর্তী তাহা উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃ ইহাই পৃথগঙ্গ হইবার মূলীভূত প্রতিবন্ধক। এতদে-

শীয় লোকের প্রধান সম্পত্তি ভূমি। ক্রমক্ৰমিকের পক্ষে ভূমি বিভাগে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু বাহারা তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ পূর্বক ভূমি অধিকার করেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিভাগের পরে কর সংগ্রহের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহাতে কাজে কাজেই অধিক খরচ পড়ে। ভূমির পরিবর্তে কেবল ভূমি-স্বত্ব বিভাগ করিলে ভূমি কিম্বা প্রজার উপরে শালিকের তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। কোন কার্যে এক জন শ্রমিক বদ্ধ হইলেই অপর সকলকে তাহা হইতে নিরন্তর হইতে হয়। ওদিকে ভূমি বিভাগ করিলে সে অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু একবার বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার পরে ভূমি বিভাগ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য। কারণ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের সকল প্রকার ক্ষতি রক্ষার বিচার করিলে ভূমি বিভাগ কখনই সর্বাঙ্গ স্বস্তর হইতে পারে না। তন্নিম্ন এতদেদর্শের ভূমি “বৈধা ফৌড়া” (পিতল গোলা) বলিয়া এই সফট শব্দ গুণে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ভূমি সম্পত্তি বিশিষ্ট লোকেরা নিতান্ত অসহ্য না হইলে একাদশবর্তী থাকিবার ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করেন না।

ভ্রাতৃসন বিভাগের নিয়ম আরো ভয়ানক। কত সময়ে ভ্রাতৃগণ পৃথক কুঠরী গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া এক একটা কুঠরীকে দ্বিভাগ করতঃ উভয়াংশই অব্যবহার্য করিয়া ফেলেন। বিবাদের এতই দৌড় যে, কেহ কেহ বিভাগের সময়ে পুষ্কারণীর মধ্য স্থলে বঁধ দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র একা-
কী সমস্ত স্বাবর সম্পত্তি অধিকার করেন।
স্বতরাং একুণ কোন গোলযোগই নাই।
কিন্তু অভিনব সমাজ শাস্ত্রবেত্তাদিগের
মতানুসারে এই নিয়ম দুঃখী। অন্যান্য
দেশে বিভাগ বিষয়ে শরিকদিগের মত-
ভেদ হইলে—ভূমি বিক্রয় পূর্বক মূল্য ভাগ
করিয়া লয়। এতদর্শে এই প্রণালীতে
সহরাতর ন্যায় মূল্য পাওয়া যায় না, এবং
অসুখী বলিয়া, ভূমির পরিবর্তে, অর্থ
গ্রহণ করিতে সকলেই আপত্তি করেন।

৪। একামবর্তী পরিবারের কলহের
বিষয় বাঙ্গালি মতেই অবগত আছেন।
ভবিষ্যে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য
যে, তাহা অনিবার্য। কলহ হইবেক না,
একুণ প্রতীশা লুকু আশাস মাত্র। স্বত-
রাং প্রথম হইতেই তাহার উপায় করা
যুক্তিসিদ্ধ।

কোনং মহৎ পরিবারে পৃথক হইবার
প্রতি এতই আপত্তি আছে যে, সম্পত্তি-
অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে
ভাগ দিতে চাহেন না। একুণ স্থলে
শরিকের অংশ অপরগ করাই অনেকের
মানস থাকে। কিন্তু তাদৃশ অসং অতি-
মন্ধি না থাকিলেও কেহ মনে করেন
যে, অনায়াকারী ব্যক্তি মোকদ্দমার ক্লে-
শ জানিতে পারিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত
হইয়া একাধে থাকিতে সম্মত হইবেন,
এবং উভয়েই লোকপবাদ হইতে অঘা-
ত হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার বৃত্তিতে পা-
রেন না যে, আন্তরিক মনোবাদের জ্বালা
লোকের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে
না। পৃথক হইবার যত প্রতিবন্ধক
উপস্থিত হয়, পরিণামে সমুদয় অকর্ণ্য

হইয়া যায়। কেবল উভয় পক্ষের অর্থ
নাশ, মান হানি, মনের ঘানি, এবং লো-
কপবাদের সীমা থাকে না।
পরিবারের মধ্যে এক জন অন্য শরি-
কের অর্থপহরণ করিলে, তাহাদিগকে
কোন প্রকারে উৎপীড়ন করিলে, অথবা
অপব্যয়ী হইলে সংসার সহজেই ভাঙ্গিয়া
যায়। অতি বড় ধনী পরিবারেও অপ-
ব্যয়ী ব্যক্তির ব্যয় সংকুলান হওয়া
দুঃসাধ্য। স্বতরাং একুণ স্থলে বাঁহারা
আত্মরক্ষা এবং স্ত্রী পুত্রের সম্ভলার্থ ভাষ্-
ত্যাগ করেন, তাহাদিগের নিন্দা করা
অন্যায়।

মধ্যবর্তী পরিবারে অর্থের অসচ্ছলতা
নিবন্ধন নানা প্রকারে পরস্পরের মধ্যে
বিরোধ উৎপন্ন হয়। স্বার্থসাধনের
জন্যই হউক বা পরিবারের সত্তম রক্ষার
জন্যই হউক, গৃহস্থানী সকল ব্যক্তিকে
নায্য অর্থ না দিয়া যদি কোন প্রকারে
নিজের আধিকার রক্ষা করেন, তাহাই হইলে
সকলেই তাঁহার প্রতি কুপিত হইবেন।
মনে কর, কোন পরিবারের এক ধানি
গাড়ি আছে; না রাখিলে সত্তমের ব্যা-
ঘাত, আবার রাখিলে প্রধানতঃ গৃহ-
স্থানির নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
কিন্তু ইহাতেও বিরোধ ঘটে; কর্তা মনে
করেন, আমি সকলেরই মাম রক্ষা করি-
তেছি; অধিনেত্রী মনে করেন, তিনি ন্যা-
যাংশের অতিরিক্ত লইতেছেন; একুণ
ঘটনা কেবল গাড়ির বিষয়ে নহে, পোষাক,
চাকর প্রভৃতি সমস্ত সত্তম সূচক ব্যয়ের
স্থলেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া
জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট

আপনার কোন প্রাধান্য প্রকাশ করি-
লেই তাঁহাদিগের মনে ক্রোধ উপস্থিত
হয়। আবার যেখানে কনিষ্ঠ কৃতী হইয়া
জ্যেষ্ঠের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হইলেন,
সেখানে তাঁহার দ্বারা একুণ কর্তৃত্ব প্র-
কাশ নিতান্ত অসহনীয়। কিন্তু অর্থ বা
বিদ্যা বুদ্ধির প্রেততা জন্য যে প্রাধান্য
জন্মে, তাহাতে কোন ব্যক্তি সর্বতো-
ভাবে গর্হনীয় হইতে পারেন না;—এবং
মনে যাঁহা থাকে, তাহা কালসহকারে অতি
মুর্খের নিকটেও প্রকাশ হয়। ফলতঃ নি-
তান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে
সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের ভূ-
লাতা রক্ষা করা অসম্ভব। গৃহস্থানী সর্বদা
সকলের স্বর্থ হুৎথের তত্ত্বাবধান, সামান্য
বিষয়েও আত্মসংযম এবং সর্বোপরি
বাকসংযম—না করিলে, কখনই ভাষ্-
রণকে একাধে রাখিতে পারেন না।
এতাদৃশ বৈরাগ্য, মাংসারী ব্যক্তির মধ্যে
নিতান্ত দুর্লভ।

সহোদরগণের সন্তান সন্ততি লইয়া
আর এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন
ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা অধিক এবং কাহার
অল্প হইলে খরচপত্র বিষয়ে জাতা এবং
সন্তান উভয় শ্রেণীতেই প্রত্যেকের ভুল-
তারক্ষা করা অসম্ভাবিত। স্বতরাং ইহার
অবশ্য ফল—পরদেব, অভিমাম এবং ব-
স্তুগা প্রভৃতি সহস্র বিপদ—নিবারণ করা
আশা; পরিশেষে নিশ্চয়ই সংসার বি-
ধ্বংস হইয়া যায়। অন্তঃপুর বাসিনীদিগের
মধ্যে কেহ ভর্তার বিশেষ অসুখ্য পাত্রী
হইলে সর্বনাশ হয়। পিতৃদত্ত আত্ম-
কুলের প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারে
না; কিন্তু যে যু পিতার নিকট সর্বদা উ-

পকার প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার স্বাভাবিক
গর্ভ অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে।

একামবর্তী পরিবারে কনিষ্ঠেরা পদেং
ক্বেল জ্যেষ্ঠের দোষই দেখেন, কিন্তু
গুণের বিষয় কেহই মনে করেন না।
সকলেই পরস্পর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি
জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে কে-
হই ব্যগ্র নহেন। কিন্তু গৃহস্থানীর সহস্র
দোষ থাকিলেও যীকার করিতে হইবেক
যে, তাঁহাকে পরিবারের জন্য সর্বদা
চিন্তা করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কেবল
আত্মবিষয়ক চিন্তাতেই নিপুণ, স্বতরাং
গৃহস্থানী স্বভাবতঃ কনিষ্ঠদিগের নিকট
কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন। পরন্তু মনুষ্য
প্রাত্যহিক উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা
প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু। অতএব গৃ-
হস্থানীর সেই প্রত্যাশা অসম্পূর্ণ থাকিতে
প্রথমতঃ অসন্তোষ, পূর্বে তৃষ্ণা, এবং
পরিশেষে অভিমাম, পরিণামে বিরোধ
অবশ্যই ঘটবেক। এই প্রকার ঘটনা
চুই একটীতে কিছুই হয় না; পুনঃ
হইতে থাকিলে, কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য
না করিলেও মনের মালিন্য ক্রমশঃ ব-
শিত হইতে থাকে।

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ মধ্যে এই রূপ; আরার
কনিষ্ঠ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আরো
সহজে উৎপন্ন হয়। সামান্য বিষয়ে
তাঁহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশ
পাইলে তাহা বিবারণ করা দুঃসাধ্য।
গৃহস্থানী তজ্জন্য কর্তৃত্ব প্রকাশ করিলে
কনিষ্ঠদিগের আক্রোশে পতিত হইবেন।
তাছাড়া করিলে-বিরোধী ব্যক্তিগণের
উভয় পক্ষই ক্ষয় হইবে, এবং মীমাংসার
চেষ্টা করিলে উভয়েই পক্ষপাতের দোষ

দেন। একামবর্তী পরিবারের মনোদ্য এই যে, কনিষ্ঠেরা কখনই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে পারেন না।

পুরুষদিগের তুলনায় অস্তঃপুরবাসিনীদিগের বিরোধ চতুঃপাশ্বে ভয়ঙ্কর। বধূগণ সকলেই স্বামী অথবা জ্যেষ্ঠ ভাতাকে ভয় করেন; তাঁহার ছিদ্ৰাহ্নসন্ধানে নিবদ্ধ থাকেন; তৎকৃত উপকার ভুলিয়া যান; তাঁহার নিকট মনের কথা গোপন করেন এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ সংগ্ৰহ করিতে থাকেন। অন্দের আছেন বলিয়া লোক লজ্জা অপন্ন হয়, এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য বশত কথার কোন আটক থাকে না। অধিকন্তু বধূগণের মধ্যে কেহ সম্পর্কে ছোট, কিন্তু রূপে বড় অথবা তদ্বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইলে বিরোধের আর একটি স্বরূপ হয়। বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মান পাওয়া হ্রাস, কিন্তু তিনি আপন পদের প্রাধান্য ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ স্বামির নিকট বিশেষরূপে আদর পাইলে (দ্বিতীয় সংসার) হৃদয়ে ইহা সন্দেহই ঘটে। তখন আর তাঁহার ব্রূহি স্থির থাকা অসম্ভব হয়। উঠে। তিনি ভর্তার উপর কর্তা, অতএব এই স্পষ্ট প্রদর্শন করিবার জন্য বয়সে জ্যেষ্ঠ-সম্পর্কে-কনিষ্ঠ-বধূগণ ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট স্থান কোথায় পাইবেন?

পৃথিবীতে যত বিরোধ উপস্থিত হয়, স্বপ্নপাত কালীন বিবদমানদিগের মধ্যে প্রায় কেহই তাহা জানিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষেরা স্নেহচরিত্র বিষয়ে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এই জন্য অবিলম্বে বিরোধের লক্ষণ ও পরিণাম বু-

ঝিতে পারিয়া অনেক কৌশলের দ্বারা তাহাহইতে নিষ্কৃতি পান। স্ত্রীজাতি চিরকাল অস্তঃপুরে বাস করাতে সৌন্দর্য কৌশলও শিক্ষা করেন নাই, এবং পুরুষের ন্যায় হঠাৎ বিপদও টের পান না। অনন্তর অমৃত্যোগ, রোদন, কপালে আঘাত, স্বামির নিকট মালিশ ইত্যাদি “গৃহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে কর, একটা বধূ অনবধানতা বশতঃ কোন কার্যের দ্বারা আর এক জনের কিঞ্চিৎ ক্লেষ জন্মাইলেন। ইনি ইহার হেতু অনুসন্ধানে কাল হরণ বা বাক্য ব্যয় না করিয়া অথ-মার ছুরভিসন্ধি অনুমান করিয়া লইলেন। এবং প্রতিফল না দিলে আধিক বা তুল্যতা রক্ষা হয় না; অতএব স্বর্ঘ্যেণ বুলিয়া একটা জ্ঞানকৃত অন্যায় করিলেন। অথবাও বিভীয়ার অল্পরূপ, বিশেষতঃ স্পষ্ট অন্যায় দেখিয়া কি প্রকারে কান্দ থাকেন; অতএব একটা শ্রেষ্ঠতর অন্যায় করিলেন। একবার কল চলিলে আর থামান কাহার সাধ্য? ওদিকে ইহা-দিগের অল্পরূপ প্রত্যহ রাজিতে বিচার কার্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ভাতাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধীয় আলাপ নিষিদ্ধ, স্বতরাং অনেক স্থলে “এক তরফা” বিচারেই একামবর্তী পরিবার নিঃশেষিত হয়। যদি ভাতৃগণ “ওয়াইফের” বিষয়ে আলাপ করেন, তবে কথা ঢালা চলিতে আর কিছু দিন অতিবাহিত হয়। মীমাংসার জন্য চারি জনের সাক্ষাৎ হওয়া বিভীষিত অভ্যস্তার লক্ষণ। অতএব পরিশেষে মূল কথা অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাম্পনিক কথার এসঙ্গে সংসার ভাঙিয়া যায়।

এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, মনেই বিচ্ছেদ হইবার পূর্বেই অম পৃথক করা ভাল।

একামবর্তী পরিবারের অন্যান্য দোষের মধ্যে পরভাগ্যোপজীবিতা অতি প্রধান। যাহারা ঐশ্বর্যক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা স্বভাবত পরভাগ্যোপজীবী, স্বতরাং একাদ পৃথগম উভয় অবস্থাতেই সমান। কিন্তু যাহারা স্বয়ং উপার্জন করেন, তাঁহারা সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়েই হইতে পারেন না। অথবা স্বাধীন হইবার ক্ষমতা জন্মিলে সামান্য কষ্টও অসহ বোধ হয়, স্বতরাং অল্প কাল মধ্যেই পৃথগম হইলে। আর যাহারা একমুখে থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই উপার্জনে অক্ষম অথবা প্রধান ভাতার তুল্য না হইতে পারিলে, অভিমান বশতঃ তাঁহার অম ধ্বংস করাষ্ট্র প্রের্য মনে করেন। কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় অকর্ম্মধা পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই। অথচ উপার্জনকারী আশ্রয় না দিলে তাঁহাদিগের যে দিন পাতেই বাধ্যত হয়, এমত নহে; বরং কেহই অর্থ সংগ্ৰহও করিতে পারেন। পরিবারগণের মধ্যে উপার্জনের স্থানান্তিরেক থাকিলে, এক জনের গর্ভ, অন্যের অভিমান, কাহারো ঈর্ষা এবং কখন কখন কোম ব্যক্তির দ্বারা ভাতৃধনাগরহণ পর্যন্তও ঘটনা হয়।

অনন্তর এই বিপত্তি নিবারণ জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য মনে করিয়াছি, তাহা একাংশ করা হইতেছে। এতদ্বিষয়ে সর্ব সাধারণের প্রায় মর্শ অত্যাশঙ্ক্য।

উপায়। গৃহস্থানী পুত্রকে উপার্জনে সক্ষম দেখিলে বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূকে সংসার কার্য শিক্ষাইবার জন্য কিছু দিন তাঁহার স্বস্ত্রীর অধীনে দিগের জন্য পৃথক আবাস নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। নতুবা, বিবাহের বায়ৎকেন্দ্রেপ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিবেন। এই রূপে এক জনের বাসস্থান পৃথক না করিয়া অন্য পুত্রের বিবাহ দিবেন না। যাহারা উপার্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের বিবাহ না দিয়া কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ দানান্তে তাঁহাদিগকে পৃথক করিবেন। পরিণামে কনিষ্ঠ পুত্র পিতৃ-আবাস অধিকার করিয়া যাত্রা, বিবাহাত ও ব্রহ্ম পিতার প্রতি পালন করার গ্রহণ করিবেন। পিতার অর্ন্তনামে মাতা এবং তদভাবে ভাতা কি অন্য অভিভাবক এই নিয়মে পিতৃ কার্য সম্পাদন করিবেন। ভূমি সম্পত্তি যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তবেই সর্বদা স্বন্দর হইতে পারে। তাঁহার অকর্ম্মাৎ যত্ন হইলে ভাতৃগণ স্বয়ং বিভাগের উপায় করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তি একাংশ করিলেই শাস্তি নিযুক্ত করা কর্তব্য। অন্ততঃ স্বগত্যা আদালতের সাহায্য লইতে হইবেক। কিন্তু দ্বিতীয়ম অস্ত্র রূপে প্রতিপালন করা কর্তব্য। যথা:—

১। বিরোধ হইবার আগে অম পৃথক করা বিধেয়।

২। পৃথগম হইয়া এত দূরবর্তী স্থানে আবাস নির্দিষ্ট করা উচিত যে ইচ্ছার বহির্ভূত সাক্ষাৎ না ঘটে। সর্বদা একজ

থাকিলে বিরোধ নিবারণ করা অসাধ্য, অতএব ঘোঁষাতে ইচ্ছা করিলে অন্যায়সে

বিনা সাক্ষাতে কাল ব্যাপন করা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যিক।

আচার্য গোল্ডষ্ট্রুকের কৃত

পাণিনি বিচার।

আচার্যের মৃত্যু ঘটনায় আমরা দুঃখিত আছি, সেই দুঃখ সহকারে আজ এই কয়েক পংক্তি স্মরণ চিত্র স্বরূপ তাঁহার পরলোক গত আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

“পাণিনি বিচার” অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যাঁহার মনে প্রকারের প্রতি ভক্তি রসের উদয় না হয়, তিনি অতি অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। দৃঢ় অব্যবসায়সহ অনন্য সাধারণ পরিশ্রম, সত্যোক্ত্যবনে ও সত্য প্রকাশে অকুতোভয়ভাব, অতি পরিপাটি বিচার শক্তি, অস্পন্দশী পণ্ডিতাভিনিয়োগের অগলত বচন প্রবণে প্রগাঢ়শ্রমী ও অগাধগামী ভট্টাচার্য্য স্বভাব শ্রুত কোপ প্রকাশ, প্রাচীন আর্য্যগণে অস্বা প্রদর্শন পূর্ব্বক আর্য্যগণের মহত্ত্ব স্থাপন জন্য ও লুপ্তপ্রায় আর্য্যগণের উদ্ধার জন্য একান্তমনে ও ত্রুতপালনে চেষ্টা, এ গুলি জ্ঞানমান রহিয়াছে। শারদীয় প্রতিমার প্রধান পক্ষ পুত্তলির ন্যায় জ্ঞানমান রহিয়াছে। আর্য্য গৌরবোদ্ধার চেতুমুর্জি মহাশুলে দশহাতে বিরাজ করিতেছে। সকল গুলিই দেবমুর্জি, প্রত্যেকটি দে-

খিলেই হিন্দুর মনে ভক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু এই পুত্তলি সমষ্টি অতি আশ্চর্য্য দর্শন। ইহার মহত্ত্ব আমরা আমাদের ক্ষুদ্রায়ত চিত্তে আয়ত্ত করিতে পারি না। সকল গুলিকেই প্রণাম করি, মধ্য মূর্ত্তিই মনে চিরঅঙ্কিত থাকে। “পাণিনি বিচার” অতি অপূর্ণ গ্রন্থ। তৎপাঠে বিচিত্রা শিক্ষা জন্মে। পাণিনি ব্যাকরণ কোন সময়ে হয়, এই বিষয়ে গ্রন্থে অতি সন্দেহ বিচার আছে। “পাণিনি ব্যাকরণের কাত্যায়ন কৃত “বার্ত্তিক” আছে; সবার্ত্তিক হ্রস্বসমস্তের পতঞ্জলিকৃত “মহাভাষ্য” আছে; এই মহাভাষ্যের কৈটয়ট (৩) কৃত টীকা আছে; সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি আরো অনেক টীকা গ্রন্থ আছে; কিন্তু আধুনিক বলিয়া আচার্য্য বিচার কালে সে গুলির বড় অসঙ্গত করেন নাই। এতদ্রিম কতকগুলি পদ্যময়ী রচনা আছে; সেগুলিকে “কারিকা” বলে। সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র থাকে; সংজ্ঞাসূত্র ও পরিভাষাসূত্র। সংজ্ঞাসূত্র গুলি প্রকৃত সূত্র; এই সকল সূত্র কি প্রকারে বুঝিতে

(১) কৈটয়ট।

হইবে, তাহাই পরিভাষায় লিখিত থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাত্যায়নই সর্ব্বাপেক্ষ প্রাচীন। তাঁহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কেহই লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। তাঁহার কৃত যেমন “বার্ত্তিক” আছে, তেমনি গুণকিত কারিকাও আছে। আর মহাভাষ্যের অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত। মহাভাষ্যের আর কতকগুলি রচনাকে “ইতি” বলে। পাণিনির অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা কাত্যায়ন প্রদর্শন করেন। মহাভাষ্যকার সেই সমালোচন কতদূর সঙ্গত, তাহার বিচার করিয়াছেন ও পাণিনি সূত্র সম্বন্ধে বাহা নিজ বক্তব্য, তাহা “ইতি” রচনায় গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, পাণিনির সকল সূত্রের কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিক নাই। কাত্যায়ন বার্ত্তিকের সকল গুলিই পতঞ্জলি পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু পতঞ্জলির সকল পাণিনি সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; আবশ্যক হয় নাই। সূত্ররাং কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া সে গুলি যে প্রকৃত পাণিনি সূত্র নহে, পরে সরিষোমিত ইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না। সম্ভারত্র প্রকৃতি প্রত্যয়ে, উভয়ের অর্থ সঙ্গতি জন্য শ্রুতের অর্থ হইয়া থাকে; কতকগুলি প্রত্যয় আছে, তাহাদের এরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয় না। তাহারিণ্যুকে “উ-গাদি” বলে। সেই দলক প্রত্যয় যোগ-নিষ্কার শব্দকেও উগাদি বলে। গোল্ডষ্ট্রুকের দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি ব্যা-

করণে যে উগাদি গুলি আছে, তাহা পাণিনির নিজেই; কিন্তু উগাদি সূত্রগুলি সম্ভবতঃ কাত্যায়ন বরুণটির। এবং ধাতু পাঠও পাণিনির নিজকৃত। “আচার্য্য গোল্ডষ্ট্রুকের কৃত জন বৈক্যাকরণিক মধ্যে কাহার পরে কে, তাহা অতি সন্দেহ যুক্তি সহকারে স্থির করিয়াছেন। যাহা এক জন বৈয়াকরণিক; পাণিনি বলেন, নিপাত তিন প্রকার; উপসর্গ, প্রতি ও কর্ম্ম প্রবর্তী। যাহা এরূপ কিছু বিভেদ করেন নাই। যাহার পাণিনির পরে না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যখন পাণিনির “বাস্ত্বানিভোষোক্তে” একটি সূত্রই রহিয়াছে, তখন যাহা যে পাণিনির পূর্ব্ববর্তী লোক, তাহাতে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

ব্যাড়ি বা ব্যালি নামে আর এক জন সংগ্রহকারী আছেন। কথিত আছে, তদীয় গ্রন্থ লক্ষ লোকসংখ্য। পতঞ্জলির একটি সূত্র এই, যদি ভিন্ন সময়বর্ত্তী অনেক ব্যক্তির নাম একত্রে এক পদমুক্ত্যকিতে হয়, তাহাই হইলে কাল গণনায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে। আমরা একটি উদাহরণ দি। যেমন মংস্যাকুর্ম্মবরহি; পৌরাণিক মতে মংস্যাবতারই কাল গণনায় অগ্রবর্ত্তী, সূত্ররাং সমস্ত পদেও মংস্য সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী হইলেন। পতঞ্জলির উদাহরণ;—

“আশিশল-পাণিনীয়-কাড়ীয়-গৌতমীয়া।” সূত্ররাং ব্যাড়ি পাণিনির পরে হইলেন। ইহার আরো প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি ব্যাড়িকে দাকায়ণ-বলিয়াছেন। দক্ষপুত্র দাকি; সেই গৌতম

দাক্ষায়ণ। পাণিনি যুবন শব্দের “অ-পতাং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রং” এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ পৌত্র প্রাপ্তি ইত্যাদিকে যুবন বলা যায়। উদাহরণে ভাষাকারের যেমন দাক্ষিণ দাক্ষায়ণ ইত্যাদি লিখিয়াছেন। স্বতরাং দাক্ষায়ণ দাক্ষিণ-তিন চারি পুরুষ পরবর্তী হওয়া সম্ভব। পতঞ্জলি বলেন, পাণিনির মতের নাম দাক্ষী। দাক্ষী, দাক্ষিণ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সুতরাং পাণিনিও ব্যাভি (দাক্ষায়ণ) ছুই পুরুষ ব্যবহিত।

বার্ত্তিককার বৈয়াকরিক কাত্যায়ন যে ব্যাকরণকার পাণিনির পরবর্তী, তাহাতেও অনেকে সন্দেহ করিতেন। অনেকে বলিতেন, তাঁহার সমকালবর্তী; আচার্য্য নানি মুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। আমরা তাহার সকল গুলি এক প্রবেশ সমিবেশ করিতে পারি না। একটি অতি সামান্য তর্ক উল্লেখ করিলাম। পাণিনির ৩৯৯ বা ৩৯৯৩ সূত্র আছে। তদাধো ১৫০০র অধিক সূত্রে কাত্যায়ন অঙ্গুলি ক্ষেপ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন। সেই জন্য ৪০০০ বার্ত্তিক লিখিয়াছেন। সেই চারি সহস্র বার্ত্তিকে স্থানত দশ সহস্র বিশেষ স্থল আছে। যদি সূত্রকার ও বার্ত্তিককার সমকালিক হইতেন, তাহা হইলে লোকে কাহার গৌরব করিত? পাণিনির কর্ণনই কেহ। কিন্তু হিন্দু বিশ্বাসে পাণিনি দেবল পুত্রপাদ্য মহর্ষি নহেন; ঈশ্বর্যবতার। কাত্যায়ন পাণিনির অনেক পরে হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পতঞ্জলি যে সকলের পরে, তাহা নিজেই স্বীকার করেন।

পাণিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কন্তকগুলি রৈয়াকরণিকের নাম করিয়াছেন; যথা, — আগশিলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্ষবর্শণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকলা, সেনক, ক্ষেটায়ন। তাহার পর ক্রমে আমরা আর কয়েকটি নাম পাই-তেছি; যথা, পাণিনি, ব্যাভি, কাত্যায়ন (বরকৃতি) ও পতঞ্জলি। ইহাতে বৈয়াকরণিকদিগের মধ্যে পাণিনির স্থলাধারণ হইল; কিন্তু পাণিনিব্যাকরণের বয়স্ক কত? এই প্রশ্নের আচার্য্য কিরূপ উত্তর দিয়াছেন, পাঠক মনোনিবেশ পূরক দেখুন।

শাকাসিংহ বুদ্ধ প্রাচীন ভারতে কিরূপ সামাজিক বিপ্লব উৎপাদন করেন, তাহা বঙ্গদর্শনের ২য় সংখ্যা উদ্ভীপন প্রবেশক ধর্ম্মগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। শাকাসিংহ ধর্ম্মবিশ্বাসেও বিধি বিপর্যয় উৎপাদন করেন। আচার্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কান্দনে মগ্ন থাকিতেছিলেন। শাকাসিংহ বলিলেন, ওরূপ আশা করিলে হইবে না; একবারে নির্দোষ পদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। তিনি এই নির্দোষ মত প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ মতে নির্দোষপদ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অর্থাৎ মতে সেরূপ হয় না। পাণিনি বলেন, “নির্দোষোহবাত।” নির্দোষ শব্দের বৌদ্ধ অর্থ থাকি দূরে থাকুক, নির্দোষ শব্দ “প্রদীপ নির্দোষ” স্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও পাণিনি লেখেন নাই। “নিভে যোগ্য” অর্থ আর “বায়ুহীন” অর্থ অনেক বিভিন্ন; পাণিনির সময়ে ছুই

অর্থ প্রচারিত থাকিলে তাঁহার মত বৈয়াকরণিকের তাহা না লেখা অসম্ভব। সুতরাং পাণিনি কেবল বৌদ্ধ মত প্রচারের পূর্বে নহে, যে অর্থ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধেরা নির্দোষ শব্দের সংজ্ঞা বাচক অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ জগদ্ব্যবহারে পূর্বে, ব্যাকরণ লিখেন। সিংহলীয় বৌদ্ধ গণনায় খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে শাকাসিংহের মৃত্যু হয়। স্বতরাং পাণিনি তৎপূর্ব্ব কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি গান্ধার (কান্দাহার) দেশবাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি প্রতীচী বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচী বৈয়াকরণিক।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যের বয়স্কন অতি ক্ষুদ্র রূপে নির্ণীত হইয়াছে। পাণিনি লিখিয়াছেন, “জীবিকায়ে চাপদোহ।” যে সকল বস্তু জীবিকার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথচ বিক্রীত হয় না, তৎসমূহাদির এইরূপ হইবে। পতঞ্জলি খীয় ভাষ্যে বলেন, মোর্ঘ্যেরা হিগণ্যার্থী হইয়াই অর্চনা পদ্ধতি স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈল্য বিক্রয় নহে, তাহাদের সমৃদ্ধে এ নিয়ম খাটিবে না ইত্যাদি। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, পতঞ্জলি মোর্ঘ্যবংশীয় প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী লোক। তাঁহার ভাষ্যের উপহাস ভঙ্কি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সেই বংশের শেষ রাজার পরবর্তী বলিয়াও বোধ হয়। যুনানী পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিলে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্বে রাজা হইবেন ও খ্রীষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্বে মোর্ঘ্য রাজ বংশের লোপ হয়। স্বতরাং

পতঞ্জলি খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে ও সম্ভবত ১৫০ বৎসর পূর্বে মহাভাষ্য লেখেন। আরো প্রমাণ আছে;—

পাণিনি সূত্র। অনুদ্যতেন লঙ।
“কাত্যায়ন বার্ত্তিক। পরোক্ষেচ লোক-বিজ্ঞাতে অথোক্তদর্শন বিধয়ে।
পাতঞ্জল ভাষ্য। পরোক্ষেচ লোক-বিজ্ঞাতে অথোক্তদর্শন বিধয়ে লঙ বস্তুব্যং।

অরুণদ্যাবনঃ সাক্ষেতঃ। অরুণদ্যাবনঃ মাধমিকান। ইত্যাদি
যখন কায়টি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত, এবং যখন তাহা ক্রিয়া প্রয়োগ কর্তার দর্শন বিষয় ছিল, অর্থাৎ যাহা তিনি দেখিতে পাইতেন, তখন লঙ হইবে, যেমন, যবন অথোপা অবরৌষ করিয়াছিল; মাধমিকদিগকে অবরৌষ করিয়াছিল; এতদ স্থলে অরুণৎ হইবে।

নাগার্জুন মাধমিক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রবেশক; বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পরে নাগার্জুন এই গ্রন্থ সংস্থাপন করেন। স্বতরাং নাগার্জুন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪৩ বৎসরে জীবিত ছিলেন; পতঞ্জলিও সেই সময়ে ছিলেন। তা নাহিলে তিনি যখন বরৌষ দেখিবেন কি প্রকারে? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে (in Bactria) অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন (Greco-Bactrian Kingdom) করিয়াছিল, তাহাদিগকেই তৎকালে আর্ঘ্যেরা যবন বলিতেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৬০ হইতে ৮৫ পর্যন্ত এই জাতীয় নয় জন রাজা হইলেন। তদাধো একজনের নাম যেনোক্ত। প্রাণো বলেন, তিনি য়ুনানী পর্য্যন্ত যবন

রাজ্য বিস্তার করেন। মথুরায় তাঁহার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ইনিই অযোধ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। লামেন সুন্দর রূপে দেখািয়াছেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব ১৩৪ বৎসর হইতে বিংশতি বৎসরের অধিককাল ইনি রাজত্ব করেন। অতএব খ্রীষ্ট পূর্বে প্রায় ১৩০ বৎসরের অথবা আজি হইতে প্রায় ঠিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পতঞ্জলি মহাভাষা প্রণয়ন করেন। আচার্য্য গোল্ডউক্কর কহিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় কালনির্ণয় কম্পে

বোধ হয়, কেবল এই গণনাটি শুদ্ধ কম্পনা অশ্রুতা নহে। যথার্থ। তিনি এ সম্প্রদায় কবিতো প্যারেন। আমরা এই তকের সঙ্কলিত কথা লিখিতে পারি নাই। এ পর্য্যন্ত বাহুনিপতিও করি নাই। তাঁহার সঙ্গে নীরবে এক দূর আসিয়াছি। যাহারা আচার্য্য গোল্ডউক্কর রচিত পানিনি বিচার পাঠ করিয়াছেন, তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, যাহারা পাঠ করেন না, অল্পরোধ করি, একবার নির্মম্মনে পাঠ করবেন।

বাঙ্গালী ভাষা।

কোন বিশেষ গ্রন্থ সমালোচন করা বড় কষ্টকর। ভাষা ভাল পারিলে, তাহাতে হস্তার্পণ করিলে কিছু কষ্ট অবশ্যই হইবে; যদি কেবল সেই জন্যই কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহা আর কোন মুখে বলিয়া বেড়াইতাম। শুধু মূর্খতা একাশ ভয়ের কষ্ট নহে, নানা কষ্ট আছে। অনেক সময়ে গ্রন্থকার সমালোচককে শঙ্ক বোধ করেন, খীয় গৌরবদ্বৈধ মনে করেন, এসব ভাবিলে মনে একটু কষ্ট হয় না? অবশ্যই হয়। উকীল, কদালি মধ্যে দেখিবেন, পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ বঞ্চেজিতে বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উভয়ে প্রশান্ত মনে বিচরণ করিতেছেন। কোন কোন দেশে লেখক ও পঠিতলেখকে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে। একরূপ হওয়া যে ভাল, তাহা আমরা বলিতেছি না। গণ্ডার

স্থল চর্য্যধারী বলিয়া জীব স্মৃতি মধ্যে তাহাকে সর্বপ্রধান বলি না। বরং আমরা ইচ্ছা বলি, যে ব্যক্তি যীয় অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ ব্যথিত হয়, সেই পরের ব্যথার ব্যথা বুঝিতে পারে। তবে আমরা একথাও বলিতেছি যে, বন্ধীয় গ্রন্থকারগণ আর একটু ঘাত-সহিষ্ণু হইলে ভাল হয়। মুৎকলস যা সহিতে পারে না; বাতু ক্যাস চারিদিকে চৌল পড়িলেও আপন কার্য্য করিতে থাকে। সমল সূর্য্য যা সহিতে পারে না, চটিয়া কাটিয়া লাগ, খাটি সোণা যত পিটিবে, ফাটিবে না, চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে না।

এস্তাব লেখক নায়রত্ব মহাশয় আমাদের সুপরচিত ও মাননীয়। এত কথা কিছু তাঁহাকে বলিলাম এমত নহে; তাঁহারকি গুটি কত কথা বলিতেছি। আ-

মরা কর্তব্য কার্য্যসাধন জন্য তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে বাহা কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি, অকতোভাষে বলিব। ভাষার দোষেই হউক বা মিত্র লেখা লিখিতে অভ্যাস করি নাই বলিয়া আমাদের অভ্যাস দোষেই হউক, আমাদের ভাষাটি সর্ব সময় মিত্র হইবে না। যদি কোন কথা বিদ্বেষ ভাবে বলি, তবে যেন ধর্ম্মে পতিত হই। আর আমরা সকল কথা ল্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলাম, তথাপি যদি তিনি আমাদিগকে বিদ্বেষী মনে করেন, তাহাহইলে আমরা যথার্থই দুঃখিত হইব। আমরা খণ্ড সমালোচন করিব না। সাধারণতঃ ভাষা বিষয়ে আমাদের ধাঁহা বস্তাবা, বলিয়া যাইব। পাঠকগণ নায়রত্ব মহাশয়ের মতের সহিত আমাদের মতের তুলনা করিয়া দেখিবেন; চিত্ত্য করিবেন, আপাততঃ আর কিছু করিতে অল্পরোধ করি না। তবে তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক খণ্ড জয় করিবেন। তাহা না করিলে গ্রন্থকার ও সমালোচক, উভয়েরই শ্রম বিফল হইবে।

কোন বিশেষ ভাষা এক সময়ে হয় না, একবারে যায়ও না। নানা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে। কোন সময়ের প্রচলিত শব্দ যে রূপেই কেন ধারণ করুক না, সেই শব্দ গুলির স্ফুটিল নামকে তখনকার ভাষা বলে। “তখনকার” শব্দটিই আমরা উদাহরণ যন্ত্রণ লইলাম। ঈকলেই তখনকার লেখন, “তখনকার” বা “তৎকালকার” লিখিত কাহাকেও দেখি না। কিন্তু “এখনকার” “এককালকার” দুই

রূপ পদই দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন দুই মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন; অন্যের এক বই দুই মূর্ত্তি এখন আর নাই। কালে বোধ করুন “এককালকার” একরূপ মূর্ত্তিও লোপ পাইল, কেবল “এখনকার” রহিল। ভবিষ্যৎ ভাষাশিক্ষানবিশ লিখিবেন, “পূর্বে ‘এককালকার’ ‘তৎকালকার’ বা ‘তৎকালকার’ এইরূপ ছিল, এত দিন হইল ‘এখনকার’ ‘তখনকার’ এই প্রকার লেখা চলিতেছে।” আমরা তাঁহার ভুল দেখিতে পাইতেছি। একটি শব্দের যেক্রপ পরিবর্তন হইল, চিত্ত অল্পরূপ শব্দের পূর্বরূপ রূপভেদ হইতে আর সহস্র বর্ষ লাগিল। হুগলি, কুকনগর জেলায় এইরূপ হইল; বাক্তাভাতে সেইরূপ পরিবর্তন হইতে আর তিন শত বৎসর লাগিল। স্বতরাং ভাষা পরিবর্তন বিষয়ে কোন কথা হঠাৎ বলা বড় দায়। একটি কথাই যখন এইরূপ হইতে পারে ও হইতেছে—তখন ৫০০০ কি. ৬০০০ কথা পরিবর্তন কম্পে কি রূপ হইতেছে, তাহা সুন্দর বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু একথাও আমরা স্বীকার করি যে, বালকরা যেমন এক বার মাথা কাড়া দিয়া, উঠে, বালিকারা যেমন একবার বিবাহের জল পেয়ে আজ কাল পাতা কটান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়, একটু বেশী সুন্দরও হয়, সেইরূপ ভাষাও সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক ভাগে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। অনেক শব্দের এককালে একই রূপ পরিবর্তন হয়। রাজবিধ, ধর্ম্ম বিধ বা বিজ্ঞান বিধে এই রূপ হইয়া থাকে।

• বাঙ্গালী ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাবলি। বিখ্যাত বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের সাক্ষিত্র জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচন সম্বন্ধে প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত নায়রত্ব শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত।

ইংলণ্ডে রোমান, ডেনিশ, নর্মান রাজগণ সকলেই সাফল্য ভাষার অল্পে খেলাত দিয়া গিয়াছেন, ভাষা রাজ-ভক্তি সহকারে সেই সকল রাজত্বই এখনও অল্প ধারণ করিয়া আছে। বাইবেল অল্পবাক্যগণ্য সেই ভাষার সর্ব অল্পে ক্রীড়ার তিলক চিহ্ন দিয়া গিয়াছেন, ভাষা ভাষাও ধারণ করিতেছেন। রাজা এলিজাবেথের সময়ে বেকন প্রভৃতি যে রসের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, ভাষা সেই রসে যান করিয়া সেই জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে চল কান্তিতে বিরাজ করিতেছেন। জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই এই রূপ রক্ত চিহ্ন, ধর্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছে। বঙ্গভাষাও সেই রূপ আছে।

বঙ্গদেশে এক সহস্র বৎসর মধ্যে বোধ হয়, চারিটি কি পাঁচটি বিধব ঘটিয়াছে। দুই তিনটি রাজবিধব, দুই তিনটি ধর্ম-বিধব। রাজবিধব দুইটির ফল ভারত-বাণী। বংশোদ্ভূত খিলজি ও রবর্ত ক্লাইবের নাম দশমবর্ষীয় বালক পর্যন্ত জ্ঞানে। খিলজি, শেখজি, সৈয়দজি সকলেই ভাষার অল্প চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্লাইবের জাতীয় ভাড়াগণের চোখা ও উৎসাহ মনে বঙ্গ ভাষা জগৎ বিখ্যাত হইতে চলিল। “এই ভাষার এখন যত কেন গৌরব করি না, ইং-রাজ-উৎসাহ গুণে যে ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা দুইটি মাত্র রাজ-বিধবের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু দুই

তিনটির কথা বলিতেছিলাম। তাহার কারণ আছে। বঙ্গদেশীয় সেন রাজ-গণের আগমন বর্ত্তি আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু নায়রজ মহাশয় বলিয়াছেন, যে স্বন্দরবন মধ্যে যে সন্দ-পথফলক-পাওয়া গিয়াছিল, ও তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রমও প্রায় সহস্র বৎসর হইবে; এবং তাহাতে বাঙ্গালা লোকের সেই সময় যে রূপান্তর হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহাই হউক, অন্য অন্য নানা কারণে আমাদেরও প্রতীতি আছে, যে সেন রাজ্য স্থাপন জন্য বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকিবে।

দুই তিনটি ধর্মবিধব হইয়াছে। প্রথম দুইটি, তত্ত্ব মত বিস্তার ও ভাগবত মত বিস্তার। এ দুইটি সমুদায় আর্য্যাবর্ত-বাণী। তত্ত্ব বা ভাগবতের সময় গ্রন্থ করা অত্যন্ত কঠিন। তত্ত্ব শাস্ত্রে বাঙ্গালা বর্ণ মালার বিশেষ বর্ণন আছে ও অনেক বলেন যে, তত্ত্বশাস্ত্র সম্পূর্ণ এই দেশজাত ও ইহাতে যে সকল আচার ব্যবহারের বর্ণনা আছে, তাহার অনেক গুলি বাঙ্গালি সম্বন্ধে বিশেষ খাটিতে পারে। সূত্র-রাং তত্ত্ব শাস্ত্রের সময় নির্ধারণ করিতে পারিলে বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস কিছু স্থির হইতে পারে বলিয়া আমরা এবিষয়ের আলোড়ন করিতেছি। তত্ত্ব শাস্ত্র খাটি বাঙ্গালি জিনিষ, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। মহা-রাষ্ট্রে রাজব্বারাদেশে তান্ত্রিক মত প্রচলিত ছিল; এখনও আছে, বলা বাইতে পারে। তবে এতটুকু বলা যায় যে আর্গা নাটকের প্রথমার্ধ যে সকল রক্তচূর্ণিত

অভিনীত হইয়াছিল; সেই ব্রহ্মবি বা ব্রহ্মাবর্ত দেশে, বুরু, মৎসা, পাঞ্চাল, শুরসেন প্রভৃতি দেশে, ভাষার সেই নাটকের প্রহসন অথচ লোনহর্ষণ ভাগ, গুলি অভিনীত করেন নাই। করেন নাই—তাই বা ভ্রমশ্য করিয়া বলিতে পারি কই? পুণ্যক্ষেত্র বারানসীতে ভাষার “শ্যামারহস্য” মতের মুক্তি পথে বিচরণ জন্য, “উপাধিপাত্তা” “পাদ্বাউপা” করিয়াছিলেন কি না, কেমন করিয়া বলিবে? যাহাই হউক, তত্ত্ব শাস্ত্র কেবল বাঙ্গালায় আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গালির ভেয়েরা, বোধ হয়, পূর্বে কখনই কাঁচলি পরে নাই! যদি পারিত, ত ছাড়িত না। যদি তত্ত্বাভিনয় কেবল বাঙ্গালাতেই হইত তাহা হইলে, “কাঞ্চুলিক” মত কখনই তত্ত্বশাস্ত্র মধ্যে অবশ্য করিতে পারিত না। তত্ত্বশাস্ত্র বাঙ্গালায় আবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে ভাষার কি করিয়াছে? যিনি উগ্রভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি একই শাস্ত্র হইয়া আরো কয়েকটি প্রশ্ন মনে ভিত্তি করিবেন। তত্ত্ব শাস্ত্রে বাঙ্গালির আচার-ব্যবহারের কত দূর পরিবর্তন হইয়াছে? তাহাতে আচার ব্যবহারের পরিবর্তন করে, তাহাতে ভাষার ব্যত্যয় করে কি না? যখন কালীকির কবি রামপ্রসাদ সেন গান করিয়াছিলেন।

সুরাপান করিলে আমি সুধা খাইরে কুহু-হলে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ মনুভাগে
মাতাল হলে।

তখন তত্ত্ব মতে বাঙ্গালির বা বাঙ্গালি ভাষার কি করিয়াছিল, তাহা তিনি না

বুঝিতে পারেন, আমরা এখন কতক বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নীলচন্দ্র, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতির রচনা, ও তত্ত্বাভিনীত সহস্র জনের লক্ষ শ্যামা বিহারী গীতিতে যে বাঙ্গালা ভাষার কতক পরিবর্তন হয় নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না; আর তত্ত্ব শাস্ত্র না থাকিলে এ সকল কোথায় থাকিত?

তত্ত্বশাস্ত্রকে আমরা যোগ শাস্ত্রের ও সাংখ্যশাস্ত্রের একই নিম্পণ অতি বিকৃত কীট পরিপূর্ণ কলমের চারা বলিয়া সময়ে সময়ে বিবেচনা করি। যোগ শাস্ত্রের পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ নইয়া তত্ত্ব প্রণেতাগণ সাংখ্যোক্ত গুরু-প্রকৃতি-বাদে কলম লাগাইয়াছিলেন। সেই কলম তখনকার কুৎসিৎ প্রের্তি দানস্না মশলার গুণে শীঘ্রই সড়েজ' হয়, ও অচিরে এক ক্ষুদ্র রন্ধে পরিণত হয়। সেই রন্ধে কালে যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা বাইতে পারে না। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া এই সকল সাংখ্যগোষ্ঠী সৃষ্টির আন্দকারগণকে প্রকৃতি বা শক্তি উপাধি দিয়া, উপনিষদে, দর্শন শাস্ত্রে সেই কারণকে যে দ্বীবিদ্বজ “ব্রহ্মব্যাক্য” নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, জগৎ কারণের সেই ব্রহ্ম উপাধি ইচ্ছা পূর্বক এতদূর করিয়া, জগদীশ্বরী-জগদদ্বা পদের ব্যবহার আরম্ভ করিল। আবার খেণ্ডশাস্ত্রতত্ত্বে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া এই জগদীশ্বরীর সহিত তাহাঙ্গের যোগ কি প্রকার, তাহার অনুধান করিতে লাগিল। সৃষ্টিকর্তার পহিত স্বষ্ট জীবের যোগ কেবল এক

প্রকারেরই হইতে পারে। তিনি প্রসূতি, আমরা অশ্রুত। বিশ্বাসের সহধর্মিণী ভক্তি আসিয়া এই বিশ্বাসকে এক রূপ জীবন্ত করিল। স্বতন তান্ত্রিক ভক্তি সহকারে পূত্র বিশ্বাসে মুক্তিহিতি কারণে “জগদধে মা” বলিয়া অপরূপ তৃপ্তি লাভ করিল। মুক্তি কারণ এখন আর অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ নহেন, তিনি জননী; জননী অচিন্ত্যনীয়া নুহেন; উপনিষদ সময়ের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় “নিমন্তে সতেতে জগৎ” কারায়ন, নিমন্তে সতেতে সর্বলোকাশ্রয়ঃ,” বলিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ভক্তিবান্ কিস্তি থাকিতে পারে, বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? মাতার সহিত মাঞ্চাৎ-সম্বন্ধ, জানসম্বন্ধ নহে; কৃপা পাইলে মায়ের কাছে কেঁদে বলিব, তুমার সময় বলিব “মা জল দেও!” মায়ের উপর অভিমান করিব, আদার করিব, স্নেহ-মমী মায়ের দেহ বল পুত্রক আকর্ষণ করিব; —তত্ত্বোপাসক এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন। একরূপ স্থির করিয়া আর কেহ অধ্যায় পদার্থবাচক শব্দ লইয়া, দীর্ঘ সময় রচনা করিয়া কুলিম ব্যাকরণের জটিলতা রক্ষা করিয়া, দাঁতভাঙ্গা-বর্ণ বিন্যাস করিয়া, —রচনা করিতে পারে? তা পারে না।

বাঙ্গালি তত্ত্বোপাসকের পক্ষে সৃষ্টি কারণ কেবল মা নহেন, তিনি বাঙ্গালি মা; স্নেহময়ী, কিন্তু-সংস্কৃতজ্ঞা নহেন। উপাসকের, জ্ঞান বলিল, ঈশ্বর সর্ববিশ্ব, তুমি যে ভাষায় ডাকিলে, তিনি তাহাতেই শুনিলেন; বাঙ্গালি উপাসকের ভক্তি বলিতে লাগিলে, তুমার ঘরে গিনি তো-মার ব্যারামের সময় তোমার গায়ে

হাত বুলাইয়া “হাবা কেনন আছি-স রে?” বলিয়া অতি কাতরস্থের জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই ঈশ্বররূপিনী। মায়ের স্নেহই ঈশ্বরের শক্তি। যদি ভূমি জগদীশ্বরকে, তোমার ঐ মায়ের সহিত যেক-রূপ কথা কহিতেছ, একরূপ শাশা কথায় মন খুলে ডাক, তাহার কাছে বোদ, ত-বেই তোমার আশ ভরিবে। মাধক ভ-ক্তির উপদেশ গ্রহণ করিল; আশভরে গায়িল “আমায় বেওবা তবিল দারি” ইত্যাদি “আমি বিনা মাইনায় চাকর ইত্যাদি। “ধন্যাক্ষয় পদ প্রদান কর,” “আমি অবৈতনিক সম্পাদক,” একরূপ বাক্য তাহার জিজ্ঞাস্য আসিল না। বা-ঙ্গালা ভাষা কাজে কাজেই এই পণ্ডিত পরিত্যক্তপণ্ডে (আমরা বলি) অথচ সহজ, সোজা, চিক পথে চলিতে লাগিল।

ভাগবত। ভাগবত গ্রন্থ কত দিনের? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। ভা-গবতের ১২ স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে “চতুদশং ভবিষ্যৎসং”। ভা-গবত ভবিষ্যৎয়ের গুরু হইল। তাহা হ-ইলে বড় আধুনিক বিবেচনা করিতে হয়। পাণ্ডে ও মাংসো ভাগবত পুরা-ণের উল্লেখ আছে। কতক পুরাতন মনে করিতে হইল। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, “যখনাস্ত্যজ গ্রীকোবাক্তিমানেরা খাতান্ত; এ কোন যবন? গ্রীকো-বাক-তিয়ানেরা? না মুসলমানেরা? আবার পদ্ম পুরাণ বলেন, পুরাণ মধ্যে সময় গণ-নায় পদ্ম প্রথম, ভাগবত শেষ। এবার কিছুই বোঝা গেল না। পদ্ম যদি প্রথম, তবে ভাগবতের নাম জানিল কি প্র-কারে? আবার ভাগবতে সকল পুরা-

ণেরই নাম আছে, স্বতরাং ভাগবত শেষ পুরাণ হওয়াই সম্ভব। ব্রহ্ম বৈবর্তে বাঙ্গালিরা যে ভাবষ্টি মনে করিয়া এটো বা দগড়ি বলে, সেই ভাবটির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে কেনন একটু বাঙ্গালি বাঙ্গালি বোধ হয়। ভাগ-বত এই বাঙ্গালি গন্ধী পুরাণেরও পরে? ভবিষ্যৎও পরে? তবে বড় আধুনিক। এমনও হইতে পারে যে, ভবিষ্যৎ বা ব্রহ্ম বৈবর্তের যে শ্লোকগুলি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া থাকি, সেই গুলি পরে বসান। হউক বা না হউক, ভাগবত পুরাণ বড় আধুনিক নহে। ইয়রোপীয় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ভাগবত, পুরাণ খ্রীষ্টাব্দের জয়েদন শতাব্দীর লিখিত ও বেগদেব গোদামী ইহার প্রণেতা। ইহার বয়সক যে এত অপ্প ও মুসলমানের রাজা-দিকারের পর ইহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ভা-গবতের প্রাগট অথচ কুট রচনাতন্ত্র দেখিলে, অন্যান্য পুরাণ যে সময় মধ্যে লিখিত, সে সময়ের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না, সকলের পরের লেখাই বোধ হয়। ভাগবতে অনার্য জাতি মধ্যে হুন (Huns) জাতির উল্লেখ আছে। সু-তরাং ইহা জয়েদশ শতাব্দীর লিখিত না হইয়া আরো আয় ছুই তিন শতাব্দী পূর্বের বলিয়া বোধ হয়।

পাঠক বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতে পা-রেন, মনে করুন, ভাগবত না হই দশম শতাব্দীর রচনাই হইল; তাহাতে ভী-ষার কি হইয়াছে? গোপনে চিন্তা না করিয়া মহাশয়ের সমক্ষে কাজে কলমে

চিন্তা করিতেছ—অত কষ্ট হইবে না। আর শ্রীমহাভাগবত বিষয়ে ভাবিতেছিলাম, সুতরাং ক্রমা প্রার্থনাও করিতে পারি না। ভাগবতের স্তব এই বঙ্গ ভূমিতেও ওড় প্রোতভাবে রচিয়াছে। ভাবায়ও সেইরূপ। জয়দেবের “ললিত লবঙ্গ-লতা পরিশীলন কৌমল মলর সমীরে” সেই ভাগবতেরই মধুর গন্ধ বহন করি-তেছে; বিদ্যাপতি, কবীন্দ্র “রসধাম” চণ্ডী-দাস “রসেশ্বর”, কোন রসে? এই ভাগবতের রসে। চৈতন্য দেব যে প্রেমে মাতিয়াছিলেন, ভাগবতই তাহার নি-দান। চৈতন্য দেবের বিষয় বিশেষ স-মালোচন করিবার ইচ্ছা আছে। একদে জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীন্দ্রস এতুতি চৈতন্যের পূর্বগামী ভাবুকদিগের রচ-নায় ভাবার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ জয়-দেবের সহিত বাঙ্গালা ভাবার কি সম্বন্ধ আছে? অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তিনী ভাষা। তবে কি আমরা বলি যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে। না, তাহা বলি না। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গা-লার জননী, মাতামহী বা পিতামহী নহে! তবে জয়দেবের সংস্কৃত ও ছন্দের মধ্যবর্তী কি রূপ? —সজীব প্রাণী হইতে উদ্ভিদ তরুলতাদির জন্ম হয় নাই অথবা উদ্ভিদ হইতে “জন্তু সৃষ্টি” হয় নাই; কিন্তু পুরুষ বা প্রবাল এক জাতি, ও জীবজাতির মধ্যবর্তী। জয়দেবের ভাষাও সেই রূপ। সে ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত; অথচ “ললমুখী কুঞ্জং” বলিলে “মায়িকাকে আধোমটী টান। পেড়ে

শাঙ্গী পরিহিতা বলিয়াই বোধ হয়। যেন বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালী কথাই কহিল। শকান গ্রন্থোক্তা নায়িকা সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের ভাষ্য বাঙ্গালী ও সংস্কৃতের মধ্যবর্তিনী। যদিও এ প্রবন্ধে বাঙ্গালী সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে আনাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি জয়দেব, বিদ্যাপতিরক 'প্রণাম কিরীয়ার জন্ম একটু নীড়াইতে হইতেছে।

ঐক্য, প্রেমী; রামচন্দ্র, কন্ডিয় ধর্মী রাজা; শাকাসিংহ, শুদ্ধ বুদ্ধ; ইশা, নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানব; গৌরাঙ্গ, ভগবান ভক্ত; মহম্মদ—তাঁহার পয়গম্বর; কোমৎ—মহাভ্রানী। ইহারা মনুষ্য জন্মের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বীর ধর্মী, কন্ডিয় ধর্মী পশ্চিম দেশীয়েরা ত্রিরাশিচন্দ্রের চরিত্র বুঝিতে পারিল; তাহাকে চিনিতে পারিল; মাদরে গ্রহণ করিল। কোমল স্বভাব বাঙ্গালি কোমল প্রেমে মজিল; আবার গৌরাঙ্গ আসিয়া যখন ভক্তি বাতালে সেই প্রেম নদীতে নদীর কিনারায় নদীয়ায় ঢেউ উঠাইলেন, তখন তাহার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিল। গৌরাঙ্গের পুর্বেই এই প্রেমের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। যে প্রেমাবতারকে কৈশর বলিয়াছে, সে প্রেম, হইতে বাতচার সত্ত্ব, একথা কখনই মনে করিতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ, তা কি কখন কলুষিত হয়? রামোপাসক কি সীতা নির্দাসনে পাগল মনে করিতে পারে? কন্ডিয়ের কুলধর্ম

পালনে পাগল কখনই হইতে পারে না। প্রকৃত গৌরাঙ্গোপাসক বৈষ্ণবকে যদি বলা যায়, “কেবল ভুক্তিতে কোন কল হইতে পারে না; জ্ঞান দ্বারা ভক্তির সংঘম করা উচিত; ভক্তির আধিক্য বাতুলতা জন্মিতে পারে; ঈশ্বরদত্ত এই মহৎ জ্ঞান ইচ্ছাপূর্বক হারান কখনই উচিত নহে, তুমি ভক্তি একটু সংযত কর।” এ কথা কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারিবে? সে বলিবে, “আপনি তাই বলুন, আমি যেন ভক্তির আধিক্য বাতুল হই; আমি যেন সেই ‘দশা প্রাপ্ত’ হইয়া চিরকাল যাপন করি। আহা! তাহাইল ত এজুর রূপা হইয়াছে।”

জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সেই রূপ, প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেম রূপ যে কোন পদার্থ আছে, তাহা অনুভবও করিতে পারেন নাই। প্রেম হইলেই হইল, সে প্রেম যখনই পাইয়াছেন, আত্মাদে উন্মত্ত হইয়া, তারি লোফানুগি, তারি ছড়া ছড়ি, তারি চলা চলি করিয়াছেন। যে আপনা ভুলে গয়ের জন্য বাস্ত, তাঁহার তাঁহার জন্য বাস্ত ছিলেন। রম্ভাবন বিলাসিনী রাধা যখন যৌরতিসিরা রঞ্জনাতে, চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, সেইরূপ, সেই তিসির পুঞ্জ কুঞ্জ বনে, একাকিনী,—লম্বিতাবেণী, চুখিতাধরনী একাকিনী শ্যাম গুণমগিরি জন্য জগৎকরিতে, তখন তাঁহার। সেই একগতা প্রাণার পশ্চাতেই ধাবমান হইতেন। তাঁহার। পবিত্র হৃদয়ে রাধা শ্যামের শিল্পে দেখিতে পারিতেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই প্রেম পাথর প-

থিক। পদকম্পতরু গ্রন্থের প্রথম ভাগ এই প্রেমের পাথর, এই গ্রন্থে প্রেম পরিচ্ছেদের সুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। নায়কের বিচ্ছেদকে প্রেমবিচ্ছেদ বলি না। বরং বিচ্ছেদে কত প্রেম দেখুন। পেনপুনকলাবতী প্রির মণী মাছে। আছইতে আছা কখন পুতলা। কুবনে অনুপম রূপ গুণে কুশলা। এবে ভেল বিপরীত আশর দেহ। দিবসে মলিন রত্ন টান কি রেহা। বাম করে কপোলাল লুটিত কেশ ভার। কর নখে লিখু মণী আখি জল ধার। বিদ্যাপতি ভগ—

নব প্রেমে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছে; ছায়ায় এই চিত্র কি মনোহর ভাবেই দেখা যাইতেছে! আমরা বিদ্যাপতির

এই পদটি তুলিয়াই অগত্যা ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাদের সুন্দর পদাবলীর বিশেষ সমালোচনের ইচ্ছা রহিল।

প্রধান কয়টি বিষয়ে তাঁহার কত দূর পরিবর্তন হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।^(১) ভাগবতে ভাষার অনেক রূপান্তর “করিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে ভাষার কত দূর স্বমরতা, কোমলতা, সরসতা, লালিত্য সম্পাদন করিয়াছে, ভাষাকে কত দূর সংস্কৃতাপসারিণী করিয়াছে, সকলে বিবেচনা করুন। ইহার অগাধ রচনা প্রণালীতে বঙ্গভাষাকে কতক সংস্কৃতভাষারিণী করিয়াছিল। তাহাই এখন বক্তব্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জ্ঞান ও নীতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই—বীকার করেন, সভ্যতারহিত-সম্ভার জ্ঞান রক্তি হইতেছে। পুর্ক পরিচ্ছেদে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সভ্যতার ভারতম্যামুসারে নীতিরও ভারতম্য লক্ষিত হয়। একপু হইবার কারণ কি, সভ্যতার প্রকৃতি বিবেচনা করিলেই সহজে বুঝা যায়। মনুষ্য যত গণ্ডভাব পরিগ্রহ করিতেছে, যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইয়া বাহু অগতের উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছে, যত নিজের প্ররক্তি দমন করিয়া সমাজের

মঙ্গল সাধন করিতে শিখিতেছে, ততই ক্রমে ক্রমে সভ্য হইতেছে। “সভ্যতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থে বাকল সাহেবও ইহা স্পষ্টাকারে লিখিয়াছেন। তিনি মানসিক উন্নতিকেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার মতে “এই উন্নতি দুই প্রকার, নৈতিক ও বৌদ্ধিক; প্রথমটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তব্য বিষয়ে, দ্বিতীয়টী জ্ঞান বিষয়ে।” (১) তিনি আরও বলেন, “যদি, এক পক্ষে,

(১) Buckle's History of Civilisation. Vol. I, p. 174.

কোন জ্ঞাতির ক্ষমতা হৃদ্বি সহকারে পাপ হৃদ্বি হইতে থাকে, অথবা, অপর পক্ষে, যদি ধর্মোপেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে অ-জ্ঞানতা বাড়িতে থাকে, নিঃসন্দেহ, সে জ্ঞাতি উন্নত হইতেছে না। এই দুই প্রকার গীতি, নৈতিক ও বৌদ্ধিক, সভ্যতা রূপ ভাবের অঙ্গ স্বরূপ, এবং মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ মধ্য নির্দেশক।” (২)

কিন্তু বাল্ক-বদিও নৈতিক উন্নতিক সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহার মতে মনুষ্যের নীতি-কিন্মাত্রও উন্নত হয় নাই; উহা চিরকালই স্থির-ভাবাপন্ন আছে; পূর্বকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। লোকে পূর্বাপেক্ষা সুনীতি সম্পন্ন হইয়াছে কি না, বহুল বোধ করেন, ইহা নির্ণয় করিবার একটা মাত্র উপায় আছে। দেখ, নীতি বিষয়ে কোন মতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। লোকের কার্য বিধাসের অঙ্গুগত; যদি অভিনব নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিবর্তিত না হইয়া থাকে, তবে নীতি-সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা নাই। এই মুক্তিঅবলম্বন করিয়া বাল্ক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নীতির উন্নতি নাই। তিনি বলেন, “আমাদিগের নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে, সভ্যতায় ইউরোপীয়দিগের জ্ঞাত এমন একটা নিয়ম নাই, বাহা প্রাচীনরা জানিতেন না।” (৩)

“পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জন করিবে; প্র-

তিবেশীগণকে আশ্রয় ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইঙ্গ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে; এই গুলি এবং আরো গোটা কতক নীতি শাস্ত্রের মার কথা। কিন্তু এগুলি কত সহস্র বৎসর পরিক্রান্ত রহিয়াছে, এবং কি উপদেশ, কি বক্তৃতা, কি গ্রন্থ দ্বারা কোন নীতিবেত্তাও ধর্মোপদেশটা একটা বিম্ব বিসর্গও হৃদ্বি করিতে পারেন নাই।” (৪) “যে বলে পুরাকাত কোন নীতিতত্ত্ব মানবজাতি খ্রীষ্ট ধর্মের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয় ত মহাযুগ, অথবা জানপূর্বক বন্দনাকারী।” (৫)

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর আইসে, তাহাতে বোধ হয়, বাল্ক সাহেব মহাশয়ে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা স্বীকার করি না যে, যদি নীতি বিষয়ক কোন মতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈতিক উন্নতি হয় নাই। কোন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি দূরবর্তী ভবিষ্যৎকাল যোগ্য নীতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সমকালবর্তী লোকদিগের অযোগ্যতা নিবন্ধন এই তত্ত্ব সমুদ্রতলস্থিত রত্নের ন্যায় অবাচ্ছতাব্যস্তায় পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহা পুনরুদ্ধৃত বা জনসমাজে পরিপূরিত হইতে অনেক সময় অব্যবহিত হইবার সম্ভাবনা; এবং পরিপূরিত হই-

(৪) Buckle's History of Civilization. Vol. I. p. 150.

(৫) Note to Page 180 Vol. I. B. H. C.

লেও তদ্বারা লোকের কার্য নিয়মিত হইতে বহুকাল গত হইবে। কর্তব্য জানিলেও অভ্যাসের বিপরীত কার্য করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেক কলিয়া থাকেন, “আমাদিগের উপদেশাঙ্গুসারে চল, আমাদিগের স্বাচরণের অনুকরণ করিও না।” তাঁহারা জানেন, তাঁহারা অনায়াস করিতেছেন, কিন্তু গ্রন্থি দমন করিতে পারেন না। এই রূপ বিবেক ও বাসনার সমর কত লোকের অন্তঃকরণে চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রায় সহস্র বর্ষ ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে; কিন্তু সেখানকার কত অংশ লোকে তাহার সারনীতিতত্ত্ব গুলি জানে, এবং যাহারা জানেন তন্মধ্যে কত ভাগ লোকে তদনুরূপ কার্য করে। ইশার শিকার যথার্থ মর্থ বুঝিয়া সমাক প্রকারে তদনুরূপে চলিলে, ইউরোপীয়দিগের মতন দেব-ভূজ্য ভাব হইত। তাহা হইলে আর তাঁহারা পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন না, অর্থ এবং ইঙ্গ্রয়ের দাস থাকিতেন না। তাহা হইলে আর ভূগুণ্ডের সভ্যতায় বিভাগে সমরানল অজ্বলিত হইত না, নরশোণিত পাত হইত না, দেশ লুণ্ঠিত ও ভয়াভূত হইত না। যখন খ্রীষ্টধর্ম বহুকাল পরিপূরিত হইয়াও নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে, জান ব্যাপ্ত ইউরোপ গুণ্ডলের কার্য নিয়মিত করিতে পারিতেছে, তখন স্বাধীনতার কল্পিত হইবে যে, কোন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া কার্যকারী হইতে, অনেক সময় লাগে। সুতরাং যে সময়ে কোন অভিনব নৈতিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে না, সে সময়ে

পূর্বাধিকৃত তত্ত্ব জনিত নৈতিকউন্নতি বহুল পরিমাণে আস্তে আস্তে হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নীতিশাস্ত্র সর্গশাস্ত্রাপেক্ষা জটিল; সুতরাং অন্য শাস্ত্রে যে কাল মধ্যে সে পরিমাণে মতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, নীতি শাস্ত্রে সে কাল মধ্যে সে পরিমাণে মতন তত্ত্ব প্রকাশিত না হইবারই কথা। অগোস্ত কোম্ভ দেখাং ইয়াছেন, যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহার তত শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে। নীতিবিজ্ঞান, মনুষ্য সমাজ ও মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া জটিলতম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কি প্রকারে দ্রুতই উন্নত হইবে? কি রূপ কার্য মনুষ্যেৎ মন্বলকর, কি রূপ কার্য অমঙ্গল কর, বহুকাল পর্যা-বেক্ষণ বাড়িরেকে নির্ণীত হইবার নহে। অগোস্ত কোম্ভ বিজ্ঞানশাখা নিচয়কে জটিলতার তারতম্যানুসারে শ্রেণি বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সরলতম গণিতকে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অপেক্ষাকৃত জটিলতর জ্যোতিষকে, তদনস্তর জটিলতা হৃদ্বির ক্রমাৱলম্বন পূর্বক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন তত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে যথাক্রমে রাখিয়া সর্বশেষে জটিলতাপ্রাপ্ত নীতি শাস্ত্রকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা নীতিশাস্ত্রকে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন-তত্ত্বের ন্যায় উন্নতিশীল না দেখিয়া তাহার একবারে উন্নতি নাই, স্থির করিয়া বসেন, উহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। জ্যোতিষের অল্পমতি সম্পর্শনে

প্রাচীনপণ্ডিতকুলচূড় সেক্রেটিসও এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, গগনচর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয়ে মানবজাতি কখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু মহুঘোর আনোমতি-মারা এক্ষণে সেই সিদ্ধান্ত জাতি মূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, নীতিবিষয়কজ্ঞানসম্বন্ধে যে মানবজাতি চিরকাল স্থিরভাবে পথ রহিয়াছে, একথা অপ্রামাণ্য। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে সর্দর সর্দমা সকলের ন্যায়ন্যায় বোধ একরূপই হইত। কিন্তু বাহারা ইতিহাসপাঠ ও দেশ-ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা বিলক্ষণ জানেন যে, দেশভেদে ও কালভেদে কর্তব্য-কর্তব্যজ্ঞানের কত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক সময়ে বা এক প্রদেশে বাহা সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, অন্য সময়ে বা অপর প্রদেশে তাহা নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। স্পার্টাবাসিন্দিগের মধ্যে চৌঘরতি এবং আমাদিগের দেশে সহমরণ প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে কে এতদধি বাপোরে অজ্ঞ-মানন করে? যদি পুরাতন উদ্ভাসিত করিতে না চাও, বর্তমান কালের অসভ্য জাতিগণের প্রতি দৃষ্টি কর; জানিতে পারিবে, তাহারা নীতিতত্ত্বসম্বন্ধে সভ্য-জাতিগণাপেক্ষা কত অনতিজ্ঞ। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন, “অষ্ট্রেলীয় ভাষায় নায়গরতা, পাণ্ড, দোষ, বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। অধিকাংশ নিম্নস্ত জাতিদিগের মধ্যে পরোপকারিতা ও ক্ষমাশীলতা-

হ্রতক কার্যের অর্থ বোধ হয় ‘না, অর্থাৎ, সমাজ সম্পর্কে মহুঘা কার্যের জটিলতর সম্বন্ধ সকল বোধগম্য হয় না।” (৬) ‘খালব্রেথ সাহেবে আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অনেক কাল বাস করিয়া তাহাদিগের নীতি বিষয়ে এই বলিয়াছেন যে, ‘তাহারা অধিকাংশ পাণ্ড কর্মকে পূণ্য জ্ঞান করে। হুরি, ঘর জ্বালানি, বলাৎকার এবং হত্যা, তাহাদিগের মধ্যে খ্যাতাপন্ন হইবার উপায় বলিয়া গণ্য হয়, এবং অল্প বয়স্ক আমেরিক বাল্যকাল হইতে হত্যাকে ধর্মপ্রেম জ্ঞান করিতে শিক্ষিত হয়।” (৭) পলিনেশীয় পর্য্যালোচনায় উক্ত হইয়াছে, “সন্তানগণের মধ্যে ভিন্নভাগের ছুইভাগ পিতামাতায় ইচ্ছাপূর্বক মারিয়া ফেলে।” (৮) বার্টন সাহেব কহিয়াছেন, “পূর্ব আফ্রিকায় বিবেক নাই, এবং আফ্রানী বর্গিতে মারায়ক দুর্দ্রব্য কর-বার স্বযোগ হারানজন্য দ্রুত বুঝায়। ডাকাতি, সন্ত্রাস ব্যক্তির লক্ষণ; হত্যা—যত নিষ্ঠুর ও নিশীথকাল কালীন, তত ভাল—শূরের চিহ্ন।” (৯) যথা আফ্রিকা পর্যটক পিটার্স সাহেব বলেন, “আমি রাফসমান-পার্শ্বক নিম্নন্যাদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যে বাহারা দ্বন্দ্ব বা মৃত্যু সমীপবর্তী হয়, তাহারা বিনষ্ট এবং ভক্ষিত হইয়া

- (১) Herbert Spencer's Principles of Psychology Vol. I. p. 369.
(২) Ethnological Journal 1869. p. 304.
(৩) Polynesian Researches Vol. I. p. 334.
(৪) Burton's First Footsteps in East Africa p. 176

ধাকে,” (১০) পালবিডুসেন্স আফ্রিকায়ে নরমাংশী ফান এবং ওশবা জাতির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, তাহারা মহুঘা-ভোজী বলিয়া অহঙ্কার করে। (১১) ফিজি দ্বীপপুঞ্জবাসীরা ভয়ঙ্কর রাক্ষস। (১২) অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে সর্দা-পেশা উন্নত নবজিলও নিবাসিরা অপ-পিত্ত মহুঘাভক্ষণ পরিভাষ্য করিয়াছে। (১৩) ভাষা এবং চিন্তার দরিদ্রতা নিব-ন্ধন ধর্মের উন্নত ভাব সকল ভ্যান্ডিমেন দ্বীপবাসিদিগের বোধগম্য করান যায় না, বলিয়া টাসমেনিয়ার ইংরাজ বিশপ নিম্নলিখিত তাহাদিগের ধর্ম পরিবর্ত্ত চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। ভন রকাস বলেন যে নৈবকালিডনিয়া নিবাসিরা নিলজ, পশুবৎ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নীতিবোধবিবক্ষিত, অবি-শ্বাসী, মিথ্যাবাদী, নরমাংশী। (১৪) মরিক্স উয়াগ্নর নামক বিখ্যাত পর্যটক লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার কাম্বিরা নানবাহারী; এমন কি, নিজের সন্তান পর্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। (১৫) ব্রেজিলের অরণ্যস্থ আদিমবাসিদিগের সম্বন্ধে ডান্ডর রবার্ট অভিলালিমন্ট ক-হেন, তাহারা উন্মত্ত, ব্রীড়াহীন, মহুঘা-ভক্ষক, নীতিভাব শূন্য; যেজন তাহাদি-গের বন্ধু সেই ভাল, যে মিত্র নয়, সে

- (১০) Egypt, the Soudan and Central Africa by John Petherick.
(১১) Explorations and Adventures in Equatorial Africa by Paul B. Duclaux.
(১২) Chamber's Encyclopedia Vol. II. p. 561
(১৩) I bid Vol. IV. p. 332.
(১৪) Man in the Past, Present and Future by L. Buchner p. 315.
(১৫) I bid p. 321

মন্দ। (১৬) আমেরিকার দক্ষিণাংশস্থিত টিরাডেল ফিউগো দ্বীপবাসিদিগের বি-ষয়ে আমাদিগের বর্তমান ভারতবর্ষীয় কেট সেক্রেটারী ডিক্টর অরু আর্গিল “আদিম-মহুঘা” নামক গ্রন্থে (১৭) লিখিয়াছেন যে, তাহারা, বোধ হয়, সকল জাতি পু-পেশা নিকটে। তাহারা বিবস্ত্র ও নরমাং-মাহারী; ব্রহ্মা স্ত্রীলোকগুলিকে কু-রাদির ন্যায় মারিয়া ভক্ষণ করে। ডান্ড-উইন বলেন, “যখন আমরা ইন্দুশ মহুঘাগণকে দেখি, তখন তাহারা যে আমাদিগের সদৃশজীব এবং এই ভূমণ্ডল-নিবাসী, এরূপ জ্ঞান করিতে কষ্ট হয়।” (১৮)

চতুর্থতঃ, প্রাচীনদিগের অজ্ঞাত একটা নৈতিক নিয়মও যে বর্তমানকালের সভ্য-তম ইউরোপীয়েরা জ্ঞানেন না, ইহা আ-মরা স্বীকার করি না। “কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না,” এই নীতিতত্ত্বটি এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানীমাজেরই নিকটে সমাদৃত হইতেছে। যদি “প্রাচী-ন” বলিতে ঐতিহাসিক গ্রীক, রোমক, যিহুদী, হিন্দু, চৈন্য প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণই বুঝায়, তাহা হইলেও দেখান যায় যে, উন্নতির সর্বোচ্চ শিরের উত্তিমণ্ডী ইহারা এতদূর্তী অবস্থত হইতে পারেন নাই। রাজনীতিগ্রন্থে আরিফ-টল দাসদিগকে সুমাজের অল্পরূপ বিবে-

- (১৬) Journey through North Brazil 1859 by Dr. Robert Ave Lallemont.
(১৭) Primeval Man by Duke of Argyll
(১৮) Darwin's Voyage of the Beagle.

চনা করিয়াছেন। (১৯) রোমের ব্যবস্থাকারের দাসত্ব সংক্রান্ত কতকথা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং রোম ও গ্রীসে কৃষিপ্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য দাসদিগের দ্বারা ই নিৰ্মাণিত হইত। যুগের ব্যবস্থা এবং বাইবলের অন্যান্য স্থল হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিহীনদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রচলিত ছিল। মানবধর্ম শাস্ত্রে মনুষ্য বলেন, দাসত্বই শ্রেষ্ঠোচিত কর্ম; এবং হিরোডোটাস্ নিগর দেশে দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কাল সভ্য জাতির এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, যাহাতে দাসত্ব ন্যায়বিরুদ্ধ অধর্ম কর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বরং তদ্বিপরীত প্রমাণই ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়।

ইহা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, যে গ্রীকজাতি যাদীনতাপ্রিয়তাগ্ণে অসংখ্য শত্রুদলন পূর্বক জয়পালা উড়ডীন করিয়া মানবমণ্ডলীর দৃষ্টান্তরূপ হইয়া রহিয়াছে, যে জাতির পুরাতন পাঠ করিতে করিতে স্বতন্ত্রতা ও শৌর্যরসে অভিযুক্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি সকল উন্নত ও নবকৃষ্টি সম্পন্ন হয়, যে জাতিও দাসত্ব কলঙ্ক দূষিত ছিল এবং সেই কলঙ্কে কলঙ্ক বলিয়া বোধ করিতে কখনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু যাহারা জানেন যে, যেরূপে বা স্বজাতির সহিত যথাক্রমে যে সময়-লগ্নে, সমগ্র মানবজাতির সহিত যথাক্রমে তদপেক্ষা কত অধিকসময় আবশ্যক, তাহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, য-

শ্রেণী বা স্বজাতির প্রতি কর্তব্যজ্ঞান-মধ্যেও সমুদায় মনুষ্যসম্পর্কীয় কর্তব্যবোধ উদ্ভিত না হইবার কারণ কি? বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের সাধারণ নিয়ম দ্বারা তাহাদিগকে এক নিয়মের অধীন বুলিয়া জানা যায়। জ্ঞানবুদ্ধি-সহকারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাহ্য বৈলক্ষণ্য সমুদায়ের অভ্যন্তরে মূল-প্রকৃতি সমতা যত লক্ষিত হইতেছে, দিন দিন যত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বজাতির ন্যায় সমস্ত নরজাতির স্বধর্মগ্রন্থের সহিত এতোক বাক্তির স্বত্ব গ্রন্থ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ততই সাধারণনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, যদি “প্রাচীনেরা” বলিতে অতি পূর্বকালীয় ঐতিহাসিক সময়ের লোক বুঝায়, তাহা হইলে প্রমাণ করা যায় যে, তাহারা নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্তমানকালীয় সভ্যজাতিগণাপেক্ষা অনেক দূর অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহই সমাজের পত্তন-ভূমি। বিবাহ হইতেই পরিবার—পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, আত্মা-বাসা, জামাতা, বধূ, মধুরভাস্য পবিত্র ভাবধারণ করিয়াছে। বিবাহ হইতেই দম্পতি প্রেম, মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ-প্রণয় প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রী সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অতি পূর্বকালে বিবাহ ছিল না, সকলেই পশুত্ব বদ্ধতা বিহার করিত। ইহার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, মহাভারত পাঠে জানা যায়, “পূর্বকালে জ্ঞানীলোকেরা অসঙ্গ, স্বাধীন ও সম্বন্ধবিহীন

নির্ণী ছিল।” ভারতবর্ষে ইহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। মালবায়ের নায়রদিগের মধ্য মহিলাগণ স্বর্ণের বিহার করিয়া থাকেন। কে কাহার পুত্র কেহই বলিতে পারে না; স্বতরাং ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়াদিকুরী। অযোধ্যায় তিমিরদিগের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধবিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে আরও লিখিত আছে যে, “উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্য ও প্রচলিত আছে।” (২০) উত্তর কুরু বলিতে প্রাচীন আর্যগণ ভারতভূমির উত্তর কোণে পুন্যসম দেশ বুঝিতেন। বোধ হয়, ইহা আদিম আর্যদিগের বাসস্থল হইবে। তাহা হইলে এক্ষণে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, অতি পূর্বকালের আর্যপিতৃগণ যথেষ্ট বিচার ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমজাতির ইতিহাসদ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়। গ্রীক পুরাতত্ত্ব-লেখকগণ পুরাতনপ্রতি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সিক্রপুস্ গ্রীস দেশে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করেন। প্লুটার্ক স্প্যাকের লিখিয়াছেন যে, রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রীপ্রদান করা রীতি ছিল।

অতি পূর্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্বসাধারণের ভোগ্য সামগ্রী ছিল, বর্ণিত আচার ব্যবহারে তাহার কোন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহপ্রণালী বহুমূল হইলেও স্বামী মহাস্ব স্বখলাত করিবার পূর্বে কোন কোন দেশে এক দিনের জন্যে মহিলাগণ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য

হইত। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়াতে কোন স্ত্রীলোক একবার রতিসন্ধিরে না থাকিয়া বিবাহ করিবার অস্বাভাবিক পাইত না। (২১) গ্রীসেও কেহই বলিতে পারে না; স্বতরাং ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়াদিকুরী। অযোধ্যায় তিমিরদিগের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধবিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে আরও লিখিত আছে যে, “উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্য ও প্রচলিত আছে।” (২০) উত্তর কুরু বলিতে প্রাচীন আর্যগণ ভারতভূমির উত্তর কোণে পুন্যসম দেশ বুঝিতেন। বোধ হয়, ইহা আদিম আর্যদিগের বাসস্থল হইবে। তাহা হইলে এক্ষণে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, অতি পূর্বকালের আর্যপিতৃগণ যথেষ্ট বিচার ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমজাতির ইতিহাসদ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়। গ্রীক পুরাতত্ত্ব-লেখকগণ পুরাতনপ্রতি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সিক্রপুস্ গ্রীস দেশে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করেন। প্লুটার্ক স্প্যাকের লিখিয়াছেন যে, রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রীপ্রদান করা রীতি ছিল।

অতি পূর্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্বসাধারণের ভোগ্য সামগ্রী ছিল, বর্ণিত আচার ব্যবহারে তাহার কোন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহপ্রণালী বহুমূল হইলেও স্বামী মহাস্ব স্বখলাত করিবার পূর্বে কোন কোন দেশে এক দিনের জন্যে মহিলাগণ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। (২৪)

চীনেরা বলে, তাহাদিগের দেশে ফোহির সময়ে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। হেরোডোটাস্ কহেন যে, মেসোজোটি এবং ইথিওপীয় দেশেও জাতি বিবাহ কাহাকে বলে, জানিত না। মেসোজোটিদিগের বিষয়ে বিখ্যাত ইতিহাস ও ভূগোলবিৎ গ্রীসোও এই কথা লিখিয়াছেন, (২৫) নিগরদেশেও উদ্ভাহপদ্ধতি প্রারম্ভের জনপ্রতি ছিল। (২৬)

এপর্যন্ত যাহা প্রকটিত হইল, তদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সভ্যতম জাতিগণও এক সময়ে বিবাহপ্রথাশূন্য ছিলেন। কি

(২১) Herodotus Clio, 199.

(২২) Strabo, Lib. 2.

(২৩) Lubbock's Origin of Civilization. p. 100.

(২৪) I bid p. 101.

(২৫) Lubbock's Origin of Civilization.

(২৬) Buchner's Man in the Past, Present and Future p. 326.

আগাংশে স্মৃত হিন্দু, গ্রীক ও রোমক-
গণ, কি সৈমকুলকেশরী বাবিলনীয় এবং
কার্থেজীয় বা কিনিসীয় জাতি, কি আফ্রি-
কাশিরোরব্র মৈসরনিকর, কি তুরানবংশ-
চূড় নীনজাতি, কেহই অতি পূর্বকালে
পরিগণ্য হইতে বদ্ধ হইতেন না। এতদ্ভাতি-
রিত্ত অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে গ্রীস
এবং রোমের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে বিবাহ-
শ্রমণী সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও
দৃষ্ট হইতেছে। বোর্গিও দীপের অরণ্য-
বাসী ও আফ্রিকার মধ্য ডোকো প্রভৃতি
অসভ্যজন জাতি আদিমাবস্থা অতিক্রম ক-
রিয়া অদ্যাপি উদ্ধাবন্ধনে আবদ্ধ হইতে
শিখে নাই, পরিবার কাছাকে বলে জানে
না, পশুও সংস্কৃত বিহার করে। (২৭)
অপেক্ষাকৃত উন্নত আমেরিকার আপা-
চারী ও বিবাহ বুঝে না; কিছু দিনের
জনা জীপুরুষ একত্র থাকে, সন্তানগুলি
কিঞ্চিৎ বড় হইলেই যশেদীয়দিগের দলে
মিশিয়া যায় এবং জনক জননীর অপরি-
চিত হইয়া পড়ে। (২৮) নারীগণ যে পূ-
র্বকালে সর্ব সাধারণের ভোগ্য বস্তু বলিয়া
গণ্য হইত, অসভ্যদিগের কোনও আচার
দৃষ্টে তাহা অজ্ঞান হইতে পারে। গ্রিগ-
লওয়ের ইতিহাসনামক গ্রন্থে ইজিপ্ত সাহেব
লিখিয়াছেন, এক্ষমোদিগের মধ্যে যে
বক্তা আইনবন্দনে বদ্ধদিগকে স্ত্রীদান
করিতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা অমায়িক-
মতাব বলিয়া কীর্তিত হয়। (২৯) এ-
ক্সিনো, আদিম আমেরিকগণ, পলিনে-

সীয়েরা, অষ্ট্রেলিয়া বাসীরা, নিগ্রোনিচর,
আরবেরা, আর্বিসিনীয়, কাকি এবং মো-
গলেরা, যে কেহ ভাষাদিগের নিকটে
অতিথি হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্ত্রী দিয়া
থাকে; এবং ইহা না করিলে তাহাদিগের
বিবেচনায় আতিথ্য ভঙ্গ হয়। (৩০)

অতিপূর্বকালে যে লোকে কেবল
বিবাহশূন্য ছিল, এমত নহে; মহা
মারিয়াও ভক্ষণ করিত। যে নর আহা-
রামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত, সেই নর
ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া গণ্য হই-
তেছে। একি অল্প নৈমিত্তিক উন্নতির
চিহ্ন? আমরা পূর্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি
যে, সকল দেশেই নরবলি প্রচলিত ছিল,
ইহার প্রমাণ আছে; এবং যেখানে
নরবলি প্রদত্ত হইত, সেইখানেই কোন
না কোন সময়ে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত
ছিল; কারণ লোকে বাহ্য স্বখাদ্য জ্ঞান
করে, আহারার্থে তাহা দিয়াই দেবতা-
দিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। আ-
দিম কালের মানবজাতির অবস্থা যিনি
মনোযোগপূর্বক পর্যালোচনা করিবেন,
তিনিই তাৎকালিক রাকসম্বল লক্ষণ ধী-
কর্য করিবেন। কোম্ব্তের মতে আদৌ
মহায নরমাংসাশী ছিল। (৩১) বুঝনর
বলেন, “ভগ্ন ও দক্ষ মহাজাতির যে বহু-
সংখ্যক আর্বিক্টিয়া হইয়াছে, তাহাতে
বোধ হয়, ঐতিহাসিক সময়ের অধিকাংশ
অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় ঐতিহাসিক

ইউরোপবাসীগণ, মানবভোজী ছিল।” (৩২)
অদ্যাপি যে কোন কোন অসভ্য-
জাতির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ চলি-
তেছে, ইহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করি-
য়াছি। আফ্রিকাস্থ নিংনাম, ফান এবং
ওসিবা জাতি, আমেরিকার কবিহিবি, ব্রে-
জিলবাসী ও টোরায়েলকিওগো নিবাসী-
গণ, ফিজি, নবকলডনিয়া প্রভৃতি দ্বী-
পাধিবাসীগণ, “ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।
পূর্বকালে আশ্চর্য্যের দেশে যে রাকস
ছিল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বর্ণ-
নাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ
গ্রীক পুরাণবিদ হেরোডোটাস্ মাসা-
জিটিক মধ্য আশিয়াস্থ জাতিবিশেষ
বলেন যে, যখন কেহ তাহাদিগের মধ্যে
রুদ্ধ হইত, তাহার জাতি কুটুম্ব সকলে
একত্রিত হইয়া তাহাকে মারিয়া আহা-
র করিত। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক্ সেন্ট জে-
কোব লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বালা-
কালে গল্ প্রদেশে গুলেলে, ব্রিটেন নি-
বাসী স্কটদিগকে নরমাংস ভক্ষণ করিতে
দেখিয়াছেন। (৩৩)

অসভ্যজাতিগণের অবস্থা হইতে সভ্য-
জাতিগণের পূর্বপুরুষগণের অবস্থা অনেক
দূর অজ্ঞান হইতে পারে; কারণ সভ্য-
জাতিগণ যে সকল সামাজিক গোপান
অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, অসভ্যজাতি-
গণ তাহার কোননা কোনটায় প্রভিয়া
আছে। এই জন্যই আমরা মহাব্যোম
আদিমাবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত অসভ্য

জাতিদিগের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত
করিলাম।

যতঃ, “পরের ভাল করিবে; পরের
উপকারার্থে আপনাদিগের বাসনা বিসর্জন
করিবে; প্রতিবেশীগণকে আশ্রয়, ভাল
বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ই-
জিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে
ভক্তি করিবে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে
মান্য করিবে;” এই সকল উপদেশ
হিন্দু, গ্রীক, রোমক, যিহুদী প্রভৃতি আ-
চীন সভ্যজাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায়
বটে, কিন্তু এই অবদ্বের মধ্যে বাহ্য
লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রমাণ হইতেছে
যে, অদ্যাপি এমন অনেক অসভ্য জাতি
আছে, যাঁহারা এই সকল নীতিতত্ত্ব অব-
গত নহে এবং পূর্বে এমনকি কাল ছিল,
যখন এসমুদায় সভ্য কি হিন্দু, কি গ্রীক,
কি রোমক, কি যিহুদী, কাহারও চিত্ত-
ক্ষেত্রে উদ্ভিত হয় নাই। যখন মহায
মহাব্যোম আহাং ছিল, যখন নরগণ ছলে
বলে কৌশলে কোন নারীকে নিজায়ত্ত
করিয়া পশুও রাস্তা পরিভ্রম করিত,
যখন পতি পত্নী, পিতা মাতা, এ সকল
স্বধাময় শব্দ শ্রুত হইত না, তখন কা-
হার মনে এই সমস্ত নৈতিক উপদেশ
প্রকাশিত বাহান প্রাপ্ত হইতে পারিত?
বাস্তবিক অনেক দূর সভ্য না হইলে কেহ
এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারেন না, এবং
প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক এবং যিহুদি-
দিগের অপেক্ষা বর্তমান কালীয় ইউরো-
পীয়গণ সভ্যতারে অধিকদূর অগ্রসর
হইতে পারেন নাই বলিয়াই নীতিতেও
অধিক উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন
না। তথাপি আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি

(২৭) Buchner's Man in the Past, Present
and Future p. 326

(২৮) Ibid 323

(২৯) Egede's History of Greenland p. 142.

(৩০) Lubbock's Origin of Civilization.
p. 102.

(৩১) See Miss Martineau's Translation
of Positive Philosophy Vol. II. p. 186

(৩২) Buchner's Man in the Past, Present
and Future, p. 361.

(৩৩) Chamber's Encyclopedia Vol. II.
p. 563.

যে, “কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না” অর্থাৎ “সকল মানুষকেই স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে” এই নীতিতত্ত্বটী প্রাচীনরা জানিতেন না, নবেরা আবিষ্কার করিয়াছেন।

সপ্তমতম, মহামুর্খ বা বধূক বলিয়া অভিহিত হইবার ভয় থাকিলেও, আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, গ্রীকধর্ম কোন মতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশ করে নাই। ইশার যতে প্রীতি ভিন্ন ধর্ম নাই। ই-হরগ্রন্থে এবং মানবগ্রন্থে ভ্রুভির্জ হও, সম্পূর্ণরূপে কায়মনবাক্যে অতি-বিজ্ঞ হও, তোমার কর্তব্য সম্পন্ন হইল। যে পিতা মাতাকে ভুলি সর্গাস্ত্রকরণের সহিত; ভাল বাস, উচ্ছাদিগের আজ্ঞা যেমন উৎসাহচিত্তে যত্নের সহিত পালন কর, তেমনি ভাবে ইশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চল। সেহময়ী ভগিনী বা অযোগ্যম ভাতার মঙ্গল সাধন জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও ব্যগ্রভাসহকারে আপনি অনেক কষ্ট সহিয়াও চেষ্টা করিয়া থাক, প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে তজ্জপ করিবে; সে তোমার যত কেন অপকার করুক না, সে তোমার যত কেন শত্রু হউক না, সে যত কেন পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হউক না, কেবল বাহ্য কার্যে নয়, অন্তরের প্রতিভাস্বতে, এই সর্বদাঃপ্রসারী প্রেম ব্যাপ্ত থাকিবে, তাহা হইলে ভুলি ধার্মিক হইবে, মিত্রতা নয়। এইরূপে মানুষের সমস্ত কর্তব্য একমাত্র

প্রীতিতে পরিণত করিয়া ইশা আমাদের বিবেচনায় সর্বোচ্চতম নৈতিক নিয়মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সামান্য নিয়মেই পুষ্কাবিস্তৃত বিশেষ বিশেষ নৈতিক নিয়ম পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ইহাতেই উত্তরকাল সমুদ্ভাবিত নীতিতত্ত্ব-সকলের মূল নিহিত রহিয়াছে। “পর দ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা হরণ করিবে না, মিথ্যা কথা কহিবে না, শত্রুকে ক্ষমা করিবে, প্রতিবেশীদিগকে আয়বৎ ভাল বাসিবে,” প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন কালের নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম, একমাত্র সার্বভৌম প্রেম সাগরে নীল হইয়াছে; এবং “কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না,” “সকলকেই স্বর্থ-ভোগে সমান স্বব্বান বোধ করিবে,” ইত্যাদি বর্তমান সময়ের নীতিতত্ত্ব সকলও সুধাকর ও কমলার নাম সেই প্রীতি-সিন্ধুর মতন উপস্থিত হইয়াছে; কেননা যে তোমার ভাতা, সে কি তোমার দাস হইতে পারে? সে যে সমান স্বত্বাধিকারী।

এই প্রবন্ধে বাংলা-ভাষা লিখিত হইল, তদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অসভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য-জাতিগণ, এবং প্রাচীনদিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়গণ শ্রেষ্ঠ। স্বতরাং সভ্যতা রক্ষিত্বস্বকারে নীতি উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

বিবরণ্য।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চোরের উপর বাটপাড়ি।

হীরা দাসীর চাকরি গেল, কিন্তু দস্ত-বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সম্বাদের জন্য হীরা সর্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়৷ বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে স্বর্য়মুখীর প্রতি নগেজের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাফল্য না পায়, সে দিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসী মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া, চলিয়া যায়।

এই রূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেজের নিকট হীরার পরিচয়াদি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু মনে যত্নায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্ট নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রার্থ্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে ভালো ঢাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা ঢাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া ছুয়ার, ঢেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

* মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, উপপতি। কিন্তু কে কার উপপতি, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহ ভঙ্গনার্থ শীঘ্র সম্ভাব্য করিল।

হীরা বাবুদিগের বাড়ীহইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিয়া, হীরা ধরবার জন্য তাহার পশ্চাৎ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রধরে ডাকিতে লাগিল, “হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!” হীরা দূরে গেলে, মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল “ওমা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?” এই বলিয়া কাঁদিতেন কুন্দের ঘরে যা না-রিয়া কাতর ঘরে বলিতে লাগিল—“কুন্দ ঠাকুর! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হইয়াছে।” স্বতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া ঘর খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হিং করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে তির-
স্কার করে বলিয়া হীরাতে কিছু বলিল
না।

মালতী গিয়া দেবজ্ঞকে সন্ধান বলিল।
ব্রহ্মেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার
বাড়ী গিয়া এসপার কি ওসপার, যা হয়
একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন
একটা “পাটি” ছিল—মুতরাং জুটিতে
পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরের পাখী।

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—“সতত
চঞ্চল।” ছুইটি ভিন্নদিগন্তমুখগামিনী
শ্রোতবৃত্তী পরস্পরে প্রতিহত হইলে শ্রো-
তাভেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে
তাঁহাই হইল। এদিগে মহালক্ষ্মী—অপ-
মান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায়
নাই—স্বর্ঘ্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া
দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের
উপরে ঐশ্বর্যশ্রোতঃ আসিয়া পড়িল।
পরস্পর প্রতিবাতে ঐশ্বর্য প্রবাহই বা-
ড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডু-
রিয়া গেল। স্বর্ঘ্যমুখীকৃত অশ্রুমাংস ক্রমে
বিবৃণ্ড হইতে লাগিল। স্বর্ঘ্যমুখী আর মনে
স্থান পাইলেননা—নগেন্দ্রই সর্বত্র। ক্রমে
কুন্দ ভাবিতে লাগিল, “আমি কেন সে
গৃহ তাগ করিয়া আসিলাম? হুটো ক-
থায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল। আমি
ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে এক
বারও দেখিতে পাই না! তা আমি কি
আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি
আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি

যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া
দেয়?” কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে
এই চিন্তা করিত। দ্রুতগৃহে অত্যাগ-
মন কর্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় ক-
রিত না।—সেটা ছুই চারি দিনে স্থির
সিদ্ধান্ত হইলে যে, যাওয়াই কর্তব্য—নহি-
লে আশ্রয় যায়। তবে গেলে স্বর্ঘ্যমুখী পু-
নশ্চ দুর্ভীকৃত করবে কিনা, ইহাই বিবেচ্য
হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দশা হ-
ইল, যে সে সিদ্ধান্ত করিল, স্বর্ঘ্যমুখী
দুর্ভীকৃতই করুক আর থাংহাই করুক,
যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া
সে গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত বা-
ইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি
সঙ্গে করিয়া হীরা যায়, তাহলে যাওয়া
হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে
বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া
বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকার অদর্শন
সহ্য করিতে পারে না। এক দিন ছুই
চারিদণ্ড রাতি থাকিতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ
করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত,
নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদঘাটন করিয়া বাটার
বাহির হইল। ক্রম পক্ষারশেষ, ক্ষীণজ্ঞ
আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা
সুন্দরী নায় ভাসিতেছিল। রক্ষাসুরাল
মধ্যে রাশিভ অন্ধকার লুকাইয়াছিল।
অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্ব
সরোবরের পলপল শৈবলাদি সমাচ্ছন্ন
জলে, দীর্ঘবিক্রেপ হইতেছিল না। অ-
স্পষ্ট লক্ষ্য রক্ষাপ্রভাগ সকলের উপর
অতি নিবীড় নীল আকাশ শোভা পাই-
তেছিল। কুরুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা

যাইতেছিল। অকৃতি সিন্ধু গাভীর্যময়ী
হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ
অজ্ঞান করিয়া দন্তগৃহাভিমুখে, সন্দেহ-
মন্দ পদে চলিল। যাইবার আর কিছুই
অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে
একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দন্তগৃহে
ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে
ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতি মধ্যে একদিন
লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি?
কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন? কি
প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির
করিয়াছিল যে, রাতি থাকিতে দন্ত-
কিরণের গৃহসামিধানে গিয়া চারিদিকে
বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে
বাড়ায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে কি
পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্র-
ভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে
দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে।
সেইদিনই কুন্দ অমনি ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া
কুন্দ শেরদ্বারে নগেন্দ্রগৃহাভিমুখে চ-
লিল। অটালিকাসামিধানে উপস্থিত
হইয়া দেখিল, তখন রাতি প্রভাত
হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথ
পানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও
নাই—ছাদ পানে চািল, সেখানেও
নগেন্দ্র নাই—বাত্যায়নেও নগেন্দ্র নাই।
কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন
নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত
হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউ
তলায় বসিল। ঝাউতলা বড় আশ্চর্য।
ছুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব যুট
করিয়া নীরব মধ্যে খসিয়া পড়িতে-
ছিল। মাতার উপরে রক্ষা পক্ষিরা

পাঁকা ঝাড়া দিতেছিল। অটালিকারক্ষক
দ্বারবানগণ কৃত দ্বারোদঘাটনের ও অব-
রোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতে-
ছিল। শেষে উভয়সামাগম হইল শীতল
বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ
ভাসাইয়া মাতার উপর দিয়া ডাকিয়া
গেল। কিছু পূরে ঝাউ পাছে কোকিল
ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গাও
গোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের
ভরসা নিখিতে লাগিল—আর ত ঝাউ
তলায় বসিয়া থাকিতে পারে না,
প্রভাত হইল—কেহ যে দেখিতে
পাইবে। তখন প্রত্যাবর্তনার্থে কুন্দ
গাত্রোথান করিল। এক আশা মনে বড়
প্রবলা হইল। অন্তঃপুর নগেন্দ্র যে পু-
স্পোদ্যান আছে—সেখানু প্রভাতে
উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়-
সেবন করিয়া থাকেন। হয় ত নগেন্দ্র
এতক্ষণ সেইখানে পাদচারণ করিতে-
ছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ
ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান
প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কির দ্বার মুক্ত না
হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ
নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায়
না। খিড়কির দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা
দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর
করিয়া ভ্রমর্যো-প্রবেশ করিল। এবং
উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক
বহুল রক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘনরক্ষ লতাঞ্জলি পরি-
বৃত্ত। রক্ষশ্রেণী মধ্যে অন্তর প্রচিতি স্বন্দর
পথ, স্থানেই স্বেত রক্ত নীলপীতবর্ণবহু

কুম্ভরশিশিতে রক্তাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তত্পরি প্রভাতমধুলক্কে মক্ষিকা সকল দলে দলে জমিতেছে—বসিতেছে উড়িতেছে—ওন্ ওন্ শব্দ করিতেছে। এবং মূৰ্খবোর চরিত্রের অঙ্কুরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালেব্ধিকিতেছে। বিচিগ্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ এক্ষুণ্টিত পুষ্পগোছোপরি রক্তফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে মগধর সুসঙ্গীত জ্বলি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিলোলে পুষ্প ভাঙ্গারনত ক্ষুদ্র শাখা ছলিতেছে—পুষ্পধীন শাখাসকল ছলিতেছেন, কেননা তাহার নজ নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা বাজিতে সকলকে জিতিতেছে।

উদান মধ্যস্থলে, একটি খেত প্রস্তর নির্মিত লতা মণ্ডপ। তাহা অখলখন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকা-ধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কৃন্দানন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্ভাস মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, যে তাহার প্রস্তর নির্মিত সিংহ হর্ষোপরি কেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কৃন্দানন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দূরভ্রাম্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ বাক্তি পাতোপান করিয়া

বাহির হইল। হতভাগিনী কৃন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, স্বর্ঘ্যমুখী।

কৃন্দ তখন ভীত হইয়া এক প্রক্ষুণ্ণিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে, অগ্রসরও হইতে পারিল না—পশ্চাদপসূতাও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, স্বর্ঘ্যমুখী উদান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে থানে কৃন্দ লুকাইয়া আছে, স্বর্ঘ্যমুখী ক্রমে সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। কৃন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে স্বর্ঘ্যমুখী কৃন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কে গা?”

কৃন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। স্বর্ঘ্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কৃন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, “কে, কৃন্দ না কি?”

কৃন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। স্বর্ঘ্যমুখী কৃন্দের হাত ধরিলেন। বললেন,

“কৃন্দ? এসো—দিদি এসো। আর ‘আমি তোমায় কিছু বলিব না।’”

এই বলিয়া স্বর্ঘ্যমুখী হস্ত ধরিয়া কৃন্দানন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

তত্ববিশিষ্ট পরিচ্ছেদ।

অবতরণ।

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত, একাকী ছত্রবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া, কৃন্দানন্দিনীর অশ্রুস্রব্দে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখি-

লেন, কৃন্দ নাই। হীরার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাসিস কেন?”

হীরা বলিল, “তোমার হৃৎ দেখে।” পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার থানা তল্লাসী করিলে পাইবেন না।

তখন দেবেন্দ্রের প্রবেশ হীরার ঘাংজানিত, আদোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, “প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।”

বেবেন্দ্র হতাশাস হইয়া কিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাব গতি বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কানা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, “বুঝি রুটি এলো।” অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাগি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর একপদ নামিতে হয়। কিন্তু, তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, “তোমার ঘরে ছাতি আছে?”

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন,

“তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?” হীরা বলিল, “মনে করিবে না কেন? কিন্তু ব্যাধ দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটয়াছে।” দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তন্ত্রপোষের উপর অতি পরিশ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিদ্ধক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপা বাঁধা ছত্রা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পূরিয়া মিটাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার মল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পেকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্ত্রতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু রহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল কটাক।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, “তোমার দিয়া চক্ষু!” হীরা মুখ হাসিল, দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ডাঙা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুনং করিয়া গান করিতেই সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছাড় দিলেন। বেহালা খাঁকর খোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বেহালা কোথায় পাইলে?”

হীরা কহিল, “একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।”

দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া এক প্রকার চলন মই করিয়া লইলেন, এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ, মধুর ভাবে গাইলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্রমকাল জনা হীরার সম্পূর্ণ আনবিস্তৃতি জমিল। সে যে হীরা, ওই যে দেবেন্দ্র, তাহা জুলিয়া গেল। মনে

করিতেছিল, ইনি শাশী, আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা ছই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়স্বখে ভুগে মুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেশ্র হীরার মুখে অন্ধবাক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেশ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উগত্তর নায় আকুল হইয়া দেবেশ্রকে কহিল, “আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।”

দেবেশ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি, হীরা?”
হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন।

হীরা তখন উদ্ভাসিত হইয়া বিবশা।
দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র?

হীরা রঞ্জন—বলিল “স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রী চরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের নায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ।” তোমাদের ধর্ম জ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার স্বথ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে

বসিলে? আমার সর্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কেন সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় সাহসের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।” দেবেশ্র জভঙ্কী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতি হইল। পরে উগ্রমতিমানে দেবেশ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কোমলতরস্বরে কহিতে লাগিল, “প্রভো, আমি আপনার রূপ গণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা, স্ত্রীজ্ঞাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসি উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান।”

দেবেশ্র আর এক প্রাস পান করিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রহ্ম সমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?”

হীরা এই উপহাসে মর্মগণ্ডিত হইয়া, রোষ-কপটত্বের কহিল, “আমি আপনার উপহাসের খোয়া নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভাল বাসা লইয়া রহসা করা কর্তব্য নয়। আমি ধার্মিক নহি, ধর্ম বুঝি না—এবং ধর্মে আমার মন নাই। তবে যে

আমি কুলটা নই বলিয়া স্পষ্ট করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনেই প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভাবিবার লোভে পড়িয়া কখন কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে এতটুকুও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম জ্ঞান নাই, ধর্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্কে ভ্রূজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভাল বাসেন না—সেখানে কি স্বেচ্ছায় বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন তাগ করেন না, এ জন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত

যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লাইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।”

দেবেশ্র হীরার মুখে এইরূপ তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনেই ভাবিলেন, “আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যে দিন কলে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্যোদ্ধার করিব।” এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেশ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত পুণ্য কর্ম।

পুণ্য কিসে হয়? সংকর্ম করিলে পুণ্য হয় অথবা সংকামনাতেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে? অথবা উভয় একত্রিত না হইলে পুণ্যকর্ম হয় না?—লোকে সংপ্রভক্তি বিনাও সংকর্ম করিয়া থাকে, এবং কখনও প্রকৃত অসং প্রভক্তি হইতেও সংকর্মের অস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। যশোবাসুদাই অন্ধক পুণ্য কর্মের মূলীভূত। উহাতে সাক্ষিকতা না থাকিলেও প্রভক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণ্য করা যায় না। এখন কেহ পরের ক্ষতি করিবার মানসে তাহার বিশ্বাস পান হইবার

জন্য কোন সংকল্প করে, তাহাই প্রকৃত রূপে অসং প্রভক্তিমূলক। তবোচ কখন কখন ঘটনা ক্রমে এতাদৃশ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা সম্পূর্ণ না হইয়া, ক্রিয় সংকল্পটী করিয়াই তাহার ক্রিয়ার অন্ত হইয়া থাকে।

মনে কর, কোন ব্যক্তি রাজস্বকট অপহরণ মানসে লোকরঞ্জন নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিলে, তাহার লোকরঞ্জন ক্রিয়া কদাচ পুণ্য কর্ম বলিয়া গণ্য হইবেক না। কিন্তু যাহারা এই প্রকারে তাহারকর্তৃক উপকৃত

হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেও সেই উপকার এক কালীন বিস্ময়ণ করা কি কর্তব্য?

খেমটুক্লিস্ যে খ্রীষ্ট বুদ্ধিবলনানা উপায়ে দ্বারা এখেষের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গুঢ় অভিসন্ধি কি ছিল, তাহা কেহই জানে না; বরং তাঁহার যশোমহিমা-বিতার অনুভবিতার প্রতি অনেক সন্দেহই আছে। তথাপি তিনি না থাকিলে সাল্লামিসের যুদ্ধে ঐক্যের কদাচিৎ জয় লাভ করিতে পারিতেন না। আর যদি ঐ যুদ্ধের দ্বারা পারস্য সত্রাই দুরীকৃত না হইত, তবে বুঝি ঐসে সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য আর উদয় হইত না এবং ইউরোপ অদ্যাবধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। অতএব খেমটুক্লিসকে অতি পায়ও মনে করিলেও তৎকৃত উপকার বিস্ময়ণ করা সহস্রের সাধ্য নহে।

ফলতঃ সংকর্ষ এবং সংকামনা, বিভিন্ন পদার্থ, এবং উভয়ের প্রতি পৃথক রূপে দৃষ্টিপাত করিলেই এতদ্বিষয়ক দ্বিধা দুরীকৃত হইবেক। অযুক্ত ব্যক্তির কামনা সং এবং স্বার্থপর নহে, লোকের মনে এতাদৃশ সংস্কার না হইলে তাঁহার প্রতি ঐতিহ্য উদ্ভেক হয় না। কিন্তু কামনা বেক্রপ হউক, কর্মটি সং এবং অন্যের উপকারজনক হইলেই কর্তব্য কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েন। তজ্জপ দুরভিসন্ধি না থাকিলে অপরাধি পশুশ্রী হয় না; তথাপি অজ্ঞানকৃত পাপ যে, পৃথিবীর কতিজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য যে পৃথক প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহার নিগূঢ় কারণ এই। আমার আশয় ভাল,

অতএব আমাকর্তৃক লোকের কতি হইবে আমি জনসমাজে এবং জগদীশ্বরের সমীপে সর্গভাভাবে দোষহীন, এক্রপ বিশ্বাস মঙ্গলকর নহে।

আমার সংকামনার জন্য আমি পুণ্যবান বলিয়া গণ্য হইতে পারি, কিন্তু আমার কার্য মন্দ হইলে, তাহার দোষ আমাকেই বহন করিতে হইবেক। সদাচিত্র-প্রায়-হইতে কুরূপ উৎপন্ন হইলে কেবল বুদ্ধির দোষ থাকাই জ্ঞান করিতে হইবেক; কিন্তু বুদ্ধির দোষ বড় ভুল পদার্থ নহে। তবে বুদ্ধিমত্তার গীমা নাই, সুতরাং বুদ্ধির ইতর বিশেষে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণে সকল লোকেই পৃথিবীর কতি বা মঙ্গল সাধন করেন। এই জন্য কেহ পুণ্যবান কি না, এক্রকার বিচার স্থলে কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করেন না। কিন্তু বুদ্ধি সংকামনার সংস্কারী না হইলে কিছুতেই ফল দর্শে না; অতএব যাহারা খ্রীষ্ট কার্য ফলের দোষ ও বিচার না করিয়া, কার্যটি সদাচিত্রায় মূলক, কেবল এই বলিয়া তাহার ঐকি কিবা পারত্রিক মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন, তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করা কর্তব্য। এবং কামনা, ভ্রূয়সী প্রশংসার যোগ্য হইলেও কর্মফলের দোষ গুণের প্রতি অনাস্থা করা অনায়াস।

কোনই নীতিশাস্ত্রবোধী বলেন, সংকর্ষ করিলে মনে এক এক্রকার স্ব-দোষ হয়, এবং তাহাই কর্মের সততার প্রমাণ। কিন্তু সর্গদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সংকর্ষ উদ্যোগপর করিলে এই রূপ তৃপ্তির ভ্রাস হইয়া থাকে। তবে ইহাতে কি সততারও

লাভ স্বীকার করিতে হইবেক?—কদাচ নহে।

স্পৃহা সংই হউক অার অসংই হউক, চরিতার্থ হইলেই স্বথ হয়, এবং অবরুদ্ধ হইলেই ক্রোধ জন্মে; ইহা মহম্মদের ভাব সিদ্ধ ধর্ম। মনোমধ্যে রিভিক্ত স্পৃহা উদ্ভিত হইলে যেটি চরিতার্থ হয়, তাহা হইতে স্বথ, এবং অপর গুলি পরিতৃপ্ত না হওয়াতে, ভ্রামিস্ত কট অংশই অহুত হইবেক। ধরাতলে সংকর্ষের মাহাত্ম্য এতই কৌণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে যে, সভাসমাজে যখন কেহ কুরূপ করিতে সর্গপ্রথমে আরম্ভ করে, তখন তাহার মনোমধ্যে উহা হইতে ক্রান্ত থাকিবার বাসনা এক কালে অল্পপস্থিত থাকে না। সুতরাং যে পর্যন্ত কুরূপের অভাস না হইয়া যায়, সে পর্যন্ত সদস্য প্রেরিত, বিরোধজনিত অসুখ অবশ্যই হইতে থাকে। কিন্তু সংকর্ষের অহুতান স্থলে সকল সময়ে কুপ্রেরিত উদ্ভেক হয় না; এতাদৃশ অবস্থায় ইহার স্বথ অবস্থিগভাবে মনোমধ্যে বিকশিত হয়। কিন্তু যে স্থলে কোন কুপ্রেরিতিক দমন করিয়া সংকর্ষের অহুতান করিতে হয়, সেস্থলে যে কিছু মাত্র কট বোধ হয় না, একথা কখনই বলিতে পারি না।

আবার অভাস হইলে কামনার দোষ-গুণজনিত স্বথ দুঃখ উভয়ই নিশ্চয় হইয়া উঠে। এমন কি, কোনই বিষয়ে স্পৃহা গুলি স্পষ্টরূপে অহুতব করা যায় না। এক জনকে কটুক্তি করিবার সময়ে কোন সদাশয় ব্যক্তির যে চিত্তবর্ষকির প্রকাশ হয়, এক জন ঠগীর (ফেসেড়ার) মনে নরহত্যা কালে তাহার চতুর্থাংশ

উদয় হয় কি না, সন্দেহ স্থল। সাংসারিক দুরভ্য নিবন্ধন যে ব্যক্তি কখন অনাহারিকে অসদান করিতে পারেন নাই, তাহার সেই ক্ষমতা উপস্থিত হইলে মনে যে অশুভ করণার উদয় হয়, কিছু কাল পরে বহু লোক অসদান করিলেও আর সেগুণ ভাব থাকে না।

এহলে ঠগীর পাঁপাদিক এবং অসদাতার পুণ্যরাজি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহাদিগের তীব্র স্পৃহা, অতাব ষাভাবিক নহে। প্রথম উল্লেখ অবশ্যই অসদানেন্দ্র এবং নরহত্যা বাসনা উভয়েরই যথেষ্ট তীব্রতা ছিল, কিন্তু অভাস সহকারে তাহার অবস্থাস্তর হইয়াছে। অতএব অভাস্ত পুণ্য ষাভাবিক পুণ্যাপেক্ষা নিরুত নহে, বরং উৎকট বলিয়া গণ্য হইবেক।

হিন্দু শাস্ত্রের এক ঐধান লক্ষণ এই যে, শাস্ত্রকারের পুণ্য কর্ম অভাস করা ইহার চেষ্টা করিয়াছেন।

“আসানশন শয্যাচ্ছিন্নদ্বিমূল ফলেন হা।

“নাম্য কশিসেমেদোহে শক্তিভোহনজিতোহাতিথিঃ।

“অর্থ। শক্যনুসারে ভোজন শয়ন পানীয় ফল “মুলাদি দ্বারা অতিষ্ঠ না হইয়া মনে কোন “অতিথি তাহার বাস্তব বাস না করেন। “ভাষপর্বা; শক্যনুসারে অতিথিকে পূজা “করিলে।” ভরত শিষ্যগণের মনু ১২২ পৃঃ ৪ অঃ ২১।

মহুর প্রকৃত সহকারে এতদ্বশে অতিথি সংস্কার ধর্ম এত প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতিপালনে পুণ্য নাই, অবহেলনে পাপ হয়; লোকের মনে প্রায় এই রূপ বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অতিথির পরিভোজন জন

আপনি অনাহারে থাকিতে প্রস্তুত হয় ত দেশহিতৈষিতার কোন অসূচনা হইলে তিনি (আমি) তাহাতে বশু করিবেন না।

মিলু প্রকৃতি কোনও মহৎ ব্যক্তি অভ্যন্তর পুণ্যের নিন্দা করিয়াছেন। (আমরা স্বাধীনতা বাস্তবীকৃত)। বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছি।)। তাহা-দিগের মতে প্রবল বাসনা হইতে সংকল্পের উদ্ভব না হইলে সেই সংকল্পের বাস্তবীকরণ হয়ইয়া যায়। কিন্তু একথা বলিলে, কাহারা এপাং কর্ম অভ্যা সহকারে যখন এতাদৃশ সহজ হইয়া উঠে যে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাহার মনে সতজ্ঞা স্মারক আশাশঙ্কিত থাকে না, তখন তাহার সেই পাপ কর্মটোও কি গুরুতর নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক? ইহা কদাচ যুক্তি সম্মত হইতে পারে না।

পরন্তু এখানে বলা কর্তব্য যে, সং কি অসং কর্মের অভ্যাস, দুই প্রকার হইয়া থাকে। উভয়েই, কর্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে বাসনার প্রবলতা জানা যায় না। কিন্তু এক প্রকার অভ্যাসের প্রতিবেশ হইলে অভ্যস্ত কষ্ট হয়; দ্বিতীয় প্রকার অভ্যাসের লক্ষণ এই যে অভ্যস্ত সং বা অসং কার্য নির্বাহ করিবার জন্য আশাসের প্রয়োজন থাকে না, এবং কার্যটি না করিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। ইহার প্রথম দৃষ্টান্তে বাসনার বিলক্ষণ তেজ আছে, কিন্তু তাহা অসুভব বস্তু গেল না—এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বাসনার তেজ প্রকৃতপক্ষে খর্ব হইয়াছে,

একথা স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু জনসমাজে উভয়বিধ সুকার্যই তুল্যরূপে ক্ষতিজনক এবং যখন কোন ব্যক্তি অনাহারে একটা সুকর্ম প্রবৃত্ত হয়, তখন উহা হইতে ক্ষান্ত থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য নহে বলিয়া, তাহার পাণের স্থানতা স্বীকার করা যায় না।

মিলু চীন ও ভারতবর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই দুই দেশে সকল বিষয়ের নিয়ম নিবদ্ধ থাকিতেই একদমে ক্রীড়া হইয়াছে। পরন্তু নিয়ম না করিলে সংকল্প কখনই অভ্যস্ত হয় না। মনুষ্য সং অসং উভয় গুণেরই আধার। যত্নাকারের ক্ষমিক্রমের উত্তেজনা এবং কৃষ্ণিয়াসক্তির দমন না করিলে মনুষ্যপ্রকৃতি এবং জনসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। অতএব নিয়ম নিষ্কারণের দোষ দেওয়া অনায়াস। মিল বলেন, নিয়মাহারের কার্য করিলে অচিরে কর্মের মন নিত্যস্ত অসার হইয়া যায়। কিন্তু কার্যের ফল কেবল কর্তৃত্বই ক্ষান্ত হয় না। ভূমি সংকর্ষণ কর বা সুকর্ষণ কর, মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সহিত তোমার কি সম্বন্ধ থাকিবেক, তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু চিত্তাক্রম কিয়টি বল কি বাহু কিয়টি বল, তোমার কার্য মাঝেই অবিনশ্বর। যত দিন মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে থাকিবেক, ততদিন তোমার কার্যের ফল জগতে বিস্তার হইবেক। এক একটি কার্য কর্তার মন হইতে উদ্ভিত হয়;—অনন্তর তাহা হইতে একদিগে কর্তার মানসিক অবস্থার ইতর বিশেষ, অন্য দিগে তাহা প্রকাশ হইলে অপর ব্যক্তির অবস্থান্তর হয়। মানসিক ক্রিয়াটি প্রকাশ না হইলেও

কর্তার মনে যে ক্রিয়াকাল অবস্থান করে তাহার দ্বারা উহা কর্মান্তরে পর্যবসিত হয়। স্মরণীয় ঘটনাসমূহ অথবা তাহার ফলের দ্বারাতেই হউক, কোন কার্যই কেবল কর্তৃত্বে নিবৃত্ত থাকে না। প্রত্যেক কার্য তৎপরবর্তী অন্য কার্যের কারণ। এবং তাহা কর্তা ও ফলপ্রাপ্তব্যক্তি হইতে কালসহকারে সহস্রাদিকে জমণ করিতে থাকে। যেমন জামায়ান জ্যোতিষ্মদের পরস্পর আঘাত দ্বারা ভয়ানক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া উভয়েই অপার পদার্থ রাশিতে বিলীন হইতে পারে; তদ্রূপ রাশিদিগের পরস্পরাগত বাস্পীকরণে, এবং গতি, উত্তাপরূপে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী হয়, কিন্তু অংশ প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ মনুষ্যের কার্য, কর্তার সহিত বিষুক্ত হইলে আর লোকালয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না।

চীন ও ভারতবর্ষনিবাসিদিগের অবনতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অবনতি কোন বিষয়ে, তাহার অলুপ্তাবন সংকর্ষণ। আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সংকর্মের প্রকৃত মর্ম ভুলিয়া গিয়াছি; তাহাতে সংকর্মের লক্ষণ বিষয়ে স্থল বিশেষে জন্ম হইয়া থাকে; এইরূপ জন্ম ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া সংকর্মের সহিত অনেক অসংকর্ম মিশ্রিত হইতেছে, এবং মর্ম বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ স্মৃতিভঙ্গ সংকর্ষণহীন। বিষয়ে বাধ্যতা জন্মিয়া। অতএব সংকর্মের মর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সুকর্মের হ্রাস এবং স্মৃতিভঙ্গ সংকর্মের অভাব ও তাহার আভ্যন্তরিক অবনতি হইয়াছে। এই ক্ষতি সামান্য নহে। কিন্তু আশাদিগের সংক-

র্মের মধ্যে অনেক গুলি, কেবল শাস্ত্রীয় বিধি ছিল বলিয়াই এখনও প্রচলিত আছে। উহা বিমুখ, এবং উহার মর্ম অজ্ঞাত, একথা সত্য হইলেও ঐ সকল কর্মকে তুচ্ছজ্ঞান করা অনায়াস।

উল্লিখিত অতিথিসংস্কার বিষয়ক মন্তব্যচন এবং দরিদ্রকে অন্নদানবিষয়ক অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা হিন্দুজাতির অন্নদান ধর্ম বর্ধিত হইয়াছে; আবার পঞ্চ বিচার বিষয়ে উহার নিগূঢ় সম্বন্ধানুসারে কার্য না হওয়াতে, প্রকৃতপক্ষে পরভোগ্যোপকর্ষী লোকের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এই জন্য মনুষ্য কিম্বা অন্নদান বিষয়ক নিয়মকে কি দোষ দেওয়া কর্তব্য? এক জনের দ্বারা কোন সংকর্মবিষয়ক একটি নিয়ম প্রচলিত হইল, কিন্তু তাঁহার বংশাবলী যৎ বুদ্ধি বিবেচনাকে আরত রাখিয়া, ক্রমশঃ বুদ্ধিহীনতা এবং নিয়ম, উভয়েরই ক্ষয় করিতে থাকিল, তাহাতে নিয়ম প্রণেতাকে দোষ দেওয়া অনায়াস। অধুনা ইংরাজদিগের আধিপত্যে সকল বিষয়েরই অতি স্বচাঞ্চল্য বন্দোবস্ত স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু যদি ভবিষ্যৎকালে বাঙ্গালিয়া এখনকার মত, বিচার প্রণালী, কর সংগ্রহ নিয়ম, রেল-রোড, টেলিগ্রাফ, এবং পানীয়জল সংগ্রহের উপায়, ইত্যাদি বিষয় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহাতে কেবল এই-মাত্র দোষ দেওয়া হইতে পারে যে, আমরা এই সকল বস্তুর উপকারভোগী হইলেও উচ্চাভে আসাদিগের পূর্ণ অধিকার জ্ঞানিতেছি না। সেইরূপ চীন ভারতবর্ষের নিয়মাবলির দোষ এই যে, লোকে তাহা সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করিতে

* এই প্রবন্ধে বহুবর্ষনবর্তিতা শব্দের পরিবর্তে বাসনবর্তিতা শব্দ প্রয়োগ করা যাইবেক।

পারে নাই, এবং ইহাতে কেবল এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, কোন ব্যবস্থার মর্ম এক জনের বুদ্ধির অগম্য হইলে তাহা কর্তৃক উহা সম্যকরূপে রক্ষিত হওয়া দুষ্কর; কিন্তু অসুখরূপ প্রভৃতির দ্বারাই হইক অথবা দণ্ডের প্রযুক্ত হইক, লোককে কোন সংকর্ষ করিলে এবং কালসহকারে তদ্বিষয়ক অভ্যাস বন্ধনুল হইয়া গেলে, যে পরিস্থা সংকর্ষ নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা অগ্রাহ্য করা কর্তব্য নহে ।

কামনা হইতে কর্ণের উদ্দেশ্য । কর্ম, কামনা চরিতার্থ করিবার উপযোগী হইলে বুদ্ধির দোষ প্রকাশ হয় । এবং একটি সংকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক গুলি অসৎ প্রেরণিকদমন করিয়া রাখা আবশ্যিক । এ সংকর্ষটা উপর্যুপরি নিষ্পাদিত হইলে অভ্যাস হইয়া যায় ; অর্থাৎ সংপ্রভৃতির উদ্ভেজনা, অসংপ্রভৃতি নিবারণ এবং কামনা ও কর্ণের উপযোগিতা বিষয়ক চিন্তা, অভ্যাসের দ্বারা এই তিন প্রকার পরিপ্রভের সাহায্য হয় । কিন্তু তাহাতে কার্যটির কোন ব্যত্যয় হয় না । অনন্তর পরিপ্রভ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া, যিনি নিশ্চিন্ত থাকেন এবং কার্যান্তরে হৃদয়ক্ষেপ না করেন, তাঁহার প্রমত্ততা অবশ্যই ঘর্ম হইবেক । পরিপ্রভে অপরূপ হইলে সহজ অনিষ্ট হইতে পারে । অতএব যে ব্যক্তি কোন সংকর্ষ অভ্যাস করণান্তর অন্য বিষয়ে আপনীর শক্তি নিবর্তিত না করেন, তিনি জনসমাজের কৃতিকারক । আলস্যের দোষ কেবল লামাকালেই ঘটে, মোর নহে । সময় অদৃশ্য এবং ইহাকে কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া ভাবনা করা

যাইতে পারে ; কিন্তু সময় নষ্ট করা সামান্য পাপ নহে । বিশ্রাম, পরিপ্রভের অভাব । কিন্তু যে পরিপ্রভ বিশ্রাম প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক সন্তোষ করিলে, আলস্য বলিয়া গণ্য হয় । পরিপ্রভের লাভ হইলে বিশ্রাম রক্ষিত করা সহজোধ্য ।

স্ববিন্দিত নিয়মপ্রায়ে এবং পূর্বপুরুষদিগের সমাধৃতনের অঙ্গসরগ দ্বারা মনুষ্যজাতির প্রেমের অনেক সাহায্য হইয়াছে—কিন্তু সেই জন্য বুদ্ধি চালনা ক্ষান্ত করিলে সামান্য ক্ষতি হয় না । অতএব নিয়ম নিবেশ করা কর্তব্য নহে ; বিবেচনা এবং সংপ্রভৃতির উদ্ভেজনা করাই যুক্তিসম্মত । স্বভাবতঃ যে পূণ্য কর্ম অসুস্থিত হয়, তাহার অনেক গুণ । কিন্তু নিয়মের দ্বারা তাহার অভ্যাস হইলে কর্মের কোন হীনতা জন্মে না, পরন্তু সেই অভ্যাস জমিত অবকাশ কৃষ্ণান্তের নিযুক্ত না হইলে ক্ষতি উৎপাদন করে । অভ্যন্ত পুণ্যে আর কোন দোষ নাই ।

যাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম নিদ্ধারণ বিষয়ে দোষ দেন, তাঁহাদিগের এক জন এই যে, উক্ত শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভের যে সাহায্য বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি সম্যকরূপ অহুদ্যবন করেন না । হিন্দুধর্মের এক প্রধান নিয়ম এই, সংকর্ষ অধ্যাপন করণান্তর তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করিতে হয় । সেই জন্য জাতিতে উক্ত কর্ণবিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই । ধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি সংকর্ষের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছেন । এই জন্য নিবর্তিত নিয়ম পরিভাগ করিয়াও অন্য উপায়ের দ্বারা এ নিয়মের মর্ম প্রতিপালন

করিতে পারেন। সামান্য লোক একপাশে স্থলে বাস্তুবর্তী হইবার চেষ্টা করিলে সকল দিক রক্ষা করিতে পারে না ; এতদূশ বিধানের ছই মহৎগুণ দৃষ্ট হইবেক । সভ্যতার আদিম অবস্থায় সামান্য লোকদিগকে নিয়মের মর্ম বুঝাইবার চেষ্টা করা রূপ, এবং প্রয়োজনের দ্বারা নিয়মগুলির লক্ষণ ও ফল পরীক্ষিত না হইলে তাহার মর্ম্যভূত করা অধিক অসম্ভব সাধ্য । অতএব সামান্য ব্যক্তির পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধান দুর্ঘণীয় নহে । তবে আবাদিগের মর্হণিগ যৎ প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম একটন করেন নাই । বোধ হয়, পূর্বকালে গুরুপদেশের দ্বারা পুরুষাচর্য্যে এই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইত, এবং কোন ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কিছুকাল শিক্ষাকার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছিল । অনন্তর নব্যশাস্ত্রাধ্যায়িগণ গুরুপদেশ অভাবে কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাই অধ্যয়ন সমাধা করাতে শাস্ত্রের নিগুঢ় মর্ম বিষয়ে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে পারেন নাই ।

সুতরাং বর্তমান কালে কেবল অহুদ্যবনের দ্বারাই শাস্ত্রের মর্ম নিরাকরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে । অতএব স্ববিধগণ শাস্ত্রীয় বিধির উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ না করাতে এই ক্ষতি হইয়াছে, এ কথা ঘাঁকার করিতে হইবেক । কিন্তু যে সকল অধ্যাপক মহাশয়রা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার স্বং কর্মফল অবলোকন করিলে শাস্ত্রীয় বিধির মর্ম অনেক স্থির করিতে পারেন, সুতরাং সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অমনোযোগিতা সাক্ষ্যনা করা যায় না ।

ফরাসি দেশের দর্শনকার কেয়ং সকল সংকর্ষের নিয়ম নিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন । মিল তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া বাস্তুবর্তিতার প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন । আবাদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই মিলের দ্বারা এবং চরিত্র বিষয়ে নিয়ম সংস্থাপন করিতে তাঁহার ন্যায় অনিচ্ছুক ।

মিল বলেন, কোমতের মহাজম এই যে, তিনি সকল বিষয়ে এবং সকল লোকের মধ্যে একটা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু সকল লোকের প্রকৃতি সমান নহে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের মনে ভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব জনসমাজ এবং মানব মনের একীকরণ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন । আর বিভিন্নতা বন্ধনে বাস্তুবর্তিতার উন্নতি হয়, অতএব মিলের মতে তাহাই ভলি ।

কিন্তু একই বিষয়ে সকলের সম্মততা হইবার প্রয়োজন নাই । এক জন বাস্তুবর্তী হইয়া অন্যদ্বারিকে অসদানে প্ররত্ত হইল বলিয়া আর একজনের বাস্তুবর্তিতা রক্ষা করিবার জন্য যে অসদান নিবদ্ধ এবং তাঁহার কেবল বস্ত্রই দান করিতে হইবেক এমত নহে । বরং তিনি অসদান বিষয়ে প্রথম ব্যক্তির অনুসারী হইয়া বস্ত্রদান বিষয়ে বাস্তুবর্তী হইলেই মঙ্গল হইবেক । বাস্তুবর্তী হইবার জন্য যে নিয়মভাগ করা আবশ্যিক, এমত নহে । কোন বিষয়ের নিগুঢ় মর্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাহারো কর্ণের প্রণালী স্থয়ং স্থির করিতে হইলে, অনেক পরিপ্রভ আবশ্যক করে, কিন্তু নিবর্তিত নিয়মের

অনুসরণ অপায়াসেই হইয়া থাকে। এতদ্বারা যে অবকাশ লাভ হয়, তাহাতে পৃথক বিধেয়ৱে চিন্তা করা এবং তত্পলক্ষে বাহুবলী হওয়াই মুক্তিসঙ্গত। এখনও মহাশয়ের চরিত্রসংস্কার বিষয়ে অনেক কৰ্ম বাকি আছে। যখন জনসমাজে তত্পলক্ষে কোন মূতন কার্যপ্রণালী আবিষ্কার করা অসম্ভব হইবেক, তখনই স্বাধুবলিতার স্থলাভাব বশতঃ চিত্তোৎকর্ষের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

কোমতের একতার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই একতা নিতান্ত অবিভাজ্য পদার্থ নহে, এবং স্বাধুবলিতাকেও তাহার এক অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কোমতের ব্যবস্থা এই যে, নিশ্চিত বিষয়ে একতা, সুনাম সাধনতা আর সর্কজ সদাকাঙ্ক্ষা রক্ষা করা কর্তব্য। অতএব যে বিধানের অন্যথা করিলে, কর্তার নিজের হউক বা অন্যের হউক, নিঃসন্দেহ কতি হইবেক, তাহাতে সকলেরই

স্বৈচ্ছাচার নিষিদ্ধ। কারণ এমন কোন কৰ্মই নাই যে তাহা কেবল কর্তার নিজের কতি করিয়াই কাঙ্ক্ষা থাকে। তবে এরূপ কার্য, কি উপায় দ্বারা নিবারণ করিতে হইবেক, তাহার বিচার স্বতন্ত্র।

স্বাধুবলিতা হইতে সদস্য উভয় ক্রিয়াই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। অতএব যে স্থলে স্বাধুবলিতা লোকের সম্বল বন্ধন করে, সেই স্বাধুবলিতাই কোমতের একতার অন্তর্গত। কোমত একতা এবং সামন্তস্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে, তদ্বারা মানবজাতির উন্নতি পক্ষে সুবিধা জন্মে। কোমতের মতে উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য; বন্দোবস্তই তাহার মূলধার এবং যেহেতু এতদ্বতয়ের গ্রন্থিস্বরূপ ও সারপদার্থ। যেখানে স্বাধুবলিতা ঘেঁষে পরিপ্লুত এবং উন্নতি মুখে ধাবিত, কেবল সেই খানেই উহা সংপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য; কিন্তু এতাদৃশ স্বাধুবলিতার জন্য বন্দোবস্ত অত্যাৱশ্যক।

যমালয়ে জীৱন্ত মানুষ।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা নিদাঘ কালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান মরীচিমালীর প্রশ্ন করণিবন্ধন দিব্যভাগে রাজকার্য পর্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কলিঙ্গ আরভ করিলেন। গ্যাসলোক সমভাগে আলোকময়, ফরাসি-ক্রমীয়

মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যবশুল শিল্পিপ্রশ্রিত্যাকবধিনির্মিত যুগ্ম যজি, কয়েকখানি সম্পূর্ণমুষ্টি দর্শনোপযোগী যুদ্ধ। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় একদিন কাচাত্তরে খীয়

মুষ্টি দর্শন করিয়া ইংরাজ দশযন্তী একাদশ মিনিট মুষ্টিভাষ্যস্থয় নিপতিত ছিলেন। আলোচ্য গুণ্ডিঅতীত যুদ্ধের বোধ হয়, অসমর্যবতীপ্রতিম লগুন নগরের যাবতীয় নাট্যশালালাভ্যক্তা মহিলাকুল যমালয়ের আলোচ্যে বৈরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহাল্লভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তমান দেখা যাইতেছে। নিরধিপতির পুরোভাগে অশীতিহস্ত পরিমাণ আশীবিধ সদৃশ বক্র নল সম্বল আলবল, তাহার হিরণ্য রুখ, তদ্বারা রাজমহলসমুদৃত তমাক নিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, “অদ্যকার বিশেষ কার্য কি?” প্রশ্নানুসি চিত্তগুণ্ডিঅচিরাৎ গাত্রোধান পূর্বক সমস্তম্বে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “ভগবন, অদ্য পিও কোম্পানির জীমারে ভীয়া ব্রিটিশ এক খানি সরকারি চিঠি এবং সমীরণ যানে এক খানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই, জরুরি, শঙ্কিত।

রাজার অনুমতি, অনুমারে মুসিপ্রবর সরকারি লিপি খানি অগ্রে পাঠ করিলেন; যথা—

“মহামহিম মহিমাগার খ্রীলখ্রীযুক্ত মহারানিরত মুন্সারহস্ত রাজাপিরাজ যমরাজ মহোদয় অপ্রতিভত প্রস্তাওপে।

অধীনের দিবেন এই যে, খ্রীপাদ পয়া ছইতে বিদায় হইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণ পূর্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলেন। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, খ্রী পুরুষ, ধনী, দীন, শিশু স্তবির, হিন্দু মুসলমান,

ব্রাহ্ম খ্রীকীয়ান, আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপক প্রদান করিয়াছেন। অস্থান নবতি পারসেই আমার অমিততত্ত্বে অভিহিত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার ত্রিমুখ যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ মাকলয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য “কৃষ্ণ” দাদাকে প্রেরণের এয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিঞ্জলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাণে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সৈন্যনে দিল্লীজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইচ্ছাইওয়া এবং ইচ্ছারবন্ধল রেলের দুই পার্শ্ব সমুদায় প্রদেশে সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, নয়মসিংগ, খ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাথরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চুট্রাংমে সন্নানল অজলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অশ্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্মদের যোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই রক্তকার্য হইবে, তজ্জন্য আপনাকে কিছু মাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বাখাঈ, মাত্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতীক্ষণী হয় নাই। পূজ্য বাধিপতি অজ্ঞাতশত্রু রণজিত ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘রক্তবর্ণে চিত্রিত গুণ্ডিন কাহাদের অধিকার?’ প্রত্যুত্তরে জানিলেন, ইংরাজদিগের। তখন তিনি

লেন, 'সব লাল হো যাণা'—রংজিতের এতদ্ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রযোজ্যতা।

যমালয়ের কারীগারে স্থানাতাব বলিয়া আপনায় আদেশাঙ্গারে বন্দী প্রেরণে স্নিহিত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ আশ্বিন।

একান্তবশতঃ

শ্রীডেংচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।

লিপির মর্দ্যবগত হইয়া কালান্তক হুঁচুচু চিত্তগুণকে কহিলেন, "ডেংচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে তাঁহার বীর-কীর্তিতে আমি মাদিগয় মন্তুই হইয়াছি, অচির্য উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া হ্রস্বাখিত হইলাম। যদি তাহারা শীত-গমনের পূর্বে ডেংচন্দ্র মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কুক" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কুকচন্দ্র রক্ত হইয়াছেন, তমি-নিমিত্ত দূর এদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিত্যম আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুদ্রিতবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা :—

"ছুট দমন শিটের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম-রাজ যমরাজ মহোদয়।

অথও এবল প্রতাপে।

গুতকলা বৈলা এক অহরহের সময় বা-গেরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত লো-চনপুর পরগণার মানাবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার, মহাশয়ের লোকের সহিত এমাদ নগরের পুঞ্জরীয়া শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার ন-

হাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাটি-য়াল, সড়কওয়াল, গড়গোয়াল, দে-সোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেক গুলি লোক হত হইয়া থানা ফেজ পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদয় নায়েব নব চা-ইর্যে এক জন গড়গোয়ালার এচণ্ড লা-টির বায় মাটাটি দোকাই হইয়া কাটিয়া পঞ্চদশ প্রাণ হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নাত্রের মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুপ্তায়িত করিল যে, আপনকার দূতেরা এবং আপনার প্রতি-কৃতি লোচনপুরের পুলিশ ইনস্পেক্টারের লোকেরা তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারিবাড়ীর বড় আটচা-লার পশ্চিম পার্শ্বের কাসরায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত এক খানি এক পাটায় ঢাকা আছে। যদি

পত্রপাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব ম-হাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কতো অবিকল নকল আপনার পুলিশসহ ইতি তারিখ নিকটে প্রে-রণ করিলাম। ভাট।"

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপর নাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্তগুণের মু-খের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে মুদ্রি-শ্রেষ্ঠ, একদ্রুত ব্যাপার প্রণয় করিয়া মো-বার হাজংক হইতেছে। না জানি, কি সর্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে।

মতুষ্য জীবনশূন্য হইকামাত্র আমার আ-ধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য পূর্ব জমীদারকর্ণ-চারীরা দিবসদ্বয় পর্য্যন্ত অনায়াসে এক জন এধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্টমে-ন্টের অধ্যক্ষ দেবদাদিদেব, মহাদেব শুনি-লে আমাকে কি আর আশ্ত রাখিবেন? এক সেই ক্রান্তগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই র-জনীমধ্যে নাএব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের পাত্রোপান করি-বার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে দদ খাইতে একটা বাঁধা আধুনি দিব।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাৎ চি-ত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচা-লার পার্শ্ব কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নাএব রক্ষিত হওনের পর পতন বাবুর কর্মকারকেরা জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিশের সবইনস্পেক্টার জ্ঞাত হইয়াছে। তাহার অতিশয় যত্ন হইয়া লাগুট স্থানান্তরিত করিল, চার-পায়া খানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোয়স্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চদ্বাত্রিংশৎ বৎসর, মস্তকে স্বদীর্ঘ কৃষ্ণিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতন্যক ৬ তাহাতে ছইটি ভাঙ মাছলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে মড়কা রোগ সঙ্কীর্ণ রেখায়, বাহ্যগুণৎ শোভা পাইতেছে; ক্ষুণ্ণ স্পষ্ট ঐত্যাক হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু জ্যোতির্ভীর্ণ নহে, নাসিকাটি লম্বা, অম্প সম্ভ্রান্তীয়ান-

কট বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর, গুমফ আয়ত নিবিড় কর্ণিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে এক-বার করিয়া কোয়ারি করা হয়। গলায় স্বর্ণ বঁটা জড়িত কৃষ্ণকলি ফলের, বিচি মদুশাক মালা, বাহুতে ইফকমচ মধ্য-ভাগে রক্তচন্দনের ফোটা, অঙ্গুলে একটি রক্তত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়, পরনে ময়ুরকণ্ঠ চলির যোড়, পায়ে হুলপুরুরে চটি। সর্গাঙ্গে, লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান, সংকীর্ণ বিধায় যক্ষ্মাকলী উৎকুনকুল গাজলোমে উপনিবেশ সংস্থা-পন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নি-রেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীষ অদূরদর্শি-তাহেতু আঁতাংকুড় জুইট হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জনা তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাস্তাবাক, তেমনি মোক-দমাযাক, জাল করিতে অধ্বিতীয়। কুড়-রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন করি মুলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর-পাটওয়ারি গিরি কর্ম করিয়া একবারমাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চুনের গুদামে এবং বারজয়মাজ সরকারি জেলে আধিসার করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নাএবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত প-রেই কুড়রাম দত্ত প্রাপ্তি দূর মাসে তৎপরিতাক্ত চারপায়া খানিতে আপ-নার বাকস্টি মস্তকে দিয়া শয়ন করি-লেন। বাকস্টি বিঘয় বকেয়া, ডালার উপর আদ ইকি পরিমাণে ময়লা জমিয়া

রহিয়াছে; বাম পাশে একটি ছিন্ন হইয়াছিল, তদ্বারা আরম্ভা গমন করিয়া একখান * কান ফোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলি, ভবিষ্যদ্বাক্যনিবারণ করিবার জন্য ছিন্নটি গালাছারি বন্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জমাখি কোন অংশে পেন্ডেলের সাজ নাই। পুরাকালে এক খানি পেভেলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহুকাল হইল অপস্থত হইয়াছে; বাক্সের মুখপ্রান্তে একটি শ্বেত চন্দনের, একটি বহু চন্দনের, একটি হরিজারি অর্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানা-বিধ দ্রব্য—এক দিম্বা শাদা কাগজ, একটি কমনরাখা বাঁশের চোলা, তাহার মধ্যে তিনটি কচুরি কলম, একটি খাঁকের কলম, একটি শঙ্কর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের চুরি আর আদখানি কাঁচি; সাতখান কান ফোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া মোড়া খাতা; একটি চুনের পুতিল; একখানি খাপ খোলা আর একখানি খাপ সংযুক্ত চমা; একটি গলাসি দোণা কানের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরোঁ দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অপেক্ষাল মধ্যেই অখোর নিজায় অভিভূত হইলেন, ভাললয়বিগ্ন কহর-ফর-ফরাং ফর-ফর-ফরাং নামসিকান্দান হইতে লাগিল। যমরাজ প্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে অবশ্য করিয়া চার পায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া ক্রতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে

পদার্পণ করিল, অপর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চারপাশা রাখিয়া বেহারারা প্রান্তঃক্রিয়া সম্পাদনানন্তর পুনর্বার চার পায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খটান্ধোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সোধ সমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুণি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা শড়কিওয়াল কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আট জন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাখাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; স্বতরাং পলায়ন করিবার অতীত উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় বারিয়া তর্জন গর্জন সহকারে কহিলেন—“ওরে নছার বেটারা, এখানে ভয় থাকে ত চার পায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ? চৌধুরীকে ভয় করি? এই চড়ে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া থাণ্ডে দাহন করিয়া যাইব, আমার প্রত্যাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, খক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের গুণপাত করিবার।”

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে

ঘুরিতে বৈতরণীন্দ্রী গর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়া পরিবর্তন করিয়া ডোম-কাক হইয়া অন্তর্যক্ষিক কর্ষ কোলাহল করিতে লাগিল, এক জন উর্দ্ধ শাঙ্গে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খটান্ধ সমীপে দাঁড়াইয়া রহিয়া কুড়রাম ভাবিলেন, “এক ভীষণ ব্যাপার, কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?” বেহারী তাঁহাকে চিন্তামুক্ত দেখিয়া কহিল, “মশাই গো, এটা চৌধুরীদের কাছারি বাড়ী নয়, এটা যমপুর।” মৌরা নব ঠাকুরকে আন্তি গিয়েলান, তা জুল করে তোমারে এনে ফেলিচি, মায়ামারি করবেন না, আর মোরে আ বন্দেন, তাই করবো।”

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাবু খুলিয়া এক তক্তা কাগজ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং ছই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাবুটি দিয়া কহিলেন, আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চলা বেহারা যে আজা বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত কার্য সম্পাদন করণানন্তর ক্রতান্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল চিত্তে বাহকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটা-ঘাতার্ভ বাহক অভিবণে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, “কর্তাশমশাই, পেলেয়ে যাও, পেলেয়ে যাও, আর অফে নেই, মারোঁ মালোঁ, বৈতরণী ধারে ঐক জন মীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত করবে, এক চড়ে আটী কাহার খাল করছে।” চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাস আনি-

য়াছিস কি না?” বেহারা কহিল, “নব ঠাকুরকে কেনে লুকয়েচে তার আদি সন্দি পানাস না, মোদের কোদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।” যম জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বতন যমকে পাঠালে কে?” বেহারা বলিল, “সে আপনি এয়েছে।” এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাবু বাহক সমভিত্যাহারে যম রাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন, যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অজ্ঞপতি দিলেন। চিত্র গুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন, যথা;—

“ইজ্যাতাহার শ্রীযমাল্লাধিপতি
ক্রতান্ত মালাম করিবা।

জিন্দাশিব।

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্বে ভূমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পুণ্ডিতন অপরূপ কার্যদক্ষতায় দৃষ্টি বাধিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, ভূমি আতিশয় পানবৎ হইয়াছে, রণ্ডনি, ভগুনি, যগুনি তোমার অস্ত্রের অভ্রবর হইয়াছে, তোমার দ্বারা রাজকার্য সম্পাদন হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। ভূমি এখন অক্ষর্য, জমীদারের কয়েক জন ‘অপ্প বেতন ভোগী আমলা তোমার

চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃত দেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। ভোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ান আশি মাজ অশেষ গুণালকৃত শ্রীকৃষ্ণ বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চাৰ্য্য বুকীয়া দিয়া পদচূত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার ম-
বাসগত হইয়া হা হেতাশ্মি বলিয়া রো-
মন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“দত্তজ মহাশয় কখন চাৰ্য্য লইবেন?”
দত্তজ উত্তর দিলেন, “এই দণ্ডে।” চিত্র
গুপ্ত তৎক্ষণাৎ চাৰ্য্যের কাগচ পত্র প্র-
স্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া
লইলেন এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে
অবতরণ পূর্বক পারিশদ বর্গের সহিত
উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাজ দো-
লাইতে দোলাইতে এবং কুর্জি বিক্ষা-
রিত বদনে সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া চিত্র
গুপ্তের প্রতি একটি জমাওয়াশীল বাকি
প্রস্তুত করিতে অঙ্কুর দিলেন। তখন
পদচূত যম কুড়রামকে সোধেন কয়টি
কহিলেন, “ধর্মরাজ, আমার কয়টি দি-
নের বেতন এবং শাখাছালানির দাম বাকি
আছে, সে গুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি
রাহা ধরচু করিয়া বাঙী যাইতে পারি।”
ধর্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “আমি
এবিষয় ভগবান ভাবানীপতিকে জ্ঞা-
ইবা; তিনি অল্পমতি দিগেই আপনার
দরবারে ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া
যাইবে।” পুরাতন যম স্তন যমের এত-
দ্বাকো অতিশয় চুপিত হইয়া বলিলেন,
“ধর্মরাজ, আস্তাবল যে ব্যারদ্বয় আছে,
তাহার একটি সরকারি আর একটি আ-

মার নিজ খরিদ, যদি অল্পমতি হয়, আ-
মার নিজ খরিদা ব্যারটি আমি লইয়া
যাই।” ধর্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “তুমি
ছটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা
হইতে দ্বারায় চৌধুরীওয়াল বাবুদের
এখানে আমন্ত্রণ করিব।” পুরাতন যম
প্রস্থান করিলে স্তন যম সভা ভঙ্গ
করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন
করিলেন।

যমালয়ের বক্ষ সকল অতি অপরিহার্য
এবং নিত্যন্ত অসমতল। ফেটান বা বের-
কুট, আফিসজান বা ব্রাউনবেরি চলবার
উপযোগী নহে। যিনি সর্বপ্রথমে, তিনিই
নহিষারোহণে গমনাগমন করেন, স-
তরাং রাজ্যের অবস্থার প্রতি কাহারো
দৃষ্টি ছিল না। ধর্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জি-
নিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
অল্পমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমু-
দায় রাজ্য পরিসর এবং সম্মার্জিত হইবে,
অনাথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরোচ্ছেদন ক-
রিবেন। চিত্র গুপ্ত কহিলেন, “ধর্মরাজ!
রাজ্য চোড়া করিতে গেলে অনেক বড়
মূল্যের বাঙী পড়িবে, সে মহাদায়ের
মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এক জন
ডেপুটিকালেক্টরের প্রয়োজন, এখানে
বাঁহারা আছেন, তাঁহারা সরবেয়িং জা-
নেন না।” ধর্মরাজ কুড়রাম কহিলেন,
“আমি সরবেয়িংপারদর্শী এক জন ডে-
পুটিকে আনাইয়া দিতেছি।” যমালয়ের
বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যার
পর নহি মর্দ্যাস্ত্রিক বেদনা পাইলেন,
কাংথি হাজেরা জমাওয়াগিলবাকী লিখি-
তে জানেন না এবং কবিওয়ালদের গীতও
বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিধা-

দ্বয়োদশসাধক দুইটি স্তন শ্রেণী
স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা
কাম্বাশালা, ধনাগার, কারাগার হাঁসপা-
তাল, পাগলা, গারদ দেখিতে দেখিতে
সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গাজলেন আর
প্রত্যক হয় না, শিবের মন্দিরে কাঁসর
ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, বৈতরণী ভীরে
ধ্বিক মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন।
কুড়রাম রাজাউলিকায় প্রত্যাবর্তন
করিলেন।

জিদিবেরশরী শচী যেমন চিরজীবিনী
এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ রাজমহিষী
কালিন্দীও সেই রূপ, তবে শচীর রূপ
দেখিলে মনে আনন্দোত্তর হয়, কালি-
ন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয়
হয়। যে যখন ইন্দ্র প্রাপ্ত হন, শচী
তখন উঁহাঙ্গি রাণী; যে যখন যমত
প্রাপ্ত হয়; কালিন্দীও তখন তাহারি
রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং সুলালী,
তাহার উদর পরিধি চতুর্দশ গজ দুই
হুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তমস্তকের ন্যায়
মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং চির
যুগল বিভক্ত, মীশেস্ত হাত হাত লম্বা,
দুই হাত চোড়া, আদ হাত উর্দ্ধ সিন্দুর
রেখা, লম্বা এত প্রশস্ত, উপত্যাকাধিতা-
কার্ণী না হইলে সেখানে বসাইয়া
দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে;
বাসিকা নতি বর্ধন নাতি দীর্ঘ, ত্র্যাহতে
একটি নত দুহিতেছে, নতটি ক্রুৎকার-
চক্র পরিমাণ মোটা, লোলকটি যেন
একটি কলমী, মুকাদ্দয় ছটি ঋপক বি-
লাভি, মুমড়া বিশেষ; দাঁত গুল্মী দীর্ঘ
এবং অতিশয় উক, ওঠে দ্বারা ঢাকা পড়ে
না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর

কর করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে
বলিবেন, কালিন্দীর অর হইয়াছে; কা-
লিন্দীর দ্বক মণ্ডল নহে, হাঁতির পা-
য়ের মত থস থসে ১১নাবাতিমুক্ত রাজার
পরিভোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেনা দুই
প্রহর হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বেশ বিন্যাশ
করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাসী
খান শাঙী পরিধান করিলেন, কিছুতেই
মন উঠিল না, পরিশেষে এক খান চুই
চুরি শাঙী মনোনিীত হইল। অল্পে আদু-
মন সর্বপট্টল চেউ খেলিতে-স্মর্দল;
প্রকাণ্ড গণদেশে মুখামৃত সহযোগে অঙ্গ
খণ্ড সমূহ শোঁতা পাইতে লাগিল। পদ
যুগলে বাইশ পাছা মল। যু যু বড়িতে
যু যু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী
অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ
হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণ পূর্বক বাম্ব বাম্ব ক-
রিয়া অপরিচিত ষামিসদিগধানে গমন
করিলেন।

শয়ন মন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণ সং-
স্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া
ভাবিতেছেন, “যমালয় হইতে পলায়ন
করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে
দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম
আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া
পড়িবে।” শয়নাগারে অসুলায়ের বাড়ীর
ঝাড় জলিতেছে। “শয্যার নিকটে কয়েক
খানি সেরউভের বাড়ীর কোচ এবং
চোয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আ-
গমন করিয়া দাঁত গুলিন বাহির করিয়া
একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করি-
লেন। কুড়রাম কহিলেন, “কল্যাণি, তুমি
কে?” কালিন্দী বলিল, “আমি যমরাজ-
রাজমহিষী কালিন্দী, আপনারা দাসী,

ধর্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।” কুড়াম ভাবিলেন, “এই বাড়ি গেলেম, যদিও ছই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ যুক্তি নশ্বন আর থাকিতে পারি না, মস্তিষ্কীয় গায় থা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, কি কৌশলে ও রক্ত বীজ বিনাশিনীর ভীষণলিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ তাগ করিতে হইল, স্ত্রী অনেক অনর্থক মূল। কালিন্দী কুড়ারমিকে চুর্ণ-গায়মনি দেখিয়া কহিলেন, “প্রাণ বলভত, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি গ্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি হাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই,
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ি,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ি,
তুমি বোলতা আমি ঢাক,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি ছল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি নিসে আমি মাগী,
তুমি ডাঙা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালি
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজীর যুথ ভঙ্গিয়ায় কুড়ারমের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বকড়াভায়ে মড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একই চড়ুকে ছাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন “শোভনে! তোমার বচন পীযুষে।

আমার কর্ণকুহর পরিকুণ্ড হইয়া গেল, শতাবধে যজ্ঞ ফলে তোমা হেন ফুলোদরা দারানিধি আশ্রিত হইলাম, কিন্তু হরিশে বিবাদ, আমার, গণিতুত যজ্ঞাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্মিণী সহবাস নিবন্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চাক্র হাসিনি, দিবসায় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটি পানের খিল কুড়ারমের মুখে দিয়া বিবাদিত মনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলটি চর্ষণ করিবারাজ হুড় হুড় করিয়া কুড়ারমের অঙ্গপ্রাশনের অম পর্বাত উঠিয়া পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের জাঁশ, কুইনাইন রাজমহিষীর ত্রিয় পানের ময়লা, আমিষীভূত করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলতে দিয়াছিলেন। ধর্মরাজ কুড়াম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাশ্রিত পানের খিল আর না খুলিয়া থাকিবেন না। কুড়াম নিজা গেলেন। স্ত্রীর যুথ মনে পড়তে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পদচ্যুত যম বিষয় বদনে ভরনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ জননী যার পর নাই চুখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবাণী নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর শব্দে কহিলেন, “বাবা যম, এতদধিক সময়ে তোমার কক্ষটি গেল, এরাবণের পুত্রী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে।

তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিযাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অহরোধ করা-ইবা। আজ কাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব অবলা” যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বস। মাজ, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাধুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন। কহিলেন, “ভয় কি বাবা, তুমি এত ভক্তাশ হইতেছে কেন? তোমার এত কালের কর্ণ কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ লক্ষ্মী ঠাকুরের অহরোধ করিলে কেহই বক্তাব প্রকাশ করিলেন না, আর যদি অবলম্বন করিবে। তোমার হাতবন্ধ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিষ্য কার্য জানি, জুতা ইপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।” জননীর সাহস বাক্যে যমরাজের চুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বর ভোজন সমাপন করিয়া উড়ানি খানি কাঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠঠন ঠঠন জুতা ঘোঁড়াটি পায়, দিলেন, তার পরে এক গাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিম্বলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসন। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতই সর্দার-মুদরী, অঙ্গ অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে ছুগাছি হীরক বলয়, পায়ে চারপাছি জলকরম মল, নিতম্বে একছড়া মোটা মোনার গৈটি, কচি ছনর যুতাশালা, মস্তকে সজল জলদ্রুতি উজ্জল কেশদামে ফিরেছি খোঁপা

বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা ছলতুল্য দেহচলা নীল পাখা। ভাঁচি পানে সমুদ্রের অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুক টুক কীর্তিতেছে। এক খানি রেলওয়েপেড়ে সিমলার শো-পাশু ফিনফিনে ধুতি পরিধান, তাহার যজ্ঞতা নিবন্ধন উজ্জল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী চুর্ভেণ নন্দিনী অমায়ন করিতেছিলেন, অপরায়ান পথে প্রদর্শনী প্রদানপূর্বক পুস্তকখানি মুদ্রিয়া আয়েমার বিধান আলাচনা করিতেছেন। এমত সময়ে যমরাজ জননী সর্গপতিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজজননী আদ্যোপান্ত সমুদায় রজস্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “মা, আপনি ত্রিলোক প্রতিপালিনী; আমার যমের প্রতি একই দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদ খানি হইয়া গিয়াছে।” লক্ষ্মী বলিলেন, “বাছা যমের কর্ণ গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় চুখিত হইলাম, কিন্তু শ্রবের আজা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অহরোধ শোভনে না, তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।” যমরাজ জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্বাদ করিলেন, “মা, আপনার ধনে পুখে লক্ষ্মী-ব্রত ইউক, মা আপনি মনে করিলে সকল করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা আমি দ্বন্দ্ব হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে কদিন বাঁচি, আপনার

কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।” লক্ষ্মী কহিলেন, “বাছা, আমার অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় চুৰ্ছিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।” যমরাজজননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, “বিদ্রি, ঠাকুরকে এক বার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।”

বিষ্ণু সম্ভ্রান্তি একটি গরুড়ের জুড়ি নিমিয়াছিলেন; পক্ষিধরের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, এক বার ওহো বোঁটা ওহো ও বোঁটা বলিয়া গাহে হস্ত বিক্ষেপ করিতেছেন, এক বার কোঁচার অগ্রভাগদ্বারা চৌঁটা মুছাইয়া দিতেছেন, এক বার তাহাদের বক্রগ্রীবা অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে বিদ্রি আসিয়া উপরআদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অশেষ গরুড়প্রিয়, ওয়ারেটের আশঙ্কায় অচিরে বিদ্রির অলুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষভাঙুরে এবশ করত নারায়ণীর নবচন্দ্রদামসম চিত্রকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, “আমামি হারিল, শুধু বিধান করুন।” নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ রোষকসায়িত লোচনে বলিলেন, “কথার ত্রি দেখ, উহাতে যে আমার অবল্যাব হয়, দাসীকে এমন কথা বলিলে তাকে কেবল অপ্রেতত করাই।” বিষ্ণু কহিলেন, “এখন তোমার প্রার্থনা কি?”

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অস্বীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাঁহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য স্মৃতন পাইয়াছি।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নশ্ব কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলনি।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর

হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “সদাম্ভিব যমের

কক্ষ ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি

তাঁহাকে পুনর্দীর দিতে হইবে, যমের মা

এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাদিতেছিল,

আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার

চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার

এতি তোমার অকৃত্রিম মেহের উপর বি-

শ্বাস করিয়া আমি শ্রীকার করিয়াছি, তা-

হার কর্ম্ম তাঁহাকে পুনর্দীর দিব।” বিষ্ণু

বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সেকি, সদা-

শিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন

যে সভার বিনা অমুদোদনে যমকে পদ-

চূত করিলেন। যাঁহা হউক যখন তুমি

তাঁহার ওকালত নামায় থাকর করিয়াছ,

তখন সে, কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

আমি অবিলম্বে ত্রক্ষাক সমভিব্যাহারে

লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব।

বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার

জন্য এত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুন-

র্দীর তাহার পদমু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা-

বনা।” দ্বন্দ্বীর অলক কুন্তলে একটি দোল

দ্বিয়া কিছু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু অতিসত্বাস্থ্যে কোচয়ান বি-

স্মাক ট্রাউন ভারপ্রণীকটানে স্মৃতন গর-

ড়ের জুড়ি যোজন্য করিলে নারায়ণ আরোহণ পূর্ব্বক পঞ্চাবোনির সপ্তসরোবরোয়ানে যাইতে, কহিলেন। ত্রক্ষা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচূত পরোয়ানা খানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচকসে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ি চুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের থাকরের প্রতি তাঁহার এক বার সম্বেদ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সম্বেদ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়িও সপ্তসরোবরোয়ানে পৌছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ত্রক্ষা সজলশীকার সম্পূর্ণ শ্মশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুর্ক-য়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রফ দেখিতেছি-লেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ত্রক্ষার তদবস্থা দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, “মহাশয়, প্রণাম হই।” ত্রক্ষা তখন মুখোস্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অশেষ লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান সহকারে আলম্বন করিয়া বলিলেন, “বৎস! কে যে অসমর্থ?” বিষ্ণু কহিলেন, “বিশেষ কার্য্য-সুচর্য্য ব্যতীত মন্ত্রাশয়কে বিরক্ত করিতে আমি নাই, আপনাদের বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাঁধর হইবার বিলম্ব কি? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, প্রাণ-নার সর্হিত সাক্ষ্য করিতে আসিতে গুয় হয়।” ত্রক্ষা কহিলেন, “সেকি বাবা, জি-

আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভরন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিলেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনীত হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের আরম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।” বিষ্ণুর পশ্চাত্ত যমকে দর্শন করিয়া ত্রক্ষা কহিলেন, “অকালে কালের আগমন; অবশ্য কোন বিলম্ব ঘটয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে নাকি?” বিষ্ণু কহিলেন, “যমরাজ যন: পীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচূত করিয়াছেন, এই পরোয়ানা খানি পাঠ করুন।” ত্রক্ষা পরোয়ানার মণ্যবগত হইয়া বলিলেন, “যমের এ বিপদ ঘটিবে, তাঁহা আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্যালোচনায় মগ্ন্যক পরাগুণ্য হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীক্স যে পর ত্রীকাতর হৃদন্ত নরায়ণদেবের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুর স্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্য শৈথিল্য, সদাশিবের তো দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত করুণি করিয়াছেন।” বিষ্ণু কহিলেন, যম আপনার সন্তান; সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জনীয়। যম আপনার নিতান্তহৃগত, বহুকালের চাকুর, উহাকে একবারে পদচূত করা বিচার সংগত হয় না।” যমরাজ করমোড় করিয়া ত্রি বিনীত ভাবে বলিলেন, “ভগবৎ, চতুর্দশ, সন্তানকে একবার মার্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতীজ্ঞা করিতেছি, আর কখন

আমাকে কর্ণে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সোধোদন করিয়া ইলিলেন, "ঋবাজির অভিপ্রায় কি?" দয়া পদ্মোদধি সহৃদয় হৃদীকেশ উত্তর দিলেন, "মার্ক্সনা করা।" ব্রহ্মা কনককি চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর ভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অহুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, "কিটানি প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচমিনিটে আনিবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বাবাজি, অর্দ্ধা বেলাবসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাপগমনে রাজি হইবে, বিশেষ সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাব পড়িয়া ভার। আপনাদের আবির্ভূতি কিছুই নাই, অতএব যমকে অর্দ্ধা বাড়ী যাইতে বলুন, কন্যা প্রভাতে আটটা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।" যম ব্রহ্মাবিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আহা নাকরিয়া যাইতে পারিবেন না, শতানিখ টউকিটলির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার আনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।" ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে আটটা বাজার পাঁচ মিনিট থাকি আছে, মহাদেব পীর কল্ভাস্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দল চন্দ্রাবীর উপবিষ্ট; ছুই হস্তে কণ্ডলু ধরিয়া গমম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্ব বিরাজিতা, শিরীষকুন্দমাপেকাও সুসুনার করণা দ্বারা শশীকলেশ্বরের পৃষ্ঠ

দেশের খামাচি মারিতেছেন। গত রজ-নীতে মূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মোতান্ত, তবে অচেতন হইহার কারণ কি? নন্দী মৃতন বাজারে গাঙ্গা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ত্রাতীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে মূল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্বদাই ভেঁসনা করেন। গত নিশিতে নন্দী বাড়ীর ঘর হইতে কতকটা মূল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাছেই পুষ্টিটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে বোমকেশ ব্রোডে নন্দী বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু কণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অধিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যাভাসমান, দিগধরী চান্দ্রভূত যাইতেছেন। পার্শ্বতী পতি-প্রাণা এবং স্বপাশীলা; অবিলম্বে ক্ষয়িত শয্যা স্থানান্তরিত করিয়া অভিনব কনুজ রচনাপূর্ণক স্পন্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং বিড়িকির পুষ্টিরীতে আপনাদের অঙ্গটি আপাদ মস্তক গস্নেনলের সাহায্য দিয়া ধৌত করিয়া আিলেন। যুগে আসিয়া হৃদয় বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; এতদে লাভেত্তার সিদ্ধন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিভ; নিকটে বসিয়া তালরস্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ স্বস্থ

হইয়াছে; পাটিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মোরলা মাচের ঝোল দিয়া চারটি ভাত দেয়। ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর রক্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাজিতে খাটে গিয়া গা দুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রায়শ, আমি তোমার রক্তাপদে পদে পদে অংগপ্রাণী, আমি তোমার পদাবিন্দু ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরের পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনত মুখী হইলেন, শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া ছুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কি?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি রস্ত অর্দ্ধ হইয়াছিল, মৃতরাং অভয়ার নিজ্রার ব্যাঘাত ঘটয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনাদের সাপ্তাহিক রস্ত, কিন্তু মূলীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর, দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া ফিৎ ফিৎ করিয়া হাসিয়া মাদর রক্তদ্বয় করিলে অতিশয় কৃতিত্ব হইতে হয়।" ব্রহ্মাকে সোধোদন করিয়া ভগবতী বলি-

লেন, "ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিলেন না, উনি অষ্ট প্রহর আমার মর্হিত এক্রপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কৃতিত্ব কি?" মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্ভুজ, অমদ্য আমার জটের উকুন, মতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকর্মাণ করিতেছেন।" ভগবতী কহিলেন, "তবে নথরে নথরে নিপাত করা, যমের বাড়ী চলে যাই।" বিষ্ণুর সমভিবাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভগবতি, তোমার যম জামাই ছুই উপস্থিত, বাহার কাছে ইচ্ছা, তাহার কাছে যাও।" ভগবতী অবগুণ্ঠনরতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীকণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যম এমন ত্রিয়মাণ কেন?" ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি শরীকর্য্যী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুদ্ধ হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অহুগত, উহাকে আপনার মার্জনা করিতে হইবে, আসি এবং নারায়ণের বিশেষ অহুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহজঃ সহজ অপরাধে অপরাধী; আপনি একা যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়ায় দড়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎ সাক্ষ্যত প্রাক্ষণ আমাদিগের কিছু মাত্র তর্ক নাই। আপনার অহুজ্ঞা অসমাদির নিকটে অথগা বলিয়া পরিগণিত; আপনাদের ক্রোধ কলপ্রভাবৎ কণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মারুদিত চিরপ্রবাহিত; অতএব হে বদান্যতা-

বারাংনিধি বগলাবল্লভ! অরুণাঙ্কুরে
প্রতি অরুণাঙ্কুর একাশ করিয়া তাহাকে
নৈরাশ্যাবন হইতে উদ্ধার করুন।” ব্র-
হ্মার চরনে মহাদেব অতিশয় বিম্বিত
হইয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা, আমি গাঁজা
খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্তৃ
করি না। আপনি এতকণ কি প্রলাপ
বক্তৃত করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র
বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত বাসি-
নীতে আপনার মাত্রাভিক্রম হইয়া থাকি-
বে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে
বস্ত্রব্রহ্মমাত্র সমুদ্ভূত হয়—ঐতন্যজ্ঞ না-
সিকা, নিজা এবং প্রভাব হয়, কিন্তু অম্য
জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া
থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের
তোজনাবশিষ্ট এক অশ্ব করি নাই,
আপনি করিতেছেন, আমি তাহাকে
পদচ্যুত করিয়াছি। কোন দিন বলি-
বেন, আমি ত্রিবিধাপিতিকে দ্বীপান্তর
করিয়াছি।” ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষ-
ণাৎ “সদাশিব” স্বাক্ষরিত পরেয়ায়না
খানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব
পরেয়ায়না খানি আদোপাশ পাঠ ক-
রিয়া কহিলেন, “এ পরেয়ায়না আমার
দগুণ হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি
আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি
স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে।
যমরাজের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীভোগ এক
মাসের মধ্যে আমার সেৱেষ্টায় উপ-
স্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরেয়ায়না
বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা
ছিল না।” যমকে সন্ধান করিয়া জি-
জ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া

দিয়াছ?” যম উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা
হাঁ।” মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া
কহিলেন, “আমার লবাস হয়, অপরেরা
একথা করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দে-
বায়ুর যুদ্ধ হয় নাই, এই পরেয়ায়না
যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উ-
চিত নহে, এই দণ্ডে দগুণের নিকটতন
গমন করিতে হইবে।” বিষ্ণু জিজ্ঞাসা
করিলেন, “ভাল যম, কুড়রামের সমভি-
বাঁহায়ে সৈন্যসামন্ত কত আসিয়াছে?”
যম উত্তর দিলেন, “জনপ্রাণী না, কিন্তু
মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি
কৃষ্ণাবতারে কংশালয়ে হাতে মাতা কা-
টিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক
জন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।” ব্র-
হ্মা কহিলেন, “শচীদেবকে সংবাদ দে-
ওয়া উচিত।” বিষ্ণুর মতে বজ্রাস্ত্র অপ্র-
য়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হই-
তেছে যে, কোন আশোদপ্রিয় লোক য-
মকে উদানদা রকম দেখিয়া যমের সহিত
কোভুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার
নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতেশ্বর
কোভুক জমিল এবং অচিরে স্পেসি-
য়াল ট্রেণে যমের সমভিবাঁহায়ে যমালয়ে
গমন করিলেন।

পারিশমবর্ণে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়-
রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত
অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ,
যমালয়ের কারাগার গুলিন প্রশস্ত না
করিলে বন্দীগণের অশেষ কষ্ট হইতেছে,
যেহেতু লোক আসিতেছে, বোধ হয় দ্রুতি
ঝালাপার করবার আবশ্যক হইবে।”
ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “এমন উপায়
বলিয়া দিতেছি, যদ্বারা কারাগার প্রশস্ত

করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে।
তুমি দ্বারায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল
দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে
ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দে-
বাবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া
আছে।” চিত্রগুপ্ত সমুচিত চিত্তে কুড়-
রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পু-
রাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা
হইতে সে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসা-
বুজ্ঞা আপিলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা।
চিত্র গুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয়
কোপাধিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া
অগ্নিধ্বলিত বহির্ভূত হইতে লাগিল এবং
বাক্কের উপর সজ্ঞের চপেটাঘাত ক-
রিয়া বলিলেন, “আমার নাম হুহুম,
তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুহুম
দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবি-
ষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার
প্রয়োজন নাই। কুড়রাম কম্পিত হস্তে
রায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা
বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত
সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম
সমগ্রসে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্বক
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাক্ষীভূত
প্রতিপাত করিয়া ভক্তিভাৱে দগুণমান
রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“বাপু, তুমি সশরীরে কি একাকারে যমালয়ে
আগমন করিলে?” কুড়রাম উত্তর দি-
লেন “প্রভো, আমি লোচনপুর ক্যুন্সারি-
আট-চালায় শয়ন করিয়াছিলাম, যম-
শ্রেণিত বাহকগণ আমাকে এখানে আ-

নিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌছিয়া
মহা চর্ছাবনায় পড়িলাম, অপরচিত
দেখ, মহায় সম্পত্তি হীন, কি করি, অব-
শেষে কাগচ কলম লইয়া একখানি প-
রেয়ায়না দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম
আত্মপক্ষ সমর্থনে হুহুরের নামটি জ্ঞান
করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ
মার্জনা করিতে হইবে, বিশেষ ‘ধায়ে’
মিতাং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চ-
ন্দ্রাবেতং যং’ ধান করিতে করিতে স্বাক্ষর
করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখরনীলকণ্ঠ!
মধ্যযজ্ঞবিনাশনামার্জনীয়মহেশ্বর! অকি-
মকমের অপরাধ মার্জনা করুন।”
মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া ক-
হিলেন, “বাপু কুড়রাম, জ্ঞান করা অতি
গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর স্ব-
রূপে তোমাকে লোচন পুরের কাছারি
বাড়ীতে পৌছাইয়া দিই।”

মহাদেব যমকে সন্ধান করিয়া কহি-
লেন “বাপু, যম মাহুয়ের উপর প্রভুত্ব
গ্রহণ করিয়া জীয়াস্ত মাহুয়ের কাছে
গিয়াছ ঢালাকি করিতে। একটা জীয়াস্ত
মাহুৰ যমালয়ে আনিয়া কারখানার
দেখিলে তো? নাকি কানে খত দাড়া-
আর কখন জীয়াস্ত মাহুয়ের ছায়া মাড়াই-
বে না। যমকে ভৎসনা করিয়া ব্রহ্মা
বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি-
লেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হই-
লেন। কুড়রাম নিজা ভিক্ষে দেখেন,
লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচা-
লার পার্শ্ব কামায় চারপাখার উপর
শয়ন করিয়া আছেন।

বঙ্গদেশের কৃষক।

বিহীয়া পরিচ্ছেদ।—জমীদার।

জীবের শত্ৰু জীব; মনুষ্যের শত্ৰু মনুষ্য; বাঙ্গালি কৃষকের শত্ৰু বাঙ্গালি ভূস্বামী। ব্যাভ্রাদি বহুজন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি রহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু বাঁধ করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্গ্গা হউক না কেন, এই সর্বস্বত্বপ্রস-বিনী বসুমতী কর্ণন করিয়া ভাঙ্গাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদারকর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রাণস্বাভাজন বিবেচনা করি। যে স্বজন্মগণের অধীত আমরা এ সংসারের প্রধান স্বধের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালি জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের অধীতাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা বাঁধা বলিতে প্ররক্ত হইতেছি, তাহাতে অধীতাজন হওয়া

দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্যাবল্লারেণে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃস-হায়, মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজ-মধ্যে জানাইতেও জানেন না। যদি মুকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাস্তবায় না করিলাম, তবে মহা পাপ সম্পর্কে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত, সমাজশ্রেষ্ঠে ভূষামিস্ত্রীরা বিরগভাজন হইব—অনেকের নিকট ভিতরকৃত, ভৎসিত, উপহাসিত, অমর্যাদা প্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতারের হইয়া কাত-রোজি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকার অত্যাচারের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাভূত হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বন্ধকুশি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোজি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্দ্রের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা বাঁধা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতিবিবেচনা করিব না।

যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে জ্ঞাত বলিয়া মার্কনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথা-বোধিত করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, দুঃখত হইয়া তাহা স্বীকার করিব। বৃত্তফল সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্ত কণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা বাঁধা বলিতেছি, তাহা জমীদার সমুদ্রায় সযত্নে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার যাকেই চুরায়া বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাৎসবৎ, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অন্ধ প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্জে না। কতকগুলি জমীদার-অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি, বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদার গুলিই বুঝাইব। পাঠক মহাশয় জমীদার সম্প্রদায় বুঝিবেন না।

বাঙ্গালি কৃষক বাঁধা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে ঔষমতঃ ঢাসের থরঃ-মুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে-বাঁধা থাকে। তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী শুদ

দিতে হইবে। প্রাবণ মাসে-ছই বিশ ধান লইয়াছে বাঁধা, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। বাঁধা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিলেক? পরে বাঁধা কাঁচ রহিল, অপ্পাশিষ্ট, অপ্পা খুদরে খুদ, চরিত্তি ইচ্ছার রস, শুদ্ধ পঞ্চলের মৃত্তিকাগত বাঁধ। তাহাতে অতি কটে দিন-পাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে-পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পোষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় ভুলিয়া, সময়মতে ছাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে টেন্সমাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পোষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর টেন্সের কিস্তি তিন টাকা। মোট চারি টাকা সে দিতে নাগায়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন,—“তোমার পোষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই ‘পাড়িল’—হয় তা গোমস্তা দেখাইতে পারিল, নয় না। হয় তা খোলাখা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় ছই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। বাঁধা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখির কবচ পায় না। হয় ত, তাহা না দিলে গোমস্তা সেই দিন টাকাকে তের

টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই ভাষার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা স্বদ কবিল। জমীদারী নিকট টাকায় চারিআনা। তিন বৎসরেও চারিআনা, এক মাসেও চারিআনা। তিন টাকা বাকির স্বদ ৭০ আনা। পরাণ তিন টাকা বারআনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় ছই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্শ্বণী, নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুখরি, পাইক, সকলেই পার্শ্বণীর হকদার। নোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজন্য আর ছই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দোরাখা জমীদারের অভি-প্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং স্বদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সেক্ষেত্রে দোহাৎ জমীদার যে বেতনে দারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদরপূর্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার

ক্ষতি কি? তাহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে? তাহার পর আঘাৎ যাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে ছই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পুথকৎ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর ন্যেব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাঁহার কাছে ব্যক্তি রহিল। সমগ্রান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহ্বারের উপায় নাই। এদিকে চান্দার সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে ভোগ। দেড়ী-স্বদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা স্বদ মনেত শুদ্ধিয়া নিঃস্ব হইবে। চান্দা চিরকাল ধার করিয়া যায়, চিরকাল দেড়ী স্বদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চান্দা কোন হার। হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাহার ধানের গোলা ও গোলা বাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসি। এরূপ জমীদারের বাবসায়

মন্দ নহে। যখন প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পরিশেষে কর্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী স্বদ ভোগ করেন। এমন অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপস্থত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অভিশক্তি আছে, অনারক্ষি আছে, অকাল বৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পল্লপালের দোরাখা আছে, অন্য কীটের দোরাখাও আছে। যদি ফসলের স্থলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেননা মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক স্বয়ং পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অধাতাবে সপ্তরবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অথবা ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ” কখন ডিফা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্প সংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন চুঃসময়ে প্রজার ভরসা স্থল নহে। মনে কর, সে বার “স্ববৎসর” পরাণ মণ্ডল কর্জ পাওয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাণ্ডের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালখাশানা, কোটাল, বা ভরুপ কোন নামধারী মহাত্মা ভাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মাহুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের ছবু দ্বি খটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। গি-

য়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।” তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহার পরাণকে মাটি ছাড়ি করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু যুগতা গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হইতেন থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারিতে রহিল। হয়ত, পরাণের মা কিথা ডাই, খানায় গিয়া একজনে করিল। সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনফেবল পাঠাইলেন। কনফেবল মাঝে—দিন দুনিয়ার, মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কনফেবল সাহেব একটু ধুম ধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনজুক—বৎসরে ছই তিন বার, পার্শ্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্গ-স্বখায় পরমপুত্রকুম্ভি রোপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টি মাত্রই মল্লব্যের স্বদয়ে আনন্দ রসের সঞ্চার হয়—ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীতি হইয়া খানায় গিয়া একাশ করিলেন, “কেহ

কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেশতাজ লোক—সে পুন্সুর ধারে ভালভায়া লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেই খানহইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাবির জন্য হয়, এমন নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কি-কিৎ প্রণামী দিয়া লাইখ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লাইখ খান না”—তখনই পরাণ মৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐ রূপ মজলচারণ করিয়া নাশিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসঙ্গ করিয়াছে”—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সমাদ্দ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃধ্ব গর্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক, বা জমিন লইয়াই হউক, বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক, বা সমগ্রান্তরে বিহিত করবার আশয়েই হউক, পুন্সুদার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাঙ্গ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জমিল। এবিহাণন মাসে জমীদারের দৌরিক্তর বিবাহ বা ভ্রাতৃপু-

ত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাজল চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ১০ আনা দিলে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিলে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিলে—তিন হাজার জমীদারের সমুদ্রে উঠিলে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করলেন, “একবার স্বয়ং মহলে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় কালোঁড় পাটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাধিয়া বাইতে লাগিল। বড় জীবন্ত রুই, কাভলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া লাজ আহুড়াইতে লাগিল। বড় কালোঁড় বাড়ীকু, গোল আলু, কপি, কলাই মুটিতে ঘর পুরিয়া বাইতে লাগিল। দপি ছদ্ম বৃত্ত নবীনতের ঢাক পাখি নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কথা বাবুর উদর ভেগেন নহে। বাবুর কথা ঘুরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্যন্ত উদরায়ের লক্ষণ দেখা বাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী”, “নজর” বা “সেলামী” দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ১০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা, তাহার ঘোনা বাকির স্মিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু

তাহার ক্ষেলে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ফোঁস খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “কোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য কোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাস্তাবাজ লোক, কোক করিলে দাস্তা হেজানো খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই বঁট অতাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রোপ্যাকের মায়াম অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধান গুলিন কাটাওয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম “কোক সহায়তা।”

পরাণ দেখিল, সর্ব্বশ গেল। মহাজনের কণও পরিশোধ করিতে পারিল না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিল না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সধিয়াছিল—জমীদারের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিব যে, ইহার জন্য নাশিশ চল। পরাণ নাশিশ করিয়া দেখিল। কিন্তু সে-ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারান্দার মদির ডুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ডাক্টরের মূল্য চাই; উকীলের ফিস চাই; আশা নী সাক্ষির তলবানা চাই; সাক্ষির খোরাকি চাই; সাক্ষিদের পারি-

ভৌদিক আছে; হয় ত আমীন, খরচা লাগিবে; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলা বর্ণ কিছু কিছু প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃশ—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নাশিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া সরু ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাটটা নাশিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল কোক অতুল করিয়া, সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষিরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত; ঘেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রোপ্য মস্ত্রে সেই পথ-বর্তী। সকলেই বলিল, পরাণ কোক অতুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নাশিশ ডিজী হইল, পরাণের নাশিশ ডিসিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই তিনি ক্ষেত্রে দিতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিত পারিল; তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল; অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচার গুলিন সকলেই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারী ঐ রূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ

নগ্ন কপ্তিত ব্যক্তি—একটি কপ্তিত প্রজাকে উপলব্ধ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমিদারেরা গত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা-বিস্তৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর এক রূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পণ্ডিত হইয়া থাকে।

জমিদারদিগের সকল প্রকার দোষ-জ্ঞার কথা যে বলিয়া উঠিতে পারি-যাছি, এমত নহে। জমিদার বিশেষে, প্রদেশ বিশেষে, সময় বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন বাহা পারেন, আদায় করেন। দুটোষ, স্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া এক খানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর ভয়ানক বন্যায় ভুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের এক খানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগস্টের অবজরদের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জল-রুদ্ধ হইল। গ্রাম খানি সমুদ্র সমুদ্র উপর। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান-পল্লভ ভুবিয়া গেল। গোষ্ঠ সকল অনাহারে মরিয়া যা-ইতে লাগিল। প্রজাগণ শম্বাস্ত। সে স-ময়ে জমিদারের কর্তব্য, অর্থদানে, খাদ্য দান প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ করিলেও অ-

নেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজনা টা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজনা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দল-বলসহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২১৯ জন খোদকান্ত প্রজা, এবং ১২১৯ জন কৃষক প্রভৃতি অপর লোক একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪০০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই;—

নায়কের পুণ্যাহের নজর	৩৮
জমিদারদিগের পাঁচ শরিকের এ	৫৭
গোমস্তাদিগের	২৭
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	১১
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	১৭
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	৬০
ভান্ডের	১১০
নৌকা ভাড়া	১১০
সদর আমলার পুজার পার্শ্বী	৬১০
কান্দারির আমলার	১১
এ হালশাহানা	১৭
পাঁচ শরিকের পার্শ্বী	৫৭
শ্রীরাম সেন, হেমচন্দ্র	১১
জমিদারের পুরোহিতের তিকা	২১
গোমস্তাদের	১২১
দুইশতদের	৩৭
বরকদাজদিগের দোলের পার্শ্বী	১৭
ডাকটেক্স	৩৭

৫৪০০

এই চতুর্থের সময়ে প্রজাদিগের উপর তিনআনা করিয়া বাজে আদায় পড়ত।

পড়িল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তার অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজার কায়ক্লেশ মেজেপেতে বেচে কিলে হাটলাত বরাং করিয়া, ঐ টাকা দিল। কিন্তু লোকে মনে করিবে, মজুর দেহে সত্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জ্ঞা-নেন, একটি একটি প্রজা, একটি একটি কৃষক। যে দিন টাকার তিনআনা হারে ৫৪০০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪৫ দিন মধ্যেই আবার উপ-স্থিত। বাবুদের কামের বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজার নিরুপায়। তাহার একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠিতে গিয়া কর্তৃ চাকিল। কর্তৃ পাইল না। মহাজ-নের কাছে হাত পাতিল—মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আশা-মীদিগকে মাজা দিলেন। আশামীরী আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালসি দিলাম।” সুবিচার হইল। কেনা জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আশামীরী খালসি?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান অবজর্সর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুই লোক সকল সম্প্রদায় মাথোঁড়ী আছে, দুই একজন দুই লোকের দুহুন্ডা উদা-হরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের

প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটি-তেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জা-নেন না।

উপরের লিখিত তালিকার শেষ বিব-যটির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। “ডাকটেক্স।” গবর্ণমেন্ট নান্দ্য বিধ কর বসাইতেছেন, জমিদারেরা তাহা লইয়া মঁহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? এ “ডাকটেক্স” কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেন্ট বিধান করিলেন, যফঃয়েল ডাক চলিবে, জমি-দারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমি-দারেরা মনে মনে বলিলেন, “ভাল, দিতে-হয়”দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে এ-কি চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুন্সফ থাকে।” তাহাই করিলেন। প্রজার ঘ-রতে ডাক চলিতে লাগিল—জমিদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গব-র্ণমেন্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার বাড়ি পড়ে।

ইনকমটেক্স ও এরূপ প্রজারা জমি-দারের ইনকমটেক্স দেয়। এবং জমিদার তাহা হইতেও কিছু মুন্সফ রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁ-হাদিগকে “রোড ফণ্ড” দিতে হয়। এ রোড ফণ্ড আমরা ভূখণ্ডিক জমা-খা-শীল বাকি ভুক্ত দেখাইছি।

রোডসে—এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহন আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পাড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নাশি করিল, এ বার আশানী “আইন অজুসারে” খালসা পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাল্পাতালির” রত্নাঙ্কটিকে চুকাবহ। সবডিবিজনের হাকিমেরা পুল, ডিপেন্সরির করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্ট্যান্ট মাজিষ্ট্রেট খ্রীযু সবডিবিজনে একটি ডিপেন্সরির করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছুই মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে এত টাকা হাল্পাতালির জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় ১০ আনা হাল্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।” গোমস্তারা তুচ্ছপ আদায় করিতে লাগিল। এ দিগে ডিপেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং এই জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট

চিরকাল টাকায় এক আনা হাল্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার এই প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছি—কখন হার বাড়ি কমে নাই—সুতরাং আমাদের খাজানা বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অযুক্ত ন হইতে হাল্পাতালি বলিয়া ১০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই চেতুতে আমি খাজানা রহিত করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে—

প্রথমতঃ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিনে অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতায় সুশিক্ষিত জুয়ানদিগের কোন অত্যাচার নাই—ঐহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজান্তে এবং অভিনত বিরুদ্ধে, ন্যায়ের গোমস্তাগণের দ্বারা হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় এই রূপ। বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় ঘরে অত্যাচার একবারে নাই। সামান্য ঘরেই অত্যাচার অস্বাভাবিক। ঐহা হার জমীদারী হইতে লক টাকার আইনে—অর্থপ্রদান করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকার লইবার জন্য তাঁহার মনে প্ররতি

দুর্জলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু ঐহা হার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার ঐহা হার নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাহ্মা অধিক। আমরা সংক্ষেপাহুর্ধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থ করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাঁহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোয়াইয়া লইতে হইবে। যথাবর্তী তালুকের স্বজন প্রজার পক্ষে বিঘম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজান্তে, কখন বা অভিভূত বিরুদ্ধে, ন্যায়ক গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোন রূপ পাড়ন হয়, অনেকেরই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারী প্রজাও ভাল নহে। পাড়ন না করিলে খাজানা বেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বুঝা যে, প্রজার উপর প্রাণে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাবে ধারণ করে না।

ঐহা হার জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সংকার্য অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপনাদের সাধারণ সম্মেলনই যে আপনাদের গ্রামে বগিয়া বিদ্যাপাঠন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথায়, অতিথিশালা ইত্যাদির স্বজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে ছোটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—জমীদারদের সমাজ। তদ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছি না, বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি সন্মান্য পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়জুক কোনও লোকের দ্বারা যে প্রজা পাড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পুরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশরিত হয়, তবে আর তিন জনে দুশরিত ভাড়া দ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতী আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রস্তাব লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জন সমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আ-

মাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরোধ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর্যাপ্ত গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কলোচ চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসিদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, জমিদারের দণ্ড তত নহে। জমিদারের পক্ষে এই দণ্ড জমিদারেরই হাত। অপর জমিদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অসমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুরন্ত জমিদার দুর্ব্বলতা ভাগ করিবেন। একবার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য, আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত জমিদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের ন্যায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে

আরোহণ করিবে। একাজ না হইলে বাঙ্গলা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। বাঁহা হইতে এই কার্য্যের স্বরূপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালির মধ্যে প্রেষ্ঠ বলিয়া পুঞ্জিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারণিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাদাক্ষণ যথেষ্ট বিষয়ে অক্ষম, আমরা অন্যতর বিশ্বাস করি না। তাঁহারা অশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা একান্তক চিন্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা বাঁহা কিছু এবিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা অস্বাভাবিকতা অধিকৃত হইতে পারিবে বলিয়াই, আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলি। যদি আবশ্যক হয়, আমরা দিগের সামান্য বুদ্ধিতে বাঁহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এবিষয়ে অসুচর্য্যগত দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও, অখ্যাতি।

বাঘ।

জগৎ যম সূর্য্য তেজঃ,
অনন্ত আকাশ মণ্ডলে।
যথা ভাকে মেঘ রাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি জ্বলে ॥
কেবা মম মন বলে,

জজ্ঞকার করি ঘবে, নামি রুম্বলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি
অটল অচলে।
হাছাকার শব্দ তুলি অসুখ অবনীতলে ॥

১
পরন্ত কন্দরে মাতি,
নাচি মহারথ শিরসে।
মাতিয়া মেঘের মনে,
পিঠে করি বাঁহা ঘনে,
তাঁরা বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে জীড়া করি, মাগর উরসে ॥
মথিরা অনন্ত জলে,
সফেদ তরঙ্গ দলে,
ভাদি তুলে মনস্তপে,
ব্যাপি দিগদশে ॥
শীকারে আবারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে।

২
বসন্তে নবীন লতা,
প্রফুল্ল ফুলে সোলে তার।
যেন বাঘ সে বা নহি,
অতি মুদুৎ বহি,
যাই তথায় ॥
হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি মাখি নিজ গায় ॥
মরাবের মান করি,
যাই যথাত পুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
পুঁজিয়ার জ্যাগায় ॥
তাঁহার অলকা ধরি,
মুখ চুমি ঘর্ম্ম হরি,
অঞ্চল ঢঙল করি,
মিষ্ট করি কায় ॥

আমার মনান কেবা যুবতী মন কুঁলায়?
৪
বেগু শব্দে মধ্যে থাকি,
বাজাই মধুর বাঁহরী।
রঞ্জে যাই আমি,
আমিই গোহুম বাঁহী,
মর লহরী ॥
আর কার গুণে হরি,
কুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেখরী?

৩
ঢল ঢল ঢল ঢল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফলে উজল,
কানন বলরী,
তাঁর মাঝে বাস্তব্যম বংশানার রূপ ধরি ॥

৪
জীব কণ্ঠে যাই আমি,
আমিই এ সংসারে মর।
আমি বাকা, ভাণ্ডা আমি,
মাতিয়া বিজান যামী,
মহী ভিতর ॥

৫
নিঃস্বপ্নে কণ্ঠে আমিই ছায়া,
ধ্বনি কণ্ঠে আমিই ওজার,
গায়ক কণ্ঠে আমিই স্বাক্ষর,
বিশ্ব মনোহর ॥
আমিই রামিণি আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাণ,
মম রূপান্তর ॥

৬
গুণ্ডরূপে ভুয়ে-ভুয়ে,
কোকিল কুহরে কুহরে উপর,
কলহংসে নাদে মরমী ভিতর,
আমারি কিস্কর ॥
আমি হাসি আমি কাহী, বররূপে
শাসি মর ॥

৭
কে বাচি এ সংসারে,
আমি না থাকিলে ছুরেনে?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
শ্বাস বহনে ॥

৮
উজ্জ্বলি খণ্ডে গগনে ॥
দেশে দেশে লয়ে যাই, বাঁহা মত ঘনে।
আনিয়া মাগর নীরে,
ঢালে তারা গিরি শিরে,
সিঁড় করি পৃথিবীরে,

হেড়ায় গগনে।

মম সম দোষে গুণে, দেখেছে কি কোন জনে?

৭

মহাবীর দেব অগ্নি,

আমিই জ্বলাই দেন অনলে।

আমিই জ্বলাই যাঁরে, আমিই নিহাই তাঁরে,
আপন বলে।

মহাবলে দলী আমি, মনন করি সাগর।

রসে সুরসিক-আমি, কুসুম কুল নাগর ॥

বাঙ্গালা ভাষা।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

ভাষা পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহা-
শয় এক স্থানে লিখিয়াছেন “যে কচিন
ও দুপ্রব ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য
হইতে পারে না, এই জন্য সেই ভাষাগত
সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতা সম্পাদন
করায় ভাষার পরিবর্তন ঘটয়া উঠে। ঐ
শিথিলতা করণ ছই প্রকারে সম্পন্ন হয়—
এক প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয় প্রকার বি-
প্রকর্ষণ—নন্দাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া
‘নন্দী আদি’ করাকে সম্প্রসারণ এবং ধর্ম
শব্দের সংযুক্ত বর্ণের ‘র’ বিপ্রেক্ষ করিয়া
‘ধরম’ করাকে বিপ্রকর্ষণ করে।” যেমন
শব্দের সন্ধি—ও সন্ধিচ্ছেদ আছে; সং-
যুক্ত বর্ণ যেমন প্রথমে সংযোগে উৎপত্তি
হইয়া পরে বিপ্রকর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত
হয়, সেইরূপ বাক্য (Sentence) ও রচনাও
[Style] তিক ঐ রূপ কারণে রূপান্তর প্রাপ্ত
হয়। ইহারও এক প্রকার স্থিতিস্থাপক
ও নুতন, আবশ্যক মতে প্রসারিত ও আকৃ-
শিত করা যায়। কোন ভাষার জমাট

শিহরে পরশে মম, কুলের কামিনী।
মজাইন বানী হয়ে গোপের গোপিনী ॥
বাক্য রূপে জান আমি ঘুর রূপে গীত।
আমারই রূপায় ব্যক্ত অক্তি দম প্রীত।
প্রাণ ব্যক্ত রূপে আমি রক্তা করি জীবনগণ।
জহ জহ! মম সম গুনবান আছে কোন
জন?

গাঁথনি, কোন ভাষার শিথিল গাঁথনি।
এক ভাষায় একটি ভাব দশটি অক্ষরে
প্রকাশ পায়, আর একটা ভাষায় সেই
ভাবটি প্রকাশ করিতে পঞ্চাশটি অক্ষর
লাগে। প্রথম ভাষায় এক অক্ষরের শব্দ
অনেক আছে বলিয়া বা শেষ ভাষাটিতে
অনেক বর্ণযুক্ত শব্দ অনেক বলিয়াই যে
রূপ হয়, তাহা নহে। ‘ভাণীয়া’ তীর্থসম-
নাশ্রিতানাং ইহার সহজ বাঙ্গালা করিতে
হইলে ‘যাহারা গঙ্গাতীরে (আশ্রয় লই-
য়াছে) বাস করিতেছে তাহাদের, ● এই
রূপ কিছু করিতে হইবে। তবেই দেখা
যাইতেছে, কোন ভাষায় অপেক্ষে হয়,
কোন ভাষায় অনেক কথা লাগে। কোন
বিশেষ ভাব, সংস্কৃত ভাষায় যেমন অতি
অপেক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে,
এমন পৃথিবীর আর কোন ভাষাতেই
হইতে পারে না। আবার ভাগবত প্র-
ভৃতি কর্তৃক গুলি গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃতের

● “মহাভারত বানিধের” এই রূপ বলিলেই যে
মন্দ বাঙ্গালা হইবে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না।

সংস্কৃত। বাছা বুনাং; জলবায় গলিবার
ছিত্রও নাই, সময়ে সময়ে মন্থতা বুদ্ধিও
তাঁহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে
পারে না।

যেমন আরবী বা পারস্যী অক্ষরের
ও অক্ষর সমষ্টির স্বপ্নস্থান সমাবেশন গুণ
বটে দোণ্ড বটে, সেই রূপ সংস্কৃত ভা-
ষার এই জমাট ভাব গুণও বটে, (সংস্কৃ-
তজ্জ মার্জনা করিবেন!) দোণ্ড বটে।
ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য মনোভাব প্রকাশ
করা;—যাহাতে মনোভাবটি অতি সুন্দর-
রূপে প্রকাশ পায়, তাই করিতে হইবে।
রহৎ আয়ত বাটী প্রস্তুত করাইতে হই-
লে, অধিক সময় লাগে, অধিক শ্রম লাগে,
অধিক ব্যয় হয়; তাই বলিয়া যাহাতে
যাহাদের হানি করে, এমন বাটী নির্মাণ
করান কর্তব্য নয়; স্বাস্থ্যরক্ষা জন্মাই ত
বাটী, তা যদি না হইল, তবে বাটী প্র-
স্তুত করণের প্রয়োজন কি? সেই রূপ
ভাষাতেও। অল্প অক্ষরে প্রবেশিকা বলি-
তে পারিলেই ভাষার গৌরব নহে। তাহা
হইলে মুক্তবোধ স্তরের ভাষার ন্যায়
আর ভাষা নাই। কিন্তু ‘বুড়ি’ আবার
সেই বুড়ির ব্যাখ্যা নাহিলে স্তর বোঝা
যায় না, তবে উপায় কি? মুক্তবোধের
ন্যায় সাঙ্কেতিক ভাষায় কোন উপকার
নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু
সাঙ্কেতিক ভাষা ত ভাষা নহে; সাঙ্কেতি
ভাষা যখন সুকলে বুদ্ধিবে, তখন আর
কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু যত
আকৃশিত করিবেন, ততই সুশিলা হইবে,
এমন কথনই হইতে পারে না। লোকে
যাহাতে সুবিধা না বোঝে, তাহা চলিবে
কেন? যে ভাষা চলিল না, তাহা কেহই

ধুস্কিতে পারিবে না। সকল বিষয়েরই
সীমা আছে, প্রথমে যেটি গুণ থাকে,
সেটি বাড়িতে বাড়িতে দোষ হইয়া উঠে;
ইহাকেই বলে ‘গুণের অতিশয়ো দো-
ষের উৎপত্তি’। সংস্কৃতের গুণ হতেই
দোষ হয়। তাহাতেই নানা বিধ প্রাকৃত
ভাষার প্রাচুর্য্য হয়। প্রাকৃত ভাষার
স্বষ্টি হয় বা জন্ম হয়, এমন কথা আমরা
বলি না। অতি গুরু পাক পলায় উপস্থি-
তির কিছু দিন খাইলেই শাদা ভাত খা-
ইবার ইচ্ছা হয়, অনেকে খাইয়াও পাঁ-
কেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পলায়ের পরি-
পাক কষ্টকর বলিয়া, ক্রমে একটি একটি
করিয়া মশলা বাদ দিয়া সকলে শাদা
ভাত খাইতে শিখা করিয়া উঠে, ও এই
রূপে শাদা ভাতের স্বষ্টি, এমন কথা
আমরা বলি না। সংস্কৃত ভাষা দুর্জহ,
দুর্জহা, প্রভৃতি; কচিন বলিয়া ক্রমে
সম্প্রসারণ বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা
প্রাকৃতের স্বষ্টি হইয়াছে, এমন কথা
আমরা বলি না। সংস্কৃতের জটিলতা,
ঘনসমাবেশন, আকৃশিতকৃতভাব, সমাস
বহুলতা প্রভৃতি জন্ম প্রাকৃতের প্রা-
চুর্য্য হইয়াছিল, এইমাত্র বলিতে পারি।

এই আকৃশণ প্রসারণ ক্রিয়া জীবন্ত
ভাষা মাজেই চিরকাল চলিতে থাকে।
এই ছই ক্রিয়াই ইহার জীবনী শক্তি।
বাঙ্গালা ভাষা কখন কহিতে কহিতে সং-
স্কৃতের ন্যায় নীরেট হইতে থাকে, কখন
বা আবার একটি বীধনের পর আর একটি
বীধন খুলিয়া গিয়া ভাষা বিস্তৃত ও
শিথিলতা লাভ করে, কখন সংস্কৃত
ভিসারিণী হয়, কখন সংস্কৃতাপায়িনী
হয়। ভাগবত বিশাণের ভাষাকে কতক

দূর সংস্কৃতভাষাসারিণী করিয়াছিল।
ভাগবত বিস্তারের নানা কল মধ্যে কথ-
কতা একটি। এ কথা বোধ হয়, সকলেই
স্বীকার করিবেন, স্তত্রাৎ অনর্থক প্রমাণ
প্রদানের আবশ্যক নাই। কথকতা
সংস্কৃতন্যায়ের মহাশয় যাহা লিখিয়া-
ছেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত
করিতেছি।

“কথকদিগের হইতেও বাঙ্গালা ভাষার
অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুঁথি-
বোনের সংস্কৃত শব্দ সকল চলিত ভাষায়
যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ সকল
ব্যাখ্যা গীত ঘর সহস্রত হওয়ায় সাধারণ
গের মনে অঙ্কিত হইয়া যায়, স্তত্রাৎ
সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার স-
ধেই ব্যবহৃত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন
করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না
থাকিলে কুড়িবাসের রামায়ণ ও
কাশীরামদাসের মহাভারত বোধ হয়
আমরা কখনই প্রাপ্ত হইতাম না।

ও এই কথা প্রতিপন্ন করণই ন্যায়রত্ন মহাশয়
যে সকল মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক এই
স্থলে উদ্ধৃত করা যেন।

“কুত্বাস বয়ঃ পিথিয়াছেন যে, আমি পুরাণ
পুথিয়া গ্রন্থ রচনা করিলাম এবং তিনি ভাষাকথিত
কথিয়া প্রথার পরিচয় দিয়াছেন।” তাঁহার “সমু-
দে পরিচয় বান বাহিরিক তাঁহার অসংস্কৃততা দি-
যবে এই এক প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহার
গ্রন্থের সহিত বাল্মীকির রচিত বুল রামায়ণের অনেক
অনেক। অতঃপ্তি যে, বাল্মীকিকে অবলম্বন
না করিয়া অন্য কোন রামায়ণ অবলম্বন করি-
য়াছিলেন তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু তিনি কোয়
কোয় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছেন; বাল্মীকির
মত গথিতে আরও কথায়, বঙ্গিরা কথি যে স্থলে
বঙ্গ প্রভিয়া করিয়াছেন, সেট স্থলেই তিনি বাল্মী-
কির ভব কিছুমাত্র না দিখিয়া অন্যত্র দিখিয়াছেন।
তদ্বা দিখিয়া তাঁহার সমস্ত ভাষাকতা দিযবে কোন

কথকতার ব্যবসায় ও আমাদের দেশে
স্থতন নহে—কথিকগণের পুর্বেও উহার
প্রাচুর্য্য ভাব ছিল।

সংখ্যই থাকে না। জামা রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে
এই বিষয়টি বর্ণিত পাওয়া যায়।
“এতঃ। কুত্বাস, বাল্মীকির মত বদ্বি কুয়া
কুয়া দিখিয়াছেন;—

“রাম না জগিতে যাতি হাচার বহসর।
অন্যতঃ বাল্মীকি রচিল কবির।” ইত্যাদি।

“শিখ বাল্মীকি, যদ্বিতঃ গ্রন্থের কোন স্থলে এমন
কথা লেখেন নাই; বরা বুল রামায়ণে এক প্রকার
লক্ষ্যাকরেই দিখিত আছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্য
প্রাপ্তির পর কথি এই গ্রন্থ রচনা করেন।” “কবির
সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অবিকার থাকিলে বোধ হয়,
এরূপ ভ্রম হইত না।”

যতঃ। লক্ষ্যাকাং রাবণ বধ প্রসঙ্গে কুত্বাস
দিখিয়াছেন, ত্রয়া রাবণকে অনান্য বয় দিয়া শেষে
কহিতেছেন।
“অন্য অজ্ঞ না হইবে একটি শরীরে।

ত্বেয়ার যে মুখ্য অজ্ঞ রবে তঃ যথঃ।
মুখম করেছি আমি সেই ত্রয়বাণ।
হর ধর শমনান রাগে তঃ ঠাই।
বর যেন অজ্ঞ পেরে তঃ শমনান।
বৃন্দান রাগে যেন বাল্মীকিতে কম।” ইত্যাদি।
ঐ প্রসঙ্গেই আর।;—

পুরাণ অনেক মত কে পারে করিতে।
হিত্যরিয়া কহিলেন বাল্মীকির মতে।
হিত্যরি কহিলেন সীতার মতে।
রাবণের মৃত্যুনাং রাবণের মতে।

ইত্যাদি উক্তির পূর বিভাগের উপলক্ষে ছন্দনা
পুর্বেক বঙ্গবাসীর দিক হইতে হইতাম কর্তৃক
মৃত্যুর অন্তমন ও সেই শত্রুতারা রাবণ বধ বর্ণন
করিয়াছেন, কিন্তু বুল রামায়ণে একবার কিছুমাত্র
উল্লেখ নাই।

“ততঃ। হস্তায় বানর সৈন্যের সম্ভাষণে সপা-
দনার হিত্যরি বর্ণিত হইতে হইতাম হস্তায়। বৈধ
আনন্দ করাইবার প্রভাবে কুত্বাসই দিখিয়াছেন;—
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
হিত্যরি রচিত হইবে শুধু রামায়ণে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অতঃ রামায়ণের কোন
স্থলে এই বৈধ আনন্দের বিন্দু বিদ্যের উল্লেখ
নাই। এদিকে বাল্মীকি রামায়ণের লক্ষ্যাকাং ৭৪৩

পূর্বকালীন লোকেরা কথকদিগের বি-
লম্বণ সমাদর ও গৌরব করিতেন।”
সুতরাং তাঁহাদের কর্তৃক ভাষার পরিবর্তন

ওমর্মে ইহার সম্ভব বর্ণন আছে।” ইত্যাদি।
“অতঃ বোধ হয়, কথকের মুখে রামায়ণ প্রথ
করিয়া কথি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিলেন।”
“পুরাণ শব্দিয়া গীত রচিত কৌতুক।” তাঁহার
নিম্নের এই লেখাচারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।
কাশীরামের মহাভারত-সুখকে প্রমাণ লেখক পিথি-
য়াছেন, “মহাভারত বুল সংস্কৃতের অবিকল অনু-
বাদ নহে, অনেক স্থানেই তিনি (কাশীরাম) ভূরি
ভূরি বিঘরের পরিবর্তন ও ভূরি বিঘরের নুতন
কোম করিয়াছেন।” “কবির কোন কোন উপা-
খ্যায় একেবারে নুতন সজ্জিতও হইয়াছে। বন-
পর্দার মধ্যে সৌরংগসাধাণায়া নামে যে একটি
বৃক্ষ ইত্যাদি নাম আছে, তাহা বুল সংস্কৃতে একে-
বারে নাই।” “অনুমান হইবে, ঐ উপাখ্যায় কোন
শৌর্য্যবিক বুল হইতেই হইবে, বা অন্য রূপেই
হইক-পুঁথি মধ্যে প্রণিত ছিল, কথি তাহাকেই
ছোট পুঁথি করিয়া নিজ গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়া-
ছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হয়,
কুত্বাসের ন্যায় কাশীরাম দাসও কথকের মুখে
মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন।
যেহেতু তিনি নিজেই কথক হইলে পিথিয়াছেন।
প্রমাণ কহি আমি রচিয়া পায়।
অহেলে শুন তাহা সংস্কৃত সাংসার।

যাহা হউক কাশীরামের সংস্কৃত জ্ঞান না থাকি-
লেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতত্বের রচনার ন্যায় বোধ
হয় না। এ রচনাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দসকল প্রযুক্ত
আছে যে, তাহা সংস্কৃতভাষা লোকের লেখনী হইতে
নিগত হওয়া সহজ কথা নহে।” আমরা যদি, দেশে
কথকতার প্রচলন না থাকিলে, এরূপ হওয়া সম্ভবই
হইত না। গ্রন্থকারও তাহাই বলিয়াছেন।

আমরা প্রমাণ হইতে অনেক বানি উদ্ধৃত
করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে প্রমাণ করিলাম। সকলে
বেশিবে, ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গভাষা সম্বন্ধে ধর্ম্মা-
বায়র বিশিষ্ট প্রমাণ দিখিয়াছেন বলিয়াই প্রমাণ-
ভাজন নহেন। তিনি কোন কোন স্থলে, একটি বিষয়
কইবার, ঘোর ঘোর ভেদ ওয় করিয়া, উল্টোইয়া
পাকীয়াই, তাহার বিচার করিয়াছেন। একটি
কবার জ্ঞান যদি চারি বানি পুরাণ পাঠ করিতে

সহজই ঘটিতে পারে। কিন্তু পুরাণ হ-
ইতে সংস্কৃত শব্দ কথকতায় ব্যবহার
করাতেই যে ভাষার পরিবর্তন হইয়া-
ছিল, তাহা নহে; অনেক গুলি কথ-
কের মধ্যে উহা ভাষা পরিবর্তনের একটি
কারণ বটে।

কথকতার চারিটি প্রধান অঙ্গ। সং-
স্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী
ও পাদ। এই চারিভাগের প্রধান উ-
দেশ্য বতন্ত্র। যুল গ্রন্থের বিশেষ তাৎ-
পর্য্য বোধ করা হইতে পারিলেই গ্রন্থের
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এই ভাগের ভাষা
কাজে কাজেই কিছু শিথিল-বন্ধনা হ-
ইবে। সংস্কৃত হইতে সংস্কৃত ব্যাখ্যা-
তেই অতি সামান্য শব্দের প্রসারণ করা
হয়; ‘গদ্য’ কি না ‘গমনংগদ্য’ ই-
ত্যাদি। এই প্রথার প্রচারের জন্যই
বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত ক্রিয়া ‘ক-
রিয়া’ ও ‘হইয়া’ যোগে-সামিত হইতে-
ছিল। পড়িতে ‘শিয়ালবন্ধি’ বলিতে
লজ্জা বোধ করিতেন, ‘গমন করিয়াছিল’
বলিতেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষাকে
‘ব্যাখ্যার ব্যাখ্যার’ ভাষা মনে করি-
তেন। ভাষাকে প্রসারিত করিয়াছি-
লেন। স্তত্রাৎ কথকদিগের ব্যাখ্যায়
ভাষা শিথিলবন্ধনা হইতেছিল। দ্বিতীয়
ভাগ বর্ণনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন,
ইহার প্রকরণও বিভিন্ন, বর্ণনার উদ্দেশ্য

হুত, তাহাও করিয়াছেন; তিনি পরিশেষে কখনও
কাতর নহেন। এরূপ গবেষণে ক্রিয়ার প্রশংসা
সকলকেই করিতে হয়। এরূপ অধ্যয়নায় পরিশ্রম
সুতরাং পালন, সার্থক হইলে আমাদের, এই মত
বিধির পরিচয়ও সার্থক হইবে।

রসোদ্বীপন। কথায় বলে 'রসের সার চুটকি' (Brevity is the soul of wit) সকল সময় না হউক, অনেক সময়ে বর্ণনা কথকেরা ভাষার রচনার বর্ণনা সময়ে এই প্রকার চুটকি প্রকার অঙ্গগম্বন করেন। ছেবলা ভাষা ব্যবহার করেন, এমন কথা বলিতেছি না; তাঁহাদের বর্ণনার ভাষার গাঁথনি চুটকি রীতির। বড় টেটে ছোট বাড়ী গাঁথা যায়; সেই রূপ সংস্কৃত শব্দে চুটকি ভাষা হয়। 'ইহার বাক্য (Sentence)' গুলি ক্ষুদ্রাবয়বের হয়, অনেক ক্রিয়াপদ অল্পকৃত থাকে, অনেক ক্রিয়াবিশেষণও অল্পকৃত থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের পর দীর্ঘক্ষেদ থাকে, কখন কখন কোন বিশেষ কথায় প্রোতারণ (ব্যাপ্তিকের) মনঃসংযোগ করান জন্য পুনরুক্তি থাকে, আর কথকদের স্থানে এই ভাষার সহায়কারী নানা ভঙ্গী থাকে। এই ভাষা ক্ষুদ্রবয়বের হয়, পাটে পাটে বসিত থাকে। ইহা উল্লীপনার ভাষা। এই ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় অতি-দীর্ঘপদ-বাক্য বিশিষ্ট নহে, অথচ আধুনিক স্থানলোকদের ভাষার নত অত্যন্ত এলো নহে; ইহাতে ছোট ছোট জমাট বাক্যের গাঁথনি থাকে। জমাট পদগুলি পৃথক করিয়া লইলে সংস্কৃত পদ বলিয়া, বেশ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত গাঁথনি ভাগবত্তের ন্যায় জটিল রীতি যুক্ত নহে। ভাগবত্তের দুইটি, সহজ শ্লোক লইয়া আমরা আবাদের কথার উদাহরণ প্রদান করিতেছিঃ—

“এতস্যাঃ সান্নি সন্ধ্যায়ঃ সগবান্

ভূতভাবনঃ।

পরিতো ভূত পশ্চিৎ বৃষোটিত ভূতহই ॥

শ্রীশান চক্রানিল ধূলি ধুমুবির্কীর্ণ বিদ্যোদয়
জটাকলাপঃ।

ভদ্রাবগচ্ছা মল্লকানু দেহো দেব স্ত্রিভি
পশ্যতি দমরং স্তে ॥’

প্রথম শ্লোকটি তীক্ষ্ণ করিয়া শেষ ভাগের বাধা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় করিতে গইলে এইরূপ করিতে হইবে।—
‘ভূতের রাজা মহাদেবের চারিদিকে ভূতেরা বেড়িয়া থাকে আর তিনি বাঁড়ে চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়ান আর শ্রীশানে যে ঘূর্ণী বাতাস হয় তাহাতে ধূলা উড়িয়া তাঁহার জটাতে লাগাতে তাঁর জটী ধূগার মত রঙের, কিন্তু তবু যেন জ্বলছে, আর সেই সকল জটী চারিদিকে ছড়ান; মহাদেবের শরীর খাতি ক্রপারমত শাদা তাতে ছাই মাখান, আর তিনি তিনটি চক্ষুতে দেখেন’ ইত্যাদি।

এইরূপ করিয়া ভাষিয়া না বলিলে বা লিখিলে অনেকের বোধগম্য হয় না; ইহাকেই বাধ্যতার ভাষা, সংস্কৃতাপমাণ্যরী ভাষা বলিবেছিলাম। বাঙ্গালার সাধারণ লোক ও সমস্ত স্ত্রীলোক নিত্যমুখ্য থাকায় বাঙ্গালা ভাষা কাজে কাজেই এই রূপ শিথিলবন্ধনা হইতেছিল। নানা কারণে ভাষাকে আবার কিছু জমাট করিতেছে। কথকদের বর্ণনার ভাষা সেই নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ; ইহাতে ভাষাকে প্রকৌশল মেয়ে বুঝান ভাষা আর সংস্কৃত অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষার মাঝামাঝি করিয়াছে। এই মাঝামাঝি ভাষায় এই সাক্ষী শ্লোকের এই রূপ অনুবাদ হইতে পারে।

‘ভূতপতি ভূতগণে বেষ্টিত’ হইয়া
রথবাহনে জমণ করেন, শ্রীশান-চক্রানিল-

ভাঙিত-ধূলিতে তাঁহার জটাকলাপ ধূ-
ত্রবর্ণ, অথচ ছাতিমান এবং বিক্ষিপ্ত,
উদীয় অমল রজত দেহে ভদ্রাস্বাদিত;
তিনি ত্রিলোচন’ ইত্যাদি।

এই ভাষাকেই সংস্কৃত ভাষাসারিণী বলিতেছিলাম; কথকদের বর্ণনা চাড়াবোঁড়া ভাষাকে অনেকটা সংস্কৃত ভাষাসারিণী করিয়াছে।

তৃতীয়ত, কথকদের পদাবলী। পদাবলীর সার শব্দালঙ্কার ও ছন্দ, লালিত্য ও মধুরতা। জয়দেব কবির গানসকল এই পদাবলী লক্ষণাক্রান্ত। পদাবলী ভাষা শ্রবণ মনোহর; কুট সংস্কৃত তাপেক্ষা সহজ হয়; ভাব গূঢ় নহে, প্রায় রূপ বর্ণন প্রভৃতিতেই পর্যাপ্ত থাকে এবং নানা বিধ ছন্দো রীতি হইয়া থাকে।

সংস্কৃত পদাবলী রীতির অল্পকরণ বাঙ্গালা ভাষায় অনেক আছে; প্রাচীন সময় হইতে এখন পর্যন্ত ইহার অল্পকরণ চলিতেছে। পূর্বতন ঐশ্বর্যবাদিগণের নামসম্বলিত, পদরচন, পদাবলীর রীতি পদাবলীর ভাষা, পদাবলীর ছন্দ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথা কি? কাশীদাসে, কৃত্তিবাসে, ভারত, রামপ্রসাদে, শ্রীশঙ্করে ও দেওয়ান মহাশয়ের গানে, কবিগোলাদিগের ঠাকুরকি বিষয়, স্বামীস্বামীর, রাধামোহন সেন ও ঐশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায়ের ও আশুতোষ দেবের গানে, বাঙ্গালাভাষার যেখানে যেখানে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্রঘুদনের ব্রজাঙ্গনা এই ভাষা কণ্ঠা কহেন, আবার আধুনিকরা ইহা যব অল্পকরণী কবিরণ অনেক সময় এই ভাষার বঙ্গ সমাজে পরিচিত হইতে-

ছেন। ইহা ভক্তির ভাষা নহে, খাটি ভক্তির ভাষা নহে।

‘সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা
তুমি।

তোমার কর্ণ তুমি কর না লোকে বলে
করি আমি ॥’

ইহা যদি ভক্তির ভাষা হয়; তাহা হইলে,

“জুটুটি ভঙ্গ, সন্নিধি সঙ্গে,
বামা কঁত রঙ্গ নেচে যায়;—”

কখন সেই ভক্তির ভাষা বলা যাইতে পারে না। যে ভক্তি,

“কি স্বদেশে কি বিদেশে
যথায় তথায় থাকি,

তোমার রচনা মধ্যে তোমায় হেরিয়া
ডাকি ॥”

বলিয়া রিদেশে অর্ঘ্য পোতে চিত্ত-
প্রসাদ লাভ করিয়াছিল, সেই ভক্তিই

যে আবার,

“জগত কারণ, জগত ধারণ, -জগত
চারণ,

জগত তারণ, কেবল তুমি,
জগতের পিতা, জগতের পাতা,

জগত বিধাতা, এই বস মাতা,
তবকীড়া তুমি ॥”

ইত্যাদি স্তোকে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে, তাহা বোধ হয় না।

পদাবলীর ভাষা চিক প্রেমের ভাষাও নহে যে কমলিনী কৃষ্ণ প্রেমের পাণ-
লিনী, কৃষ্ণ ধনের কাঞ্চালিনী, যে কৈতে
কৈতে কৃষ্ণ কথা, আলু খালু বর্ণনাত,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অচেতন হয়,
যেকি আবার সেই প্রেমের, তাহার হৃদি
পদ্মাসন, করে অঘোষণ, পীত বসনের

দয়শন না পাইয়া, নিম্নাকর্মণকে বিচ্ছেদ-
হতাশন জালিয়া, নিয়াছে বলিয়া অসু-
যোগ করে? তাহাতেই বলি সংস্কৃত
পদাবলীর অসুকারের ভাষাখাটি ভক্তির
ভাষা নহে, ঠিক প্রেমের ভাষা নহে।
এই ভাষার অনেক গুণ আছে। কিন্তু
গুণ অপেক্ষা দোষ অধিক। শব্দ চাতুৰ্য্যে
শব্দ লালিতা শব্দ মাধুর্য্যে রচকের বি-
শেষ লক্ষ্য থাকে বলিয়া এই ভাষায়
অনেক দোষের সংঘটন হয়। শব্দ ঘোর
ঘটা ঘটিত আধুনিকা সংস্কৃত ইহাতে
বিকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালির সকল বিখ-
্যেই পুঞ্জি কথা, কার্য্যে কথা অল্প
কথার দাস, সাহিত্যেও শব্দালঙ্কারের
ক্রীত দাস। শব্দালঙ্কারে মনোযোগী
হইলে, অর্থ সম্ভতির অকলান হয়, এই
স্থূল কথা আমরা যে দিন বুঝিতে পা-
রিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পা-
রিব, সেই দিন বাঙ্গালা ভাষা যথার্থ
স্বাধীন হইবে। শব্দালঙ্কার প্রিয়তা যে
কেবল কথকদিগের দ্বারা পদাবলী পা-

ঠেই বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা
নহে। কতকগুলি কারণের মধ্যে ইহাও
একটি কারণ। কথকতার নীতি ভাগে
হয়, বর্ণনার ভাষা, নয়-পদাবলীর ভাষা,
নয় প্রেম ভক্তির ভাষা থাকে, সুতরাং
এই ভাগের পৃথক সমালোচন আবশ্যক
নাই।

হুইতি বর্ণ ধর্ম্ম বিপ্লবের মধ্যে আমরা বলি-
য়াছি যে ভক্তি প্রধান চরিত্রশাস্ত্রের প্রচার
হওয়ায় ভাষা পণ্ডিত পরিত্যক্ত সহজ
পথে চলিতে থাকে। ভাগবতের রসবি-
স্তারেও ভাষাকে সহজ ও কোমল করি-
য়াছিল। ভাগবত প্রচার জন্ম কথকতার
বৃদ্ধি হয়। কথকতার চারি ভাগ। প্রথম
ব্যাখ্যাভাগে, ভাষাকে শিথিল করে।
বর্ণনাভাগে, ভাষাকে ক্ষুদ্রাবয়বযুক্ত অণুচ
জমাট করে। পদাবলী রীতির অনুসরণে
ভাষায় শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য হয়। শেষ-
ভাগ গান কোশলে যে বিশেষ কিছু অন্য
পরিবর্তন করিয়াছিল, বোধ হয় না।

মৃতন গ্রন্থের সমালোচনা।

আমরা প্রথমতঃ প্রাপ্ত পুস্তকাদির
সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত
হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আ-
মাদিগের বিবেচনায় এক্ষণে সংক্ষিপ্ত
সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার
নাই। এই রূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়
গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে
পারে না। তদ্বারা গ্রন্থকারের প্রশংসা

বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ
হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা
নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কে-
বল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্র-
বৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নাই। গ্রন্থ পাঠ ক-
রিয়া পাঠক যে মুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ
করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা
তাহার রসিক করা; গ্রন্থকার যেখানে

জান্স হইয়াছেন, সেখানে জম সংশো-
ধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট
হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা
সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এই
গুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উ-
দ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না।
সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমা-
লোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা
আছে, অবকাশসুস্থারে গ্রন্থ বিশেষের
বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।
সাধ্যসুস্থারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হই-
তেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল
গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার
অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ
করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ
বলি। প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ
যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে গ্রন্থ গুলি
উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না
করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য
প্রেরণ আমাদিগের কর্তব্য। তদপেক্ষা
একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা
তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

১। প্রবচনবিজ্ঞ। ত্রিবিম্বাইচাঁদ শীল
প্রণীত। নিমাই বাবু অনেক নাটক
লিখিয়াছেন, এই খানি সর্বোৎকৃষ্ট।

২। নটনন্দিনী। ত্রিহরিশঙ্কর বন্দ্যো-
পাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা মৃতন
সংস্কৃত বৃত্ত। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থ-
কার লিখিয়াছেন যে, “সদ্বৃষ্টিমান বলি-
য়াই হাঙ্গাম্পদের ভয় করিলাম না।
এইটি আমার প্রথম চেষ্টা।” প্রকৃত
আমরাও সম্ভবতঃ কিছু বলিতে পারি-
লাম না। হরিশ বাবুর উদ্যম প্রশংস-

নীয়, এবং তাঁহার নায় ব্যক্তি বাঙ্গালা
রচনায় অসুস্থাপন প্রকাশ করেন, ইহা
বাঞ্ছনীয়।

৩। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। ত্রিভা-
রকনোথ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রণীত। কলি-
কাতা, বাঙ্গালী বৃত্ত।

বিষয়টি নিতান্ত আদরনীয়, এবং তারক
নাথ বাবুর তৎপ্রতি অসুস্থাপন দেখিয়া
আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

৪। মেঘদূতম্। ত্রিপ্রাণনাথ পণ্ডি-
তেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতক। কলি-
কাতা। বাঙ্গালী বৃত্ত।

মেঘদূতের এই সংস্করণ দেখিয়া আ-
মরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহা
মজিনাথের টীকা, নানা প্রকার পাঠান্তর,
এবং সমৃদ্ধ বাক্য সংকলন, এবং পরি-
শেষে, বাঙ্গালা পদ্যে একটি সুন্দর অনুবা-
দের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। সকল
দিক দেখিতে গেলে, বলা যাইতে পারে,
যে মেঘদূতের এক্ষণে সংস্করণ দ্রুত, এবং
অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্যের এই রূপ সংস্ক-
রণ প্রচারিত হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয়
হয়। প্রাণনাথ বাবু, কালিদাসের অ-
নুদয় কাল নিরুপণ সময়ে ত্রিযুক্ত

তারানাথ তর্ক বাচস্পতির মতাত্তরিত
হইয়াছেন। তৎপ্রতিবাদার্থ্য আমাদে-
র কিছু বক্তব্য আছে, অবকাশ হয়, সময়া-
ন্তরে বলিব। বাঙ্গালা অনুবাদটি আর
একটু সরল এবং সাধারণের বোধন্যম
হইলে ভাল হইত।

৫। প্রথমশিক্ষা বীজগণিত। ত্রিরা-
জসুখ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল,
সম্মিলিত। ইংরাজি হইতে মৃতন
কটি শাস্ত্র বাঙ্গালায় সম্মিলিত করা কত

বড় কঠিন কাজ, তাহা যাহারা এখনি বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহারা ই জানেন। বীজগণিত সঙ্কলন, বোধ হয়, অন্যান্য বিষয়াপেক্ষাও কঠিন। এই চক্রহ-বাংপারে রাজকৃষ্ণ বাবু যে রূপ রতকার্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এমন বিষয়ে এতাদেশ কার্য সিদ্ধি রাজকৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধি অথবর্তার বিশেষ পরিচয়। রাজকৃষ্ণ বাবু মুকবি, উত্তম আখ্যায়িকার প্রণেতা, সুযোগ্য দার্শনিক, রাজব্যবস্থার অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত—এ সকল বিষয়ের পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা গণিত শাস্ত্রেও তাহার যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এ রূপ সর্বব্যাপিনী বুদ্ধি অতি বিরল। এই গ্রন্থ খানি বিদ্যালয়ে বাবহার হইবার বিশেষ উপযোগী।

৬। ইউরোপে তিন বৎসর। এই নামে যে এক খানি মনোরম ইংরাজি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা করি, এজন্য এখানে আর কিছু বলিলাম না।

৭। মুখুয়ার মাংগেজিন। কলিকাতা রেজিদি কোং। দশ বৎসর পরে ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। ইহা যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা

এক্ষণে বলা বাহুল্য, কেননা উহা সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে। শম্ভু বাবু স্বয়ং এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক; এবং যে সকল ব্যক্তি এ বিষয়ে তাহার সহকারী, তাহারা বাঙ্গালা দেশের চড়া। আমরা ইহার চুই সংখ্যা পাঠ করিয়া কি পর্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষাও দ্বিতীয় সংখ্যা উৎকৃষ্ট। ক্রমে যে ইহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া, বঙ্গদেশের উন্নতির একটি বিশেষ কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮। বেঙ্কলামাংগেজিন। কলিকাতা, বিক্টোরিয়া প্রেস। উপরোক্ত পত্র খানি, এবং এ খানি উভয়ই ইংরাজি। শ্রীযুক্ত রেবেণ্ডের লালবেহারী দে কর্তৃক এখানি সম্পাদিত। ইহাও, অর্ন্ত উৎকৃষ্ট পত্র। মুখুয়ার পত্র মধ্যক্বে বাহা বলিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধেও তাহা বলা যাঁতে পারে। সম্পাদক স্বেলেখক এবং কৃতবিদ্য, এবং অন্যান্য লেখকেরাও তরুণ সকল গুণবিশিষ্ট। সিদ্ধাবগতঃ এবন্ধ গুলি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, Man defined এবং A Threat এই প্রকার এবন্ধ গুলি সমিবেশিত না করিলে পত্রের আরও গৌরব হইত।

৯। সঙ্কীতলহরী। কুমার মহেন্দ্রলাল খান প্রণীত। এখানি গীত পুস্তক। গীত গুলি ভাল নহে।

মূল্য প্রাপ্তি-সেপ্টেম্বর ১৮৭২।

মফস্বল।

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন দাস, ...	৩০/১০
মুখ্যপ্রসাদ ঠাকুর, ...	১৫/০০
মহম্মদসিংহ ...	১৫/০০
পশ্চান্ন মৌর্য, বাঁকীপুর ...	২০/০০
ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২০/০০
বারাণসী ...	২০/০০
মধুসূদন। মজুমদার, ...	৩০/১০
ছোটগুণ্ডাখরা ...	৩০/১০
মুদ্রনরনারায়ণ দাস, বালেশ্বর ...	৩০/১০
দিননাথ ধর, চট্টোয়া ...	৩০/১০
ভগবানচন্দ্র সেন, ঢাকা ...	৩০/১০
ইকলাচন্দ্র ঘোষ, ...	৩০/১০
মেদিনীপুর ...	৩০/১০
দ্বারিকানাথ আদিত্য ...	৩০/১০
মোহনচন্দ্র মিত্র, ...	৩০/১০
বহরমপুর ...	৩০/১০
হারাচন্দ্র মিত্র, ...	৩০/১০
রামধন মজুমদার, ...	২০/১০
ধনপতি সিংহ, ...	৩০/১০
গুরুচন্দ্র দাস, ...	৩০/১০
গণপতি ঘোষাল, ...	৩০/১০
হারাচন্দ্র রায়, ...	৩০/১০
মহেন্দ্রনাথ বসু, ...	৩০/১০
কৃষ্ণমোহন দাস, ...	৩০/১০
কাশীপুর ...	৩০/১০
প্রসন্নকুমার সিংহ, ঝাড়পাড়া ...	৩০/১০
প্রিয়নাথ ঘোষ, বীরভূম ...	৩০/১০
কুলদাসচন্দ্র দাস, মজিলপুর ...	৩০/১০
নন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩০/১০
আচিন্দ্র ...	৩০/১০
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩০/১০
হাটাল ...	৩০/১০
অক্ষয়কুমার সেন, বরিশাল ...	৩০/১০
ঈশানচন্দ্র দত্ত, উলুবেড়ীয়া ...	৩০/১০

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র দাস, ...	৩০/১০
হরিশোভন ভট্টাচার্য, ...	৩০/১০
বীরভূম ...	৩০/১০
গিরিধারী লাল, পানিঘর ...	৩০/১০
একলাচন্দ্র বসু, মজিলপুর ...	৩০/১০
রজনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা ...	৩০/১০
বিদ্যাপুর দাস, ...	৩০/১০
চন্দ্রকান্ত দাস, বরিশাল ...	৩০/১০
অভয়াচন্দ্র পাণ্ডে ...	৩০/১০
নিরালচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩০/১০
শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র নারায়ণ, ...	৩০/১০
কুচবেহার ...	৩০/১০
বাবু গিরিজাকান্ত লাহড়ী, ...	৩০/১০
মহম্মদসিংহ ...	৩০/১০
রাধাকিশোর বসাক, ...	৩০/১০
শিবগঞ্জ ...	৩০/১০
অচিন্ত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ...	৩০/১০
নদীয়া ...	৩০/১০
ইকলাচন্দ্র বসু, মুন্সীগঞ্জ ...	৩০/১০
শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল রেজাক, ...	৩০/১০
জলপাইগুড়ি ...	৩০/১০
মোহাম্মদ রফিক ...	৩০/১০
কলিকাতা আদালত ...	৩০/১০
পাইনা ...	৩০/১০
বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য, ...	৩০/১০
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুষ্টিয়া ...	৩০/১০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন ঘোষ, চট্টগ্রাম ...	৩০/১০
ভবানীপ্রসাদ নেউগী, ...	৩০/১০
রংপুর ...	৩০/১০
প্রসন্নকুমার সেন, ...	৩০/১০
দীকপাশা ...	৩০/১০
পরেসনাথ মুখোপাধ্যায়, ...	৩০/১০
ঢাকা ...	৩০/১০
কালীমোহন দাস, ...	৩০/১০
মোহাম্মদ ...	৩০/১০
বঙ্গবিহারী পাল, কুমারগঞ্জ ...	৩০/১০

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী বসু, বারাসত	১০
“ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	
“ ত্রিছত	৩৫
“ নকুচন্দ্র দ্বিধাস,	
“ অগোঁধ্যা	২১০
“ ঝারিকানাথ রায়, বরাকর	৩
“ মুখ্যানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	
“ হাজারি বাগ	১০
“ কুলদাচন্দ্র রায়, নবগ্রাম	৩
“ গোপীনাথ মিত্র, পুরী	৩১০
“ রঘুনাথ গোষাামী,	
“ শান্তিপুত্র	২
“ রাসবেহারী গোষাামী, এ	২১০
“ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	
“ দার্জিলিং	৩১০
“ শারদাপ্রসাদ কুমার	
“ গুদারী	১৫০
কলিকাতা।	
শ্রীযুক্ত বাবু নীননাথ গাঙ্গুলি, বাঙ্গালগোষ্ঠ	৩
“ যাদবচন্দ্র বার, ... এ	৩
“ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়,	
“ ধরমলা	৩
“ গোপালচন্দ্র মল্লিক,	
“ চিনাবাজার	৩
“ ঝারিকানাথ মিত্র,	
“ প্রেসিডেন্সী কলেজ	২
“ মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, হাটকোট	২

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	
“ কল্যাণাট	১
“ উমেশচন্দ্র লাহড়ি, চানাবাজার	৩
“ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী,	
“ ডাকঘর	১
“ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ	৩
“ পঞ্চানন দত্ত, বাঙ্গালপুর	৩
“ আইজাক পরমানন্দ রায়,	
“ টেজুরি	৩
“ বিজয় কিশোর বসু, বড়বাজার	৩
“ রাজেন্দ্র চন্দ্র, শাহাবাজার	৩
“ উপেন্দ্রনাথ বার চৌধুরী,	
“ বেহালা	৩
“ প্রসাদ দাস মল্লিক, বড়বাজার	৩
“ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী, গোবরভাঙ্গা	৩১০
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, কল্যাণাট	২
“ লালবেহারী দত্ত, পটোলভাঙ্গা	৩
“ কাশীনাথ মৈত্র, চক্কেডে	৩
“ রাসবেহারী রায় চৌধুরী,	
“ পাথুরেঘাটা	৩
“ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,	
“ মেজবাজার	৩
“ নন্দলাল হালদার, শ্যামপুকুর	৩
“ হেমলাল দত্ত, কলুটোলা	৩
“ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	
“ নুতনবাজার	৩
“ অনাথ বন্ধু গুহ—সিমলা	৩
“ শ্রীধর সেন, হাটখোলা	৩

আকাশে কত তারা আছে ?

এ যে নীল নৈশ নভোয় গুলে অসংখ্য
বিন্দু জ্বলিতেছে, ও গুলি কি ?
ও গুলি তারা। তারা কি ? প্রশ্ন জি-
জ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র যাজেই
তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য।
সব সূর্য্য ! সূর্য্যত্ব দেখিতে পাই বিশ্ব-
দাহকর, প্রচণ্ড ক্রিয়ার মালার আকার ;
তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারও মন্ড-
যোর শক্তি নাই ; কিন্তু তারা সব ত
বিন্দু মাত্র ; অধিকাংশ তারা ই নয়নগো-
চর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের

‘মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ? কোন গ্রন্থানের
উপর নির্ভর করিয়া বলিবে যে এ গুলি
সূর্য্য ? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছা-
ত্রের দেয় নহে। এবং বাঁহারা আধুনিক
ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ
মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই
অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে
আমরা কখনে ইহাই বলিতে পারি যে,
এ কথা অলজ্ঞা প্রশ্রয়ের দ্বারা নিশ্চিত
হইয়াছে। সেই প্রশ্ন কি, তাহা বিবৃত
করা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে।
বাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার স-
ন্যায় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের
পক্ষে সেই প্রশ্ন এখন বিবৃত করা
নিশ্চয়োজন ? বাঁহারা জ্যোতিষ সমগ্ৰ
অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে
সেই প্রশ্ন বোধগম্য করা অতি দুর্লভ
বাপূর্ণ। বিশেষ দুইটা কঠিন কথা
তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে ; প্রথমতঃ
কি প্রকারে নভঃ জ্যোতিষের দূরত-

পরিমিত হয় ; দ্বিতীয় আলোক পরী-
ক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং
কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং যে বিষয়ে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত
হইলাম না। অদ্য যদিহান পাঠকগণের
এতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁ-
হারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বি-
শ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই
আলোকবিন্দু গুলিন সকলই সৌর প্র-
কৃত। কেবল আভাসিক দূরত বশতঃ
আলোক বিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে ?
এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা ই অদ্য
আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার
চন্দ্রবিযুক্তা নিশিতে নির্মল নিরবুদ আ-
কাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি-
তে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন
আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অ-
সংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য !
বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখি-
তে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা
হয় না ?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধা-
বসায়াক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত
হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ
দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই যে তারা গুলিন দেখি-
তে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য নহে
—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে
তারা সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা
উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য হয়।
যাহা প্রবীণবন্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহার

অপেক্ষা, বাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ বাতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐ রূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬ টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হেব্বোর্টের মতে তাহা ৪১৪৬ টি মাত্র। গেলানির আকাশ মণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুস্পর্শে তারার যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার :

১ম শ্রেণী	...	২০
২য় শ্রেণী	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	২০০
৪ম শ্রেণী	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	৩২০০

৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসময়ে আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষু দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিযুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে বাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়। কিন্তু এদেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভব নহে।

এক কালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ বা-

তীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরাহ্ন অথন্তলে থাকে। সূর্য্যাস্ত মধ্যাহ্ন চক্ষু এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষুর কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য বীক্ষার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই হইবে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিচ্ছি, দূরবীক্ষণ সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলানী এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিম্নে রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে বেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে বেরূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারা ই বা কত তারা সহস্রের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারও সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্যে প্ররক্ত হইলেন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দূরবীক্ষণসমীপাংত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এই রূপে ৩৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চক্ষু কর্তৃক বাণ্ড হয়, ত-
ক্রপ আট শত গাণনিক যথোমাত্র তিন

এই ৩৩০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তারার ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। জুব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, এই রূপে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর জন হর্শেল ঐ রূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হইলেন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সমৃদ্ধি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারার তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন। তাহা-
বীষ সপ্তম শ্রেণীর ১০০০০ তারা; অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থল খেত রেখা নীরে ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে মন্দাকিনী বলি। ঐ মন্দাকিনী কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরত্ব বশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ের মন্দাকিনী খেতবর্গ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর উইলিয়াম হর্শেল গণনা করিয়াছেন যে, কেবল মন্দাকিনী মধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

জুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ মণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

মস্তুর শার্কোয়ার্ক বলেন, “সর উইলিয়াম হর্শেলের আকাশ সন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, সেনেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকা দৃষ্টি-
কাত্তে যে রূপ গড় পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।”

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সমৃদ্ধি লক্ষের কথা মূর্খে বোধ, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যার শেষ হইলনা। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গণনাভাষ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুষ্কাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অভ্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহু সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্র পুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষু বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গণনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটিমাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় মন্দাকিনী এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূরদৃষ্ট তারা পুঞ্জময়ী নীহারিকা যতদূর বর্তমান নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন

বালি, বনে যেমন পাভা, মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাত্তে নক্ষত্র রাশি তেমন অসংখ্য এবং বনবিন্যস্ত। এই মুকল নীহারিকাসংগত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে সাত কোটি পঁত্তর লক্ষ স্বেথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যাধিক হয় না। এই আশ্চর্য্য বাপার ভাবিতে ভাবিতে মন্থ্যাবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হয়। চিত্ত বিষ্ময় বিবল হয়। সন্নকশমিনী মন্থ্যাবুদ্ধিরও গমনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য! আনরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা বহুদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ রূহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এক সূর্য্যাপেক্ষাও রূহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, প্রজাপতি নামক নক্ষত্র (Sirius) এই সূর্য্যের

২৬৬৮ গুণ রূহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোনও নক্ষত্র যে এক সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনারদ্বারা স্থির হইয়াছে। এই রূপ ছোট বড় মহা ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদের গের সৌর-জগতের মধ্যবর্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি এই সকল সূর্য্যগাঠে গ্রহ উপগ্রহাদি জমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে! এ আশ্চর্য্য কথা কে বুঝিতে পারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কথা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সমাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমান, —বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মন্থ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মন্থ্যবাদ লইয়া গর্গ করিবে?

বঙ্গালা ভাষা ।

তৃতীয় সংখ্যা ।

একগুণে রাজ্য বিস্তার। সেন বংশ আগমনবার্তা ভাল জানি না। তারপর মুসলমানবিজয়। মুসলমান বিজয়ে ভাষার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে কি না? এ সকল বিষয়ে বঙ্গালাভাষা বিষয়ক গ্রন্থ

স্তাবে বিশেষ কিছু সমালোচন নাই। গ্রন্থকারের একগুণ সমালোচন উদ্দেশ্য নহে। ছন্দোযুক্তি আলোচনায় তিনি এ বিষয়ের অসঙ্গতঃ যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

“কেহ কেহ কহেন, বঙ্গালাব বর্তমান পয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অরূপ নহে, উহা পারসীর বয়েৎ নামক ছন্দের অরূপ। একটি বয়েৎ উদ্ধৃত হইল—
করীমা ববখায় বরহালমা।
কে হান্তেয় আসিরে কয়দে হাওয়া ॥

[পান্দনামা।]

দেখ, এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরের পরিমিত; ইহার পূর্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর বতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর; পূর্বার্দ্ধের যতির পর ঐটি অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির পর ষটটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধ হয় না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিৎসাম্য সাদৃশ্য আছে বটে—কিন্তু তথা প্রদর্শনই এক বিজ্ঞাতীয় ভাষার ছন্দকে বঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতে যাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার মূল বলা সম্ভব হয়। সত্যম নট করিয়া যার তার অধমণ হওয়া অপেক্ষা, যাচার নিকট সত্যম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহার চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল। এই সমালোচন সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

১। এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষর, মিত নহে। ইহার প্রত্যেকাক্ষর একাদশ অক্ষর (Syllable) যুক্ত। “ববখায়” শব্দে খয়ের নীচে স দিয়া লিখিত হয় নাই ও “বরহালমা” শব্দে হকারে রেফ যোগ করিয়া লিখিত হয় নাই বলিয়া প্রথমার্দ্ধে তের অক্ষর আছে, বলা বাহিতে পারে না।

সেই রূপ শেখাওঁও খণ্ডনকার পূর্ণাক্ষর রূপে গণনা করা অনায়াস; এবং “হাওয়া” শব্দের ওয়া অন্তঃস্থ বকারে আকার মাত্র। স্বতরাং এই শ্লোক এগার এগার করিয়া বাইশ অক্ষরময়।

২। ইহাতে বতি ভঙ্গ হয় নাই।

৩। পয়ারের সহিত ইহার কিঞ্চিৎসাম্যও সাদৃশ্য নাই; উপরে এক ছত্র, নীচে এক ছত্র, ইহাতেই যে কিছু সাদৃশ্য হউক। ছন্দোগত কোন সাদৃশ্য নাই। পূর্বার্দ্ধে বয়েৎ লগুগুরু ভেদাঙ্ক ছন্দ। পয়ার আধুনিক ছন্দ; না মাত্রারতি, না অক্ষর রতি। পারসী বয়েৎ সংস্কৃত কুজ্জল ত্রয়োতের প্রায় অরূপ, শেষের একটি বর্ণ নাই বলিয়া বোধ হয়। গুরু বর্ণ গুলির উপর (।) শলাকা চিহ্ন দিয়া আবার একটি কুজ্জল ত্রয়োতের শ্লোক ও বয়েৎটি দিলাম। উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। শলাকা চিহ্ন যে গুলির উপর আছে সে গুলি গুরু, আর যে গুলিতে কোন চিহ্ন নাই, সে গুলি লগু বর্ণ;—

ভ ভ ভ ভ ভ ভ শিলা ঘোর বাজে ।

দি নে শ প্রতাপে নিশা নাথ মাজে ।

ক রী মা ব ব খসায় ব র্হা ল মা (০)।

ক হা স্তেয় অসীরে ক নন্দে হ বা (০)।

কেবল শেষের গুরু বর্ণটি পয়ারী শ্লোকে নাই। সেই স্থানে শূন্য দিয়া উপরে শলাকা চিহ্ন দেওয়া গেল। সংস্কৃত

যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বলা সম্ভব

এমন কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। সামুদ্রা উপলব্ধিতে সহোদরতা কখন কখন অল্পসেই হইতে পারে। কিন্তু একটি বস্ত্র তাহার সমুদ্র বস্ত্রের প্র-
স্থিতি বা প্রস্থত বলা মুক্তিসঙ্গত নহে।
তর্ক বহুলতার প্রয়োজন নাই।

৫। উক্ত ভাগের পরামর্শটি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যখন স্বর্ণ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে, তখন প্রস্থকা-
রের পরামর্শ একবার স্মরণ করিয়া চিন্তা করিব। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, যে পূর্বে এই বিষয়টি তোমরা স্বর্ণ করি-
য়াছ কাহার নিকটে? তখন একবার নান সন্তান বিম্বৃত হইয়া সন্তোর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে প্রস্তুত হইব।
যদি দুষ্ট শত্রু বধা যবনের নিকট হইতে স্বর্ণ লইয়া থাকি, স্বীকার করিব; প্রতিবেশী আত্ম কুলীয়া ক্রাঙ্ঘন মহা-
জনের ঘোড়াই দিয়া মিথ্যা বাক্যে সন্তান রক্ষা করিব না। বয়েতের অল্পকরণে পয়্যারের স্বজন নহে, এক কথা যেমন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিলাম, সেপক্ষে যদি সকল বিষয়ে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম। কিন্তু তাই আমরা বলিতে পারি না। বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?

মুসলমানেরা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন। বঙ্গ ভাষার বহু দিন পর্যন্ত কোন পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা যখন চৈতন্যদেবের ভক্তি বাহিনীতে নিজ কুলীয়া সাজাইয়া এক দিকে স্রোতোমুখে বাজা করিবার উপ-
ক্রম করিতেছিল, সেই সময়েই পারসী ভাষা আসিয়া সেই তরলিতে আপনার কতগুলি কায়দা, কতগুলি রীতি, শত

শত শব্দ আনিয়া তুলিয়া দিল; ভাষা এই ধৈর্যমিশ্র গুরুভারে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। নৌকা যত চলিতে লাগিল, পারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এই রূপ ক্রমাগত বেড়ে শত কি ছই শত বৎসর যায়। পারসীর বোঝাই বাড়িতে থাকে, নৌকা আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতে সেই নৌকার যাবনিক ভ্রম্য অব্যবহার্য ও পরিহার্য বোধে, দেশীয় বস্ত্রভাষার সওদা করতেন; সাধারণের নিত্যকর্মে, বাবাসরে, শিম্প বিপণিতে, হিসাব পত্রে, জমীদারী সেরেস্টায় এই যাবনিক সওদাইই কেনা বেচা অধিক পরিমাণে হইত।

১২০৩ অব্দ হইতে আকবর শাহের সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাতে পারসী-
কের যোগে কোন পরিবর্তন হওয়া বোধ হয় না। ১৫৫৬ অব্দে আকবর শাহ সিং-
হাসনে আরোহণ করেন। এই সালে দিন শ বৎসর পারসীভাষা কেবল রাজ-
দ্রিন মহারঞ্জের ভাষাভাষ ছিল। আকবর শাহ নিজ সহকর্ত্তে হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টার অনেক গুলি ফলের মধ্যে উর্দু ভাষা একটি ফল। কিন্তু উর্দু ভাষা সৃষ্টির সমালোচনে প্রয়োজন্যতাব। বিখ্যাত হিন্দুরাজা তোড়র মল আকবর শাহের রাজত্ব সচিব ছিলেন। আকবর শাহ হিন্দুদিগকে রাজ্যের উচ্চপদ প্রদান করেন; তিনি জাতি বা বর্ণ-বিচার দোষে লিপ্ত থাকিয়া পক্ষপাত করিয়া নাই। মানসিংহ, বীরবল, তোড়র মল প্রভৃতি আমীরগণ রাজ্য সংরক্ষণ একই বিষয়ে

কর্ত্তা ছিলেন। হিন্দুজাতির পদোন্নতি-
সাধনে সম্রাটের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও হিন্দুরা উচ্চপদে অভিযুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, অনেক সম্রাট হিন্দু পারসী জানিতেন না, পারসী জানা আবশ্যকও বোধ করিতেন না। রাজ-
সভায় পারসীই প্রচলিত ভাষা ছিল, পারসী না জানা থাকতে তাঁহার রাজ-
সভায় সম্রাটের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে বা পরিচিত হইতে পারেন নাই। রাজা তোড়র মল হিন্দু জাতির অসু-
খতি এই কারণ জানিতে পারিয়া, নিজে সকল পারসী শিখেন, তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজস্বসচিব; তিনি তদীয় বিভাগে এই নিয়ম করিলেন যে, সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য ভাব্য বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে। সেই নিয়ম চলিল; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সরকারী সকল কাজ পারসীতে থাকিলেই সকলকে পারসী শিখিতে হইবে; পারসী শেখা থাকিলে রাজ্য সভায় পরিচিত ও রাজ-
কার্যকম হইতে পারিবে। সকলেই পারসী শিখিতে লাগিল; এখানে এখানে আখবালি লম্বা শব্দভাষাভিমাধ্যম অল্প লিখনালন করিতে করিতে দেখা দিল যে, দোলাইতে লাগিলেন। উত্তর ভারত-
বর্ষের সকল ভাষাই রূপান্তর গ্রহণ ক-
রিতে লাগিল। বঙ্গভাষা সন্তান বৈষ্ণবী ভক্তিবাহিনীতে তরি ছাড়িয়াছে মাত্র, আখবালি ভাষার উপর বোঝাই চাপাইতে আরম্ভ করিলেন।

(১) ১৪৮৬ অব্দে চৈতন্যদেব জন্ম

পরিগ্রহ করেন; ১৫২০ অব্দে সম্রাটসম্মত
গ্রহণ করেন; ১৫২২ অব্দে নীলাচলে
প্রস্থান করেন; ১৫৩৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু
হয়। (২) রূপ, সনাতন, জীব, মুরারি,
সামোদর প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক
গ্রন্থকর্ত্তা। (৩) চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ বোধ
হয়, ১৫৪৮ অব্দে লিখিত হইয়া থাকিবে,
(৪) এবং চৈতন্য চরিতামৃত বোধ হয়, ১৫৭৩ অব্দে লিখিত হইয়া থাকিবে। (৫)
কৃষ্ণভাসের রামায়ণ এক সময়ে লিখিত
হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসাধ্য।
যখন ভূতত্ত্ববিদ্যা নদীগর্ভ পরিবর্তন
গণনা করিয়া, বলিতে পারিবে যে, এত
দিন পূর্বে ভাগীরথী সমুদ্রাশ্রমের নীচে
দিয়া আকনা মাহেশ্বরে পার্শ্ব দিয়া গমন
করিত, তখন এই কথার কতক পরি-
হৃত হইবে। (৬) কবিকঙ্কণের চণ্ডী সঙ্ক-
বতঃ ১৫৯০ অব্দের পরে এবং ১৬০৩ অব্দের
পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। (৭) এ
দিকে লোদী বংশের প্রধান রাজা বেলে-
স্তি ১৪৫০ হইতে ১৪৮৮ অব্দ পর্যন্ত,
ও শেরশাহ লোদী ১৪৮৮ হইতে ১৫১৭
অব্দ পর্যন্ত, ই. দ্বাদশ ১৫১৭ হইতে ১৫২৬
অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লোদীবংশ
লুপ্ত হইল। তখন চৈতন্য নীলাচলে প্র-
স্থান করিয়াছেন। মোগল পাঠানে সমর
আরম্ভ হইল। মোগল সম্রাট বাবর শাহ
১৫২৬ অব্দে দিল্লীর রাজ্যসমূহে উপবিষ্ট
হয়েন, ১৫৫০ অব্দে, তাঁহার মৃত্যুর পর
হুমায়ুন শাহ রাজা হয়েন; ১৫৪০
অব্দে পাঠান বংশীয় শের আফগান
তাঁহাকে তাড়াইয়া বেন; তখন চৈতন্য-
দেব নীলাচলে সাগরের নীল জলে জীবা-
সংবরণ করিয়াছেন। ১৫৪২ অব্দে আকব-

রশাহ জয় গ্রহণ করেন; ১৫৫৪ অব্দে হুমায়ুন রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন; ১৫৫৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; আকবরশাহ সন্যাস্ত হইলেন; ১৫৭০ অব্দের পর রাজা তৌড়র মল পারসী প্রচলিত করেন। ১৬০৫ অব্দে আকবর শাহের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন প্রাপ্তি। উপরে যে বৈষ্ণবপঞ্জী ও মুসলমান পঞ্জী দেওয়া গেল, তাহাতে দেখা যায় যে, যখন মোগল পাঠানে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদে নিযুক্ত, তখন বৈষ্ণবেরাও “পাণ্ডুলদনে” প্রবৃত্ত ছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার একটু সুস্থির হইয়া রহদগ্রস্থ ভাগ্যত প্রণয়ন করিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরেই হুমায়ুন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারের দ্বিতীয় রহদগ্রস্থ চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নের পুঙ্কেই রাজস্ব সচিব পারসী প্রচলিত করিয়াছিলেন। যখন কবিকল্প চণ্ডী সমাপ্ত করেন, তখন আকবরের রাজ্যকালের শেষ হইয়া আসিয়াছে ও তখন পারসী বিলম্ব চলিতেছে। কবিকল্পের সময়ে পারসী ভাষার সংশ্রবে বাঙ্গালা ভাষা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য চণ্ডী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল;—

“স্বনরে সভার জন, করিলের বিবরণ,
এই ধীত হইল যে রাতে;
উল্লিঙ্গা মায়ের বেশে, কবির শিরদণ্ডে,
চাঁদকা বসিলা আচরণে।
সহর চলিমাংস, তাহাতে সুমন রাজ,
নিম্নে নিয়োগী গোপীনাথ;
তাঁহার তালুকে বসি, দামুনায়া চাস চসি,
নিবাস পুরুষ দ্বয় সাহ।

ধর্মরাজা মানসিংহ, কিন্তু পদার্থজ্ঞে ভূত,
সোড় বন্ধ উৎকল সমাপে,
অথবা রাজ্যের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাং পায় মহাবর গরিফে।
উজীর হলো রাজ্যজানা, ব্যাপারীরা ভাবে সনা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হলো অসি;
মাগে কোণে দিরা মড়া, পোনের কোঠার কড়া,
নাহি মাগে প্রজার গোয়ারি।
সরকার হৈল কাল, খিল জুমি লেখ লাল,
বিনা উপকারে পায় দূতি,
পোদার হইল যম, টাকার আড়ালি আনা কম,
পাই লতা লয় গিন প্রতি।
ডিহিয়ার আরোজ খোজ, টাকার দিলে নাহি রেজ,
খান গোলা কেহ নাহি কেনে,
প্রভু গোপীনাথ নহি, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিকাবে।
কোতালিয়া বড় পাপ, সজ্জনদের কাল সাপ
কড়ির কারণে বহু মারে,
আখালিপাখালি কড়ি, লেখাজোখা নাহি কেহি
বত দিরা যে বা নিতে পারে।
জমাবার বন্যার কাজে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার মুড়িয়া দেয় থানা,
প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে খানা গোলা নিতা,
টাকার দুখ হয় দশ জানা।
সহায় শ্রীমন্ত ঠাঁ, চণ্ডীগড় ঘাঁর গাঁ,
যুক্তি করি গাড়ীর খাঁর মনে,
দামুনা ছাড়িয়া যাই, মল্ল-রামানন্দ ভাই,
পথে দেখা হৈল ভার মনে।”
এই নয়টি শ্লোকে নয় দ্বিগুণে আঠার
অধিক পারসী কথা আছে। শুধু
তাই নয়, বঙ্গদেশ ভালুক বিভক্ত হই-
য়াছে, হিন্দু গ্রাম নগর গিয়া। মুসলমান
নামে সহর স্থাপিত হইয়াছে; উজীর
কোটাল, সরকার, ডিহীদার, জমাদার,
পোদাদার প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা কার্য
করিষেছেন; লোক পুরুষদের পরিবর্তে
খিলাং পাইতেছেন; শ্রীমন্ত গাড়ীর, ইহা

দিগের উপাধি গাঁ হইয়াছে; যাবনিক-
রীতি সমাজের সকল স্তরে অবশ্য করি-
য়াছে; মৃতরাং বৈষ্ণবতাও অতি অল্প
দিনের মধ্যে যাবনিক মিশ্রানে এক
মুহুর্তে মুক্তি ধারণ করিয়াছে।
বখতিয়ার খিলিজি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে
বঙ্গ জয় করেন বটে, কিন্তু পারসী শি-
খালে বঙ্গ ভাষার যে কিছু পরিবর্তন
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ আকবর
শাহের সময়ে। এই রূপ বেগ
গতিতে পরিবর্তন অস্বাভাবিক নহে।
সকল ভাষাতেই ইহা মধ্যে মধ্যে হইয়া
থাকে। ইহাকেই বিবাহের জল পেয়ে
মেয়েরা যে রূপ বাড়ে, তাহার সচিত
উলনা করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের বালা
হইতে কৈশোরে পারকবন, বড় অল্প
পরিবর্তন নহে। তখন চরণের চঞ্চলতা
নয়ন হরণ করিয়া লয়; উদরের স্থলতা
বন্ধ ও জ্বন চুই দিগ হইতে ভাগ
করিয়া লয়; শাখাঙ্গ সকলের কুশতা
চারি দিগ হইতে একত্র করিয়া কটদেশ
নিজ কক্ষ মধ্যে রাখিয়া দেয়। “কুমুদিনী”
দশ বৎসর বয়সে মর করিতে গেল,
তিন বৎসর পরে পিতালয়ে প্রত্যাগমন
করিল, কুমুদিনীকে কি এখন চিনিতে
পারা যায়? সেই রূপ মোগল সন্যাস-
ত্বের রাজ্যকালের প্রথম অবস্থার ভাষা
ও আকবরের শেষ সময়ের রচিত চণ্ডীর
ভাষা যে সেই একই কুমুদিনী, তাহা এক
দৃষ্টি নাজেই উপলব্ধি না হইতে পারে,
কিন্তু বাস্তবিক তাহা একই ভাষা। নারী
শরীরের অস্বাভাবিক পুঞ্জের ন্যায় জাহাঙ্গীর
প্রবাহিনী গুলিও এক সময়ে পুঙ্খলিভের
জনা উদ্ভাষিত হইয়া থাকে, কোন বিশেষ

কারণে সেই ব্যস্ততার নিবারণ হয়, সেই
অভাবের মোচন হয় ও অগ্রিম ভাষার
বিশেষ পুঙ্খি সাধন হইয়া থাকে।
আকবর শাহের সময়ে যেরূপ বৈষ্ণব
স্রোতে পারসী স্রোত আসিয়া ভা-
ষাকে এক মূহুর্তে পথে লইয়া যায়,
এ রূপ স্রোতে স্রোতোপাতও মধ্যে মধ্যে
হইয়া থাকে। আকবর শাহের মৃত্যুর
পর হইতে ভাষা এক গতি চলিতেছিল;
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সংস্কৃত চর্চার
প্রাবল্য নিবন্ধন কবিরঞ্জন ও তাঁহার কন্য
হইতে রায় গুণাকর যেমন গ্রহণ করি-
লেন ও কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত কবিগণে
একমিলিয়া ভাষাকে এক মূহুর্তে
স্রোতে ছাড়িয়া দিলেন, কোথা হইতে
এক ত্যানক রাজ্য বিঘ্নের রূপ স্রোতও
আসিয়া, এমন কি, পুণ্ড্রাংশ বৎসরের
মত সকল স্রোত বন্ধ করিয়া রাখিল।
১৭৫২ অব্দে অমদাগমল গ্রন্থ শেষ হয়;
১৭৫৭ অব্দে পলাশীর বিপর্যয়; তার
পর পুণ্ড্রাংশ বৎসর ভাষাতে উন্মিত অব-
নতি প্রায় কিছুই হয় নাই। জগন্নাথ
তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত সকল বিরাজ করিয়াছেন, কিন্তু
ভাষা মুখবন্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থির
ভাবে ছিল। উপপ্লব কর্তা মহাদ্বারা সাম-
যোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া
দিলেন। ভাষা এক দিগে যাইতেছিল;
কিন্তু আকবর শাহের তৌড়র মল্লের
ন্যায় আসাদিগের শাহন শাহের তোল-
পাড়মল্লগণ এই ১৮৭২ অব্দে এক বৎ-
সরেই কি করেন, দেখুন।
কা স্বয়ং বাঙ্গালার কর্তা বসিতেছেন
সংস্কৃত মিশ্রণে আমার বাঙ্গালা

ভাষার পবিত্র শোণিত দৃষিত করিও না; যত পারগী ইংরাজী শিশুও, তাহাতে লজ্জা বই নোকর্শান নাই।

খ। আক্টোব্রাট জেনেরাল হিসাব নবীশ বাহাদুর বলিতেছেন, তুর্কি ইংরাজী জানি আর নাই জানি, আমি ইংরাজিতে শিখা বুঝি, সকলে ইংরাজীতে হিসাব রাখিবে।

গ। ওদিগ হইতে বীমস সাহেব বলিতেছেন, বাঙ্গালী ভাষাটা খড়্ গোলা মেলে গতিতে বেগে যাইতেছে—এসো আমরা জন কয়েক লিখিয়া, বালেশ্বর ক্যানাল কোম্পানির নায় খাল কাটিয়া, বাঙ্গালী ভাষার জল পলতার ঘাটের ফিল্টরের ম্যায় ছাঁকনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া বেশী আস্তে আস্তে খালের ভিতর দিয়া এক দিকে লইয়া যাই। (জিজ্ঞাসা করি, কোন দিকে?)

ঘ। কৌন? পরিগামদর্শনভিম্যানী ইংরাজ জুকুট ডক্সী করিয়া মৃদুলাসো বলিতেছেন, অষ্ট্রেলিয়া দেখ, আমেরিকা দেখ; আর এ দেখ, হিমালয় প্রদেশে সাক্ষণ উপনিবেশ সংস্থাপন হইতেছে, কাহাকেও কিছু কষ্ট পাইতে হইবে না। আপনা আপনি চমকের ভাষা ভারতের অষ্টাদশ ভাষার দোপ করিবে।

এই সকল বিষয়ের বিশেষ সমালোচন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে রূপ বিশেষ কারণে ভাষার পরিবর্তন হয়, সেই রূপ অনেকগুলির স্বরূপাত এ বৎসর হইয়াছে; ইহাতে কি হইবে, বলিতে পারি না। আকবর শাহের সময়ে এইরূপ কারণে চতুর্দশ ভাষার নায় ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর শাহের পরও

ক্রমে হুতন হুতন কায়দা বাঙ্গালী অব্যবহাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একটি নামে দেখুন:—

“শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অলি জানবে শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী নাবালিগা জুজ্ঞে ৩ জুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাকিন তকিপপুর জেলা হগলী পরগণে আরশ।

বকলম শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার আমমোক্তার সান্বেলডিহী জেলা চক্ষিশ পরগণা” ইহার সংস্কৃত তাহ্মায়া বাঙ্গালী করিতে হইলে এইরূপ কিছু করিতে হইবে:—

“আরশা পরগণার অন্তর্গত ও হগলী জেলার মধ্যে তকিপপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে মৃত জুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্তাবয়বাবধা বিধবা বনিতা শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবীর রক্ষক ও কার্যকারক আছেন, তাঁহার সেই কার্যকারক রূপে ও স্বীয় সাধারণ প্রতিনিধি কর্মচারী” জেলা চক্ষিশ পরগণার অন্তর্গত পাতী বেলডিহী গ্রামনিবাসী “আমি শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার এ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহার স্বীয় পক্ষে ও এই কার্যকারক পক্ষে লিখিয়া দিলাম।” এরূপ করিলেও কেবল সংস্কৃতে বাঙ্গালী পণ্ডিতের বোধ গম্য হইবে না। অন্য উদাহরণের প্রয়োজন নাই। পারসী ভাষায় বাঙ্গালার যে বিশেষ রূপান্তর হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন।

আত্মীয় গুটিকত পুষ্টিভরনের নিদর্শন করিয়া বাঙ্গালী ভাষা প্রবন্ধের এই ভাগের উপসংহার করিব।

১। বিশেষণপদ অনেক সময় বিবেচ্যের পরে বসিতেছে; যথা শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী নাবালিগা। কাহ্নম চাহরম।

২। সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধের পরে বসিতেছে; যথা অলি জানবে অমুক—অমুকের পক্ষে কার্যকারক।

৩। হুতন পদ্ধতির বহু বচন; যথা, নদীয়াজেলার বলে, মাণীন, ছৌডান।

৪। সাকিন, মোকান, বকলম, বনাম, মারফত, দরুন, বাবতে প্রভৃতি বহুবচন ও বহু সংখ্যক বোজক অব্যয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ ভাব ক্ষুদ্র একটি কথায় প্রকাশ করিতেছে।

৫। তাহাতে ভাষা কিছু দুর্বল হইয়াছে।

৬। অক্সেল সেলানী, বেগারের দেলান, হাকিম ফেরে হুদুম ফেরে না, প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য প্রবিষ্ট হইয়া ভাষার চুটকি বিভাগের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

৭। আবুদিক রাজধর্ম সম্পর্কীয় নানা পারসী শব্দ ভাষায় সংযুক্ত হইয়া বহু ভাবকে অর্থকরী মূর্তি ধারণ করিবার উন্মুক্ত করিয়াছে। বিষয় কার্যের উপযুক্ত করিয়াছে।

৮। রূপাদি বর্ণনে ধারা বাহিক অভ্যুত্থান কখন প্রথা প্রচারিত হইয়াছে; ইশপ জেলখা আদি প্রস্তর রূপবর্ণনের সহিত বিদ্যার রূপ বর্ণন তুলনা করিলেন। আর কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা পারসীজ পাঠক বিলক্ষণ জানেন।

যে মুসলমানেরা পাঁচ শত পঞ্চাশত বৎসর এই বলে একাধিপত্য করিয়াছেন; ধর্ম্মে গাণিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বর্ন বিবি চালাইয়াছেন; ধর্ম্ম সংস্কারে দম্প্ত সংস্কারের উপর সমাধিসংস্কার চালাইয়াছেন; কৃষিবিশ্বাসে মামদোভূতকে প্রত্যেক কবর স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; যে যখন সাধারণ বাঙ্গালির নয়নপথে পরীকে জিনীকে, আকাশ ধার্ম্মে উড়াইতেছিলেন; যে যখন বাঙ্গালি দেহের উপর রাক্ষসের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন; আল্-হার পদ্ধতির উন্নতি শিক্ষা দিয়াছেন; সমস্ত ভূভাগের বন্দোবস্ত নিজমতে করিয়াছেন; আয় ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি নিজ মতে প্রচার করিয়াছেন, সেই যখন যে বাঙ্গালী ভাষার রীতির কিছুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই, একথা কে বিশ্বাস করিবে? বাঙ্গালী ভাষার রীতি যখন শাসনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

বিষয়সূচী।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

খোশখবর।

বেলা দুই প্রহর। খ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটার লোক জন সর্ব আহারান্তে নিদ্রা ঘাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ—একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়ার বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোথের উপর, পায়েয় ভিতর মাতা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাক খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া স্থচি হস্তে কারপেট ভুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আঁলু ঝালু—কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে বাটার নিকট হইতে উল গুলিন অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃগয় বাস্তবের সুও লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুইরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাঁহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্র চাকলাসুন্দর। বোধ হয়, বিড়াল ভাবিতেছিল, “সহুঘোর দশা অতি ভয়ানক; সন্ন্যাসী কার্পেট তোলা, পুতুল খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মনঃ

নিবৃত্ত, ধর্মকর্মের মতি নাই; বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?” অন্যান্য একটা টিক্‌টিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া, উদ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকা জাতির দুষ্ট-রিতের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল; সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপালিকাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিক্‌টিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও সহুঘ্যচরিত্র পরিবর্তনের কোন লক্ষণ স্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাঁকি ভুলিয়া, ধীরে ধীরে অনায়াস চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কারপেট রাখিলেন। এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, “অ, সতু বাবু, নাঃ—হুমে আপিসে যায় কেন, বলিতে পার?” সতু বাবু বলিলেন, “ইলি—লি—রিং!” ক। সতু বাবু, তুমি কখন আপিসে যেও না।

সতু বলিল, “হাস!”

কমলমণি বলিলেন, “তোমার হাস করার ভাবনা কি? তোমাকে হাস করার

জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বোঁ ছুপার বেলা বসে বসে কাঁদিবে!”

সতু বাবু বোঁ কথাটা বুঝিলেন, কেননা কমলমণি সন্ন্যাসী ভাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বোঁ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু এবার উত্তর করিলেন।

“বোঁ—মারবে!”

কমল বলিলেন, “মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বোঁ মারিবে।”

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না, কেননা এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া এক থানি পত্র আনিয়া কমলর হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া, আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষর মনে সোনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ;—

“প্রিয়সে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের জুলিয়া গিয়াছ—নচিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সখাদের জন্য আমি সন্ন্যাসী ব্যস্ত থাকি, জান না?”

“তুমি সন্দনানন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া পিয়াছে—সুনিয়া স্বখী হইবে—বড়ীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্মারির বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিদ্বাবিবাহ শার্জে আছে—তবে নৈম—কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নাচেও তোমাকে নি-

মন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুল-শয্যার সময়ে আসিও, কেননা তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।”

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ শয্যাগৃহে, একখানা বাচ্চালা বেতাব পাইয়া তাহার কোণে খাইতে ছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইখানে কি, বল দেখি সতু বাবু?” সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া বাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে জুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, “এ সতু বাবুর কর্ম নয়, এ আমার সেই সস্ত্রীটি নইনে হইবে না। সস্ত্রির আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু, আজ এস, আমার রাগ করিয়া থাকি।”

যথা সময়ে সস্ত্রির খ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়া চুঁড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাচের উপর শুইলেন। খ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে হঁকা লইয়া দুইরে কোচের উপর গিয়া বসিলেন। হঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, “হে হঁকে! তুমি পেতে ধর গন্ধাজল, মাতায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি

আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নিছক আমি তোমার মাথায় আঙুন দিয়া এই খানে বসিয়া বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াম!

শুনিয়া, কমলমনি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপল ভূলা চক্কুরিয়া বলিলেন, “আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কহিতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি!” এই বলিয়া শয্যা ভ্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সায়িক তামাক ঠাকুরকে বিসর্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া স্বর্য়ামুখীর পত্র পড়িতে দিলেন, এবং বলিলেন, “ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাছিয়ানা কাটিব।”

শ্রীশ। বরং আগাম মাছিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাছিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, “এটা তামাসা!”

ক। কেনটা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্রখান্না?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রীশাইকে ডিশচার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধি ইকুও নাই? সেয়ে মাছুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে বা তামাসা কোরে পারে

না, তাকি সত্যই পারে?

কম। প্রাণের দায় পায়ে। আমার বোধ হয়, এ সত্য?

শ্রীশ। সে কি! সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাতা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন,—

“আজ্ঞা, মিথ্যা বলি, কমলমণির সত্যের মাতা খাই।”

শ্রীশ। তাহলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাতা নাই খেয়ে—এখন বিধাতা বুঝি স্বর্য়ামুখীর মাতা খায়। দাদা বুঝি জোর কোরে বিয়ে করিতেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিস্মা হইলেন। বলিলেন, “আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?”

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন।

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বাহা লিখিলেন, তাহা এই:—

“ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিকারেই বা কাজ কি?

ঘৃণাপ্রদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ভ্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদপ্রাপ্ত হইব—তাহার বড় ব্যক্তি নাই।

“একথা বলার পর, আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না।”

তোমরাও বোধ হয়, ইহার পর আর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে

না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

“যদি কেহ বলে যে; বিধবা বিবাহ হিন্দু-ধর্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যে খানে দাদৃশ শাস্ত্রবিখারদ মহাশহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত;

তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহা সমাজ সম্মত নহে; আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গো-

লিদ্ভূরে আমাকে সমাজচ্যুত করে, কার মাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সে-

খানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনে-

রুকার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাতত কেহ জানিবে না।

“তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, ছই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিমে জানিলে, ইহা নীতি-

বিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরাজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরাজেরা কি আজ্ঞা?

মুমার বিধি আছে বলিয়া ইংরাজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি মুমার বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে

কি হেতুতে এক পুরুষের ছই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিবে?

“তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের ছই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর ছই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর ছই স্বামী

হইলে অন্তর্নিহিত ঘটনার সম্ভাবনা; এক পুরুষের ছই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর ছই স্বামী হইলে সম্ভা-

নের পিতৃ নিরূপণ হয় না—পিতাই সম্ভানের পালনকর্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছ্বলতা জন্মিতে পারে।

কিন্তু পুরুষের ছই বিবাহে সম্ভানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

“যাহা অধিকাংশ লোকের অনিচ্ছাকারক তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের ছই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর,

তবে দেখও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিচ্ছকর।

“যুগে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি

মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি

অযুক্তি?

“শেষ আপত্তি—স্বর্য়ামুখী। ঘেহময়ী পত্নীর সপত্নী কটক কর কেন? উত্তর—

স্বর্য়ামুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত

করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?

“তবে কোন কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?”

—

রুড়িংশ পরিচ্ছেদ।

কাহার আপত্তি?

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, “কোন কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন!

কিন্তু কি জম। পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হোক, মন্ত্রিবর, আপনি সজ্ঞা

করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।”

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে সূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর খাতার উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতে তাঁহার নৌকারোহণে গোবিন্দপুর বাতী করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দানীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সমিতি সাক্ষ্য হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হয়। গিয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামির নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি একারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সাতীশ যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাহির ভিতর, প্রবেশ করিয়া, অস্পষ্ট ধরে, সাতসুশ্রুনা হইয়া দানীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বর্ঘ্যমুখী কোথায়? মনে ভয়, পথেছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে, স্বর্ঘ্যমুখী মরিয়াছে।

দানীরা বলিয়া দিল, স্বর্ঘ্যমুখী শয়ন কক্ষে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়ন কক্ষে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যুগান্তকাল ইতস্তত নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, কক প্রান্তে, এক রক্তগবাক সমিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু চিনিলেন যে স্বর্ঘ্যমুখী। পরে স্বর্ঘ্যমুখী তাঁহার পদমঞ্জি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। স্বর্ঘ্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি,—বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—স্বর্ঘ্যমুখীর কাঁদের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুলা স্বর্ঘ্যমুখীর দেহতরু ধস্কের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, স্বর্ঘ্যমুখীর অঞ্জলি পদ্মপলাশ চক্ষু কোঠের পড়িয়াছে—স্বর্ঘ্যমুখীর পদ্যমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কবে হলো?” স্বর্ঘ্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, “কাল।”

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কান্দিতে লাগিলেন—কেহ কাহাকে কিছু বলিলেন না। স্বর্ঘ্যমুখী কন্দলের কোলে মাতা লুকাইয়া কান্দিতে লাগিলেন,—কমলমণির স্কন্ধের জল তাঁহার রক্ত কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র কৈঠকখানায় আসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন: “কুন্দ নন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী!

কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!” কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। একই বারমাত্র মনে পড়িতেছিল, “স্বর্ঘ্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ স্বখে আর কাহার আপত্তি?”

সম্প্রবংশ পরিলক্ষিত।

স্বর্ঘ্যমুখী ও কমলমণি।

যখন প্রদোষ, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন স্বর্ঘ্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহস্বত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিত হইয়া বলিলেন;—

“এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগে আপনি মরিলে?”

স্বর্ঘ্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, “আমি কে?”—মুহুর্ত, ক্ষণি হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—মৃত্তির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেই রূপ আমি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আনন্দ দেখিয়া আইস?—তখন জানিবে, তোমার দাদা আজ কত মুখেশ্বরী। তাঁহার এত স্বখে যদি আমি চক্ষু দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন স্বখে?—আজ তাঁকে অস্বস্তি রাখিব? তাঁহার এক দেগুর অস্বখে দেখিলে মারতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাজ তাঁর

মন্মান্তিক অস্বখে—তিনি সকল স্বখে রিস-ক্সন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার স্বখে কি রহিল? বলিলাম, ‘প্রভো! তোমার স্বখেই আমার স্বখে’—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।”

কমল। আর, তুমি কি সুখী হইয়াছ? স্বর্ঘ্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখন সচ মির পায় কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি এখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া স্বর্ঘ্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষুর জলে বসন ভিজিয়া পেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কমল, কোন দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?”

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমন ঘটে।”

হু। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য, সম্পদ—সে সকলও ইচ্ছা কথা—এত গুণ কার স্বামির? আমার কপাল জোর কমল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

হু। তবে এ জালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামির আজ্ঞাকার আ-
জ্ঞান পূর্ণ মুখ দেখিয়া, সুখী—তথাপি

বলিতেছে, এ ছালায় মন পোড়ে কেন? ছুই কথাই কি সত্য?

হু। ছুই কথাই সত্য। আমি তাঁর মুখে স্বামী—কিন্তু ‘আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন’ বলিয়াই তাঁর এত আত্মদান। স্বর্ঘ্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কঠিন হইল,—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন;—

“তোমার পায়ে ঠেলছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হইতেছে। তবে কেন বল ‘আমি কে?’ তোমার অন্তঃকরণের আশ্রয় আশ্রয় আমিও আসিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জন করিয়াও অহুতাপ করিবে কেন?”

হু। অহুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন মশগল নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

স্বর্ঘ্যমুখী কান্দিলেন। কমল তাঁহার মাতা আপন হৃদয়ে অনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথা—সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে কলমমণি ব্রতীতেছিলেন যে, স্বর্ঘ্যমুখী কত দুঃখী, অন্তরে স্বর্ঘ্যমুখী ব্রতীতেছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সশব্দ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ঘ্যমুখী তখন আপনার কথা ভাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন।

সতীশচন্দ্রকে আনাহিয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেককণ পর্যন্ত সতীশ ত্রিশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথা আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া, স্বর্ঘ্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, এবং সতীশ চন্দ্রকে কোড়ে লইয়া ঘুমুহীন করিলেন। উভয়েকে বিদায় কালীন স্বর্ঘ্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসমরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্বাদ করিলেন, “বাবা! আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্বাদ আমি আর জ্ঞানি না।”

স্বর্ঘ্যমুখী স্বাভাবিক মুহুরের কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বলনা?”

হু। কিছু না।
কম। আমার কাছে লুকাইও না।
হু। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন সঙ্কল্প চিত্তে শয়ন মন্দিরে গেলেন। কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাঙ্গ কমল এখানে জানিতে পারিলেন। এখানে স্বর্ঘ্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, স্বর্ঘ্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু লজ্জাক শয্যার উপরে একখানি পত্র পাড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাতা ঘুরিয়া

গেল—পত্র পাড়িতে হইল না—না পাড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, স্বর্ঘ্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন; পত্র খুলিয়া পাড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাঁহা করতলে বিমর্ষিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শব্দার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, “আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে বাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?” সতীশ নিম্নে কটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কান্দিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশীর্বাদ পর।

শোকের প্রথম বেগ, সশব্দ হইতে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্র খানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;—

“যে দিন আমি যখন শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র স্মৃতি নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাঁহার হাতে আমিকে সমর্পণ করিয়া কুন্দনন্দিনীকে স্বামী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহস্থ্য করিয়া যাইব। কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার পাইয়া তাহাকে স্বামিদান করিলাম। কখনও গৃহস্থ্য করিয়া চলিলাম।

কালিবিবাহ হইবার পরেই আমি রাতে

গৃহস্থ্য করিয়া যাইতাম। কিন্তু আমি যখন যে স্থানে কানামার আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে স্থান ছুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর এক বার দেখিয়া যাইব, সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অথবা আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাদিক, তিনি স্বামী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তেঁা আমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

“তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাঁহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

“আর যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি লইলে সঙ্গে লইবে পারিতাম, কিন্তু অন্নভি ছিল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোমন্বল রূপে সঙ্গে লইয়া যাইব?

“তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের

জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। ‘কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম, আবার লিখিলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন ‘পত্রেরে বর্ণিত পাবিলাম না। কথা বলিতে পাবিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সম্বাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও, যে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। বাঁহাকে মনে হইলেই আচ্ছাদন হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল; যত দিন না মাটিতে এমটি নিশাণ, ততদিন থাকিবে। কে-

কালিদাস ।

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেফপিয়র যেরূপ সমুদ্রের কবিতার নির্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন-সিক্ত করি-

নন। তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন জুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ জুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বভাগিনী হইতেছি।

‘তোমারও কাহে জন্মের মত বিদায় লইলাম, আশীর্বাদ করি, যে তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চির-সুখী হও। আরও আশীর্বাদ করি, যে দিন তুমি স্বামির প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আয়ুঃ এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।’

যাচ্ছেন, কালিদাসের কবিতাও তরুণ সকলের হৃদয় কদরে প্রেমবারি সিঞ্জন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধু স্রাখা অমূল্য কবিতা কলাপে শ্রাব্য করিয়াছেন,

• কুমার সম্ভবম্ । সমুদ্রসর্গাণ্ডম্ । মহাকবি কালিদাস কৃতম্ । শ্রীমদ্ভাগবত সুবিরচিতম্ । স্বামীমনি স-মাধার্য্য ব্যাখ্যায় গবর্ধনকেশসংকৃত পান্ডু-মহাযাণ পঞ্চমোহর্য্য তর্কচালপতি ভট্টাচার্য্য কৃত ত্রিবিধাস্ত্যাকরবসন্ত বিরহোদ্যান্তিয়ার্ণবিত্তম্ । কৈশব সম-কৃতম্ । কলিকাতা ॥

তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতি ভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে “আমাদিগের কবি কালিদাস” বলিয়া তাঁহার প্রতি ত্রীত প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার কাব্য সমূহ অতাপ্পকালের মধ্যে ইং-রাজী, জর্ম্মণ, ফরাসী, দেন এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সমস্ত ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাণীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষা তত্ত্ব-মিৎ জোস্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ব্রিট্টেন্, ফিস্, ফোকস্, সেন্সি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগেল এবং হমবোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়া ইউরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক চর্চামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে সেক্সপিয়রের “হামলেট” অপেক্ষা গেটের “ক্লট” এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রন তাহার ছায়াগান লইয়া “ম্যানফ্রেড” রচনা করিয়াছেন; শ্বভারং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম জোস্ কৃত ইংরাজী অনুবাদে জর্ম্মণ অনুবাদ

পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, “কদ কেষ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চন্ডের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্ণ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, যে অভিজ্ঞান শত্ৰুশূল! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।” • একজন বিদেশীয় কবি শত্ৰুশূলর এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্বরস পানে এক কালে বিমূঢ়—তাঁহার নম্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—“মাং উৎকৃষ্ট কাব্য।” • তাঁহার চতুষ্পাণীতে ছাত্রগণকে কালিদাস রুত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে “ভট্টী” ও “দৈব-বদ” পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ভ্রাম্ভণ পণ্ডিতগণ ভাদ্রপু আদর করেন না—এমন কি, এক ব্যক্তি মেঘদূত অপেক্ষা জীব গোবাসীর-“গোপালচন্দ্র” নামক আধুনি কল্পপক্কট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে “কালিদাসকে সর্বোচ্চাসন

• সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী ।

↑ উপমা কালিদাসের ভাষারই বীরবদ্য ।

• ইন্দ্রবে পদ সাজিত্য মায়ে সজিত্যেয়াগবা ।

• মেঘদূতম্ মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্ । শ্রীমদ্ভাগবত সুবিরচিতম্ । স্বামীমনি স-মাধার্য্য ব্যাখ্যায় গবর্ধনকেশসংকৃত পান্ডু-মহাযাণ পঞ্চমোহর্য্য তর্কচালপতি ভট্টাচার্য্য কৃত ত্রিবিধাস্ত্যাকরবসন্ত বিরহোদ্যান্তিয়ার্ণবিত্তম্ । কৈশব সম-কৃতম্ । কলিকাতা ॥

প্রদান করেন। বোধাই প্রদেশস্থ অপ্র-
সিদ্ধ পণ্ডিত ডাওদাজী কালিদাসের
শ্রদ্ধ করিতা পাঠে ক্রান্ত না হইয়া, বহু
পরিশ্রম ও বহুয়াশা স্বীকার করত প্রা-
চীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষ্যশাসন পত্র
হইতে তাঁহার জীবন চরিত্র সম্বন্ধে অ-
নেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আম-
রা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া
কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিজ-
য়াদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ;
ইছাভের তাঁহার প্রামাণিক জীবন-
সংক্রান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ
সাধারণ লোকে অগণ্য নহেন। বঙ্গ-
দেশীয় পণ্ডিতাভিনানী কতিপয় ব্যক্তি
তাঁহাকে লম্পট-স্থির করিয়া উল্লভ আদ-
রস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে
প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রা-
হ্মণ যুবকেরা মুদ্রবোধ ব্যাকরণের কিয়-
দংশ পঠিত করিয়াই এ সকল উচ্চ শ্লোক
অভ্যাস করিয়া ধনিগণের সনোৱঞ্জন
করত বার্ষিক গ্রহণ করেন। ফলে এ
সকল উচ্চ কবিতা কালিদাসের কৃত
নহে, আধুনিক কবিরচিত। “প্রবুল
জ্ঞান নেত্র” নামক এক খানি বাঙ্গালা
পদ্যময় বহুতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালি-
দাসের জীবনচরিত্র মধ্যে প্রচলিত রসিক-
তা জনক কাণ্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া,
এছাড়া আর কলিভ উল্লাবনী শব্দের
পরিচয় দিয়াছেন। সম্ভ্রুতি ইংরাজী
জুদিকা সহ যে একখানি “রঘুবংশ”
সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এই
সকল কাণ্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে,
দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরি-
চয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত
আছে যে;—

পঞ্চময়ঃ রূপনকোমরকিংশং শংকুঃ
বোভালভুটটচরণং কালিদাসঃ
খ্যাতে বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়া
রুক্মাণিহ বরক্কাচ নবরিক্তময়া।

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার প-
রিচয়। “অভিজ্ঞান শকুন্তল” গ্রন্থকর্তার
এই পরিচয়ে কখনই সন্দেহ থাকিতে পারি-
না। স্তবরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে
তাঁহার বিধয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

গ্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল,
কোলাচল মল্লিনাথ স্থির কালিদাসের
দ্বারা সমুহের চীকা রচনা করেন ; তাঁহার
চীকা দক্ষিণাবর নাথের চীকা দুটো র-
চিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্স্পা।

ভাষাতত্ত্ববিৎ জানেন কহেন, কালিদাস
দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের সভায়
বসমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর
ফলকে সমুদ্রগুপ্তের “কবিবন্ধু কাব্যপ্রিয়”
এছাড়া প্রাশংগবাদ দুটো কবিশ্রেষ্ঠ
কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ বিবেচনা
করিয়াছেন।

বেনাট্ট, মহর পাড়ির জর্নেল “এসি-
য়াটিক” নামক পত্রিকায় “ভোজপ্রব-
ন্ধের” ফরাসি অনুবাদ ও “আইন
আব্বারী” দুটো লিখিয়াছেন, ভোজ-
রাজার ৮০০ শত বৎসর পূর্বে বিক্রমাব্দ
ভোর সভায় কালিদাস বর্তমান ছিলেন।
একথা সম্পূর্ণ অশ্রেয়। বেনাট্ট স্বীয়
গ্রন্থে একুশ অশ্লোক এলাপ করিয়া, লিখ-
িয়াছেন, তদুদ্ভূত তাঁহাকে হিন্দুদিগের
ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা করি-
য়াছেন।

কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রেসেপ ও এলফিন-
টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০
শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

ভোজ প্রবন্ধের প্রমাণসমূহের গুঞ্জরাট
মালয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন,
কালিদাস ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে মুজের জাত-
পুত্র উজ্জয়িনী নিবাসী ভোজরাজের
সভাসদ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপটে
কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন
হইয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ
নৃপতির রাজ্য কাহ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ
স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়,
শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও
তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা
বুঝ “ভোজ প্রবন্ধ” পাঠ করিয়া দেখি-
য়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব
মহোদ্যগত ধারানগরারিণি ভোজ, সিদ্ধ
পুত্র এবং মুজের জাতপুত্র। শৈশ-
বাবস্থায় পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে তাঁহার
পিতৃব্য মুজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন
এবং ভোজ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া
বহু বিদ্যা অর্জন করেন। ভোজ জনে
বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার ধুলতাত
তদ্বার সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা
করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁ-
হার গ্রাণ বিনাশ করবেন, এই ভয়ানক
চিন্তা তাঁহার হৃদয় কন্দরে জন্মে বহুশ্রম
হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি
বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া
আপন দুই অভিসন্ধি জ্ঞাপন করত
ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ
করিতে অশ্রুক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তিনি
ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে
লোহিতর্শন আসি মুজ ভূপকে উপহার

দিলেন। তদুদ্ভূত তিনি মানদক্ষিণে জি-
জ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ
করিয়াছে? বৎসরাজ তখনই একটি
পত্রোপরি লিখিয়া মিলেন—“মাক্কাভা,
যিনি ক্রতযুগ নৃপকুলের শিরোমণি ব-
রূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।
রাবণার রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু
নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং
অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা মুদ্রিতির
স্বর্ণারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী
কাহার সন্তিত গমন করেন নাই, এবারে
তিনি আপনার সন্তিত রসাতলগামিনী
হইবেন।” ইহা পাঠ করিবারান্ত মুজের
শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের
নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে
তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ
দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া দারা রাজ্য
প্রদান করণান্তর, ঈশ্বরপ্রদান নিমিত্ত
অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃ-
সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য
পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া
ছিলেন। আমরা ভোজ প্রবন্ধে কালি-
দাসের নাম সহ নিম্নলিখিত পণ্ডিত-
গণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি ;—

কপূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল,
শ্রীদচন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব, তারেঙ্গ,
দামোদর, সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভব-
ভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর,
মাধ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত,
হরিবংশ বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববন্ধ, বিশ্ব-
কবি শঙ্কর, সম্ভব, শুক, সীতা, সীমন্ত,
স্বরূপ ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেখরিণী শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,
মল্লাসেন, ভোজ প্রবন্ধ ১২০ খ্রীষ্টাব্দে

রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান রক্ষির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কিরণগণকে কেবল অনুমোদন করিয়াই ভোজের সভাসদ স্থির করিয়াছেন। ভোজ চরিতে এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ভোজ প্রবন্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিবে? এই ভোজরাজ চম্পু, রামায়ণ, সরস্বতী কথোভরণ, অমরতীকা, রাজ বাহিনী, পাতঞ্জলটীকা, এবং চারুচর্য্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের একথাটির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

বিশ্বগুপ্তদর্শি গ্রন্থকার বোধাত্মচর্য্য কালিদাস, ত্রিহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা :—

মায়শ্চর্য্যে ময়ুরো মুররিপুংগপয়ো ভাঃ-
বিঃ মারদিশ্য।

শ্রীহর্ষকালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাসয়ো
ভোজরাজঃ।

কিন্তু ইহাতে তিসিও ভোজপ্রবন্ধ প্রত্যয়ে বলালে ন্যায়, মহাজন্মে পণ্ডিত হইয়াছেন, কেননা ত্রিহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এক কালে বর্তমান ছিলেন না; এবিষয়ের জুরিং প্রমাণ দেওয়া বাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শকাব্দগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্রাট স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হমবোল্ট বলেন, কবিরথ হো-

রেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন; এ কথা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন, “যত দিবস হিন্দু সাহিত্য বর্তমান থাকিবে, তত স্থান ভোজ প্রমত্ত ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।” কিন্তু বহুগুণ মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা চক্কর। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বন্ধ ৩৩১। ৭২ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

“সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি,” “বেতাল পঞ্চবিংশতি” ও “বিক্রম চরিত” মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ আলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। মেরু ভূতকৃত “প্রবন্ধ চিন্তামণি” এবং রাজ শেখরকৃত “চতুর্বিংশতি প্রবন্ধ” মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে জৈনক সিদ্ধদেব স্থির নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন লেখক কছেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করত। ইনি এবং রত্ন-ভোজ উভয়ে বুদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈনগ্রন্থ গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত

অন্যান্য গ্রন্থে এসকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। রত্ন ভোজ, মনোভূজ স্থির শিষ্য ছিলেন। মনোভূজ, বাণ ও ময়ুর ভট্টের সমকালীন জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণ রূত চরিত্রিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে ত্রীকটাপতিধর্ম্মবন্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কানাকুবজাধিপতি হর্ষ বন্ধন শিলাদিত্য এবং ইহার নিকট চৈনিক পরিত্রাজক হিয়াও সিংহ ও আহুত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াও সিংহ রূত গ্রন্থ পাঠে খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষ বন্ধনের সহিত চৈনিকচার্য্যের সাক্ষাৎ “বনন প্রোক্তপুণ্য” হইতে হর্ষ চরিতে সংগৃহীত হইয়াছে।

“কথা সরিৎসাগর” ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কথ নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পুর্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, কথা সরিৎসাগর ও মঙ্গ্য পুণ্য-রাণের মতাহসারে শতাব্দিকের পোড়।

নাসিক অন্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাকে নভাগ নম্রয়, জনমেজয়, যথাত এবং বলরামের নাম বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্ণ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কি রূপ গোল ঘোণ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জ্ঞানিত, একগুণ ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক তত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আবাদিগের শক প্রামাণিক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত

হওয়া অবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের মূল্যবান কবিতা-চুড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেই বড় সহজ ব্যাপার নহে, কাজেই ঐতিহাসিক জ্ঞানীরা কথা উত্তম রূপে সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

খ্রীষ্টাব্দকৃত বিক্রমচরিতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বিক্রমাদিত্যের নন্দ্রাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শাক্য স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কছেন, “জ্যোতির্বিদ্যভরণ” নামক কাল জ্ঞান শাস্ত্র মহাকবি কালিদাস, রত্নরংশ, কুমারসম্বৎ এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এবিষয়টি মেঘদূত প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যভরণ বেরক্ষার কালিদাস প্রণীত, এবিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত পরিপোষক, জ্যোতির্বিদ্যভরণের কৃতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

“আমি এই গ্রন্থে শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়নে প্রকল্পবন এবং ১৮০ নগরীসংঘটিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি। ৭।

শঙ্ক, বরকট, মণি, অংগুদ, জিষ্ণু, জিলোন, হরি, চটকপরি, অমর সিংহ,

এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সত্য, বরাহ, মিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিষ, কুমার সিংহ, এবং আমি ও অপর কএক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ১।

ধনুস্বর, ক্ষণনক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকপূর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বরকৃষ্ণ বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত। ১০।

বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজ্য আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬ জন বাগী, ১০ জন জ্যোতির্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

তাঁহার সৈন্য অসীমদশ যোদ্ধা ব্যাপক স্বলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হস্তি এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্দাদ প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপুংক্তির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

তিনি ১৫ শক নৃপতিকের সংহার করিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অঙ্ক স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যাহ মণি, মুক্তা, স্বরূপ, গো, অশ্ব, এবং হস্তি দান করিয়া ধর্মের বৃদ্ধোদ্ভল করিতেন। ১৩।

তিনি ব্রহ্মিড়, লতা, এবং গোড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুজর দেশ জয়, ধারানগরীর সমৃদ্ধি এবং কাশ্মীরাদি-পতিবির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪

তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইহা;

অম্বুধি, অমরক, সর, এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের আত্মপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া চূর্ণ পুণ্ড্র প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

প্রজাবর্ণের সুখকরী, ও মহাকালের অধিনেত্রী সুবিখ্যাত, উজ্জয়িনী নগরী, তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

তিনি মহাসমরে রুমাদিপতি শক-নৃপতিকের পরাজয় করণান্তর বন্দী রূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

এই রূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্ণ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়-মাছুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্য গণ উহার রাজ সভা উজ্জল করিয়া ছিলেন। তাঁহার সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

আমি প্রথমে রণু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা করিয়া, বৈদিক “প্রতি কর্ণ-বাদ” প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করত, এই “জ্যোতির্বিদ্যভরণ” প্রস্তুত করিলাম। ২০।

আমি ৩০৬৮ কলিগতাব্দে, বৈশাখ নামে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। রত্নবিধ জ্যোতির্বিদ্যের উক্তন রূপে পরিদর্শনার্থে, আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্বিদগণের সম্মানার্থে সংকলন করিলাম। ২১।

পুণ্যায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন “এ পর্যন্ত কবোজ,

গৌড়, অঙ্ক, মানব ও সৌরাস্ত্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত মাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।”

জ্যোতির্বিদ্যভরণ গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১২৪৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তৎকালীনে মহাশয় এই গ্রন্থে প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তৎদৃষ্টে বাবু প্রশান্নাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্তমান ছিলেন, ও কালিদাস খ্রীঃ তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং জ্যোতির্বিদ্যভরণ ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাক্ষত্র সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১৫ সংখ্যক শ্লোক জ্যোতির্বিদ্যভরণ হইতে অবিকল কালিদাসের লেখনীনিষৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকে জানেন। জ্যোতির্বিদ্যভরণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাস প্রণীত গ্রন্থে যখন ভ্রান্তি বা সঙ্কলন বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এক কথা; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাস প্রণীত!—কখনই নহে। কেহই বলিতে পারেন, আমরা তৎকালীনে মহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে, তাঁহার প্রমাণ প্রগ্রাহ্য করি—এ সম্প্রদায় আমাদের নাই। আমরা তৎকালীনে “বাচ-স্পতি” গ্রন্থকার বিনীত ভাবে অহরহ

করিতেছি। এক বার রণু কুমার রচনার সহিত জ্যোতির্বিদ্যভরণ রচনা-প্রণালীর তুলনায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জ্ঞানিতে পারিবেন—মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থে কখনই প্রমাণ করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসের। তিনি আপন গুণ গান করিয়া জনসাধারণের অবতরণিকায় আপনাকে “নবরত্নের” অন্তর্ভুক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি ঐজন ধর্মাবলম্বী। পুনশ্চ, জিকু (ব্রহ্ম গুপ্তপতি) বিক্রমাদিত্যের “নবরত্নের” সঙ্গে একত্রে বর্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, জ্যোতির্বিদ্যভরণ গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অমক্রেম সংস্কর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন এবং ঘটকপূর যে এক জন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোধাই প্রতীয়মান পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন, ঘটকপূর নামে, কোন কবি ছিলেন না। এবং ঘটকপূর নামে যে ক্ষুদ্র কাব্য বর্তমান আছে, তাহা কালিদাসের। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতির্বিদ্যভরণ গ্রন্থকার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শক প্রথমক বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অসঙ্গতা এবং কাল নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। স্বতরাং এ কালিদাস, আমাদের যেরূপ আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি

“শক্ৰ পরাভব” নামক জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রন্থে তা। ইহার গনক উপাধি ছিল।

কলে উইল ফোর্ড বিক্রমাদিত্যসদৃশে “শক্ৰমহাশা” হইতে এককটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে একমুখ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। শক্ৰমহাশা ঐক্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সুরি বজ্রভীরাঙ্গ শিলাদিত্য নৃপতির অমৃতমাহাত্ম্যের শক্ৰমহাশা পর্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, “আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নিরাসনের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম বিরাগী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চমসর খাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস পরে বিক্রমাক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের নাগ সিদ্ধ সেন সুরির উপদেশ গ্রহণ করত, পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্তৃক চলিত অঙ্গ স্থিত হইয়া, নব অঙ্গ স্থাপিত হইবেক।” ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্তমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে মধ্য স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ খেতাবের জৈনের প্রাচ্য করিয়া থাকেন। কলে উইল ফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীর বা বীর বিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের অম হইয়া উঠিয়াছে। শক্ৰমহাশাচার মতামতের বজ্রভীরাঙ্গ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অব্দ) সৌরভি হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিস্কৃত করিয়া শক্ৰমহাশা এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনঃ গ্রহণ করত জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল

ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা একগুণকার ভাষা তৎকালি পণ্ডিতেরা গুপ্ত করিয়াছেন।

রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে, খ্রীঃ পূর্ব পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসন কর্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য এক বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৩১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত্য করেন।

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে “আশীশাটিক রিসার্চেস” পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্বে এই নামধেয় আর এক জন জুপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

কল্লণ পণ্ডিত রাজ তরঙ্গিনীর তৃতীয় তরঙ্গে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে বর্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণ মণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতাল মেঘ এবং ভর্তৃসেধ সভাসদ ছিলেন। “মেঘ” নিঃসন্দেহ ভট্টশঙ্ক বাচক, তাহা হইলে বেতাল মেঘ এবং ভর্তৃসেধ, বেতাল ভট্ট, ভর্তৃভট্ট। কোনও জৈন গ্রন্থে “মেঘ শব্দ” মেজ্জ লিখিত আছে। বিম্বকোয় অমৃত্যের সংস্কৃত ভাষায় মেজ্জ অর্থ প্রদান। বেতাল ভট্ট দ্বিতীয় নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত এবং ভর্তৃহরি নীতি বৈরাগ্য ও শূদ্রা শতক গ্রন্থকার। ইনি

বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? রাজ তরঙ্গিনীর তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণ মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি স্বপ্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপরাধ এখানি নাম। কিন্তু পুর্বযোড়শ স্কৃত জিকাও শেষ মধ্যে কালিদাসের—রঘুবীর, কালিদাস, মেঘাদি এবং কোটিলিহিত এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্ত কৃত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কল্লণ প্রদান করি বলিয়াছেন। রাবণ ভট্ট শকুন্তলার চীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তচর্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রদান করি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী নিশ্চয় হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবর সেনের আজ্ঞামতের কালিদাস সেতু কাব্য নামক প্রাকৃত কাব্য সংস্কৃত চীকা সংরচনা করেন। সম্ভবতঃ বারানসী দর্পণ চীকার রামাশ্রম কালিদাসকে সেতু চীকার রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত প্রতাপ রত্ন, দণ্ডাপ্রণীত কাব্যদর্শ এবং সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে সেতু কাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেতুকাব্য বিস্তৃত নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌসেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি, “অভিনব” বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহার পিতামহ শ্রেষ্ঠ সেন রাজ-তরঙ্গিনীর মতে, “প্রথম প্রবরসেন” নামে বিখ্যাত। গ্রিগোর এই দুইজন ভিন্ন অন্য দুইজন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের

পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্য দ্বিজের অবল প্রতাপাদিত্য নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন ধী শিলাদিত্যের সভাসদ কবি বাণ হর্ষচরিতে প্রবরসেনের ও সেতুকাব্য গ্রন্থে কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা;—

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রাচ্যতা কুম্ভোজবলা
মাগরস্য পরং পাতং কোপিসেনেবসেনুনা।
নির্গতাসু বাক্যনা কালিদাসস্য মুখিযু
প্রতিমধুরাসু। মুমধুরীম্বিরজ্যাতত ॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা রাজতরঙ্গিনীর প্রমাণ দিক হইতেছে, এবং মহাকবি কালিদাসও—একথা ভাণ্ডারী লিখিয়াছেন, তদুপে আমাদের নবরত্নশ্য উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহাপ্রমাণ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্য ও অনেকগুলি—তাঁহার মধ্যে উপরে লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যুপে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পুথক ব্যক্তি। কাথত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মূলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকাগণকে পরাজিত করত “শকাব্দ” স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অঙ্গস্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করবার চেষ্টা পাওয়া গেল। অনেকই আমাদের উপর বিরক্ত হই-

বেন, কিন্তু আমরা বিচারমন্ত্র হইয়া বিবাদ
করিবার জন্য সাহিত্যরসস্থিতে দণ্ডা-
য়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে
প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া
পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা
দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয়
হয়। এক্ষণে প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য
কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহাকে অন্ধ রাজা প্রদান করিয়া-
ছিলেন। “রাজ ভরঙ্গীর” মতে হর্ষ
বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কামীর রাজা
প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত
আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত
জ্ঞানশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কা-
শ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক
দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পর-
লোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের স্বার্থ
উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রতাপন
করত যতি ধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রারম্ভীতে
আগমন করেন। এবং প্রবর সেনের সঙ্গে
বন্ধুত্ব স্থাপন আবদ্ধ হইয়া সেতু কাব্যে
তাঁহার গুণ কীর্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত
স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি
মেঘদূতের ঘটনার সঙ্গিত একা হইলে
কবির স্বীয় বিবরণ বলিতেও হয়। তিনি
আপন শোক বন্ধ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,
এবং রাম গিরির শৃঙ্গে বসিয়া আমাতের
একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেমসীমার
নিকট বার্তা লইয়া বহিতে বলিয়াছেন।
কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করি-
য়াছেন, এক্ষণা স্বভাবত তাঁহার মন যে-
রূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত রূপে
ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা

ছিল। কালিদাস যেরূপ কামীরের ও
হিমালয়ের স্বন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,
তাহা যথেষ্ট না দেখিলে কখনই এতাদৃ-
শ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতে বোধ হয়,
তিনি কামীর প্রদেশে অনেক কাল বাস
করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এইমাত্র বক্তব্য,
যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালি-
দাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে
তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান
ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক
মাত্র প্রামাণিক পুরাতন “রাজ ভরঙ্গী”
হইতে গ্রহণ করিলাম।

মলিনাথ সুরি মেঘদূতের চতুর্দশ সং-
স্কৃত শ্লোকের চীকার লিখিয়াছেন, কালি-
দাস দ্বিগুণাগাচাৰ্য্য এবং নিচুলের সম-
কালিক ছিলেন। দ্বিগুণাগাচাৰ্য্য কালি-
দাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়-
সূত্র রত্নিকার। কালিদাস রঘুবংশ, কুমার
সম্ভব, মেঘদূত, ঋতু সংহার, অভিজ্ঞান
শকুন্তলনাটক, বিক্রমোদধীশী দোষ্টক, মা-
লবিকাগ্নি মিত্র নাটক, নলোদয়, শূঙ্গার
ভিলক, প্রভৃতিবোধ এবং সেতু কাব্য প্রা-
য়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে রঘুবংশ,
কুমার সম্ভব, মেঘদূত, ঋতু সংহার, শকু-
ন্তলা, বিক্রমোদধীশী, মালবিকাগ্নি মিত্র
এবং প্রভৃতিবোধ, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত
হইয়াছে।

“পুষ্পেয় জাতি নগরেয়ু স্বাদী,
নারীযু রজা, পুরুষেয়ু দ্বিজ।
নদীযু গজা, নৃপতিচ রামঃ
সাব্যেয়ু মায়াকবি কালিদাসঃ”

ইংরাজস্তোত্র।

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ১।

তুমি নানা গুণে বিকৃষিত, স্বন্দর কান্তি-
বিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত; অতএব হে ইং-
রাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২।

তুমি ভীষণ—শত্রুদলের; তুমি কঠোর—
আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রচু-
তির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তো-
মাকে প্রণাম করি। ৩।

তুমি সমরে দিবাশ্রমধারী—শিকারে ব-
ল্লমধারী, বিচারাগারে অন্ধ ইক্ষি পরি-
মিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে
কীট চামুচে ধারী; অতএব হে ইংরাজ!
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৪।

তুমি একরূপে রাজপুত্রী মধ্যে অধি-
ষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর এক রূপে
পণবাহিকা মধ্যে বাগিজ্য কর; আর এক
রূপে কাছাড়ে চার চাস কর; অতএব
হে জিমুর্ভে! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ৫।

তোমার সন্তপ্ত তোমার প্রণীত প্রস্থি-
দিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমা-
র কৃত মুদ্রাদিতে প্রকাশ; তোমার তমো-
গুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্রাট
পদাদিতে প্রকাশ।—অতএব হে জিগুণা-
য়ক! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬।

তুমি বাছ, এই জন্যই তুমি সন্ত-
তোমার শত্রুর রণক্ষেত্রে চিত; এবং
তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ; অতএব

হে সজ্জনানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম
করি। ৭।

তুমি ব্রহ্মা, কেননা তুমি ঐজাপতি;
তুমি বিষ্ণু, কেননা কমলা তোমার প্র-
তিমি রূপা করেন; এবং তুমি মহেশ্বর,
কেননা তোমার দুহিণী গৌরী। অতএব
হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ৮।

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র;
তুমি চন্দ্র, ইন্দ্রক টেক্ষ তোমার বল্লভ;
তুমি বায়ু, রেইলগুয়ে তোমার গমন;
তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অত-
এব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ৯।

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে
আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে;
তুমিই অগ্নি, কেননা অগ্নি তোমার গমন;
তুমিই যম, বিশেষ অমলা বর্গের। ১০।

তুমি বেদ, আর স্বকৃষ্যবাদি মানি না;
তুমি স্মৃতি—মহাদি ভুলিয়া গিয়াছি;
তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি তো-
নারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তো-
মাকে প্রণাম করি। ১১।

হে শ্বেতকান্ত! তোমার, অমল-ধবল
দ্বিরদ-র-শুভ্র, মহাশ্রুশোভিত মুগ-
মণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হই-
য়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব
হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ১২।

তোমার হরিতকপিষ পিঙ্গললোহিত

কুক্কুশ্চাদি নানা বর্ণ শোভিত, অতি
যত্ন রঞ্জিত, ভল্লক মেদ মাচ্ছিত, কুন্তলা-
বলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে,
আমি তোমার স্তব্ধ করিব; অতএব
হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরান্বিতার, তাহার
শ্রবণেহ নাই। হাট তোমার সেই গোপ-
বেশের চূড়া; পেটলুন সেই ধড়া,—
স্মার ছইপ্ সেই মোহন মুরালী—অতএব
হে গোপোন্নত! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ১৪ ॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি
শামলা মাতায় বার্থিয়া তোমার পীতুং
বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও।
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ ॥

হে শুভকর! আমার শুভ কর। আমি
তোমার ধোয়ানোদ করিব, তোমার
প্রিয় কথা কহিব। তোমার মন রাখা
কাজ করিব—আমায় বড় কর। আমি
তোমাকে প্রণাম করি। ১৬ ॥

হে মানদ—আমায় টাইটল দাও, ধে-
তা ব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে
তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ১৭ ॥

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পা-
দ্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—
তোমার করল্পর্শে লোক মণ্ডলে মহামা-
নাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার
স্বস্তি লিখিত ছই এক খানা পত্র বাক্স
মধ্যে রাখিবার স্পষ্ট করি—অতএব হে
ইংরাজ! তুমি আমায় প্রতি প্রসন্ন হও;
আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮ ॥

হে অন্তর্ধান! আমি বাহা কিছু করি;

তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা
বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি
পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার
করি; তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি
লেখা পড়া করি। অতএব হে ইংরাজ!
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি
তোমাকে প্রণাম করি। ১৯ ॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিম্পেন্সরি
করিব; তোমার ঐতিহ্য স্থল করিব;
তোমার আজ্ঞামত তাঁরা মিব, তুমি আ-
মার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ২০ ॥

হে সোমা! যাহা তোমার অভিমত,
স্বাহাই আমি করিব। আমি বুট পাট-
লুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাটা চা-
মুচে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার
প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ২১ ॥

হে মিষ্টভাষিণ! আমি মাতৃভাষা ভাষা
করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম
ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব; বাবু
নাম বুটাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আ-
মার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে
প্রণাম করি। ২২ ॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি,
পাঁউরুটি খাই; নিমিষ্ট মাংস নাইলে
আমার ভোজন হয় না; কুকুট আমার
জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে
চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলিনের
জাতি মারিব; জাতিভেদ উঠাইয়া দিব
—কেননা তাহা হইলে তুমি আমার

স্বখাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ!
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪ ॥
হে সর্দদ! আমাকে ধন দাও, মান
দাও, যশঃ দাও;—আমার সন্তোষাসনা
সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও,
রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কোমিসলের
মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম
করি। ২৫ ॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে
দিনের আইহোম্ নিয়ন্ত্রণ কর; বড়
কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর,
জুজিস্ কর, অনুরারী মাজিস্ট্রেট কর,

আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬ ॥
আমার স্পীচ শুন, আমার প্রশ্নে পড়,
জামায় বাক্স দাও,—আমি তাহা হইলে
সমগ্র হিন্দুসমাজের পিন্ধাও গ্রাসা ক-
রিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম
করি। ২৭ ॥

হে ভগবন! আমি অকিঞ্চন! আমি
তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি
আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে
ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে
রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে
কোটিং প্রণাম করি। ২৮ ॥

সাবিত্রী।

তমিপ্রা রজনী যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমান গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কেলেতে করিলা যামির দেহ।
আধার গগন জ্বলন আধার,
অন্ধকার মিরি বিকট আধার,
দুর্গম কাহার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নেড়ে না কেহ ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব?
কেহল গরজেহিন্দু পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পানী শাখার।
সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও চোপে পতি সেহ-পরিঃ
পরশে অধর অনুভব করি,
নীচে কাদিলা চুখিছে তার ॥

হেরে আচমিতে এ ঘোর শজ্জটে,
ভয়বর ভায়া আকাশের পটে,
জিল যত তার, তাহার নিকটে,
ক্রমে স্থান হইবে গেল নিবিড়া।
যে ডারা পশিল কাননে,—অমনি,
পলায় যাপন, উঠে পনজননি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙ্গিল আপান,
মর্তী ধরে শবে বুকে ঝুটিয়া ॥

৪

মহা উজ্জল ঘোর বনশ্রী,
মহা গদা ব্রহ্মা, যেন বা বিজুলি,
দেখিলা সারিত্রী, যেন ব্রহ্মাবলী,
ভাঙ্গিল নিরুরে আলোকে তার।
মহা গদা দেখি প্রথমিলা মর্তী,
জানিলা কৃতান্ত পরলোক পতি,
এ ভীষণ ভায়া তাহারই মূর্তি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার ॥

গভীর নিশ্বনে কহিলা শমন,
থরং করি কাঁপিল গহন,
প ত গন্ধরে জ্বলিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মায়ে ।
“কেন একাকিনী যাবনদিনি,
শব লয়ে কোলে ব্যাপিল যামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধিনী,
মম সঙ্গে তব বাঁধি কি নাজে ?

“এ সংসারে কাল বিরাম বিহীন,
নিরমের রুখে ফিরে রাতি দিন,
যাহারে পরশে সেই মম অধীন,
ছাবর জগন্ম জীব সবাই ।
সত্যবানে আমি কাল পরশিল,
লতে তবৈ মম তিক্তর আসিল,
সাদ্রী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এনেছি তাই ॥,

৭
সব হলো বুঝা না শুনিলা কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নাহে পরশিতে সাদ্রী পতিব্রতা,
অধর্মের ভয়ে ধর্মের পতি ।
তখন কৃতান্ত করে আর বার,
“অনিতা জানি এ ছাবর সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি ॥

৮
“রক্তচক্র শিরে রক্তজুতা অঙ্গে,
রক্তাসনে বসি মহিবার সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
জীবাগ্নিরা রাজ্য লই তাহারে ।
দীর্ঘদর্প ভাদ্রি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপনীরে,
জান গোপ করি গরাসি জানীরে,
সুখ আছে শুধু মম আগারে ॥

৯
“অনিতা সংসার পুণ্য কর মার,
কর নিজ কর্ম নিয়ত যে মার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দ্বিই আমি তবে করম ফল ।
যত দিন মতি তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম এলো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত হবে কাঁছে কাজে,
জুগ্মবে অনন্ত মহা মঙ্গল ॥

১০
“অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত ।
দম্পতী আছয়ে নাহি বিবধা ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জন,
রূপ আছে, নহে রিপু দুরন্ত ॥

১১
“রবি তথা আশোক করে, না করে দাহন,
নিশি ক্ষিতকরী, নহে তিমির কারণ,
যুদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পথন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলস্ত ।
নাহিক কল্ক তথা কুসুম রতনে,
নাহিক তরঙ্গ যজ্ঞ কেলোলীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ মরসে নাহিক পঙ্ক ॥

১২
“নাহি তথা মারাবশে বুথায় বোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বুথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বুথায় মতন,
নাহি অশ্রু লেশ, নাহি অলস ।
লুপা কুলা তরা নিদ্রা শরীরে নাহি,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিবা জ্ঞানের উদয়,
দিবা নেত্র নিরন্তর দিক দশ ॥

১৩
“জগতে জগতে দেখে পরমানু রাশি,
মিলিছে ভাদ্রিছে পূনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কাল তরঙ্গে ।
দেখে লক্ষ কোটি ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটি কোটি ফিরে গুহগণে,
অনন্ত বর্জন রব চিন্তিছে অবশে,
মাতিলে চিত্ত সে গীত তরঙ্গে ॥

১৪
“দেখে কর্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে,
নিরমের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেদীর মণ্ডলে,
নির্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নাহে ।
ক্ষণকাল তরে মরে ভবে দেখা দিয়া,
জলে ঘেন জলবিধে যেতেছে মিশিরা,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আসিয়া
পুণ্যই সত্য অন্তা সংসারে ॥

১৫
“তাই বলি কখনো, ছাড়ি দেহ মায়া,
তাজ বুঝা কোভ; তাজ পতি কায়া,
ধর্ম আচরণে হও তার জায়া,
দিয়া পুণ্যধাম ।
গৃহে যাও তাজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিলিবে জুগ্মল,
দিগ্ধ হবে কাম ॥”

১৬
শুন যম বাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখ খানি,
ডাকিছে সাবিত্রী;—“কোথায় না জানি,
কোথা গুহে কাল ।

দেখা স্নেহে রাখ এ দামীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের স্থান,
পরশিয়ে কর এ শব্দটো ত্রাণ,
মিটাও জুগ্মল ॥

১৭
“স্বামী পদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি আমি,
যদি থাকে বিধে তেঁহে অর্থবী,
রাখ মোর কথা ।
সতীছে য়াকপি থাকে পুণ্যফল,
সতীছে মনাপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে, দিবে পদে স্থল,
জুড়াও এ কথা ॥”

১৮
নিরমের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীক্স রতন,
সাবিত্রী সুদর্শী ।
মহা গদা তবে চমকে তিমিরে,
শব পদ রেগু তুলি লয়ে শিরে,
তাজে প্রাণ সতী আঁচি ধীরে ধীরে,
পতি কোলে করি ॥

১৯
বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল জুতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরী যুগলে,
বিজিত বিমান ।
জন্মিল তথা দিবা তরুণর,
সুগন্ধি কুসুম শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লুতা মনোহর,
সে সিক্ত স্থানে ॥

धर्मनीति ।

আজি কালি ধর্মনীতির প্রতি সমাধা-
রণতঃ লোকের যেরূপ অনাস্থা দেখা
যাইতেছে, তাহাতে দেশের আরও কি
দশা ঘটিবেক, ভারিয়া স্থির করা যায় না ।
ধর্মই ধর্মনীতির মূল । কিন্তু সে ধর্মের
প্রতিও আর লোকের তাদৃশী প্রজ্ঞা
লাই । ধর্ম যে ভক্তির সামগ্রী, তাহা
এক প্রকার সকল ভুলিয়া যাইতেছেন ।
ধর্মের এসম্মত মানেই অনেক চমকিয়া
উঠেন । এবং মনে মনে “ধূর্ত, কপট্যা-
চারী, এতদরক” ইত্যাদির আন্দোলন
করিতে করিতে শীঘ্রই বাহ্যতে এসম্ম-
তারূপের সন্নিহিত আলাপ বন্ধ অথবা তা-
হার সম্মত ভাগ করিতে পারেন, সেই
চেষ্টা করেন । ইহাতে আশ্চর্যের বিষয়
কিছুই নাই । বহুকাল হইতে এদেশের
হিন্দু ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকি-
তে, তৎপ্রতি লোকের অচলা ভক্তি
এবং দৃঢ় বিশ্বাস জগিয়াছিল ; সকলেই
নির্মিলেপে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার
পরিপালন করিয়া আসিতেছিলেন
কিন্তু কালক্রমে দেশ মধ্যে বিদেশীয় ভি-
ত্তির জাতির সমাগম, এবং তন্নিবন্ধ-
তাহাদের ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রাদি অধ্যা-
সন করিবার উত্তম সুযোগ হওয়াতে অ-
নেকে তাঁহাদের প্রভাবের অবলম্বিত
ধর্মের সন্নিহিত আপন আপন ধর্মের তুল-
না করিতে সক্ষম হইয়া বাহার বে-
দোষ ও যে গুণ, তাহা বুঝিতে পারিয়া
ছেন । এবং কৈহই অন্য ধর্মের সারমত
বুঝিতে পারিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া

ছেন, কেহ কেহ বা হিন্দুধর্মের সারাংশ
নির্ধারন করিয়া লইয়াছেন। এপ্রমোক্ত
দলের কোন কথাই নাই; তাঁহারা ধ-
র্মোন্মত্ত হইয়া অকুতোভয়ে সমাজ বন্ধন
এক বায়েই ছিদ্দন করিতে সর্মথ হই-
য়াছেন। কিন্তু শেখোক্ত সম্প্রদায়ের
তরুণ ঘটিতে পারে নাই। সম্প্রতি
যদিও অধিকাংশ লোকে এই সম্প্রদায়ের
অভুগামী, তথাপি তদাধো অনেককেই
হিন্দু সমাজের গঠিত একবারে সম্পর্ক
অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহা-
দের প্রকৃত মত বাছাই হউক, একাংশে
হিন্দুর ন্যায় সকল আচার ব্যবহার মানা
করিয়া চলিতে হইতেছে। দৃঢ়তা নাই,
এই মাত্র বিশেষ। অনেকে আবার নানা
ধর্মের সর্ম্ম অবগত হইয়া, কোন ধর্ম্মে যে
মতি স্থির করিবেন, অদ্যাপি বুঝিয়া
উঠিতে পারেন নাই।

ধর্ম সম্বন্ধে দেশের আধুনিক অবস্থা
এই রূপ। কিন্তু কোন ধর্ম বিশেষের
আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।
যিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন, ধর্মনীতির
প্রতি সকলেরই সমান প্রাণা পাকী উ-
চিত। ধর্মনীতি ধর্মের সাধারণ পদার্থ,
সকল ধর্মেই ইহার উপদেশ দিয়া থাকে।
ধর্মে মতভেদ অপরিহার্য, কিন্তু ধর্ম-
নীতিতে তত্রাপ হইবার আরশ্যাকতা
নাই। কিন্তু কোন ধর্ম মনোনির্ভর করিয়া
ভাবুতে নীকিত হইলে, তৎপ্রতি দৃঢ়
ভক্তি ও বিশ্বাস হইলে নিত্যম্ আশ-
শ্যক। ভক্তি থাকিলে যে ধর্মেই অবলম্বন

করা যাউক না, তাহাতে ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য গিল্লির সম্ভাবনা আছে। 'ভক্তি' না থাকিলে ধর্মদানিতর প্রতিও শৈথিল্য হয়। এবং একগুণ শৈথিল্য অগ্রযুক্ত সমাজের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সংপ্রতি বন্ধীয়সমাজ এই দোষে দূষিত হইতেছে। সকলেরই ইহা মনোযোগ করিয়া দেখা উচিত। এই সময়ে প্রতিভাবানের চেষ্টা না হইলে পরে কঠিন হইবেক।

আজিকালি সাধারণতঃ নীতির প্রতি লোকের এত দূর উপেক্ষা যে তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে অথবা কেহ কোন প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রায়ই প্রবণ বা পাঠ্য যোগ্য হয় না। এমনকি বক্তা বা লেখককে বাতুল বলিয়া উপহাসও করেন। হাঁহাদের মত এই যে, নীতিসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান আবশ্যিক, তাহা বহু দিন জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। আর তাহাতে হতন কিছুই নাই। যদি কেহ কিছু এক্ষণে হতন লিখিতে পারেন, তাহা হইলে পাঠ করিতে কিম্বা তাহা আলোচনা করিতে কাহারও অনিচ্ছা নাই। এক্ষণে যে নীতিসম্বন্ধে হতন কিছু উপস্থিত নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি। এক্ষণকার কথার কাজ কি, যেদিন “আত্মবৎ সর্গস্ফুটতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ” এই নীতি স্বত্ত্বের সন্মত এতম উদ্ভাবিত হয়, সেই দিনে তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বহুদায়, সংক্ষেপে তৎসমুদায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে কি আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই? হুম্মিলে হইবামাত্রই ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে যে ভাগ আমাদের নমনপথে পথিত হইয়াছিল, যাহা এতদিন দেখিলাম

যদি সেয়ে দেখাতেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, আর জ্ঞানিবার প্রয়োজন না হয়, তবে নীতিজ্ঞানেরও যে আর প্রয়োজন নাই, একথা স্বীকার করা হইতে পারে। কিন্তু তাহা যখন কোন ক্রমে সম্ভব কথা হইতে পারে না, তখন নীতি সম্বন্ধেও তজ্জপ বুঝিতে হইবেক। আর যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, নীতি বিষয়ে যাহা কিছু আবিস্কৃত হইবার, হইয়া গিয়াছে, কামিনকালেও আর কিছু হুতন বাহির হইবেক না, তাহাতেই বা কি? নীতি শুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় নহে, প্রত্যন্ত সর্বদা আলোচনার বিষয়। তদ্ব্যতীত নীতিশাস্ত্রে যে যে বিষয় উদ্ভাবিত হইয়া রহিয়াছে, সে সকলেরও বিশ্বর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে। আমরা যে এই প্রস্তাবে তজ্জপ কোন প্রয়োজন সাধন করিতে পারিব, এমন বোধ করি না। কিন্তু দোষ ও ছল ধরিবার ক্ষমতা সাধারণ; আমরা যদি সমাজের কোন দোষ অথবা জন্ম দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা কইলে বোধ হয়, যেটি আমাদের অনর্থক কার্য্য নহে। বিশেষতঃ সমাজের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল; যাহাতে আমাদের মঙ্গল, তাহাতে আমাদের বার্থ আছে। বন্ধীয়া সমাজে আমাদের বার্থ আছে। যাহাতে আমাদের বার্থ আছে, যাহাতে আমাদের কোন একর ইষ্ট প্রঞ্জন রহিয়াছে, জানিতে পারিলেই তাহার দোষ আমরা অবশ্যই প্রকাশ করিব। দোষ একাশে দোষের তিরোভিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়াই প্রকাশ করিব।

• যতদিন মানব স্বভাব আছে, ততদিন

তাঁহার দোষও আছে। যিনি যে কেন নীতির উন্নতি করেন না, কেহই কখন এমন প্রভাশা করিতে পারে না যে, এ জীবনে তিনি সেই উন্নতির সীমা দেখাইতে পারিবেন। পারিলে তিনিই দেবতার মধ্যে গৃহ্য; তখন তাঁহাকে আর মানব কে বলে? কিন্তু মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ অসারূপ; উন্নতিশীল, অচ্যুত কোন কালেও একবারে দোষ শূন্য নহে। মহামহোপাধ্যায় গণ্ডিতুল্লুচাঁদমণিরও দোষ আছে, আর সাধারণতঃ “বৃত্তলোক” এই উপাধিধারী ব্যক্তিরও দোষ আছে; অধিকন্তু সে সকল আবার এমন প্রকারের দোষ যে, তত্ত্বজ্ঞানের নিকটোরেই স্পষ্ট চক্ষুতে তাহা দেখিতে পায়।

মন্মথের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যিনি যত ইচ্ছা সাধন হইয়া চলুন না, কল্পিনকালে তদীয় উত্তর পুরুষের মধ্যে কাহারও ভ্রমস্পর্শ নির্দেশ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমগুণে অবতরণ করিবার সম্ভাবনা আছে, এমন কিছুতেই বোধ হয় না। আমাদের প্রকৃতির দুই অংশ শরীর ও মনঃ। এ দুইয়ের কোন না কোন দোষ লইয়াই প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ ইহাতে বিশ্বাস জন্ম করিয়েন না। মানবস্বভাব যে কোন কালেই একবারে নির্দোষ ছিল না, তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে “চুল্লিকা স্বর্ভূত ইহক, দোষ একবার আমাদের প্রকৃতিগত হইলে তাহার ফল যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা এককালীন সাধ্যাতীত বলি-গাই অগত্য একরূপ বলিতে হইল। ফলতঃ দোষ যে এক প্রকার স্বভাবের দৃষ্টি,

একধে আর তাহা স্বীকার না করিয়া পাড়া যায় না। এই কৃতি পুত্রগণ সর্বদা প্রার্থনীয়, কিন্তু কোন অংশেই সহজ বাণীপার নহে। এমন কি, তদ্বদ্যো যমুদায় জীবন বাপন করিলেও কৃতকার্য হওয়া যায় কি না, সন্দেহ। বাহা হউক, ইহাতে হতাশাস হইবার বিষয় কিছুই নাই। মানব স্বভাবের যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। আমরা স্বভাবতঃ দোষের বিরোধী, এবং গুণের অভিলাষী। দোষ পরিজ্ঞানমাত্রেই তৎপ্রতি আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়া থাকে; এবং বাহ্যতে উহা একবারে দূর হয়, সেই ইচ্ছা বলবতী হয়। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে কোনমতেই অলস হওয়া উচিত নহে। আলস্যেই সহজ শীথা প্রশাখা বিস্তার করে। স্বভাবের দোষ যদিও একবারে যায় না, কিন্তু উহার সমুলোপচারণা সম্পূর্ণ করিয়া অনবরত চেষ্টা করিলে, এবং সর্বদা সতর্ক থাকিলে, কালে উহা আর আছে, এমন বোধও করা যায় না। উহার অন্তিম প্রসবিনী শক্তি ধ্বংস করা আমাদের শেষ সাধ্যাত্তন। তাহা হইলেই এ জীবনে দোষে কল্যাণ হইল। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও স্বভাবের কোন দোষ পরিহার করিতে না পারিলে, তজ্জন্য হতাশ বা অসুখী হওয়া উচিত নহে। বরং তখন সন্তুষ্ট চিত্ত গুণ বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা ভাল। গুণ বাহুদেয় দোষ অক্ষয় করিয়া রাখা যায়।

মানব স্বভাবের একটি ভয়ানক বিপদ আছে। দোষ প্রবণতাই সেই বিপদ। আমরা সহসা এবং অতি সহজে দোষ

করিতে পারি। ফলতঃ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন এ সংসারে দোষ করা এবং দোষ না করা ভিন্ন আমাদের আর কার্যই নাই। চিরকাল দোষ সংশোধন করিতে থাকি, এই উদ্দেশ্যেই যেন আমাদের স্বষ্টি হইয়াছে। আর এ জীবনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া আমাদের আরও একপ্রকার অন্তিম আছে, একরূপ বিশ্বাস করা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নহে। সে যাহা হউক, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কোন দোষ সংশোধন করিতে পারিলে তাহাতে প্রকৃত স্বস্থ আছে। বোধ হয়, যে দিন আমরা আমাদের সমুদায় দোষ সংশোধন, অর্থাৎ দোষ প্রবণতাকে এককালীন ধ্বংস করিতে পারিব, সে দিন আমাদের স্রষ্টা হইতে অধিক দূরবর্তী থাকিব না।

আমাদের আরও এক বিপদ আছে। আমরা সম্যক প্রকারে আপনি আপনার দোষ দেখিতে পাই না। দোষ সংশোধন করিবার এই এক প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের স্ব স্ব অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু তথাপি আমরা সে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারি না। যিনি যতই কেন আত্মপরীক্ষায় তৎপর হউন না, আপনার সকল দোষ আপনি দেখিতে পাইবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয়, আত্ম-বিশ্বাসের যথার্থ সীমা এবং পরিমাণ বৃদ্ধিতে পারা যায় না। বলিয়াই স্বদেশের প্রতি অন্ততঃ দূর হয় না। এই জন্যে বাহিরের সাহায্য প্রয়োজনীয়, আর এই জন্যেই বোধ হয়, কোন কবি এই মর্মে লিখিয়া গিয়াছেন;—

“আপনাকে কি বিশ্রাম, জানিতে বিশেষ নিজের সন্তক দোষ, তাজি অভিনাম-রোষ, যাহু নিম্ন উভয়ের ধর উপদেশ।”

বস্তুতঃ নিঃসন্দেহ এবং শত্রুৎক ব্যক্তিরাই আমাদের দোষ সর্বাঙ্গীন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। এবং একরূপ স্থলে তাহার আমাদের আত্মীয়ধর্ম অপেক্ষাও অধিক হিতকারী।

স্বাক্ষর চরিত্র সংশোধন এবং স্বভাবের উন্নতি, সাধনই আত্ম পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অগ্রে আপনার দোষ সমূহের পরিজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নতুবা যাহার অন্তিমই সন্দেহ জনক, তাহার দৃষ্টি কে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারে? কিন্তু দোষ পরিজ্ঞান মাত্রই যে আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল, একরূপ বোধ করা সম্পূর্ণ জন্মের কার্য। উহার ফললাভ আরও কিছু মাপেঞ্চ; সেই কিছু অভাস। যখন নিঃসন্দেহ আপন কোন দোষে বৃদ্ধিতে পারা যায়, তখন তৎপ্রতিবিধানার্থ অভাসের শরণ লওয়া আবশ্যক। অনেক দিন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তৎপ্রতি আমাদের এক প্রকার আশক্তি জন্মিয়া যায়; এই আশক্তি দৃঢ়, বন্ধনুল ও স্থায়ী হইলে অভাস রূপে পরিণত হয়। কোন দোষ পরিহার করিতে হইলে অগ্রে তৎপ্রতি পূর্বের আশক্তি ভাগ, এবং তৎপরে অভাস দ্বারা তাহার বিরোধী গুণের আয়ত্ত করা আবশ্যক। অভাস আমাদের সাধারণ শক্তি নহে। যাহা কিছু স্বভাবে স্থান, অভাস তাহাও অনেক কাল পর্যন্ত স্থায়ী করিতে পারে। বস্তুতঃ

অভ্যাস আমাদের স্বভাবের সহায়, কার্য-
স্বত্বের প্রবৃত্তি। এই গ্রন্থের শিখিত্যায়
সকল কার্যই শিখিত হইয়া যায়। এই
গ্রন্থের অবিস্মার্যে "নিয়মাবলী" কেতুক
মাত্র; কুর্য্যকলাপ বিশৃঙ্খলা ব্যতীত আর
কিছুই নহে। ইহার শক্তি করুণ ও রুতর,
এবং প্রকৃতি করুণ অপরিবর্তনশীল, যিনি
কখন স্বকীয় বহুকাল ধৃত কোন ক্রিয়ার
পরিবর্তন সাধনে কৃতসম্মুখ হইয়াছেন,
তিনিই তাহা সমাখ প্রকারে বুঝিতে
পারিয়াছেন। জড় পদার্থে কোন প্রকার
বল প্রয়োগ করিলে যেমন সে প্রতিনিয়-
ত সেই বেলের প্রতিনিয়ত থাকে; এবং যথেষ্ট অধিবদ্ধক উপস্থিত
না হইলে, সহ্য প্রলয় পর্য্যন্ত এক ভাবে
চলে, একবার অভ্যাসের অধীন হইয়া প-
ড়িলে মানব প্রকৃতিরও সেই রূপ অবস্থা
ঘটে। তখন ইহাকে প্রতিনিয়ত করা
নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও সহজ পা-
রিবার শাখা কি? তজ্জন মহা বিপদগ্রস্ত
হইতে এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে
হয়। অধিক কি, বহুকালের অভ্যাস হইলে
চরমকাল ভিন্ন প্রায়ই তাহার হাত হইতে
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

এই শক্তির বিষয় প্রাচীনালোচনা করিতে
করিতে মনোনাশক এই এক প্রবেশের
উদয় হয়, এবং তজ্জনিত এক চমৎকার
আনন্দ অল্পভব করিতে পারা যায় যে,
যে-জান পথাভীত মহাপুরুষ, যে অনাদি
অনন্ত সময় ও স্থান ব্যাপী এই বিশ্বের
নিয়ন্তা মানবরূপ আত্মা জীবের সৃষ্টি
করিয়া তাহাকে স্বভাব প্রদান করিয়া-
ছেন, তিনি সেই স্বভাব দোষ শূন্য নহে
জানিয়া তাহাকে বাধ্যতার নিতান্ত অন-

ধীন করিয়া দেন নাই। এই বাধ্যতাই
অভ্যাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। মচরাচার
আমরা যে সকল সঙ্গুণের কামনা করিয়া
থাকি, তাহা প্রায়ই অভ্যাস দ্বারা বদ্ধ
হইতে পারে। অধিক কি, সংসারের
মধ্যে অস্থিতিয়-প্রার্থনা কেনের মুখ; ম-
নের মুখ না থাকিলে কেহ কোন মহৎ
কার্য করিতে পারেন না; কিন্তু সে
স্বপ্ন ও অভ্যাসের অধীন। তদ্ব্যতীত বিদ্যা
ধন, মান; বশ্য প্রভৃতি যে সকল প্রার্থ-
নীয় বস্তু আছে, সে সকল ইঞ্জিয় ও মনো-
রক্তি পরিচালন এবং আপন কর্তব্য সম্পা-
দনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই
ইঞ্জিয় ও মনোরক্তি পরিচালন এবং ক-
র্তব্য সম্পাদনেও আত্মদিককে কতদূর অ-
ভ্যাসের অধীন হইয়া চলিতে হয়। অ-
ভ্যাস ব্যতীত আর কিসে রূপের স্থিরতা
ও স্থায়ী সম্পাদন করিতে পারে? ফ-
লতঃ আমাদের প্রকৃতির সমুদায় উৎকৃষ্ট
শক্তির মধ্যে অভ্যাস একটা সাধারণ
নহে। সকলেরই ইহা অস্বাভাবিক করিয়া
দেখা উচিত, এবং শৈশবাবধি বাহ্যে
নীতি ও সঙ্গুণের অভ্যাস জন্মে, তাহার
গুণের কথা আবশ্যিক। স্বভাবের দোষ
ও তাৎক্ষণিক তিরস্কারের যোগ্য নহে। বাহ্য
স্বভাবের দোষ, তাহা কথঞ্চিৎ মার্জনীয়;
কেননা তাহা আমাদের ইচ্ছা পূরক হয়
নাই। বাহ্য অভ্যাসের দোষ, তাহা মার্জ-
নীয় নহে, কারণ আমরা "স্বয়ংই সে দো-
ষের কর্তা।" বাঁহা স্বভাব সিদ্ধ কোন
সঙ্গুণ থাকে, আমরা তাঁহাকে প্রশংসা
করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি বহু বস্তুর ও বহু
কষ্টে কুসংসার রূপে হৃদয়ে শৃঙ্খল ছে-
দন করিয়া সঙ্গুণে জুড়িত হন, তাঁহারই

বর্ধাধ পৌরষ। তিনিই আমাদের অধিক-
তর এবং প্রকৃত প্রশংসার পাত্র।

সুদীক্ষা এবং সংপ্রতিষ্ঠ মানব জাতির
বর্তমান গুণ। লোকে সাধারণতঃ সত্য-
প্রিয়, সঙ্গুণবান্ধবী, হিতৈষী, স্বাভা-
বীতির উৎকর্ষসাধনে ইচ্ছুক, ধর্মভীত
এবং অনান্য যে সমস্ত গুণ থাকিতে
মহুযা নামের এত পৌরষ, সে সকলেই
জন্মদায়ী। ইহার বিরুদ্ধে যিনি যাত্রা
ইচ্ছা করেন, বলিতে পারেন; কিন্তু
ইহা সাধারণের ব্যবহার দ্বারা প্রতিপন্ন
হইতেছে। স্বপ্রশ্রীতি প্রাণীরবর্গের পীড়ন
ভয়ে অভিভূত না হইলে, যে দম্য, সে
মহুদ-চিহ্নে স্বীকার করে, তাহার কার্য
অতি গর্হিত; পয়ের সম্পত্তি অপহরণ
করা অস্বচিত; যে গুপ্ত যাতক, সে স্বা-
কার করে, তাহার মন নরাধম পৃথিবীতে
আর নাই। অন্য দিকে প্রভাবক, প্রভা-
বগ; এবং বিশ্বনিম্মক, পরনিমদা; দোষ
বলিয়া স্বীকার করিতে কিছু যাত্র কুণ্ঠিত
হয় না। ফলতঃ এই রূপ সকল দোষী
ব্যক্তিই আপন আপন দোষ স্বীকার,
করিতে প্রস্তুত। ইহাতে কেহ বিম্বিত
হইবেন না। "এক্সপ সহজে প্রদায় স্বীকার
অযৌক্তিক নহে।" বাবৎ অন্যের নিকট
হইতে আপন ব্যবহারের তুল্য প্রতিদান
না পাওয়া যায়, অথবা অন্যের ব্যবহার
দ্বারা আপন স্বার্থের কোন প্রকার হানি
না হয়, তাবৎ "কেহ ব্যবহারের দোষ-
বোঝ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এক্ষণে
আমরা কান সামাজিক ব্যক্তির সে দোষ
জগ্মির্ভে বাকি আছে? দোষী ব্যক্তি
আপনার গুণ স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে
আপনাকে দোষী ভাবিতে চাহে না,

কিন্তু আপনায় ব্যবহার যে দুর্বলী,
অভিপ্রায় কোন গতিকে ব্যক্ত হইলে
এবং অভ্যাসের ভয় না থাকিলে, তাহা
অন্যায়সে স্বীকার করে। অধিকন্তু হৃদয়
জন্মিত অন্তরের অমুখ নিতান্ত অপর-
হার্য। দোষী ব্যক্তি যতই কপট ভাবা-
বলন করুক না, সে অমুখ তাহার অ-
ন্তর ভেদ করিয়া বাহ্য অবয়বে প্রকাশ-
পায়। অনেক সময়ে তাহার স্বার্থপর-
তাতেও তাহার দোষ গোপন করিয়া
রাখিতে পারেন না। কোন কোন বি-
শিষ্ট পণ্ডিতের মত এই যে, অভ্যাস
প্রভাবে অসৎকার্য জনিত আত্মরানিও
কাল ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক-
বারে বিলুপ্ত হয়, একথা আমরা স্বীকার
করিতে পারি না। এই মত বলা বাইতে
পারে যে, অভ্যাসের গুণে কখন কখন
বিশুদ্ধ প্রায় হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে
কি? সময়ে সময়ে সে আত্মরানি
ভ্রমাদ্বাদিত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত
হইয়া হৃদয় কন্দর দাহন করে, কোন
ক্রমেই নিবারণ করা যায় না।

অন্যের মনের কথা জানিতে হইলে
আমাদের স্বয়ং মনই আলোচনার বিষয়।
তদ্ব্যতীত অন্য কোন, মনুপায় নাই।
আমি স্বয়ং যখন জানিতে পারিতেছি,
যে আমার এমন অনেক দোষ আছে,
যাহা অভ্যাস সিদ্ধ, বিস্তরকেটা ক্রিয়া
ও অদ্যাপি তাহা পরিহার করিতে
পারি নাই, এবং তজ্জনিত অপ্রসন্নতা
মধ্যে মধ্যে আমার চিত্তের শান্তি হরণ
করে, নিবারণ করিতে পারি না; তখন
কেননা বিশ্বাস করিব যে, বঁত বড় রক-
মের অথবা যত ভিন্ন প্রকারের দোষই

হউক না, অন্যের সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে ?

যাহা-হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসাই এই যে, দোষ হইতে চিত্তেই যে অপ্রসন্নতা জন্মে, তাহা হইতে কি উপলব্ধি হইতেছে না যে, মনুষ্য মানবোই স্বভাবতঃ সত্য, ধর্ম ইত্যাদির বিবেচী নহে ? অজ্ঞতা, অ-ভ্যাস, কুসংসর্গ ও ইত্যাকার অন্যান্য প্রতিভুল কারণেই তাহাদিগের বর্তমান ক্ষুব্ধবস্থা ব্যটিয়াছে। যাহারা অজ্ঞতা প্র-যুক্ত দোষী, তাহারা কোন মতেই নিম্নোক্তকাল নহে; অভ্যাস দয়ার পাত্র। যে কার্য দৃঢ়, তাহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিলে কাহারও আর তৎপ্রতি প্রজ্ঞা থাকে না, স্বতরাং শীঘ্রই তাহা পরি-ত্যাগ হইতে পারে। কিন্তু কে তাহা-দিগকে বুঝাইয়া দিবে ? আমরা ইহা বলিতে চাহি, যে অল্পকাল ধারণ বশতঃ যে যে ব্যক্তি প্রচুর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এবং স্ব স্ব নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই সদয় হইলে অসৎকেও সংপর্শে লইয়া যাইতে পারেন। উপকীর্তিয়ারক্তি পরি-চালনের যদি কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে, তবে এই কার্যোত্তেই আছে। কিন্তু অনেকে তাহা না করিয়া আবার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করেন; তাহার। দুষ্টিয়াসক্ত, ব্যক্তিদিগকে অশুভকরণের সহিত ঘৃণা করেন। এই ঘৃণাই তাহা-দের সর্বনাশের মূল হয়। তাহারা আ-পনাদিগকে নিতান্ত পরিত্যক্ত জানিয়া ক্রমাগৎ অধিকতর পাপপক্ষে নিমগ্ন হইয়া দিন দিন দুষ্ট প্রভাও বৃদ্ধি করিতে থাকে।

পাপাকে সাধু করা বড় সহজ কথা নয়। ইহাতে অনেক যত্ন, অনেক সত-কতা, মানব প্রকৃতির অনেক জ্ঞান থাকা চাই। এমন কি, কিছু ক্ষণের নিমিত্ত আ-পনার স্বার্থ পর্যাণ্ড বিস্তুত হইতে হয়। এসংসারে প্রেমাই হৃদয় রাজ্যের অস্বি-তীয় ঈশ্বর। কি শিশু, কি যুবা; কি প্রবীণ, কি বৃদ্ধ; কি ধনী কি দিগ্ধ; কি পাপী, কি সাধু; কি বিদ্বান, কি মুখ; কি শত্রু, কি মিত্র; সকলেই এক বাক্যে ভাল বাসার দাস। অন্যের অশুভকরণে প্রযুক্ত করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভাল বাসা দ্বারাই তাহার পথ করিতে হয়, মনুষ্য উপায়ান্তর নাই। অসাধু ব্যক্তিকে ভাল না বাসিয়া উপদেশ বা সংপর্শ মর্শ দান করিলে কি হইবে ? হয় তা সে উপদেশদাতাকে স্তূতন্ত্র প্রকৃতির লোক, এবং তিনি যে প্রকারান্তরে তা-হার উপর কর্তৃত্ব করিতে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। স্বতরাং তাহার উপদেশ বাণীতে তাহার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয়, এই নিমিত্তেই ইংলণ্ডীয় কোন প্রসিদ্ধ নীতিবেত্তা লিখিয়াছেন যে, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে এরূপ ভাবে দেওয়া আবশ্যিক, যেন সে বুঝিতে পারে, সেই উপদেশে সে নিজেই নিজের উপদেষ্টা হইতেছে, চিন্তা অন্য কেহ তাহাকে প্ররতি দিতেছে না। এই রূপ পূর্ণরূপ শিক্ষাদানেরও উদ্দেশ্য ভাল-বাসা দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে। ব্যক্তি মাত্রেই নৈসর্গিক ইচ্ছা এই যে, অন্য ব্যক্তি তাহার সম স্বত্ব দ্বুখে ভাগী

হয়। উপদেশগ্রহীতা যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার সহিত উপদেশ দাতার সম্বন্ধতা আছে, তাহা হইলে উপদেশ গ্রহণে তাহার আর আপত্তি থাকে না। যে তাহাকে আপনার সহিত সাধারণ স্বত্বাধাপন বোধ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, এবং প্রকৃতই যে তিনি তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, বুঝিতে পারে। তখন আর তদীয় ব্যব-হার তাহার অসহনীয় নহে। কিন্তু এই সম্বন্ধদায়ক উৎপত্তি কোথায় ? ভাল বাসা বাতীত আর কিসে অন্যের অশু-করণের দ্বার উন্মোচন করিতে পারে ? বস্তৃতঃ সম্বন্ধতা না থাকিলে যে পরের প্রকৃত উপকার করা যায় না, এবং সর্ব-ময় স্নেহের অভাবে যে সর্ব প্রকার সদ-গুণও থাকে না থাকা সমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর গুণে মনু-ষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব কিসে হয়, এদেশীয় নবাগণ ভুরি ভুরি উৎকৃষ্ট প্রহু পাঠ করিয়া তাহা পুণ্যাহুগুণ্য রূপে জানি-তেছেন। বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে তাহাদের মহৎ হইবার ইচ্ছাকৃত বল-বতী দেখা যায়। তখন রোধ হয়, যেন জতি সামান্য সদগুণেরও প্রশংসা তাঁ-হারা এক মুখে করিয়া উচ্চিতে পারেন না, ধর্মনীতি সকল মুর্ত্তিমতি হইয়াই যেন তাঁহাদের জিজ্ঞাস্যে নৃত্য করিতে থাকে। সদগুণের প্রতি তাঁহাদের তাৎ-কালিক প্রজ্ঞাতক্তি দেখিলে কাহার বা মনে হয় যে, ইহারা ই দ্বুভ মানব কার্যের রঙ্গ ভূমি স্বরূপ সংসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে না জানি লোকের মনে

স্বত্ব প্রভাও কত বেগেই উজ্জলিত হইয়া উঠিবেক; না জানি তাহাদের অনন্য সাধারণ সম্ভাবহার দর্শনে বিম্বিত যশেশ-বাসিনী তাহাদিগকে প্রশংসা নীত স্নানিতে সন্তুষ্ট করিতে কতই প্রতিঘো-গিতা দেখাইবেক! কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে অন্যতি বিলম্বেই বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এককল প্রভাশ-সম্পূর্ণ অমমূলক। কৃত বিদ্য মহাশয়ের। কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতেই স্বতন্ত্র প্রাণী হইয়া বসেন। তখন তাঁ-হারা হয় পূর্ণদৃঢ় ধর্মনীতি সকল সে কালের চিন্তাশীল বায়ান্তরা পণ্ডিত দি-গের বুঝিবার ভুল, না হয় বর্তমান কা-ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অল্পযুক্ত বিষয়, স্থির করিয়া সে সকল বিস্তৃতির অতল জলে বিসর্জন দিতে চেষ্টা পান; এবং কখন ইচ্ছাকৃত দ্বারা, কখন বা অজ্ঞাতসারে দিন দিন পাপের পথ প্রশস্ত করিতে থাকেন। তাহাদের এতদ্রূপ অসম্মত এবং অজুত ব্যবহার দর্শনে জন সাধা-রণের মনে নান্য কৃতক উপস্থিত হইয়া থাকে; কেহ কেহ তাহাদের প্রতি যৎ-পরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু তাহাদিগকে অপ্রজ্ঞা করিলে কি হইবে? কি কারণে তাহারা এরূপ হইতেছেন, তাহাই অল্পধাবন করিয়া দেখা আবশ্যিক।

চিন্তাশীলতা এবং কার্যপরতা আ-মাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু এ দুইই মধ্য প্রকারগত বিভিন্নতা এত যে ক-খন কখন একটি অপরটির বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি অধিক চিন্তাশীল, সে কার্যপরতায় স্থান;

যে অধিক কার্যাপর, সে চিন্তা শীলতায় স্থান । কিন্তু এ দুইএর তুল্য সম্মিলন ব্যতীত—প্রকৃত সহজ লাভে সর্গর্ভ হওয়া যায় না । ইউরোপীয় জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার ভূয়সী উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । চিন্তা ও কার্য উভয়ই মানব প্রকৃতির, সাধারণ কার্য্য ; একটি অন্তরের আর একটি বাহিরের । উভয়ই স্বতঃ পরিচালিত হয় । কিন্তু বিবেচনার সাহায্য ব্যতীত আমরা ইচ্ছারের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারি না । আমরা বিচার শক্তির সহায়তায় স্থির করিতে চিন্তা করিয়া ভাল মন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করি । মনে ধারণা জমিলে তখন মন্দ এবং অকর্তব্য পরিচাণ, এবং ভাল ও কর্তব্য, কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে । কিন্তু এই ইচ্ছা সফল করা সহজ ব্যাপার নহে । যাঁহা অনায়াসে ভাবা যায়, কাজে তাহা করা বড় কঠিন । আমাদের সদিচ্ছার কার্য্যে অনেক বিষয় আছে,—যেখানেই বহু বিঘ্নানি । সদিচ্ছা এবং তদনুযায়ী কার্য্যের মধ্যে কোন প্রকার বাধমান না থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় । কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের সে বাঞ্ছা পূরণ করেন নাই । তিনি যে সদিচ্ছাপ্রদেয় তাহা করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ কি ? আর যখন আমাদের আত্ম-শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন, তখন সে বাঞ্ছা পূরণের অয়োজনও নাই । প্রেরণ কার্য্য সম্পাদনার্থ সম্পূর্ণ ও চৌদার অসাধারণ দৃঢ়তা থাকা চাই ; আর যদি পূর্বের কোন মন্দ অভ্যাস বিরোধী হয়, কিংবা কোন বহির্বিশয়ে বাধা জন্মায়, সাধাশুশারে তাহাদিগকে

অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যিক । নতুবা সফলমনোরণ হইবার সম্ভাবনা কি ? ফলতঃ দুই বস্তুসম্বন্ধকারে সর্গপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিলেও সর্বদা মর্তকতা পূর্বক আবশ্যক মতে পুনঃ পুনঃ সদিচ্ছার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাবৎ উহা সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস না হয়, তাবৎ আপন ক্ষমতাতে বিশ্বাস করা অনুরূপ । অভ্যাস জমিলে আর ভাবনা নাই ; তখন আর সংকার্য্য সমূহ আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না । উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সে গুলি যেন আপনাই হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায় । প্রতিবন্ধক তখন হয়, একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়, না হয় পূর্বের মত ততঃ দুরাক্রমণীয় বোধ হয় না ।

এদেশের লোক ক্লিষ্ট চিন্তাশীল, এবং ক্লিষ্টগত সংকল্পের অসুচীতা, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাঠ্যবস্ত্তাভেই পাওয়া গিয়া থাকে । সে সময়ে উক্ত অভ্যাসটি জমিলে আর কোন আপদ থাকে না । কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কি ? বিদ্যালয়ে বিদ্যালীভিই মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রকৃতই বিদ্যার অর্থোৎসাহ কি না, বলিতে চাহি না, কিন্তু সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়া থাকে । কিন্তু তৎকালীন বৈয়য়িক ব্যাপারে সম্বন্ধবিহীন থাকাতো জানের এয়োগ আবশ্যক হয় না ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্তই থাকি । পরে সময় ক্রমে যখন বিষয় বস্ত্ত উপস্থিত হইতে হয়, তখনই আমরা পূর্বোদ্যোগের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি । বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে যে সুনীতির শিক্ষা পাওয়া যায়, পূর্ব

হইতে মনোমধ্যে সে সমুদায়ের উচিত ধারণা হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা শৈথিল্য প্রযুক্ত তৎপরিচালনে বিরত থাকার কারণেই হউক, এক্ষণে শীঘ্রই সে সমস্ত আমাদের স্মৃতি অতিক্রম করিয়া যায় । স্বা অলয় নীতি অভ্যাসের উচিত স্থান ; কিন্তু আজিও আমাদের দেশে সে সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হয় নাই ।

যাহা হউক, ইহাই কৃতাবিদ্যাদিগের ব্যবহারগত ন্যেবের একমাত্র কারণ হইলে ততঃ দুঃখের বিষয় হইত না । কিন্তু অধুনা আর একটি গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে । জটিল মনোবিজ্ঞান এবং অন্তর নীতিশাস্ত্রই এই কারণের প্রকৃতি । এই দুই শাস্ত্রের অথবা ব্যবহারেই নব্যবিদ্যা মনোপ্রমাণ ঘটিতেছে । সে কালে লোকের এত বিদ্যার দৌড় ছিল না, কে কাহাকে শিখাইবে ? সুতরাং স্বভাবকে গুরু মানিয়া বিনীতভাবে ও সমলচিত্তে সকলে তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত । কিন্তু এক্ষণে ত আর সে দিন নাই, সে জ্ঞানের অভাবও নাই, যে লোকে সে প্রাচীন গুরুকে মান্য করিয়া চলিবে । অভিনব শিক্ষাপ্রণালী এবং অভিনব গ্রন্থকারদিগের রূপায় আজিকালি জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্যক প্রস্তুত শিশুর করস্থ । সুতরাং এমন স্ববিধা থাকিতে কে আর স্বভাবকে কষ্ট দিতে যায় ? পূর্বকালে পণ্ডিতেরা যতাবের উপদেশ বানী গ্রহণ করিতে কিছুমান কৃষ্ণিত হইতেন, না । প্রকৃত উচ্চাতে যৎপরোনাস্তি প্রজ্ঞা ভক্তি-প্রকাশ করিতেন । বিশ্বাস করা তাঁহাদের এক রোগ ছিল । কিন্তু অধুনা

যে দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কি আর তদ্রূপ সহজ আচরণ সম্ভবে ? এক্ষণে তর্কদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে কিছুই বিশ্বাস যোগ্য নহে । এমন কি, কেহ এতদূর কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন যে, স্বাকী অকোতে, স্বাকী আবাস ভূমি জগতের অধিতীয় কর্তার অধিভেদেও সন্দেহ করিতেছেন । আরও কিছু জানরাষ্ট্র হইলে আপনার অন্তিমুখও জুলিবেন । সেও বরং ভাল, কিন্তু অন্য কাহারও অন্তিমুখ হস্তকপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হইবেক । আমাদের জ্ঞান অনন্ত বা অসীম নহে । ইহার নির্দিষ্ট সীমা আছে । সেই সীমায় উত্তীর্ণ হইলে আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা রূপা । যিনি জ্ঞানগর্ভে দীর্ঘজীবিত হইয়া এবং মানুষকে অবস্থা ভুলিয়া সেই সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হন, তাঁহাকে দ্বারায় তাহার প্রতিকূল পাইতে হয় । তিনি একপদেই পূর্ণজাতি সর্গস্থ হারান । এমত বলিতে তিনি যাহা যে, পরমেশ্বরের অমান্য করিলেই পাপিত হইয়া তাহার উচিত দণ্ডবিধান করিবেন । বরং যদি পরমেশ্বর থাকেন, তাহা হইলে আমাদের এই বিবেচনা করা উচিত, তাঁহার প্রকৃতি কোন অংশেই মানবপ্রকৃতির তুল্য নহে । তিনি রোপ পর্বত অথবা প্রত্যক্ষ শাসনানিলাধী হইবেন, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে । অসীম আধিপত্য ; ইচ্ছা করিলে সৃষ্টিক অসৃষ্ট করিতে পারেন । তবে সামান্য মানবের অবমাননায় তাঁহার ভয় কি ? তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, যাহা তাহার ভাল লাগে, করুক । সহজ চেষ্টা করি-

লেও সে যে তাঁহার অব্যর্থ অভিপ্রায়ের এক তিলও অন্যথা করিতে পারিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব যদি কেহ ঐচ্ছা পূর্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য করেন, করুন। কিন্তু পরমেশ্বরের অমান্য করিতে গিয়া যদি সাধারণের কোন অহিত করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ছাড়িব না। আমরা যদি বুঝিতে পারি, যে পরমেশ্বরের অস্বস্তি স্বীকার করাতে যত লাভ, অস্বীকার করাতে তাহার কিছুই নাই, প্রত্যুত বিস্তর ক্ষতি, তাহা হইলে কেননা আমরা তাহা স্বীকার করিব? আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, ত্রুটিবিরতি অন্যান্য ইঞ্জিরের ন্যায় একটি অভিরুক্ত সুখের আকর, তবে কেন ইচ্ছাপূর্বক তাহা ত্যাগ করিব? সাধারণ জনসমাজের এইমত। আমাদের সুখের বিষয় এই যে, বাঁহারা নিরীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অসংখ্য; সুতরাং মানব সমাজের কোটি অংশের একাংশ হইবে কি না, সন্দেহ। কিন্তু যদি, কখন তাঁহাদের দলপুঙ্খ দেখা যায়, তবে আশঙ্কার বিষয় বটে। কিন্তু তাহা যে মহাপ্রলয়ের অধিক পূর্বে হইবেক, এমন বিশ্বাস হয় না।

ঈশ্বর গণকল্প লোকের কুতর্ক হেতু যদি ধর্মনীতির ক্ষতি হয়, তাহা লোকে সহ্য করিবে না। কারণ ধর্মনীতির ক্ষতিতে সাধারণের ক্ষতি অপরিহার্য। অতএব ঈশ্বরের প্রতি যিনি যেরূপ ইচ্ছা বাবহার করুন, ধর্মনীতির প্রতি তদ্রূপ করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকে পারিবেন না। অধিকন্তু কোনটি

ধর্মনীতি, কোনটি নহে, একথা লইয়াও তিনি অধিককাল তর্কবিতর্ক করিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ লোকে বাঁহাকে ধর্মনীতি বলিয়া মান্য করে, তাঁহাকেও তাহাই করিতে হইবেক। সর্বদা উচ্চসুখে চলিলে পদে পদমুখলনের সহ্যনা। 'আমাদের পদ সর্বদা মুক্তিকামংলয়, আমরা পৃথিবীর পদার্থ, এক্ষণে আমরা রাখিয়া নশিঁশিরে ঢলা ভাল। আর ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এসংসার আমাদের কার্যভবন, বিশ্রামভবন নহে। আমরা স্ব স্ব মত স্থির করিবার নিমিত্ত অধিক সময় পাইতেছি না। আজি কালি নব্য সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাবে ধর্মনীতি লইয়া 'বাদাচ্ছবাদি' করিতেছেন, সে ভাবে এক্ষণে থাকিতে তাঁহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সৃষ্টি অর্থাৎ এতকাল পর্যন্ত যদি ধর্ম এবং ধর্মনীতির যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না ইহা থাকে, তবে যে আর মানব শরীরে মনুষ্যের যুক্তির উহা সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আর যখন ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাধারণ গণিত শাস্ত্রের মধ্যে কোন প্রতিজ্ঞাই আদ্যন্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না, প্রথমতঃ কয়েকটি যতাবের আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন নীতিশাস্ত্র অন্যরূপ করিবার প্রয়োজন কি? গণিতের মত কি আমরা বিশ্বাস করি না? তবে ধর্মনীতির মত বিশ্বাস করিতে আপত্তি কেন? স্বীকারের উপরেই যুক্তির কার্য, যুক্তির উপরে স্বীকার নহে। বিশ্বাসে সন্শয় আছে, অবিশ্বাসে শাস্তিও নাই।

বাঁহা হউক, নরশেষে যে নিরীশ্বরবাদীর মতপ্রিয় দেশীয়, কৃতবিদ্যাগণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা আপন আপন অবস্থার বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখুন। আজি কালি তাঁহারা সমাজের পরিমাণ, তাঁহারা সমাজের বিশিষ্ট লোক; সাধারণের চক্ষু নিয়ত তাঁহাদের উপরেই রহিয়াছে। তাঁহাদের দোষ গুণ লোকে যত লক্ষ্য করিয়া দেখে, এত আর কাহারই নহে। তাঁহারা এক্ষণ বিবেচনা করিতে পারেন যে, ধর্ম ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বাঁহাই হউক, লোকে তাহা বুঝিতে না পারিলে কোন সাধারণ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; কিন্তু এ তাঁহাদের সম্পূর্ণ জম। লোকে তাঁহাদের অতি গোপনীয় কার্যেরও সংবাদ লইয়া থাকে। তাঁহারা আপন আপন যুগে যেরূপ আচরণ করেন, তাহারা সে সকলও জানিতে পায়। এবং অতি সন্মোহণ সহকারে তাহার কারণ অসুসন্ধান করে। ধর্মের প্রতি যে তাঁহাদের কোন আস্থা নাই, ইহা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্যেতেই প্রকাশ পায়। ইহাতে তাঁহারা কি মনে করেন, লোকে তাঁহাদের প্রতি সম্মতি আছে? সম্মত কোন জনেই নহে, প্রত্যুত

তাঁহাদের অতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রাক্তারও ভ্রাস হইতেছে। কেনে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসও থাকিবে না। অতএব আর, যেন তাঁহারা ধর্মের এক্ষণে অভ্যাসী না থাকেন। ঐশিক বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের নিখুঁত সন্ধান বুঝিবার সাধ্য কাহারও হইবেক না। তজ্জন পরলোক পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেক। ইহা লোকে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাঁহাকেই সম্মত থাকি উচিত। তাঁহাতেই স্ব স্ব কর্তব্য স্থির করিয়া তৎসম্পাদনার্থ যত্ন করা আবশ্যিক। আর আমাদের এমতও বোধ হয় যে, যিনি যত সন্দিহান হউন, সত্য সত্যই কেহ পরমেশ্বরের অস্বস্তি স্বীকার করিতে পারেন না। যদি সন্দেহই করেন, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, তাহা অপেক্ষা বিশ্বাস কি সর্বোৎকর্ষ ভাল নয়? সে বাঁহা হউক, যাবৎ মানব সমাজ থাকিতে হইবেক, তাবৎ কেহই ধর্মনীতি অবহেলন করিতে পারিবেন না। ধর্মের ভক্তি না থাকিলে ধর্মনীতির প্রতি দৃঢ়তা থাকে না। সুতরাং সকলকেই ধর্মের মতি স্থির করিতে হইবেক। অন্যথা কেহই মনের স্বখে থাকিতে পারিবেন না।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

কাব্যমালা। কলিকাতা। বৈগীমাধব দে এন্ড কোম্পানি।
কাব্য নিউয়ের ন্যায় আশু মধুর।
এ মিঠাইয়ের নয়রা কে, তাহা এঁহে

প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না।
জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখন
হাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলি একে-
উত্তল ভাজা, তায় বাশী। তিনি মাম

পত্রে বরফটি হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

চতুরান।

অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন তাঁহার রূপালৈখিকা তাহাই লিখিয়াছে। আমরা নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতা গুলিন সকলই আদিরস ঘটতি। তাহা হইলেই দোষের হইল না। বাহা শারীরিক কুপ্রভাবের উদ্দীপক, তাহাই দৃঢ়্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতক গুলিন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পত্য প্রেম—বাহা সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম, চিন্তাৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরস ঘটতি এবং অস্বাভাবিক। তাঁহারান্নে করেন, এই রূপ কথা কহিলেই, লোকে ইংরাজি ওয়ালী এবং খুসভা বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ড মুর্থ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিন্তার সমলভারই ফল। যঁহার কিছুই বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চক্রে সকলই সমল। যঁহাদিগের চিত্ত কেবল বুদ্ধিয়ার অভি-

লাবী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রভাবের উদ্দীপক হইয়া উঠে।

আমরা অনেক বার দেখিয়াছি, অতি বিন্দল এসজেরও এই পাণ্ডাচার্য্য অসদর্থ বুদ্ধিয়াছে। সে স্বভাব প্রেমী মধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রভাবের উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থ খানি সেই মহাদোষে দূষিত। “কোন প্রোণা নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি,” “পয়োধারি” ইত্যাদি কবিতা গুলি এই কথার প্রতিপোষক।

একান্ত রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন। কাব্য মধ্যে এরসেরও হ্রতন কথা কিছু দেখিলাম না। সকলই চর্মিত চর্মণ। গ্রন্থকার নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন;—

“যদিও এ ফুলচয়, মৃদুদয় নব নয়
রসপূর্ণ বটে তি না তোমারো বুঝাই”

২ পৃষ্ঠা।

তবে গ্রন্থকার এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতা গুলি না লিখিয়া, পূর্ণ কবিদিগের উপর বরাত দিলেই গৌরব মিটিত।

বিষয়বস্তু।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষয়বস্তু কি?

যে বিষয়বস্তুকে বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে ‘আমরা’ গ্রন্থ হইয়াছে, তাহা সকলেরই যুৎ প্রাচুর্য্যে রোপিত আছে। রিপূর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উগ্ধ হইয়া থাকে। এমন কোনই মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বৈধ কামকোপাদির অক্ষম। জ্ঞানিব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে, সেই সকল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যের প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন, এবং সংযত করিয়া থাকেন; সেই ব্যক্তি মহাত্মা। কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জ্ঞান বিষয়বস্তুকে বীজ উগ্ধ হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অন্ধুর, তাহাতেই এরফের রুদ্ধি। এই রুদ্ধ মহা তেজস্বী; এক বার ইহার পৃষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব, ও সযুৎসুল মুকুলমালা, দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

কিন্তু ভেদে, বিষয়বস্তু নানা ফল ফলে। পাত্র বিশেষে, বিষয়বস্তু রোগ শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্ত সংযম পক্ষে, প্রথমতঃ চিত্তসংযমের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ

চিত্তসংযমের সক্ষমতা আবশ্যক। ইহার মধ্যে ক্ষমতা প্রকৃতিজন্য; প্রকৃতি শিক্ষাজন্য। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। স্বভাব চিত্ত সংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরুপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে চুঃখতোষাই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখন হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল স্থানের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা; স্বশীল চরিত্র; স্নেহময়ী মাদ্রী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এসকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়হৃদ; পরোপকারী, অথচ নায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্তব্য কর্মে স্থিররূপ। পিতা মাতা বর্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; বাবার প্রতি নিতান্ত অহরহ ছিলে; বন্ধুর হিতকারী; ভ্রাতার প্রতি রূপাবান; অসুখতের প্রতিপালক, শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাধ্য। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিস্মিত সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান; বিদেশে যশ; অসুখত

ভূতা-প্রজাগণের সমিধানেন ভক্তি; স্বর্ঘ্য-মুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটত, তবে তিনি কখন এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। বাহ্যর বাহ্যতে অভাব, তাহার তাহারই লোক। কৃন্দনন্দিনীকে লুক্ক লোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখন লোভে পড়েন নাই, কেননা কখন কিছু-রই অভাব জানিতে পারেন নাই। স্ত-রাং লোভ সধরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্য তিনি চিত্তসংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হই-লেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; অথচ পূর্ণগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

জিংখং পরিচ্ছেদ ।

অনুসংহা ।

বলা বাহুল্য যে, যখন স্বর্ঘ্যমুখীর প-লারনের সম্বন্ধ গৃহ মধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অবেদ্য লোক পাঠাই-বার বড় ভাড়াভাড়া পুঙ্খা গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছু-টিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, ভুলাভরা ফরাশীর

ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মসং করি-য়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খানসামার গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে মাঠাকুরানীকে ফিরাইতে চলিল। কতক-গুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় খেল। গ্রামস্থ মাঠে ঘাটে বৃ-জিয়া দেখিতে লাগিল, কোথাও বা গাছ তলায় কমিটি করিয়া ভামানু পুড়াইতে লাগিল। ভজ লোকেকল্লও বোরোইয়ারি আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায় কচকিঠা কুরের টোলে, এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাট গুলাকে ছোট আদালত করিয়া ভুলিল। বালক মহলে খোর পর্দাধী বাঁধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠ-শালায় ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র, এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, “তিনি কখন পথ হাটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোতাও আশঙ্কায় পথ গিয়া কো-থায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পা-ইব।” কিন্তু যখন দুই তিন ঘন্টা অতীত হইল, অথচ স্বর্ঘ্যমুখীর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র ষয়ং তাঁ-হার সন্ধানেন বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রোদ্দে পুড়িয়া মনে করিলেন, “আমি বৃজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত স্বর্ঘ্য-মুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।” এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখি-লেন, স্বর্ঘ্যমুখীর কোন সম্বাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফি-রিয়া বাড়ী আসিলেন। এই রূপে দিন-মান্ন গেল।

বস্ত্রতঃ শ্রীশচন্দ্র বাহা বলিয়াছিলেন, ভাড়া সভা। স্বর্ঘ্যমুখী কখন পদব্রজে বাটীর বাহির করেন নাই। কতদূর যাই-বেন? বাড়ী হইতে অর্দ্ধকোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আসি বাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাওয়াত করিত, সেই সন্ধান করিতেই সেই বাগানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল;—

“আজ্ঞে, আসুন!”

স্বর্ঘ্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, “আজ্ঞে, আসুন। বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।” স্বর্ঘ্যমুখী তখন, কোথ ভরে কহিলেন, “আমাকে ফিরাইবার ভূই কে?” খান-সামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়া-ইয়া রহিল। স্বর্ঘ্যমুখী তাহাকে কহিলেন, “তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।” খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া ক্রত গিয়া নগেন্দ্রকে সম্বাদ দিল। নগেন্দ্র শ্রুতিবা লইয়া ষয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর স্বর্ঘ্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে তল্লাস করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

স্বর্ঘ্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ রুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া বাহিষ্ট পারে, এতএব সেও সন্ধানেন ছিল। স্বর্ঘ্যমুখীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁগা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরানী গা?”

স্বর্ঘ্যমুখী বলিলেন, “না, বাহা।” বুড়ী বলিল, “হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরানী।”

স্বর্ঘ্যমুখী বলিলেন, “তোমাদের মা ঠাকুরানী কে গা?” বুড়ী বলিল, “বাবুদের বাড়ীর বউ গা।”

স্বর্ঘ্যমুখী বলিলেন, “আমার গায়ে কি সোনা দানা আছে যে, আমি বাবু-দের বাড়ীর বউ?”

বুড়ী তাবিল, “সুভা ত বটে।” সে তখন কাঠ রুড়াইতেই অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে রথায় গেল। রাজে-ও কোন ফল লাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য সিদ্ধ হইল না—অথচ অসুস্থত্বের ক্রটি হইল না। পুরুষ অসুস্থত্বানকারিরা প্রায় কেহই স্বর্ঘ্যমুখীকে চিনিত না—তাঁহার অনেক কাশাল গরিব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সমুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভজ লোকের মেয়ে ছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমক হালাল হিন্দুস্থানীরা “মা ঠাকুরানী” বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পালকী বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, স্রবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অসুস্থত্বান আরম্ভ করিল। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া, অসুস্থত্বান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সকল সুখেরই সীমা আছে।

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে স্বপ্ন হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাঁহার পর স্বর্ঘ্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, “স্বর্ঘ্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য দুঃখাগ্নী হইল। আমি মুখী’না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।” দেখিলেন, ‘সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যা শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া বাজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি স্থলকণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ ছুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ স্বপ্ন থাকিলে এতদূর ঘটে না।

কিন্তু স্বর্ঘ্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহা’দের সম্পূর্ণ স্বপ্ন কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্বদা মনে ভাবিতেন, “কি করিলে, আমার যেমন ছিল, তেমনি হয়।” আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি করিলে, যেমন ছিল, তেমনি হয়?”

নগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সাহিত বলিলেন,—“যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অন্ততাপ হইয়াছে?”

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন,—“তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে

স্বখী করিয়াছ—তা’হা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তা’হা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, স্বর্ঘ্যমুখী ফিরিয়া আসে।”

নগেন্দ্র বলিলেন,—“এ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে স্বর্ঘ্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দহ হয়—তোমারই জন্য স্বর্ঘ্যমুখী আমাকে তাগ করিয়া গেল।”

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন। কিন্তু—নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। কহিলেন,—“এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। স্বর্ঘ্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।” কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যঞ্জে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেককণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন,

“কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?” কুন্দ কহিলেন,—“না।”
ন। কেবল একটি ছোট্টটো “না” বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আশায় আর ভাল বাস না?

হু। বাসি বই কি?
ন। ‘বাসি বই কি?’ এ যে বালক জ্ঞান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আশায় কখন ভাল বাসিতে না।

হু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়া বুঝিলেন না যে, এ স্বর্ঘ্যমুখী নয়। স্বর্ঘ্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তা’হা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীষণভাব, কথা জানেন না। আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তা’হা বুঝিলেন

না, বলিলেন, “আমাকে স্বর্ঘ্যমুখী বরাবর ভাল বাসিত। বানরের গলায় ফুঁকার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।”

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে, উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না, যে, তা’হার কাছে প্রবেশ করেন। কমলমণির আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এবিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাতে প করেন নাই। কিন্তু আজিকার মধ্যপীড়া, সহৃদয়, ঘোষময়ী, কমলমণির মাঝাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। যে দিন, প্রণয়ের নৈরাশোর সময়, কমলমণি তাঁহার চুপে চুপে হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চন্দ্রের জল বুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কান্দিতে গেলেন। কমলমণি, কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অগ্রসর হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কান্দিত লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, “কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনাকে আপন চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন,—“আমার কাজ আছে।” অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিসম্বন্ধের ফল

হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পর।
তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে বত কাজ করিয়াছি, তা’হার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা, সর্বাংশে জাতি-মূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া স্বর্ঘ্যমুখীকে হারাইলাম। স্বর্ঘ্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সন্দেহেই মাটি খোঁজে, কহিছুর এক জনের কপালেই উঠে। স্বর্ঘ্যমুখী সেই কহিছুর। কুন্দনন্দিনী কোন গুণে তাঁহার স্থান গুণিত করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? জ্ঞান, জাতি! এখন চেননা হইয়াছে। কুন্তকর্ণের নিভাভ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহ-নিভা ভাঙ্গিয়াছে। এখন আমি স্বর্ঘ্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তা’হাকে ভাল-বাসিতাম? ভাল বাসিতাম বৈ কি—তা’হার জন্য উদ্যমগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সৌ’কেবল চোখের ভাল বাস। নহিলে আজি পনের দিবস মাত্র ‘বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিবে কেন, “আমি কি তা’হাকে ভাল বাসিতাম?” ভাল বাসিতাম কেন? এখন ভালবাসি—কিন্তু আমার স্বর্ঘ্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম,

কিন্তু আজি আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি

হরদেব খোজালের উত্তর ।

স্রামি তোমার মন বুঝিয়াছি। কৃন্দন-
দিনীকে ভালবাসিতে না, এমন নহে—
এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল
চোকের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ।
স্বর্গাশুখীর প্রতি তোমার গাঢ় মেহ—
কেবল ছই দিনের জন্য কৃন্দনদিনীর
ছায়ায় তাহা আরত হইয়াছিল। এখন
স্বর্গাশুখীকে হারাইয়া তাহা দুঃখিয়াছ।
যতক্ষণ স্বর্গাদেব অনাক্ষয় থাকেন, তত-
ক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত ছই,
মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু স্বর্গ্য অস্ত গেলে
সুখিতে পারি, স্বর্গাদেবই সংসারের
চক্র। স্বর্গ্য বিনা সংসার আধার।

“তুমি আপনাতঃ হৃদয় না বুঝিতে পা-
রিয়া” এমনও গুরুতর আশ্বিত্বলক কাজ
করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কৃত
করিব না, কেননা তুমি যে জন্মে পড়িয়া-
ছিলে, আপনাতঃ হইতে তাহার অনুদীনদন
বড় কঠিন। মনের অনেক ভুলনি ভাব
আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা
বলে। কিন্তু চিন্তার যে অবস্থায়, আমার
সুখের জন্য আমার আত্মস্থ বসির্জন
করিতে স্বতঃ প্রস্তুত ছই, তাহাকেই প্র-
কৃত ভালবাসা বলা যায়। “স্বতঃ-প্রস্তুত
ছই,” অর্থাৎ স্বর্ধজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায়
নহে। স্বতঃ-রূপবতীর রূপভোগলাভসা,
ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা-
কে অনের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না,
তোমনি ক্ষুধাতুরের চিত্তাঙ্কলকে রূপ-
বতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।
সেই চিত্তাঙ্কলকেই আর্ধ্য কবির। মদন

শরজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যে হস্তির
কপিত অবতার, বসন্ত সহায় ছইয়া,
মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া-
ছিলেন, বাঁহার অসাদ কবির বর্ণনায়
মৃগেরা মৃদাদিগের গায়ে গাভ কণ্ডুয়ন
করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পায়
মৃগাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই
রূপজ মোহ মাত্র। এ হস্তিও জগ-
দীশ্বর প্রেরিতা, ইহার দ্বারাও সংসা-
রের ইচ্ছা সাধন হইয়া থাকে, এবং
ইহা সর্ধজীবযুদ্ধকরী। কালিদাস,
বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি—বিদ্যা-
সুন্দর ইহার ভেটান। কিন্তু ইহা প্রণয়
নহে। প্রেম বুদ্ধিহীনমূলক। প্রণয়-
সম্ভাবনারি গুণ সকল যখন বুদ্ধিরতির
দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় সেই সকল
গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সন্মোহিত এবং
সফালিত হয়; তখন সেই গুণাধারের
সংসর্গ লিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জ-
ন্মায়। ইহার ফল, ‘সহৃদয়তা’ এবং পরি-
ণয়ে আত্মবিস্মৃতিও আত্ম বিসর্জন।
এই যথার্থ প্রণয়; সেকপীয়র, বাস্মিত্তি,
মাদাম্ দেস্তান্ ইহার কবি। ইহা রূপে
জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ,
গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গ-
লিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে
প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জন। আমি
ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে
স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায়
এইরূপ। আমার বেধ হয়, অন্য ভাল
বাসিরও মূল এইরূপ; তবে দেখ-
কারণে উল্লিখিত হয় না। কিন্তু সকল
কারণই বুদ্ধিরভিমূলক। নিতান্ত পক্ষে
বুদ্ধিরভিমূলক কারণজাত মেহ ভিন্ন

কখন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা
নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্ত-
বিকৃতি, তাহার তাক্ততা পৌনঃপুনো বৃদ্ধ
হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুনো পরিতৃপ্তি জন্মে।
গুণজনিত পরিতৃপ্তি নাই। কেননা রূপ
এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই
বিকাশ; গুণ নিত্য স্থতন স্থতন ক্রিয়ায়
স্থতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও
প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয়-জন্মে,—কেননা
উভয়ের দ্বারা আসঙ্গ লিপ্সা জন্মে।
যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয়
শীঘ্রই জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ-
ফল বন্ধমূল হইলে রূপ থাকা না থাকা
মান, রূপবান ও কুংসিতের প্রতি মেহ
সমান হয়। কুরূপ স্বামী বা কুরূপ স্ত্রীর
প্রতি মেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—
কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য
সে প্রণয় একবারে হঠাৎ বলবান হয়
না—ক্রমে সফলিত হয়। কিন্তু রূপজ
মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে।
স্বাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয়,
যে অন্য সকল বৃত্তি তাক্তারা উচ্ছিন্ন হয়।
এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—
ইহা জ্ঞানবীর শক্তি থাকে না। অনন্ত
কাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবে-
চনা হয়। তোমার তাহাই ‘বিবেচনা
হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে
স্বর্গাশুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম,
তাঁহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল।
এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি সুখার্থের
হ্রাসবিধি। অতএব তোমাকে তিরস্কার
করি না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই
স্বর্গ্য হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ ছইও না। স্বর্গ্যাসুখী অ-
বশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না
দেখিয়া তিনি কত কাজ থাকিবেন? যত
দিন না আসেন, তুমি কৃন্দনদিনীকে মেহ
করিও। তোমার পত্রাদিতে বতদূর বুঝি-
য়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও
গুণহীন নহেন। রূপজমোহ দূর হইলে,
কাল স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা
হইলে তাঁহাকে লইয়াই স্বর্গ্য হইতে
পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা
ভাৰ্য্যার আশ্রয় স্থান না পাও, তবে
তাঁহাকে জুলিতেও পারিবে। বিশেষ
কনিষ্ঠা তোমাকে ভাল বাসেন। ভাল
বাসায় কখন অবদ্বন্দ্ব করিবে না। কেননা
ভাল বাসাতেই মানুষের এক মাত্র
নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভাল বা-
সাই মনুষ্য জাতির উন্নতির শেষ ইচ্ছা—
মনুষ্য মাত্রে পরম্পরে ভাল বাসিবে
আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকি-
বে না। ইতি।

নগেন্দ্র নাথের প্রত্যুত্তর।

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্ল-
েশের কারণ এ পর্যন্ত উত্তর দিই নাই।
তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝি-
য়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সংপরা-
ম, তাহাও জানি। কিন্তু, যুগে মনঃস্থির
করিতে পারি না। এক মাস হইল, আ-
মার স্বর্গ্যাসুখী আমাকে ভাগ করিয়া
গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সন্ধান
পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন,
আমিও সেই পথে যাইবার কল্পনা করি-
য়াছি। আমিও যুগে তাহার কণ্ঠসা করি-
দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব।
তাঁহাকে পাই, লইয়া যুগে আসিব।

নচেৎ আর আসিব না। কৃন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার যুগ্মদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিস্তা ভৎসনা করি—সে কান্দে—আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।

নগেন্দ্র নাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেই রূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণ-বক্ষণের “ভার দেওধানের উপর নাস্ত করিয়া অচিরাৎ যুগ্মভাগ করিয়া পর্য্যটনে বাঁধা করিলেন। কমলমণি অগ্রায়ে গিয়াছিলেন। সুতরাং এ লিখিত আশঙ্কিতদিগের মধ্যে কৃন্দনন্দিনী একাই দর্শনদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন আর হীরা দাসী তাঁহার পরিচর্যায়া নিযুক্ত রহিল।

দর্শনদিগের সেই সুবিধুতা পুরী অন্ধকারে—হইল। যেমন বহুদীপ সমুজ্জ্বল, বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্য-

শালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী ধ্বংসমুখী নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই রূপ আধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুস্তক লইয়া এক দিন কৌড়া করিয়া, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে; তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জমািতে থাকে; তেমনি কৃন্দনন্দিনী, তত্ত্ব পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, একাকিনী সেই বিস্তৃত পুরী মধ্যে অবশ্যে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বন দাহ কালীনা শবক সন্নিহিত পক্ষীনাড়ি দগ্ধ হইলে, পক্ষীনা আহার সন্নিহিত পক্ষীনাড়ি দগ্ধ হইলে, রক্ষ নাহি, বাসা নাহি, শাবক নাহি; তখন বিহঙ্গিনী নীড়াঘেবণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতেই সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেই রূপ স্বর্ধ্যমুখীর সন্ধান দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমত অনন্ত সাগরে অতল জলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, স্বর্ধ্যমুখী তেমনই দুষ্টপানীয়া হইলেন।

বঙ্গদেশের কৃষক।

ভূতীয় পরিচ্ছন্ন—আইন।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অস-বস্ত্রের কাল, তাহা কেবল জমিদারের দোষ নহে। দুর্ভিক্ষের উপর পীড়ন করা,

বলবানের যত্ন। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই, রাজ্যবলবান হইতে দুর্ভিক্ষের রক্ষা করেন, ইহারই জন্য সম্রাটের রাজশাসন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার

আবশ্যক। যদি কোন রাজ্যে দুর্ভিক্ষকে বলবান পীড়ন করে, তবে তাহা রাজ্যেরই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাভ্রাণ। যদি এদেশে জমিদারের কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা গতা হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুত্ৰবর্গদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাইক, তাঁহারই আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমিদার ছিল না। প্রজারা যথোপায় রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে; কেহ তাহাদিগকে মাজন মাথ পান্নগীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বাভাবিক রাজ্যকালের পুরাতন লিখিতা যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্য বিবয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাহারা মুসলমান ও মহাদ্বীপদিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহার বিশেষ জ্ঞাত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেননা সাহিত্য এবং স্মৃতি দমাজের অপ্রকৃতি মাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিপত্তিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজা-

পালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার গোঁড়। যুনানী রাজ্যগণের নামই ছিল “Tyrant” সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হইতে; একজন রাজা প্রজা কর্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসংখ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসী বিপ্লবের স্ফী। ভারতবর্ষে উত্তরপাশী মুসলমান এবং মহাদ্বীপদিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন রাজগণের এবিষয়ে বিশেষ গোঁড়। তাঁহার কেবল যথোপায় সংস্কৃত গ্রন্থে পাখিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমিদারের স্ফী। তাঁহার রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অধীনা ক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে বরসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহার এক প্রকার কর সংগ্রহের কল্টুক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী বাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাত থাকিবে। ইহাতেই জমিদারির স্ফী, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের স্ফী। এই কল্টুক্টরেরাই জমিদার। রাজার রাজস্বের

উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহারে লাভ। সুতরাং তাঁহারী প্রজার সর্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা চইলেন। তাঁহারি বখন রাজা গ্রহণ করেন, শুধুন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা যোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ক্রটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস মহা ভ্রমে পতিত হয়। প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী দিক নাই বলিয়াই, জমীদারীতে তাঁহাদের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার নহিলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারী প্রজাশিড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপ্নন করিলেন। রাজাধের কল্টারকটরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাশিড়ক, সেই প্রজাশিড়ক রহিলেন। লাতের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বপ্ন একবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কখন কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহনীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামির নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লিয়া তহনীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইং

রাজ রাজো বঙ্গ দেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গ দেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কখন কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী কেননা এ বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী।”

কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের এলো ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অন্ত্যাতার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, “প্রজা প্রভূতির রক্ষার্থ ও মজল্লার্থ গবর্ণর জেনেরেল যে সকল নিয়ম প্রস্তাব করিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভূতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।”

“বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজার পুরুষাঙ্গ ক্রমে জমীদার কর্তৃক শীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১১ শালে “কোর্ট অব ডিরেক্টরস্” লিখিলেন, “যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বল্প নিরূপণ এবং সামগ্র্য্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদলপল কিছুই করা হইল না।” এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮১২ শালে

১. ১২০৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা।

কাহেল নামক এক জন বিচক্ষণ রাজ কর্ণচারী লিখিলেন, “এ অধীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য ভূস্বামী (প্রজা) দিগের অগ্রে জমীদারকে হাঁড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং যে অধীকার মত কর্ণ করেন নাই।”

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্বলকে আরো দুর্বল করিলেন, বলবানকে আরও বলবান করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বধ ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাটী দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টররা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, “সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সচ্ছ কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই উভয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ষ কালের বিখ্যাত “পঞ্জম।” যদি কেহ প্রজার সর্বস্ব লুটীয়া লইতে চাহিত, সে “পঞ্জম” করিত, এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। “কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার

● Revenue Letter to Bengal 9th may, 1821 para 54.

প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল। ● জমীদার চিরকালই প্রজার কলল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দন্যস্বত্বকে আইনসম্মত করিলেন। অদ্যাপি এই দন্যস্বত্ব আইনসম্মত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টররা লিখিলেন যে, এই আইন অজুযারে জমীদারেরা কদমী প্রজাদিগকেও নিরুদ্ধক বিবাদমুখল তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। †

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে, বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকার প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৮৬০ শালে কর্ণওয়ালিস যে অধীকার করিয়াছিলেন, আয় ৭০ বৎসর পরে আন্তঃস্বরণীয় লর্ড কানিং হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণও শেষ। তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৫৯ শালের ৮ আইন দশ আইনের অল্লিপি মাত্র। †

● সন ১৮২৩ শালের ১৮ আইনের দুই ধারা।

† Revenue Letter 9th may, 1821 para 54.

‡ এই সকল ওর যাহারা সবিত্তরে অবগত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা শ্রীমুক বাবু সত্যীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত ‘বঙ্গীয় প্রজা’ (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রস্তাবে এ আশের কতক সেই গ্রন্থ হইতে সম্বলিত করিয়াছি।

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত জানিয়া বলি না। প্রজাদিগের বাঁহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তৎকালিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা, হয় নাই। কৈরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার বাজনা বা বাঁহাবার বিশেষ ক্ষপণ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে বাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এই টুকু নাম প্রজার পক্ষতা প্রকাশ্য প্রজাধৈর্য, স্বার্থপর কোন কোন দিক দিক কতই কোলাহল করিয়াছিল। অদ্যপি করিতেছেন।

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান জমীদারের বলবদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইহা পূর্বক ব্রিটিশ রাজপুস্তকের প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাজী। দেওয়ানী পাইয়া এবং এ পর্যন্ত, কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্য বশত তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, স্বতরাং পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত

হইয়া এই মহৎ অনিত্যকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু অমবশ্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দণ্ড প্রতাপ—সেই প্রতাপে সমগ্র আশিয়া ধ্বংসকৃত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আধিনিয়মের রাজ্য জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অত্যাচারের দ্বারাও লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় না কেন? জমীদার প্রজাধরিয় আনিতেছেন, কলদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লুটতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতিকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুস্তকের আইন পরিচালন, আদালত করিয়াছেন, তবে ব্যবসেটের জট কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসী করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজীবী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, বাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কি? শাসনদণ্ড ইংরাজের কি ইহার কিছু

প্রবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদফতার পর করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কার্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালি কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাঁহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। বাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়গত নহে। স্বতরাং তাহারা তদ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপারীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, স্বতরাং কৃষকের দুর্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষকে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাঙ্গ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া—বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। এয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের

অনেক কার্য কতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নাশিষ্ট করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয়, আর এক জন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাড়া লইয়া তাহার জমী ঘানি দখল করিয়া লইল। তদ্বন্দ আশাদিগের দেশের লোক বিশেষ ইহর লোক অত্যন্ত আশা পরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতিকার করিতে চাহে না। বাঁহা বিচারকার্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারা ই বিচারকের স্বাভাবিক হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নাশিষ্ট জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নাশিষ্ট হয় না, যেবাঙ্কি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচার কার্য থাকায়, দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দুষ্কিন্দনে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই

মৌকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য না দিলক্ষি করিল। যদি বড় কপাল জ্বারে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসর। আশীল আর এক বৎসর। যদি আত্মিক সৌভাগ্য গুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসর। বাদির কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে দিনে বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। একুণ প্রতীকারের আশ্রয় কোন কৃষক জমীদারের নামে ব্রালিশ করবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতই অল্প—যে খানো তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, যে খানে এক জন বৈ নাই। স্বতরাং মৌকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপি বাহুল্যের, এবং অত্যন্ত কার্য বাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মৌকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মৌকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সুতরাং আর পাঁচটি মৌকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বামে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্ন-যোগ্য মৌকদ্দমার একটি নিষ্পত্তিজনীন সাক্ষী অল্পপণ্ডিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। স্বতরাং মৌকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে, বিচার আইনসম্মত হয় না।

নিষ্পত্তি আপীলে টিকেনা। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘূর্ণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম এই।

আমরা যে সভা হইতেছি, দিনেই যে দেশের শ্রীরক্ষি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাতে হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢেলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশেই কিছু চড়া দামে বিকাজিতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলা গিরি প্রভৃতি অনেক গুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বাণ্যারীরা আপন-স্বপ্না দ্রব্যের প্রশংসা করিতেই অধীর হইতেছেন। গলাবাংরি জ্বোরে, আগে যাহাদের অন্ন হইত, না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীরক্ষির আর সীমা নাই, সর্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বৈষ্যনিকি করিয়া স্থিরতার করিতে পারে না! তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারাই আইনের গৌরব বুঝে না, স্থবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

সে কল, গোমস্তা কি অপর কেহ কোন দুঃখী অজ্ঞার উপর কোন গুরুতর দোষাভ্যাস করিল। গোমস্তা সেশানের রিচারে অর্পিত হইল। সেশানের বিচারে প্রতিবাদী সাক্ষিদিগের সভা কথায় অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির

হাতে। জুরির মহাশয়েরা একাজে স্থতন ব্রতী; এমাত অগ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষির জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারি কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প উল্লাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারি কিশে ঘাড়ুদর, গৃহে গৃহিনী কি রূপ জল্পবাগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ বাস্তবায়ন “চার্য” দিতেছিলেন, তখন তাঁহারি মনেই জজ সাহেবের দাড়ির পাকা ফুল গুলিন গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, “সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে,” তাহাই কেবল কানে গেল। জুরির মহাশয়দিগের সকলেই সন্দেহ—কিছুই শুনে নাই, কিছুই বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয়ত সে শক্তিও নাই, স্বতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সংক্ষেপে ফোয়ার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিতামটি লোপ করিলেন। আমরা বড় সম্মত হইলাম—কেননা জুরির বিচার হইয়াছে—বিলাতি প্রথাভূমার বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভা হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ধমান আইনের এই রূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবচারণের কুতূহল কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারক বর্ণের অযোগ্যতা।

গাত। এ দেশের প্রধানতম বিচারকরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদবুদ্ধি। কিন্তু তাহাইলেও বিচার কার্যে তাহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেননা তাঁহার বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অগণত নহেন, এ দেশের যেকোন চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধতা নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। স্বতরাং স্থবিচার করিতে পারেন না। বিচার কার্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যিক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মৌকদ্দমাই অধস্তন বিচারকর দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই দেশীয়,—তবে ইহাও ঠিক জনতক ইংরাজ-বিচারকরাই অধিক বিচারদান সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাস্তবী বিচারকই বিচারকার্যের যোগ্য নহেন। বাস্তবী বিচারকদের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্প সংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগে বাস্তবীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবুদ্ধি নাই; যাহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপার্জন করেন, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক, বিচারকের পদের প্রার্থী হনেন না। স্বতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হনেন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচার

রকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আশীশের চূড়ান্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আশীলের ভয়ে করেন না; বাহা আশীশের থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে 'লাইকট অফেন' সময়ে বিশেষ অনিষ্টকর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া 'দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;—বলেন, এই রূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এই রূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি জমায়াক-কৃষকন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে, তদুপরী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্ট-জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এবং সুবিধিতৈ মজ্ঞ, মুনসেফ ও ডেপুটি মাজিস্ট্রেট অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহা দিগকে অপেক্ষাকৃত অবজ্ঞাদিগের নিদেপ্তবর্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর, "সমাজ-দর্পণ" নামে এক স্থানি অভিনব সমাদ্র পত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে "বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ" এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি, কেননা লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেককেই সেই রূপ বিবেচনা করেন, বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

"একেই দশ শালা বন্দোবস্তের ভূত"

দিকের গর খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সাধারণ বাসালির অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?"

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি, যে দশ শালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে, বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভয় ঘটয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভব নহে। সেই ভাষ্টির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংস বঙ্গসমাজের যোতরত বিশ্বখ্যাতি বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলের মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইবেন, প্রজা-বর্ণের চিরকালের অবিধাঙ্গতাজন হইবেন, এমন কুপারামশ আমরা ইংরাজদিগকে দিই নাই। যে দিন ইংরাজের জমজলাকাজী হইব, সমাজের অনঙ্গলাকাজী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিবা এবং ইংরাজেরাও এমন নিকৌপন নহেন যে, এমত বর্ষিত এবং অনিষ্টজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার মতদুর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "বাংলাদেশে দশশালা বন্দোবস্তের কোন রূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অসুস্থ হইবে।" তাহা সত্য হইলে সত্য হইবে।

যেরই উন্নতি হইয়া দেশের ত্রীভুজ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে জমায়াক, অন্যায়, এবং অনিষ্টকরক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ভাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে যত্নবান করিয়াছেন, এবং কর রক্ষিত অধিকার ভাগ করিয়াছেন, ইহা দৃঢ় বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায় সম্মত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই জমায়াক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন;—

"আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিত্য নতুন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৩০ সালেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক ও রাজপুত্রেরা প্রায়ই লুণ্ঠা ঘাইতেছেন। মুনি মহাশয় কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগের বর্তমান খ্রীর উপায় না করিয়া ঘাইতেন, তবে দেশ-এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই দুই জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

সাধারণতঃ অনেককেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবে-

চনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নিরধন বটে, কিন্তু পূর্বাঙ্গেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নিরধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইতি পূর্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্বাঙ্গেক্ষা দেশের ধন রক্ষিত হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। "বঙ্গদেশের কৃষকের" এতখান পরিচ্ছেদে আমরা কোনও প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি। উদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক ও রাজপুত্রের দেশের টাকা লইয়া ঘাইতেছে বলিয়া, যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রস্তাবের মধ্যে এক্ষণে বিদেশীয় বণিকদিগের বিবয় আলোচনা করা বাউক।

যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর 'ভাৎপাণী' বোধ হয়, এই যে, বণিকের এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈকি? যে টাকা তাঁহাদের লাভে, সে টাকা, 'এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকার; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এ দেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরে দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয়

করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্বিষয় অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী বিক্রয় গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়ন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মন চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মন বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোক দিল। বরং এ দেশের লোককে আড়াই টাকা পুড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার খান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোক দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে, যে এ দেশের টাকা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই জমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে আকায় বিন পণ্যস্ত লোকের যন আচ্ছন্ন

ছিল, এবং তথায় কৃষিবিদ্যা ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অখাপি দূর হয় নাই। ইহার বার্থ তত্ত্ব এত দ্রুত যে, অল্পকাল পূর্বে মহা মহা-পাখ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রজিগণ ও রাজসম্রাটগণ এই জমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে বাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্ররস্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাঅসামান্য সমাজনীতি স্ক্রুই ইউরোপ (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্বচ্ছিন্ন পূর্বেক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট ও কবডেন চিরস্বর্ণনীয় হইয়াছেন। কুনসে তাহা বিশেষরূপে বঙ্গমূল করিয়া, তৃতীয় নাগোলয়নও প্রতিষ্ঠা কর্ত্তন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপ অনেকের এ জম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে জম থাকিবে, তাহার আশংকা কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বন্ধের এত পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল পাঠ করবেন। ঐদৃশ দ্রুততত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটা কত দেশী কথা বলিয়া দ্বাশ্ব হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি খান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরি-

বর্ডে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতিই নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার খানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশীমূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে খান আমার কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোককে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ খান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অস্বচিত নহে। যে ছয় টাকায় খান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি একারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক বিদেশে পলায়ন করিল? তাহার দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া নয় নাই, কেননা উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যে খানে কাহারও ক্ষতি নাই, সে খানে দেশের আনিষ্ট কি?

আপত্তিঃ মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিঃ করকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে খান কিনিলে টাকা ছয় টা বেশে থাকিত। ভাঙাই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে খান কই? সে যদি খান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে

ঐ রূপ খান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে খান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেননা বিদেশীও আমাদের কাছে খান লইয়া যেমতে আসিত না। কারণ, দেশীয় রিক্রেত যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দুর্ব্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে খান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য খান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, তাহা হইতেছে। খান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জন করিতে পারিত না; খান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনাংশিত থাকিত। যেমন খানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনই ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে নোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তাত্ত্বিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। ঐ খানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি খান বুনে না, পুতি বুনে। পুতির অপেক্ষা খান সম্ভা, সুতরাং লোকে খান পরে, পুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাঁতির তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আঁক খাইতে শায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববোত্তরা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিত। ধানে বা দ্রুতিতে সে ক্ষয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কই?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাই-লেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায় গেল এ ব্যবসায়ের লভ্য কিমিয়া হইবে, কেননা অনেক লোক গেল অনেক ধান হইবে সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল রই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষ বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতক গুলি বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেই রূপ বিলাতীয়রা আমাদের দেশের কতক গুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন খুঁটির প্রয়োজন

কমিতেছে, তেমনি তাঁউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতক গুলি তাঁতির ব্যবসায় হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, বেশী লোকের চাস করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ক ব্যবসায়ের হানি হয়, সূতর ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি ধান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতা-দিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক ধান বেচিয়া যে লাভ করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুণ্ঠ করিল কি? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কি?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক হইয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের চরিত্র্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই? কেননা ধানের পরিবর্তে যে চাউল যায়, তত্তৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের হ্রাস, তাহা হইয়াই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এই রূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এ রূপ যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থ হানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, একথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের একশত টাকা নগদ আছে, সে সেই একশত টাকার ধান কিমিয়া গোলা জাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু একশত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূরূষাপেক্ষা গরিব হইল?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এদেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হ্রাসিত চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অপমানজনক নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধন হানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদের ধন হানি নাই, বরং হ্রাস হইতেছে। কেননা যে পরিমাণ নগদ টাকা বা রূপা আশিগির দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই

রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন হ্রাস করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আশ্চর্য্য নীতিতে কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদের দেশের ধন হ্রাস হইতেছে। যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিশেষ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে যায় হইতেছে। যে বিপুল রেল-ওয়ে গুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?—

বিদেশীয় বণিকদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু বর্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাজকর্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে আমাদের মাত্র। বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন হ্রাস হইতেছে, এবং অর্থম পরিষ্কন্দের পরিণামে যত কৃষি জ্ঞান যে ধন হ্রাস হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বহুশত বাড়িতেছে, কমিতোছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি বহাঙ্গী কণওয়ালিস জমীদারদিগের বর্তমান

শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়?"

এ কথা শুনে সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাপুত্রের বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না তা কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার এক মাত্র কারণ যে তাঁহার ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাপুত্রের বন্দোবস্ত হইলে, প্রজাপুত্র সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহার হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন কতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটাই এই ভাঙ বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাধিলে তাঁহার ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহার ধন আছে, বিবেচনা করেন না। লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আশ ক্রোশ অন্তর একটি কাঁড়ি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার স্বস্তিও ষাঁকার কবিত হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই

এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, 'না ঘরে ছড়াই ভাল? পূর্ণ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধর্ম গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গল কারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই রূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানমুতাবেক ধনের সাধারণতাই সমাজোপতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ মাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অমৃতাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অনায়াস আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কণ্ডোয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দুষ্ট। প্রজাপুত্রের বন্দোবস্ত হইলে এই দুই চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশ শুদ্ধ অমের কাঞ্চাল, আর পাঁচ মাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না, সকলেই স্বয়ং সঙ্কল্পে আছে, কাহারও নিষ্পয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমেই অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমান অধিকার করিবেন না। প্রথমেই অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এদেশে প্রায় তাহার গদগদ জমা ঘটিয়া উঠে। তাহার যাহারা নিতান্ত অম বস্ত্রের কাঞ্চাল ভাঙাঘের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক 'ব' মাল্য না হইয়া, জন সাধারণের সঙ্কদাবস্থা হইলে সকলেই মল্লয়া-প্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা

পাকিত না। এখন যে জন পাঁচছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মুহুর্ত কণা করেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র গর্জন গভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

যাত্রা।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারি উন্নতি হইয়া থাকে। এথেন্স, (Athens) স্পেন ও ইংলণ্ডের নাট্যকারি তাহার প্রমাণ। এবং কথিত আছে যে, ভারতবর্ষেও হিন্দু রাজগণের সময়ে নাট্যকারি বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমাজের আরম্ভ মাত্রই কাব্যরসাম্বুভব শক্তি জন্মায় না; তাহা প্রথমে অতি রূঢ় অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে মার্জিত হয়। প্রথম অবস্থায় রচনার অর্থ বা ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দ মিল থাকিলেই হইল, যথা:—

শান্তিপুত্রের থাশা খই,
বন্ধুমানের বসা দই,
ঈশু আমি তোমা বই,
জোর করে না ই।

এইরূপ রচনা এক সময়ে সমাজে অস্বীকৃত বলিয়া গৃহীত হয়। পরে ক্রমে প্রচুর ভাবের প্রতি দৃষ্টি হইতে থাকে এবং একবার সাধারণের রস বোধ হইলে

আমরা দেখাইলাম যে, যাহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তত্ত্বপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

রসহীন রচনায় সহস্র শব্দ মিল বা অলুপ্তাশ থাকিলেও তাহা আত সমাদৃত হয় না।

কিন্তু এক সময়ে যেটি কাব্যের গুণ বা রস বলিয়া গৃহীত হয়, সময়ান্তরে হয় তাহা দুর্বল বা অগ্রাহ হইয়া পড়ে। সেই রূপ এক সময়ে যেটি রসহীন বলিয়া সমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সময়ান্তরে তাহার আবার রসপূর্ণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। অবশ্য, যে রচনায় স্বভাব বর্ণন আছে, এবং যাহা বাস্তবিক রসপূর্ণ, তাহা যুগযুগান্তরে ও দেশ দেশান্তরে সমাদৃত হইয়া থাকে। হয় ত প্রাচীন কালে তাহা সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে সমাজের রসগ্রাহী শক্তি বিশেষ পরিমার্জিত ছিল না, পরে সুমার্জিত হইলে তাহার মূল্য আরম্ভ হইল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। যে গুণগ্রাহী নহে, সে এরচনার গুণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, এই মাত্র। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদিগের রস-

গ্রাহিণী শক্তির কোন অবস্থা? এক্ষণে আমরা রসপূর্ণ রচনার গুণগ্রহণ করিতে পারি, কি তাহা ভ্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট রচনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদর করি? যে রচনা সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়, সেই রচনা সমাজের তাত্‌কালিক রসগ্রাহিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপ। রসমহীন রচনা যদি সমাদৃত হয়, তবে সে সমাজের রসান্বাদন শক্তি সুরক্ষিত হয় নাই। আর রসপূর্ণ রচনা যদি কোন সমাজে সম্মান পাইয়া থাকে, তবে অবশ্য সে সমাজকে রসজ্ঞ বলিতে হইবে। সেই রূপ যে নাটক বা যাত্রা জন-সমাজের প্রিয়, সে নাটক বা যাত্রার দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অহুত্ব কর, যাইতে পারে। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের রসগ্রাহিণী শক্তি কতদূর পরিমার্জিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রাদি দ্বারা অহুত্ব হইতে পারে।

এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে গ্রামে এক-কবার এই যাত্রা হইয়াছে, সে গ্রামনিবাসীগণ সময় পাইলে কখন কখন তদ্বিষয় স্পন্দিত করিতে তুটি করেন না। অন্য যাত্রাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের আধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার রসজ্ঞতা বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গা যাত্রা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসমত হইবে না।

নায়ক নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল

যাত্রার উদ্দেশ্য। কাব্য কি নাটক কি নাটকভিনয়, এককোরেই উদ্দেশ্য মনুষ্য জন্মের চিত্র। মনুষ্য চিত্তবৃত্তি মধ্যে বিশেষ বেগবতী এবং সুখকরী যে রক্তি, তাহা মেঘ, অল্পরাগ, প্রণয় ইত্যাদি নামে পরিচিত। এক জনের প্রতি অন্যের আত্মপেক্ষা আন্তরিক সমাদরকে এই নাম দেওয়া যায়। এই রক্তির পাত্র ভেদে, বৈক্যবেরা মধ্য বাৎসল্যাদি নানা প্রকার নাম দিয়াছেন। “এবং সে সকল নাম সাধারণেও চলিত। যে কারণেই হউক, ইহার মধ্যে দম্পতী প্রণয়ই সর্বশ্রেণে সর্বকালিক সকল কবি কর্তৃক বর্ণিত এবং সকল নাটকে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবার স্পর্শ কর, তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিবাদ কিরূপ, আকাশিকা কিরূপ, চাক্ষুষ কিরূপ, ধর্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সঙ্গমযাত্রা কিরূপ, তদ্বিষয় বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কিছুই দেখা যায় না। এবং তাহা দেখাইবার স্থানও এ যাত্রায় নাই। বস্তুতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে তাঁহার বাস এবং দৌত্যকর্মে মালিনীর প্রেরণ, এই কয়েকটী অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন অংশে রসোন্মাদনের সুস্থ-বনা? ইহার মধ্যে কোন স্থানে প্রেমালাপ প্রবাহিত হইবে? যাত্রায় এই অংশের শেখভাগে কখনই বিদ্যাসুন্দরের মিলন পূর্ণাঙ্গ অভিনীত হইয়া থাকে। ইহার স্

শক্তির উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু হৃর্ভাঙ্গা বশতঃ প্রায় এইসময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সূর্য্যাকিরণ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। মা মা করিয়া দুইটা ঠকুরানী বিষয়ক গীত গাইয়া যাত্রাকরেরা শেষ করিয়া দেয়। অতঃপর বিদ্যাসুন্দরের প্রথম আলাপ কীরূপ হইল, তাহা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যার সহিত মিলন হইলে পর সুন্দর সমাসির বেশ ধরিয়া রাজসভায় বাতায়িত করিতে লাগিলেন, এই অংশকে সমাসির পালা বলে। ইহার যাত্রা সর্বদা না হউক, মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। বিদ্যাকে সমাসী বিবাহ করবেন বলিয়া বাতায়িত করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া বিদ্যা কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য সুন্দর স্বয়ং সমাসী সান্নিধ্যাছিলেন। রাজ্যে যখন সুন্দর মিলনে যে, সমাসির বাতায়িততে তাঁহার বড় চিন্তা হইয়াছে, তখন বিদ্যা কেবল বলিলেন,

“জান মনে মনে উভয়ের মিলন;

তবে চিন্তা কর কেন?”

এ রস সুন্দর প্রভাষা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না; ভাষিয়া গেল।

আদিরসের তীব্রতা নাই। রস মধ্যে করণ রসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করণ রসে বাসুশ মনুষ্য চিত্তকে, আলোড়িত করা যায়, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জন সাধারণ আদিরস প্রিয় হইলেও, সর্বদেখের সর্বকালে কবিরূপ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যটির মনোহা-রিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর তাহাকে বিরহ

বা বিচ্ছেদ বলে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কত সরস দেখা গেল—বিচ্ছেদ কিরূপ দেখা যাউক।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অস্পষ্ট। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেই টুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন; নাচিয়া তদ্বিষয় দুই একটি গীত গায়িয়া থাকেন; অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত ছুটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ। এতদ্বিধি যদি অন্যরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাও সামান্য। সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না, কাহারও নয়ানাক্রম পতিত হয় না, বিদ্যাও কঁাদে না, শ্রোতৃগণও কঁাদে না। “আমার উপর কচ্ছে প্রাণ” এই কথায় বা তদ্রূপ কথা যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল, তাহার বেশী নহে।

সামান্য বিচ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মন্তকচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মসানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কালদোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া নাচিতে নাচিতে আড়ম্বমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের প্রভোৎসাহে বহিতে থাকে, অমনি বাহবার প্রত্য পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরো ঘুরিয়াই নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আত্মাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন ঢুলিতেছে! বেশাশুভা-বাস্করকে সুপাই নট, কেমন নয়ন-সুন্দর,

ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া চুর্ভাগা স্বন্দরের বিদ্যাপ্রোক্তারা একবারে ছুটিয়া যায়।

একগণকার রুচির-এই এক পরিচয়। শোকাকুলো নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠা-রিয়া শোক করিতেছে, আর আশাদি-গের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। প্রোক্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিকরঞ্জেয় কৃষ্ণ বিষয়-কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন? কেহ উত্তর করিতে-ছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মার্থে কালিয় দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থ নহে। এরূপ প্রোক্তাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা স্বাভা-ব, তথাপি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার এক স্থানের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু কৃষ্ণ যাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেননা কৃষ্ণযাত্রা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। তবে ইহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এতদংশে কিছু ভাল, এই জনাই আমরা সে প্রশ্ন করিতে সাক্ষ্য পাইতেছি। বিবেচ্য যে দেশে কৃষ্ণ প্রধান দেবতা, কৃষ্ণলীলার কথা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, যেখানে গুরু কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দি-তেছেন, পুরোহিত মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছেন, কর্ণক গ্রামে কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে আবাল রুদ্ধ, আপামর সাধারণ, দোকানি গো-সাক্ষি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎ-সবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ,—যে দেশে মাঠে ঘাটে, বনে বাজারে, মন্দিরে

নাট্যশালায়, বৈঠকখানায়, বৈশালায় চাশা চুয়াড় নট নটী বাবু বৈশা ইতর সাধারণ সকলেই অহরহ কুলুগীত গায়ি-তেছে,—যেখানে ঘৃহত্রি কৃষ্ণ, গাজ বস্ত্রে কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বিধিয়া কি কল?

নাটকগণ্যে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বাবুদি-গের মুখ চাহিয়া বিদ্যাসুন্দরের দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিয়াছি—রন্ধ ও বৈষ্ণবদি-গের মুখ চাহিয়া কৃষ্ণযাত্রার একটি গীত উল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণ মথুরাধিপতি; গোপকন্যা রান্না দুই তাঁহার আনমনে যাইতেছে। তাহার কথায় রাজার গো-চারণে পুনরাগমন করিবার সম্ভাবনা নাই—

—এজন্য দুই দর্প করিয়া বলিল যে, যদি না আসে, তবে বাঁধিয়া আনিব। কৃষ্ণকে বাঁধিবে। রাধার কথা অসহ্য হইল—

“আমি মরি মরিব, তারে বের্ন না,
যে দৃষ্টি তারে পায়ে ধরি, তারে বের্ন না,
সে আমারি প্রিয়।

সে দেখানে দেখানে থাকুক,
তাহারে রাধানাথ বই তো বলিবে না”

ইত্যাদি গীত সকলেরই অভ্যাস আছে, এ জন্য সমুদ্রাংশে উদ্ধৃত করার প্রয়ো-জন নাই। রাধা এই কথায় অনেককে প্রেমাস্র-বর্ষণ করিতে হয়। কৃষ্ণকে বাঁধিবে, এইটি কেবল কথায় মাত্র বলা হইয়াছিল; রাধা তাহাতে ব্যথা পাইলেক। কিন্তু স্বন্দরকে কেবল কথায় নহে, একটু প্র-স্তাবে ঝঙ্কন্তযুক্ত করিয়া বাঁধিল, মসানে কাটিতে পর্যন্ত লইয়া গেল, তথাপি বিদ্যার কণাযাত্রাও ছুৎ হইল না,

প্রোক্তাদিগেরও হৃৎস্থ হইল না; অপ্র-পাতের ত কথাই নাই। বিদ্যাসুন্দর-ভক্তগণ, বেশ হয়, এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যার প্রণয় চিত্র প্রগাঢ় বলিয়া যাত্রায় বর্ণিত হয় নাই। এই তুলনায় আরো বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ ‘কবি ছিলেন’ এবং প্রোক্তগণ অনেকাংশে রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভ-য়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য স্বয়ী সাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়া প্রোক্তাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।

সচরাচর যে রূপ চিত্তরত্তির বেগ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আকাক্ষা পরি-তুষ্ট হয় না। ভগ্নপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধা-রণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখ-সৌরভ মাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। কিন্তু সৌপরি-চয় কবি ভিন্ন আর কাহারো দিব্যর মাধ্যম নাই। তাহাতে কবির কল্পনা শক্তি আবশ্যক। যদি অপর কেউ করে, তাহা হইলে এই যাত্রায় যে রূপ বিদ্যা-সুন্দরের পরিচয় আছে, সেইরূপ হইয়া পড়ে—অর্থাৎ মাহাঘোর পরিবর্তে রহস্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক এই যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক। মালিনী সুন্দরের কথাবার্তা কি ভ্রাদ্যাসুন্দরের কথাবার্তা, উভয়ই সম-ভাবের রহস্য পরিপূরিত। কখন কখন প্রণয়দ্বিগের মধ্যে রহস্য কি কোভ-কালাপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু

তাঁহা অতি সাধারণ। যে স্থলে প্রণয় গভীর, সে স্থলে উপহাস রহস্যাদি স্থান পায় না। কিন্তু এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাণ্ড ভাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাক্যরোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। বিদ্যার কথা বার্তা সন্তুজ্ঞেই অস্প; রহ-স্যের উত্তর না দিতে হইলে, তাঁহার গীতের ভাগ অন্ধের কমিয়া যায়।

এই যাত্রায় মালিনীই প্রধান। তা-হার রঙ্গরঙ্গ লইয়াই এই যাত্রা। কয়েই ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। নায়ক নায়িকা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপলক্ষ মাত্র। মালিনীর যৎকিঞ্চিৎ ছায়া-আঁচ, কিন্তু বিদ্যা কিছুই নহে; না প্রণয়িনী না উন্মাদিনী না জড়, না অন্য।

পূর্বে বাঙ্গালায় করণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্তে এ দেশে হাস্যরসের আধা-ন জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কোন ক্রমেই সাধারণপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই যাত্রা সাধারণপ্রিয় হইবার আর দুই একটি কারণ আছে। যে ভাষায় ইহার গীত গুলন রচিত হইয়াছে, তাহা সরল; অনায়াসেই অপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তন্নিম্ন সঙ্গীতেরও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। আর অনেকে মনেহ করিয়া থাকেন যে, এই যাত্রায় যতটুকু সামান্য কাব্যরস আছে, তাহাই একগণকার প্রোক্তাদিগের বোধোপযোগী। তদতিরিক্ত হইলে তাঁহাদিগের বোধো-পাত্ত হইত। যে রচনার রসগ্রহ হয়, তাহাই ভাল লাগে।

আমরা এ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কাহিনী এবং প্রোভাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে এই যাত্রার নীতি সহজে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভাষার অধিক প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা বলিব, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালিনী, সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটি লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিন জনের মধ্যে কোনটি অল্পকর-নীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় ভাষার কন্যার চরিত্র হউক, অথবা সুন্দরের ন্যায় ভাষার পুত্রের স্বভাব হউক। কেই বা প্রার্থনা করে যে, মালিনী ন্যায় ভাষার গৃহিণী হউক অথবা দাসী হউক। লোকের এক্ষণে প্রার্থনা করা হইতে থাকুক বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটির মধ্যে কোনটিও আদর্শ যোগ্য নহে বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ম ব্যতীত আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কখন কখন কবিতা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমন ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি দৃশ্য এবং ভয় উভয়ই অনিবার্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে অপকৃষ্ট হইতে উৎকর্ষ শিক্ষা হইল, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে অপকর্ষ সেরূপ চিত্রিত হয় নাই। কামেই বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, যাত্রা কি নাটক উভয়ের কোনটিই শিক্ষার নিমিত্ত নহে, ইহা হইতে সংশিক্ষা

প্রভাশা করা অসংগত। বিশেষতঃ যে নায়ক নায়িকা বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য, সে স্থলে অন্য আর কি শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এটি ভ্রাতাদের ভুল। যাত্রার বর্ণিত বিষয়, ধর্ম বিষয়ক হউক বা নীতি বিষয়ক হউক বা যাচাই হউক, আরো অধিক হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতের ছন্দে বিশেষতঃ স্বরে তদ্বিষয়ে কত সাহায্য করে। আর “আদিরস” বর্ণন থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কৃশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমন নহে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নায়ক নায়িকা হইলেই সে রূপ শিক্ষা সম্ভব।

মহাকবি সেকন্দরপুরের প্রণীত গুণে-লো নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম আদ্যোপাঙ্গ বর্ণিত আছে। বিদ্যা যে রূপ পিতার অজ্ঞাতে সকলকে লুকাইয়া সুন্দরকে আশ্রয়মর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ গুণেতার নায়িকা ডেসিডিমোনা আপন পিতার অজ্ঞাতে এক জন অতি ক্লুরূপ কাকির প্রেমে বন্ধ হইয়া তৎসমিতির পিতাভয় হইতে পলায়ন করেন। বিদ্যা এবং ডেসিডিমোনা, এই উভয় নায়িকার প্রেমারম্ভ প্রায় একই প্রকার দোষাবহ। কিন্তু ডেসিডিমোনার কার্যে, ব্যবহারে, কথাবার্তা, চিন্তায় এত সরলতা, এত নির্মলতা, এত পরিজ্ঞাতা প্রকাশ আছে যে, তাহা দেহবর্জিত বলিয়া বোধ হয়। এবং যদিও তিনি “ক্ল্যুভাগা” করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাবৎ চন্দ্র হইয়া থাকিব, তাবৎ ভ্রাতার সতীত্ব সতীত্বের আশ্রয়রূপ থাকিবে। যিনি ডেসিডিমোনা-কে ভাল বাসেন, তিনি সতীত্ব ভাল বাসেন। ধর্ম বস্তু, নীতি বস্তু, পিতা

মাতা বা অন্য উদ্দেশ্য দাতা, সকলেই বলিয়া থাকেন, সতীত্ব স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম; সতীত্ব রক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কর্তব্য; সতীত্ব রক্ষা করিলে যুগসম্পদ হয়। এ সকল কথা শিরোধার্য। কিন্তু কেবল শুদ্ধ উপদেশে অন্তরস্পর্শ করে না। এক ডেসিডিমোনার চরিত্রে “সতীত্বের সাপেক্ষে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছে, সহস্র উপদেষ্টা একত্র হইয়া ক্রমশঃকালে তাহা পারিতেন না।” এতৎ যাত্রা কি নাটকের নায়ক নায়িকা দ্বারা যে নীতি কি ধর্মশিক্ষা হয় না, এমন নহে।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা কেবল পুরাণ ব্যবসায়ী কথক আর যাত্রাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাণ ব্যবসায়ীরা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। এক্ষণে যাত্রাওয়ালা দেশের শিক্ষক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে যাত্রার আলোচনা আমরা করিলাম, সে যাত্রা যেখানে সমাপ্ত, তথাকার শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা এক প্রকার অসুস্থ হইতে পারে। পল্লীগ্রাম অসুস্থদান

করিলে এই যাত্রার ফলভোগী অনেককে পাওয়া যাইতে পারে। মালিনী যাপি দৌত্যক্রিয়া অধ্যাপিকা; ভাষার শিষ্য প্রশ্রিয়া ক্রমে দেশ ব্যাপিতছে। ছোট খাটো সুন্দরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিদ্যার বংশধর কি রূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ জ্ঞান নাই; কিন্তু বোধ হয়, নিতান্ত অল্প না হইতে পারে। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মত্তা সুরলা যুবতী গুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত বা তদ-রূপ গীত শুনিলে তাহাদের শিক্ষা কি রূপ হয়?

“এখন উপায় আদি, কর ত্বারে আনিতে।
“স্বামিনলে রেলেরে ছলে, ভুলে আছে মনেতে।
“করে সে মুলিন চরে, সুধাকর প্রকাশিবে,
“হাতি বিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই রূপ গীত পিতা পুত্র, লইয়া, মাতা কন্যা লইয়া শুনে; লজ্জা করেন না। সেই পুত্র কন্যা জ্ঞানবান হইলে পিতা মাতাকে কি রূপ ভাবিবেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

সাংখ্যদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
উপক্রমশিক্ষা।

এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বহুদর্শন ন্যায়ের আধার। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাৎপ

মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি কুরিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সম্ভব। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু

অন্যাপি হিন্দু সমাজের হৃদয় মধ্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাতন অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন^১ না বুঝিলে উহার সম্যক জ্ঞান জন্মিবে না; কেননা হিন্দু সমাজের পূর্বকালীন গতি অনেকদূর সাংখ্য প্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দু সমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্য অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আত্মাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হৃদয়ে অবশ্য করিয়াছে, এমন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তিমিবন্ধন, ভারত-বর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দু চরিত্র। যে কার্যপন্থতত্ত্বতার অভাব আত্মাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিন্দু আত্মাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজ্ঞাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র। এই বৈরাগ্য সাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিদের রূপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাস্তব সত্ত্বোৎসাহ জন্ম যুগলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্ম অন্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্মই বহুকাল হইতে, এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ হইয়া

তত্ত্বের সৃষ্টি। সেই তাত্ত্বিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তত্ত্বের রূপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্যচরণ করিলান বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তত্ত্বের প্রভাবে, প্রায় শত বোজন মূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কোথাকোড়া ঘোণী উলঙ্গ হইয়া কদর্যা উৎসব করিতেছে। সেই তত্ত্বের প্রসাদে আমরা চুর্ণোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক, জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন পুজার পূর্বে চীনা বাজারে, বড় বাজারে ডিউ তৈলিয়া যাইতে পারি না, তখন সাংখ্যজ্ঞারকে গালি দিই। যাহাকে পুজার সময়ে বহুদিন কিনিতে কিছু টাকা কর্তব্য করিয়া দিতে হইয়াছিল, তিনি যখন গণ পরিশোধ করেন, তখন মনে— “কপিলের বাপ নির্ধন হউক, বলিলে অনায়াস কথা হইবে না।

অন্যাপি ত্রিমুদ্রাগবাকীতা, মুশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্য-পুস্তক। সেই গীতা মিশ্র পদার্থ। তৎ-প্রণেতা যিনিই হউন, “বহুশাস্ত্র গুরু-পাসমণ্ডে সারাদানং যই পদবং” ● সাংখ্য প্রবচনের এই বাক্যসমূহের তিনি কার্য্যকরিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যেখান হইতেই তিনি সঙ্কলন করুন, সাংখ্য হই-

তে বাহা লইয়াছেন, তাহা জাজ্ঞাল্যমান। সাংখ্য দর্শন না হইলে ভগবাকীতা হইত না।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধ ধর্ম ভারত-বর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন মধ্যে যে সময়টি সর্বাঙ্গোৎকর্ষ বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। এখন ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া, দিগ্‌হলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্রীলঙ্কা, এই ধর্ম অন্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধ ধর্মের আদি এই সাংখ্য দর্শনে। বদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ-ধর্মের এই তিনটি সূত্র; এই তিনটিই ঐ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক রূলকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধ-ধর্ম এবং সাংখ্য দর্শন” ইতি বসন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিই মূল সাংখ্য দর্শনে। নির্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিণাম মাত্র। বেদের অবজ্ঞা, সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সাংখ্য সম্বন্ধে ক্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তৎ-পুস্তকী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্য মধ্যে কে সর্বাঙ্গোৎকর্ষ অধিক লোকের জীবনের

উপর অশুভ করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে যীশু খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সম্বন্ধে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাংকরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শন শাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম করিলে বহু ফলাৎপাদক হয় নাই। দ্বৈতে বা আরিস্তন্তল, বেকন বা দেকার্ড, অধিকতর শুভ ফলের বীজবপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফল বাহুল্যে কপিলের সৃষ্টি ভূতলে আত্মতা। সেই সৃষ্টির সকল পরিণাম যে শুভ নহে, সে দোষ কপিলের নয়। যে ভূমিতে তাহার বীজ পড়িয়াছে, অনেক দোষ সেই ভূমিরই। জুর্মান ভূমিতে কপিল দর্শন কাঁচি দর্শনোপেক্ষা অধিক ফলোৎপাদক হইতে পারিত সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষে কাঁচি দর্শনে কি মন্দ ফল না জন্মিত?

সাংখ্যের প্রথমোক্তপত্তি কোন কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিংবদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস্য করবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন দেশীয় ব্যক্তি, কোন কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথক স্মরণ রাখিবেন, যে আমরা “নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি শ্রবীত যোগ শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে।

● বৌদ্ধধর্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সত্যিকার বিচার স্থান এ নহে।

এ প্রবন্ধে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ-প্রাচীন কোন সাংখ্য গ্রন্থ থোঁদা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেরই কপিল স্বয়ং বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, নায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থ মধ্যে আছে। এ সকল দর্শনের মত সাংখ্য প্রবচনের খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্বিষয় সাংখ্যাকারিকা, তত্ত্ব-সমাস, ভোজ্যবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যাতত্ত্ব প্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অতিনব। কপিল, অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং বাহ্য কপিল বৃত্ত বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অলম্বন করিয়া, অতি সামক্লেপে সাংখ্য দর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা বাহ্য কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমন বিবেচনা কেহ না করেন। বাহ্য কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতক গুলিন বিদ্ব লোকে বলেন, এ সংসার স্ব্থের সমুদায়। আমরা স্ব্থের জন্য এ পৃথিবীতে, প্রেরিত হইয়াছি। বাহ্য কিছু দেখি, জীবের স্ব্থের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের স্ব্থ পথনি করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টি মধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে পায়?

আবার কতক গুলিন লোক আছেন; তাঁহারাও বিদ্ব—তাঁহারা বলেন, সংসারের স্ব্থ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা নাকি অতিশ্রমে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহা বলিতে পারি না—তাঁহা মনুষ্য বুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারের জীবের স্ব্থের অপেক্ষা অস্ব্থ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘন পৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর সেই সকল নিয়ম এমনত করিয়াছেন যে, তাঁহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাঁহা লঙ্ঘনের এরূপও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক সেবন পরিণামে মনুষ্যের আত্ম দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের এরূপ মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদক সেবন এত সুসাদা এবং আশুস্বখের কেন? কতক গুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাঁহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আত্মাস্বস্থিরের পরীক্ষায় সন্ধান, হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহান অনিষ্টকারী কার্বনিক-আসিড প্রধান বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিলে অসুস্থদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিপরীত কখন আসাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাঁহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেক গুলি নিয়ম এমন

আছে যে, তাঁহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সন্নিহিত কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাঁহা আমাদের জ্ঞানের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাঁহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ্য লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কষ্ট দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডযুগ্ম; তাঁহার মূর্খতার বস্ত্রায়া পিতা রাষ্ট্র দিন বস্ত্রা পাইতেছেন। মনে কর, শিকার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্কুলস্থলি লইয়াই ভূমিষ্ট হইয়াছিল। আমরা নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্য বুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রায় নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও যে দুঃখ পাইব না, এমনও দেখি না। এক জন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহ বস্ত্রা ভোগ করিলাম। আমার জমিবার পক্ষাঘাত বৎসর পূর্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজ্য কখন হইয়াছে, আমি তাঁহার কলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার, গোষ্ঠীকৃত এমন গুরুতর বিষয় আছে, যে ভাবাত্মিক নিয়মাত্মবর্তী হওয়াতেই দুঃখ। লোকসংখ্যা রাষ্ট্র বিষয়ে মালখসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ ইনসার্গিক নিয়মাত্মসারে আপনং স্বভাবের পরিচায়ক করিলেই লোকসংখ্যা রাষ্ট্র হইয়া সহঃ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখ নয়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যাকার তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্য দর্শনও বোধগম্যের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু স্ব্থ আছে, তাঁহাও অব্যর্থ্য নহে। সাংখ্যাকার বলেন যে, স্ব্থ অপ। কদাচ কেহ স্ব্থী, (৩ অধ্যায় ৭ সূত্র) এবং স্ব্থ, দুঃখের সহিত একত্র মিশ্রিত যে বিবেচকেরা তাঁহা দুঃখপক্ষে নিদেপ্ত করেন। (এ; ৮) দুঃখ হইতে যত ক্লেশ, মুগ হইতে তাদৃশ সুখাকাজ্ঞা জন্মে না। (এ, ৬) অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখ মোচন। এই জন্য সাংখ্য প্রবচনের প্রথম সূত্র—“অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্ম্য নিরস্তিত্যন্ত পুরুষার্থঃ”।

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাঁহারই পর্যালোচনা সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাঁহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছে, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যাকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখ নিরস্তি নাই; কেননা আবার

সেই সকল দৃষ্টান্তের অস্বভাব আছে। তুমি অস্বভাব করিলে, তাহাতে তোমার আশ্রিতার ক্ষুধা নিরস্ত হইল, কিন্তু আবার কাল ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রুত করিয়া, তুমি এবার পুস্ত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুস্ত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেই রূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এ রূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে, আর পঙ্গু হইবে না। সেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সম্ভূপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরস্ত হইলেই পুস্ত্রশোক বিমুত হওয়া যায় না। (১ অধ্যায় ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দৃষ্টান্ত নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্বের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দৃষ্টান্ত নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ভাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনঃস্থালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নি-নাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহদগ্ধন ভিন্ন আর জীবের দৃষ্টান্ত নিরস্ত নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জয়জয়ান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জয় পৌনঃপুন্য আছে, তাহাও, এবং সেখানেও জয়মরণাদি দৃষ্টান্ত সমান ভাবিয়া তাহাও দৃষ্টান্ত নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়ঃ ৫২, ৫৩ সূত্র) আত্মা, বিশ্বকারণে বলীন হইলেও তদবস্থাকে দৃষ্টান্তনিরস্ত বলেন না, কেননা যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে। (উ ৫৪)

তবে দৃষ্টান্ত নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দৃষ্টান্ত নিরস্ত। অপবর্গই বা কি? “দ্বয়োরেকতরসা বৌদাসী নামপ-বর্গঃ।” (ভূতীয় অধ্যায় ৬৫ সূত্র, ১) সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ব্যাধি করিবেন না। বাহ্য প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত, বা সর্বজনপরিচ্ছাদ্য, এমন মনে করিবেন না। বিবেচকে দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বুদ্ধি এমন স্থায়ী ফল করিবে কেন?

রামায়ণের সমালোচনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সান্ত্বিত্য সম্ভোগ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন যত্ন

করিলে একজন শুরুর হইতেন, তদ্বিধয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্য গ্রন্থ খানির স্থল তাৎপর্য,

বানরদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজয়, ও রাক্ষসদিগের সর্বশেষ নিধন, ইহাব বর্ণনীয় বিষয়। বানরদিগের কীর্তি সম্যকরূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য নহে। গ্রন্থকার যে ততদুর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দুর রুতকার্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাঝেই স্বীকার করিবেন।

রামায়ণে অনেক নীতিগত কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা ইহাতে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। এক নির্দোষ প্রাচীন রাজার যুবতী ভাৰ্য্যা ছিল। বুদ্ধিমত্তা-বৈকল্যে স্বীয় পুস্ত্রের উন্নতির জন্য, নির্দোষ রক্ষকে ছাড়াইয়া ছলক্রমে রাজার স্নেহপ্রসূতকে বনবাসে প্রেরণ করিল। স্নেহপুস্ত্রও ততোধিক মূর্খ; আপন স্বভাবিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাগের কথায় বনে গেল। তা, একাই বাউক, তাহা নহে; আপনায় যুবতী ভাৰ্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। “পথেনারী বিবর্জিতা,” এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে বাহা ঘটবার, ঘটিল। স্ত্রীস্বভাবস্বত চাপল্য বশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজভোগ করিতে গেল। নির্দোষ রাম পথের কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে, এতটা ঘটত না। সীতা দুঃখ-রিদ্ধা হইলেও, ঘরে থাকিত; বনু গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্যের সংসর্গ প্রসাধ্য হইয়াছিল, এ জন্য এমন

ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

লক্ষ্মণ আর একটি গুণ মূর্খ। তাহার চরিত্র এ রূপে চিত্রিত হইয়াছে যে তদুদার। লক্ষ্মণকে কর্তৃকম বোধ হয়। মনে করিলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের “পিতৃ হইয়া, আপনায় উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।

আর একটি গুণ মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ মূর্খ লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে ছাড়াইলে আমরা বন্দনীয় পূর্ণপুস্ত্র তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সর্বশেষে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে মানেন, কিন্তু মূর্খের মূর্খতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে এক দিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সে টার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাজ স্থখে ছিল। পরে বুদ্ধিহীনতার বশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া মাড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ করিয়া, মাটিতে পুড়িয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে এই রূপেই ঘটে। রামায়ণের স্থল তাৎপর্য এই। ইহার অন্তঃকরণে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিংবা

সম্মী আছে যে, ইহা বান্দীকি প্রণীত। বান্দীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তাহা বিধেয় সংশয়। বান্দীকি হইতে বান্দীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বান্দীকি মধ্যে এই গ্রন্থ খানি পাওয়া গিয়াছিল; ইহা কাহারও প্রণীত নহে।

রামায়ণ নামে এক খানি বান্দীকা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কীর্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বান্দীকিরামায়ণ কীর্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বান্দীকি রামায়ণ কীর্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কীর্তিবাস বান্দীকিরামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। “রামায়ণ” শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বান্দীকায়ে সমর্থ হয়। বোধ হয়, “রামায়ণ” শব্দটি “রামা যবন” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল “ব” কারু লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কীর্তিবাস গ্রন্থের ইহার রচনা করিয়া থাকিলেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বান্দীকি মধ্যে লুকুইয়া রাখিয়া দিল। পরে গ্রন্থ বান্দীকি মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বান্দীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থ খানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উদ্ধাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিমস্ত ঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতা

হরণ, এ সকল আদিমস্ত ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরগণকর্তৃক সমুদ্র রুদ্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করণ রসান্ত্রিত বিষয়। লক্ষ্মণ, ভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু ভাস্যারস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা রসিও প্রাজ্ঞল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে “অযোদ্ধাকাণ্ড”। গ্রন্থকার তাহা “অযোদ্ধাকাণ্ড” না লিখিয়া “অযোধ্যাকাণ্ড” লিখিয়াছেন। ইহা কি সামান্য মুখতা? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থ খানি সাধারণের পরিহার্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে এই কদর্য গ্রন্থ খানি পড়া ভাগ করিবেন। আমি এক খানি স্মৃতিম রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্তে তাহাই সকলে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য; কেননা আমি ত বান্দীকির নাম্য কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নছি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিশ্লেশণ।

মহামর্কট।

পুনশ্চ। আমার প্রণীত রামায়ণ আমার ভ্রাতৃসন রঞ্জে নিম্নশাখা পাওয়া যায়। মূল্য এক এক ছড়া স্বপ্নক মর্ত্যমান রত্ন।

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা।

(১) ক
(প্রয়োগ)

মুদুর পশ্চিম—ছাড়া গাভার,
ছাড়া পারস্য, আরব-কাহার—
নাগর, ভূধর, মনী, নন ধার,
বেশ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে—
বীণা যন্ত্র করে বাণী-পুষ্পগণ
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায় শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর বৈলে।

(শাখা) খ

অরে তবু তুমি—বীণার অধম—
তুমিও বাজিতে কর রে উদ্যম;
বীণার যেমন রাখাল অধরে,
বাজ রে নীরব ভারত ভিতরে—
বাজ রে আনন্দলহরী ঘরে।

(বিরাম) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় হবে,
তখন মুকুট বিহণ সবে,
রক্ষিত গগনে বিভাস ঘেরে,
আগিয়া শিশুর, পল্লব ঘেরে,
গাছা ভাঙে-বিমান আশে,
মুদুরলহরী ভাঙা রাগে;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তানদের না যায় দেখা—
প্রভাতে-অরুণ উদয় হবে,
তখন বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখন কানন পূরে সুবসে।

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে উক্তি; গাছক কর্তৃক উচ্চারিত।

(খ) গাছক সন্নিহিত দুই কবিা ভিন ভিন কর্তৃক উচ্চারিত।

(গ) অরুণ হইতে অম্বা কণককরন কর্তৃক উচ্চারিত;
অনন্তে অনন্তে উচ্চারণে আশাবিধের বনের ভাব প্রকাশ করিতেছে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে।

(২)
(প্রয়োগ)

কবিরহস্যমি এই না সে দেশ,
ধ্বনিবাকরূপ লহরী আশেব
সঙ্গীত সেখানে—সেখানে দিনেশ
অকুল উদ্যতে উদয় হত;
যেখানে সরসী কমলে নলিনী,
যামিনী কৈকেতে যথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনি,
গগন-লগ্নাতি বাহিরা বর?

(শাখা)

তবে মিছে ভ্রম, ভ্রম রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পুরিরা আশয়—
যে রূপে মায়েকে কমল-আদরন,
দ্বিগুণ শত দল রাতুল চরণে,
অমর পুঞ্জিলী নন্দন বনে।

(বিরাম)

কেন রে মাজারি কুমুদ-হার,
ভারতে শারদা মাহিক আর;
অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ,
বাজে না সে বীণা—নীরব উজনি;
মাহি সে বসন্ত, সুরভি মৃগ,
গোধূলি নাহি সে কোকিল-গান;
গোধূলি-নিকটে মুগন্ধ উঠে না;
নীল-অচলে মল্লক ভুটে না;
নাহি শিল এক ভারত বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর বনে—
কেন রে মাজারি কুমুদ-বনে।

(৩)

(প্রয়োগ)

যেত শতল তেমনি সুন্দর
রাগ খেতে খেতে মৃদাল উপর,
আরু কমল, নীল পদ্মধর,
মিশাও তাহাতে চাকুরি করে;

কার্য্য করি রাখ মস্তকলে,
কেতকী কুমুদ, পারিজাত নলে,
আলকু করিতে অলাও অঙ্কলে
রশালমঞ্জরী গাথি লহরে।

(শাখা।)

ঘের চারি ধার মাধবী লতায়,
চামেলি, গোলাপ বীধ তারু গায়,
কজুরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবী লতায় কর রে সিকন—
মাতৃক সুগন্ধে সুবরন।

(বিরাম।)

রতিল আসন অমরগণে,
আইল কন্দর্প যতু স্বকৃ সনে;
অগনি সুমন্দ মলয়-বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরয়ে ধায়;
তাজিয়া কৈলাস ভূধর-শুভ,
আইলা মহেশ দেখিতে রজ;
অপিতি আইলা কমলা সনে,
অমর-আলয়ে প্রহুজ মনে,
দেবেন্দ্র-চরনে আনন্দকায়
বেবধি, কিরর, গজর্গ ধায়,—
সতী সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়

(৪)

(৫)

শোভিল সুন্দর কুমুদ-আসন,
মনের আঙ্কালে বিধাতা তপন,
তাজি ব্রজলোক করিলা গমন,
ধামতে বসিলা আসন-পাশে;
যথা পূর্ণ দিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্মমূর্তি-কালে—দিব শিখাময়,
ক্রমে চকুমুখ সেই রূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ণ ভ্যোতি প্রকাশে।

(শাখা।)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরুদ্ধ হুটে,
ব্রহ্মার ললাট হতে ভ্যোতি হুটে,
ঔপরূপ এক মুগ্ধ বরণা,

নারী উপজিল, হাতে করি বোণা—
মুখে নিত বেরে করে ঘোষণা।
(বিরাম।)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে,
মুনিমতভের ঘুচিবে ঘরে;
স্বনে বেরগান বাধীর মূরে,
হবে জয়ধ্বনি আকাশ পূরে;—
নামে রে যখন গগন পথে,
মলিন তপন—কে রোধে রথে?
আকাশের তারা খসিলে, হায়,
পুনঃ কি উঠে সে আকাশে ধায়!
উজানে কখনো ছুটে কি ছল,
ফিরে কি যৌবন করিলে হল?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল।

(৬)

(প্রয়োগ।)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরয়ে পুজিলা অমরে;
উজাসে মহেশ, উম্মত অন্তরে,
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান;
আপনি বিধাতা, হইলা বিজল,
আনন্দে ভুজিয়া শেষত শতবল
দীলা শেষে ভুজ—বেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ।

(শাখা।)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তপনি
বীণাধ্বনি সহ প্রবাহ বহিল—
হায়! যুগ-তরি কতই ভাসিল,
ভারতে ঘরে সে তরল ছিল।

(বিরাম।)

কে বলিল পুনঃ পারে না তায়?
হারান মাগিল পাঞ্জা ত যায়;
হয়, যায়, আসে মাদ্যার ভবে,
গৃহের ছায়া কে দিন রবে?
এ জগত মাঝে করো না ভয়,
মাহল যাহার তাহার জয়;

দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখে চেষ্টে কত দূর আছে;
আই দেখে দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত ভীমিরে,—
আর কি উহারে পাবি না ফিরে।

(৩)

(প্রয়োগ।)

ক্রমে যত দিন বহিতে লাগিল,
শারদা পুজিতে মানব আইল,
কবি নামে খ্যাত ধরতে হইল
মধুর লসর মানবগণে;
আইল প্রথমে আর্ব্যকুল-রবি,
জগত বিখ্যাত বাল্মীকি কবি—
দিলেন শারদা করুণার ভবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রহুজ মনে।

(শাখা।)

হেরিরা সে ছবি আদো কত জন
আসিল পুজিতে মাতের চরণ—
আসিল হোমীর যুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে হৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ণ কোরাস, কৃপাণ-রাশি।

(বিরাম।)

রাজ্যে আনন্দে সমর তুরী,
যাও রে দুজন অবনীপূরি;
স্বনায়ে মধুর অমর ভাব,
যুগাও মানব মনের ভাস;
সেখাও মানবে কুবনত্রয়
ভুজিয়া আনন্দে, করো না ভয়।
জুই ও না কেবল কৃতাঙ্কধাম—
বোহানা ফিল্টন, ডানটি নাম,
আসিবে দুজন অমুর পানে,
এ পুরী খুলিয়া দেখাও নরে;

দেখাও ইহার অমলময়
অসীম বিস্তার, অসম্ভ ভয়—
আতঙ্কে হেরিবে কুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ।)

পরে অদৃষ্ট মানব দুজন
আইল পুজিতে শারদাচরণ—
পৃথিবী, আকাশ, নরদু পবন,
সকলি তাদের কথার বশ।
ডাকিলা শারদা আনন্দে দুজনে,
বসাইলা নিঃ কুমুদ-আসনে;
অমূল্য বীণা দীলা এক জনে,
দীলা অন্য মনে যতেক রস।

(শাখা।)

যাদুকর বেশে, চমকি কুবন,
নিজ নিজ বেশে ফিরিল দুজন;
এক জন তারে সে বীণার স্বরে,
মেয়ে করি দূত প্রিয়া মনঃ হরে,
এক জন বসি আভনের ধারে
সুখা চলে বের অমর নরে।

(বিরাম।)

বিজন মরুতে মাজায়ে ছেন
এ কল-মাগিকা গাথিলি কেন?
আর কি আছে রে সুরভি যুগল,
আর কি আছে সে কোকিল গান?
আর কি এখন সুগন্ধ ময়,
গৌড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়,
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুধায়ে গিয়াছে সুধার লেশ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কানন্দে ঠৈল এ ধন,
রাখিলি ফুলাতে কাহার মন?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

স্বাস্থ্যকৌমুদী। অর্থাৎ সর্গদ্বাধারণের অবস্থা জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য বিষয়ক হস্তনবিধ গ্রন্থ। অগ্রথ ভাগ। ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঢাকা প্রিণ্টারী যন্ত্র।

আমরা এই গ্রন্থ খানি দেখিয়া বিশেষ স্তুতি লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের যুগান্তে সকল যে অজ্ঞত অপাঠ্য অসার কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা উল্লারিত করিতেছে, তদ্বোধে এক খানি সারবৎ গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল। কাব্য নাটকের আমরা অবমাননা করি না, এবং আধুনিক বিষয়ী বাহুস্বাভিলাষী ইংরাজদিগের ন্যায় বলি না যে, সকলে মিথিয়া, কেবল বাহ্যতে দৈহিক স্বপ্নের রক্ষি, সেই বিদ্যার অশুশীলন কর—কাব্য—নাটক স্পর্শ করিও না। যত দিন মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্তন না হয়, তত দিন বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, উভয়েরই সমুচিত পর্যালোচনা ভিন্ন মনুষ্য উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্যের উপকারিতা ব্যাপ্যোজন লঘু নহে। কিন্তু যে সকল অভিনব কাব্য নাটকাদি দিনে বাঙ্গালায় প্রচার হইতেছে—তাঁহা অপেক্ষা বঙ্গভূমে কাব্য নাটকের একবারে লোপ হয়, সেও ভাল। তৎপরিবর্তে এ সকল চর্চার একাদিপতা পরমাঙ্গদেব বিষয়। এই জন্য বলিতেছি, একখানি সুদৃষ্ট শারীরবিধান গ্রন্থ দেখিয়াও আমাদের চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল।

ভারতচন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বাহ্যতে আমাদের স্বদেশস্থ লোকে, আমাদের সাধারণ, সংক্ষিপ্ত শারীরবিধান জ্ঞাত হইতে পারে,—প্রত্যাহ, দণ্ডে যে সকল নৈমসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালীরা ক্রীণ, অস্পায়িত, অস্থ্য, এবং নিলুপ্ত হয়, সেই সকল নিয়ম বাহ্যতে সকলে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার লঙ্ঘনে বিরত হইতে পারে—বাহ্যতে বাঙ্গালির সুখ রক্ষি, পরমাণু রক্ষি, কল্যাণ রক্ষি হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তদ্রূপ উদ্দেশ্যে শতই উত্তম গ্রন্থ ইউরোপে মচরাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং তদ্রিষদ্বন্দ্বন মহৎ ফল ফলিতেছে। কিন্তু এ দেশে এগুলি অতি দুলভ। মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়ই বাঙ্গালীর মধ্যে এ শাস্ত্রের অধিকারী; কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই অর্থোপার্জনে ব্যস্ত, অথবা আপন মাত-ভাষায় বীথ বজ্জা ব্যস্ত করিতে অক্ষম, সুতরাং এদিকে বড় চেষ্টা নাই। নব্য ডাক্তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতি কেহই এপথে অগ্রম পদাৰ্পণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বাবুকে এপথের আর এক জন পথিক দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

তাঁহার গ্রন্থ খানি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন মাত্র। ইহার অধিক এক্ষণে প্রত্যাশ করা যায় না। সবিস্তারে এসকল বিষয় বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই। তবে ভারত বাবুর

সঙ্কলনে, বোধ হয়, সংক্ষেপের অতিশয় দোষ ঘটিয়াছে। শারীরতত্ত্ব ভাগের অনেক অংশই এত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহা শারীরতত্ত্ব অনভিজ্ঞ পাঠক বড় কিছু বুঝিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ। অনেক গুলি নিত্য আ-বশ্যকীয় বিষয়ের উপযুক্ত বিবরণও দেখা যায় না। যথা—পচন এবং সমীকরণ (Digestion and Assimilation) ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমে বোধ গম্য বিবরণ কোথাও দৃষ্ট হইল না। রক্ত সঞ্চালন (Circulation) সম্বন্ধেও এরূপ। স্নায়ু মণ্ডলীর বর্ণনায় স্নায়ু গ্রন্থির (Ganglia) কোন উল্লেখ নাই। পচন, সমীকরণ, সঞ্চালনের যে কিছু উল্লেখ আছে, তাহা অন্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক ফলিক উল্লেখ মাত্র। যদি কোথাও এসকলের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, তবে গ্রন্থকার আমাদের নিকট নার্জনা করিবেন—সে আমাদের পোষিবার দোষ। যদি না থাকে, তবে তদ্ব্যতীত শারীরতত্ত্ব পরিচ্ছেদটি, একটা কৃষ্ণ বিন্দু কৃষ্ণাভার মত হইয়াছে।

গ্রন্থ খানি সাধারণের বোধগম্য হইবার আর দুইটি বিষয় চিত্তাচ্ছে। অগ্রন্থভাগে ভাষা। শারীরতত্ত্ব লিখিতে ভারত বাবুকে তদ্রূপযোগিনী ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। একদিন ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রশংসা। কিন্তু সাধারণ পাঠক সহজে সেই ভাষাটিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। ইহা গ্রন্থকারের দোষ নহে।

দ্বিতীয় বিষয়, চিত্রের অভাব। শারীরতত্ত্ব শিখিতে গেলে, জীবদেহচ্ছেদ ভিন্ন

শিক্ষা হয় না। তদভাবে, উত্তম চিত্র অর্থাৎ বহুলায়। কিন্তু এদেশে তদ্রূপযোগী চিত্র কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? ইহাতেও গ্রন্থকারের দোষ দিতে পারি না।

গ্রন্থের দুই একটি অভাবের উল্লেখ করিলাম বলিয়া অগ্রশংসা করিতেছি না। দেশ, কাল, এবং পাঠকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিলে, বলা বাহির্ভূত পারিবে যে, এক্ষণে এরূপ কার্যে যত্নের সফলতা লাভ করা যাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহা লাভ করিয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট প্রশংসা। তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত করেন নাই—শারীরতত্ত্ব স্থপণ্ডিত, এবং স্নেহলব্ধ। কিন্তু একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে সকল কথা আজিও অস্বাভাব্য মাত্র—প্রামাণ্যিক বলিয়া গৃহীত হয় না—তাঁহা অতি নিশ্চিত করিয়া না লিখিলে ভাল হইত।

উদাহরণ;—

“মস্তিষ্কের পুস্ক বর্ণ পদার্থে মনের সং-স্কার, সঞ্চিত ও সেই সংস্কারের মর্ম গৃহীত হয়, এবং স্নায়ু মূত্র দ্বারা উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত বা একক স্থান হইতে চালিত হয়।” পুস্ক বর্ণ পদার্থের পরিমাণ বিশেষে বুদ্ধির তারতম্য হয়।”

পুনশ্চ;—

“কোন আশ্রয় প্রযুক্তের হানি হইলে আহার কিছু দ্রুত অবনতি হয় না। যেহেতু আহার দিশাশ না। ইহা লোকে আমাদের সকল শ্রমভাষ্য কর্মের অনুষ্ঠান করি, আশ্রয় পরলোকে সেই সকল সুখ দুঃখরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে।”

একি বিজ্ঞান? না ধর্মোপদেশ? যিনি ধর্মোপদেশকে বিজ্ঞানের স্থলা-

ভিত্তিক করেন, তাঁহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার্ণবত্ব অপূর্ণ আছে, বিবেচনা করিতে হয়। এই দোষেই ভারতবর্ষের গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

দুই—একটি দোষে সমগ্র গ্রন্থের অবমাননা করণ যায় না। ভারতচন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানি প্রশংসনীয়। রক্ত, যুবা, এবং স্ত্রীলোক, সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্তব্য। সকল ঘরেই ইহার এক এক খণ্ড থাকা আবশ্যিক। বাঙ্গালী বিদ্যালয় সমূহে ইহা পঠিত হইলে ভাল হয়, কিন্তু পড়াইবে কে?

ললিত কবিতাবলী। কাব্যমালার রচয়িত্রী প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এগ্রন্থ খানি এবং কাব্যমালার একই রিচয়িত্রী প্রণীত বলিয়া সন্দেহ বিদ্বান্স হয় না। একবিভা গুলি ভাল। কাব্যমালার যে ঘোরতর দোষে দূষিত, এগ্রন্থে সে দোষ নাই; কেদারিৎ বিদ্বপাত হইয়াছে মাত্র। কবিতা গুলিও মধুর। সংস্কৃত ছন্দোবন্দে সকল কবিতা গুলিই লিখিত। উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালী কবিতা রচনা কতকদিন, তাহা অনেকেরই জ্ঞানেন। লেখক সে দুরূহ ব্যাপারে যে অনেক দূর কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মদ পরিচয় নহে। অখণ্ড কবিতা মধুর এবং সরস হইয়াছে। তবে পুরাতন কথায় অনেক।

দেখা যাইতেছে যে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, দুই আছে। তবে কেন তিনি, কাব্য মাল লিখিয়াছেন? কাব্যমঞ্জরী। শ্রীলব্ধের পালিত প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

এই কবিতা গুলির মধ্যে অনেক গুলি উত্তম। স্থানে২ কবিত্তের পরিচয় আছে। গ্রন্থকার যে এক জন কৃতবিদ্যা ব্যক্তি, অনেক স্থানে তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়।

এই কবি কিছু রূপক প্রিয়। অনেক গুলি কবিতাই এই অলঙ্কার বিশিষ্ট। এই রূপ কাব্য, অপার্যন্ত কখন অভ্যুত্কট কাব্য মধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারেও না। কাব্যমঞ্জরী মহাশ্ব সেরূপ কাব্য গুলিরও অভ্যুত্কট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তথাপি সে গুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য হয়। “কবিতার জন্ম” ইত্যাদিধেয় কাব্যখানি আমাদিগের বিশেষ আঁতিকর হইয়াছে।

কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতিগত। আদিরসের সত্ত্বব মাত্র নাই। এসকল বিষয়ে কাব্যমঞ্জরী কাব্যমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যমালার কে লিখিয়াছে? কবিদিগের হৃদয়ে কি, গ্রন্থগণের মত, এক পিঠ আধার এক পিঠ আলো।

আর্য্য প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পাতুরিয়া ঘাটস্থিত সাহিত্য যন্ত্র। শ্রীকর্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পত্র খানির বাহ্যদৃশ্য উত্তম, ভাল কাগজে পরিষ্কার রূপে ছাপা হইয়াছে। বিষয় গুলিও মন্দ নহে; চিত্তাকর্ষক বটে, এবং বস্ত্রসংযুহীত, কিন্তু রচনা প্রাঞ্জল বা প্রণালীবদ্ধ নহে। কাগজ খানির উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে আমরা অহুরোধ করি, তিনি যেন কেবল প্রকৃত ঘটনা ও বিচারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন।

অবলা বিলাপ। শ্রীমতী অমদা মুন্দরী দাসী প্রণীত। ত্রীযুক্ত হৃদয় শঙ্কর রায় কর্ত্তক প্রকাশিত। বাঙ্গালী সুলকামিনীরা যখন গ্রন্থ রচনা করেন, তখনই তাঁহার পাঠকের নিকট একটু দয়ার পাত্র হইয়া বসেন। রচনা কর্ত্তা মনে ভাবেন, “আমি যে স্ত্রীলোক হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছি, ইহাই বঙ্গবাহী পুরুষগণের ভাণ্ডা; আমার তাহার উপর লিখিলাম—আর কি রক্ষা আছে!” পাঠকেরা বলেন, “ভাল যোর ধন!—চের হয়েছে।” স্বতরাং গ্রন্থ কর্ত্তাগণ ভাল না লিখিয়াও স্থখ্যাতি পাত্রী হইয়েন। আমরা সে রূপ সত্যাতিক্রয়ে বড় অনিচ্ছুক। আমরা বলি যে, বাঙ্গালির মেয়ে যে লেখা পড়া শেখেন, ভালই; কিন্তু ভাল রচনা করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগের রচনা করিয়া সাধারণের সমীপবর্ত্তিনী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি উঁহারা আমাদের শিক্ষাদাত্রী হইতে স্পর্শ করেন, তবে স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব; স্ত্রীলোক হইবে না পারেন, তিনি যেন দেখেন না। অমদা মুন্দরীকে স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও দয়া বা ক্ষমা করিতে হইবে না। তিনি যদি পুরুষ হইতেন, তথাপি তাঁহার কবিতা প্রকার বিষয় হইত। বাবু হৃদয় শঙ্কর রায় বিজ্ঞানপন লিখিয়াছেন, যে, “বঙ্গ কামিনী বিরচিত যে কয়েকখানি পদ্যগ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিপথে, নিখতিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে সকল অপেক্ষা এই খানি কখন স্থান নহে।” সে সকল

অপেক্ষা স্থান নহে, বলিলে প্রশংসা হইল না। আমরা বলি, ইহা কোন খানির অপেক্ষা স্থান নহে।

হৃদয়শঙ্কর বাবুর বিজ্ঞাপনে জানা যায়, গ্রন্থকর্ত্তা নারীজনে নিতান্ত মন্দভাগিনী। পিতা, মাতা, স্বামী, ভাতা, মহোদর, সকলকেই একে একে শমনহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তাঁহার শোকানন্দ, “অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন নির্দীপিত অথবা লঘুকৃত করিবার মানসে এই পদ্য গুলি অবসর ক্রমে ক্রমশঃ রচনা করিয়াছেন।” গ্রন্থকর্ত্তার মন্দভাগ্যের কথাই আমাদিগের যে কট হইয়াছিল, শেষ কথাটিতে তাহার কিঞ্চিৎ লাভব হইল—আমরা স্বখী হইলাম। দুর্দ্দৈবহ শোক সন্তাপ অবশ্য এত দূর মন্দভেজঃ হইয়া আসিয়াছে যে, এক্ষণে তাহা পদ্যে ব্যক্ত হয়, এবং নির্দীপিতও হয়। এ রূপ নিয়ম না থাকিলে সংসারের যন্ত্রণা কে সহিতে পারিত?

গ্রন্থকর্ত্তাকে প্রকট পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সাধারণ পাঠকের নিকট সহৃদয়তার প্রত্যাশায় কবিতা গুলি প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক, গ্রন্থ গ্রন্থেতার দ্বয়ে কখন কাতর হয় না। তাহাদিগের নিকট সহৃদয়তার কামনা অরণ্যে রোদন মাত্র। মনের দুঃখ মনে যেন রাখিলেই স্ত্রীলোকের যোগ্য কাজ হয়।

পরিভ্রাত্ত পত্নী। শ্রীঅধিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তক প্রণীত। দামোদরের বন্যায় গ্রাম নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য কবি নৃমদে কিছু ভৎসনা করিয়াছেন। আমরা ভরসা

করি, নদ আর এমন দুর্দৃশ্য করিবেন না। কিন্তু আমরা কবিকে জিজ্ঞাসা করি, একের অপরাধে পরের দণ্ড কেন? দামোদর নদ দুর্দৃশ্য করিয়াছে বলিয়া, আমরা ২৫ পাঠ নীরস কবিতা পড়িয়া মরি কেন?

প্রবন্ধ কুম্ভমাবলী। ক্রীষ্টানচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কবিতা গুলিন অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা নাই কার, তাহা যে স্থপাঠ্য ও চিত্তরঞ্জন সমর্থ, তাহিহয়ে সংশয় নাই।

তর্জুহরি কাব্য। ক্রীলদেব পালিত প্রণীত।

তর্জুহরির বিষয়ে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তর্জুহরি নাম রাজা এক অনন্ত যৌবনপ্রদ ফল প্রাপ্ত হইলেন। আপনি তাহা ভক্ষণ না করিয়া প্রাণদ্রাব্য মন্দিরকে দেন। আবার মন্দির প্রাণদ্রাব্য আর এক জন। তিনি ঐ ফল সেই উপপতিকে দিলেন। উপপতির প্রাণদ্রাব্য এক কুম্ভা বারান্দা। সে গৌরী বারান্দাটুক দিল। বারান্দা এ ফল ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র কাহাকেও না দেখিয়া উহা রাজাকেই দিল। রাজা সর্বিশেষ বৃত্তিতে পারিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বলদেব বাবু এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত আত্মপুঙ্খিক বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য নহে— তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থান বাহিয়া লইয়া চিত্রিত করিয়া তিনি কাব্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তিন সর্গে চারিটি মাত্র চিত্র। প্রথম

রূপবতী মহিষী, দ্বিতীয় স্নাতী মানময়ী, তৃতীয় সাদাশা বারান্দা, চতুর্থ বিবাগী বনবাণী রাজা। এই চারিটি চিত্রই চিত্রনিপুণের হস্তলিখিত। যেমন চিত্রকর বর্ণন করি, কবি ভাষাও করিয়াছেন। রূপবতী অঙ্গনার সঙ্গে, কুসুমিতা বারান্দার বৈষম্য, অসামান্য রাজমহিষীর সঙ্গে, সাদাশা বারান্দার বৈষম্য; অবশ্য নগরীর উজ্জ্বল স্রিং সহিত, বিজন বৈষ্ণবগণের বৈষম্য। সিংহাসনারূঢ় সন্নতি তর্জুহরির সঙ্গে বাণপ্রস্থ তর্জুহরির বৈষম্য। এই বৈষম্য গুণে চিত্র গুলিন বিশেষ মনোহর হইয়াছে। সচেতন বলদেব বাবু যে রূপ উজ্জ্বল বর্ণের বাছল্য করেন, তাহাতে রঙ্গ ছলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

এই কাব্য গ্রন্থ বানি, “ঐন্দ্রোপাশ্ত অপর্যায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্বে করিগণ, দুই একটা সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ বান্ধালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্ভ্রুতি, “ললিত কবিতাবলী” প্রণেতা, এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য নব কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বান্ধালা ভাবার যে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা প্রস্তুত হইত হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বান্ধালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে নাদেহ নাই। কিন্তু মালিনী, উপজাতি প্রভৃতিতে বান্ধালা কবিতা যেমন স্থানেই মধুর এবং ওজোগুণ বিশিষ্ট

হইয়াছে, তেমনি অনেক স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে। “তর্জুহরি কাব্য” সংস্কৃত-নভিষ্ঠ পাঠকে সচরাচর বৃত্তিতে পারেন কি না, তাহা সন্দেহ। বস্তুরিয়া পুনঃ পড়িলে বৃত্তিতে পারিবেন, কিন্তু কত করিয়া যে কবিতার অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ পাঠক পড়িতে অনিচ্ছুক। তর্জুহরি কাব্য মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে, যে সংস্কৃত-নভিষ্ঠ পাঠক তাহা সংস্কৃতই মনে করিবেন; কেবল দুই একটা অর্থবোধের অভাব বোধ করিবেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি মালিনী, এবং কয়েকটি বংশস্থবিরলের কবিতা তর্জুহরি কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে আমাদের কথিত দোষ গুণ সকলই প্রমাণিত হইবে।

মালিনী।

হুগলম স্বকুমারী, দীর্ঘকেশা, কৃষ্ণাঙ্গী, অচপলতড়িতা মুদরী, গৌরকান্তি, মধুর নব বয়স্কা প্রাণিনী অপ্রাণা, যুবকনয়নলোভা “কামিনী কামশোভা” বিকচজলজতুলা শ্বেত উৎকল্ল অমায়; জমরকচর তাহে ভুজশোভা প্রকাশে। স্থলিত চিত্রবন্ধ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠদেশে, পতিত যিমল তপে নিমিয়া সেখমাল। স্বতঃ অনতি বকাজলতা দীর্ঘ রেখা; প্রণয়মলিলপূর্ণ শ্লিষ্ট নীলবকুনেজ; জিনি মধুরপাকী পক্ষরাজী বিশালা; নয়নতট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলতা।

বংশস্থবির।

তথ্য ভীমানিত-বর্ম-ভূষিত, প্রচণ্ড আভাস চক্ৰ মস্তকে,

সবিন্দুতাপ্রি প্রলয়োন্মত্তাশ্রুতবৎ কৃপাপানি প্রধরি-ব্রজ ভূমে। মধী ধরাকার শরীর পীবর, প্রমুখ ভ্রামাশ্রম সন্নত নৃতি, অজস্র আশ্রমালিত কর্ণ মণ্ডল, প্রকাশ দন্ত ক্রমবপ্রভেদনে। ইহন্ততলালিত শূণ্ড ভীষণ, প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃহৎ প্রনি, বিরাজিত চোরণপাশ শোভিতা প্রভিম মুখপ্রতি বজ্র শৃঙ্খলে। সন্ন্যাসবৃত্তি পট মণ্ডপে স্থিত, প্রযুক্তঃ রক্তবর্ণ সেরিত, বন্যমুদ্রা দৈর্ঘ্য ততঃ শ্রুত যৌতিক গভীর হোয়াস খনে ক্ষুরে ক্ষিত।

জ্ঞানান্দুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মানিক গুণ। রাজশাহী, বোয়ালিয়া। রাজশাহী প্রেস।

এই পত্র খানির ‘কলবর দেখিয়া’ অনেকের ‘ভক্তির অভাব জন্মবে।’ মদ কাগজে মদ ছাপা, দেখিয়া অপ্রীতি হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে ‘অপ্রীতি’ হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং মুখের উদয় হইবে। যদি অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যার তুল্য হয়, তবে ইহা যে বান্ধালা পত্রের মধ্যে একখানি অত্যন্তকৃত পত্র হইবে, তাহিহয়ে কোন সংশয় নাই। দেখা-বাইতেছে যে, লেখকেরা কৃতবিদ্যা, চিন্তাশীল, এবং লিপিপটু। তরসী কবির, পত্র-খানি স্থায়ী হইবে। অধীক্ষকে আমরা অহরোহর করি যে, পত্র খানি কলিকাতায় ছাপা-

• একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হরির বৃহৎ খনি ‘ব্রহ্মপাশ’ হইল কি প্রকারে?—বীহারী শ্রমেন নাই, ভীহারী আনেন না যে হরির বৃহৎ একটা মাধুর্য গুণ বিশিষ্ট।

ইবেন। হৃদয়ের কীর্ণ মলিন বসনারতা দেখিলে যে রূপ কট হয়, জানাহর দেখিয়া আমাদের সেই রূপ কট হইয়াছে।

ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন? কাট দর্শন বাস্তবায় লেখা নিতান্ত কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা বলি, যে আমরা বাস্তবী, বাস্তবী জ্ঞান লিখিতেছি। যদি বাস্তবায় কাট দর্শন বুঝাইয়া লিখিতে পারি, লিখিব, বাস্তবায় বুঝাইয়া লিখিতে না পারি, লিখিব না। এরূপ প্রবন্ধ যে ইংরাজিতে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন আমরা বলি না। কিন্তু তোলা সাধারণতঃ দেওয়া, এখন ছদ্ম দান থাক। বাহাদের রুদ্ধ কেশ, তাহাদের জন্য আছে। তৈলের "দুলান কলিয়া উঠা যাউক।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান। অজ্ঞানবান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকটি কাব্যোক্তি-হাস কীর্তিত, এবং কয়েকটি আধুনিক ছন্দ লোকের চরিত্র সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

সঙ্গীত রত্নাকর। শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র দত্ত প্রণীত। "বহু বহু এবং পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থ থানি সংকলিত হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা গ্রন্থাকারে ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থাকারের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্তের একটি রূপাধায় বিষয়ক অংশ শ্রীযুক্ত বাবু দীনাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

সাধ্যাে গ্রন্থাকারের নিজ অল্পসন্ধান দ্বারা নানা প্রবন্ধে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক ৫ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, এবং শেষ ভাগে একটি উত্তম পরিশিষ্টে বিশিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রনাথের ঠাকুর-মহাশয়ের স্থানে অর্পিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে সঙ্গীত সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ ইতিহাস, ভূমিকা-স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভাগের শৃঙ্খলা, সারবত্তা এবং বিচার পদ্ধতির কিছু আধিকা থাকিলে আমরা অধিকতর আপ্যায়িত হইতাম। বোধ হয়, গ্রন্থকর্তা যেন সময়ে-যে "নোট" করিয়াছেন, তাহা এক স্থলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌরানিক, ঐতিহাসিক এবং জনশ্রুতি সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের কথা বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কিছু স্থলে হইতে তাহা উদ্ধৃত, তাহার অল্পসন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা এক্ষণে পৌরানিক কাল অতিক্রম করিয়া ঐতিহাসিক কালে উপস্থিত হইয়াছি, "পৌর" ইতিহাস প্রার্থনা করি; কেবল গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের এক মিলনের পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু নানা দেশের পদ্ধতির সহিত একা না করিলে, দোষ গুণ বিচার হয় না। "আমরা বড় লোক" বলিয়া মনকে বেগবিহীন করিলে, উন্নতি হইবে, রুদ্ধ হইবেক। গ্রন্থকার কহেন না, ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদেয়া এদেশীয় প্রণীত প্রণালী উত্তম রূপে অবগত হইলে, তাহা উত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা ইহা নির্দাকরে।

গরিমা বশত ইউরোপীয়েরা অনেক স্থলে বাহা না বুঝেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন; ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ইউরোপীয় দোষ, আমাদের জ্ঞানিয়া শুনিয়া, গ্রহণ করিবার আবশ্যিকতা দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার কহেন, ইউরোপীয় সঙ্গীতে কেবল "অহং এবং অহং" শব্দই রাগিনী দ্বয় মাত্র আছে, এ সম্বন্ধে তিনি তোখায় পাইয়াছেন? বাঁহার বিচার করিতে হয়, তাহার উভয় পক্ষের দোষাদোষ দেখিতে হইবেক।

গ্রন্থকার আরও কহেন যে, মুসলমানেরা আমাদের সঙ্গীত নিরুচ্চ করিয়াছে, "পূর্বতন স্বাধীন ভারতবর্ষে সঙ্গীত শাস্ত্র ক্রমে বৈষ্ণব পরিণত হইয়া আসিতেছিল, সেই রূপ আর দুই সহস্র বৎসর থাকিলে এখানে সঙ্গীতের উন্নতির আর অবধি থাকিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন এই দেশে বৈষ্ণবী জ্যোতির্মগের শাসনাধীন হইয়া স্বাধীনতাচ্যুত হইতে লাগিল, সেই অবধি সঙ্গীতের চর্চা ক্রমে ভিন্নাভিত হইতে লাগিল," এই প্রকার বিচারে আমরা সম্মতি দান করিতে পারি না। হীনবীর্ষ্য হইলেই এক জাতি অপর জাতির দ্বারা পরাজিত হয় এবং জ্যোতির্মগের উন্নত সভাব অল্পকালে পরি-জিতদিগের শ্রীরক্তি হয়, সংসার নির্ভা-হার্থে ঈশ্বর কর্তৃক এই নিয়ম দ্বারা "হই-রাছে, এবং এই নিয়ম দ্বারা আনিষ্ঠের কোনও সম্ভাবনা হইতে পারেন না।

মুসলমান কর্তৃক সঙ্গীতের শ্রীরক্তি হইয়াছে, "এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা ভারত সঙ্গীতের ক্রমে উন্নতি লাভ হইবেক। গ্রন্থকার আপনাই স্বীকার করি-

য়াছেন যে, খেয়াল এবং টপ্পা মুসলমান-গায়ক হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশীয় প্রণালীকমে স্বরাধায় উত্তম বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্বর সাধন তাবুরার সহিত না হইয়া পিয়ানার সহিত হইলে ভাল হয়। উপস্থিত প্রণালীতে স্বরের বিকৃতি হয়, স্বর স্বভাবে থাকিবে কর্তব্য, এবং তাহা হইলেই সুপ্রাণ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাগাধায় বর্ণিত ও লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় বহু বন্ধে সম্বলিত এবং ইহাতে নানা রাগ রাগিনী লিখিত হইয়া সাধারণের মূল্যের ও উপকারের সামগ্রী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সঙ্গীতের নানা সাধারণ আ-দর্শ না হইয়া কেবল এক সামান্য সাধারণ রূপ বাচক হইয়াছে। "রত্নাকরের" রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি সেতারের গণের রূপাঙ্ক-বাগী প্রদত্ত খেয়াল টপ্পা ইত্যাদির উদাহরণ ইচ্ছাতে নাই। ভারত সঙ্গীতে প্রবণত খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি পরম রমণীয়, এবং বিধি স্বত্বকর। বাঁগা এবং সেতারের গণ সমল অতি উৎকৃষ্ট রূপে বাদিত হইলেও, কেবল ভগ্নাংশ বিশিষ্ট বলিতে হইবে। ইহার দ্বারা ভারত-সঙ্গীতের উপযুক্ত চিত্র লক্ষিত হয় না। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, স্বর লেখার পদ্ধতিতে যথাবিধি, চিহ্ন সকল নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভবে, "ডা, রে, ডিরিড শব্দ সমুহ একাধারে লিখিত হওয়াতে, অনাবশ্যক এবং ভ্রমজনক হইয়াছে।" ভৈরব রাগের একটি হৃদয় মূর্ত্তি গ্রন্থে চিত্রিত আছে, কিন্তু ডিরি ডিরি বিশিষ্ট গণের দ্বারা অল্পত স্বর রূপনা উপযুক্ত মতে উপ-

লক্ষি হয় কি না, পাঠক মহাশয়েরা
বেধিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কয়েকটি স্বীকৃতি
যন্ত্রের আদর্শ সহিত যন্ত্রাধারের বিবরণ
প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত
বলিয়াই গণনা করিতে হইবেক। ইহাতে
সকল যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই, এবং
যন্ত্র সম্বন্ধীয় উৎপত্তি, উদ্ভাতি এবং প্রকা-
শের উপযুক্ত ইতিহাসও নাই। মৃদঙ্গ
হইতে মাদল কি মাদল হইতে মৃদঙ্গ
হইয়াছে, ইহার অনুসন্ধান আবশ্যিক।
এতদ্বারা কহেন, “বিয়ালী” সারঙ্গী হইতে
উৎপত্তি হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আর
কি? ভাল, “আমরা যেন বড়
লোকই” হইলাম, এবং সারঙ্গী হইতে
বিয়ালীই যেন হইয়াছে, কিন্তু উভয়
যন্ত্রের মধুরতা ও শক্তি বিবেচনা করি-
লেই, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় যন্ত্রা-
ধারের ভারতম উপলব্ধি হইবেক।

এই পরিচ্ছেদে তানাসাধারের সংক্ষেপ
বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অপায়তনে
ইহা এক প্রকার সম্পূর্ণ এবং উত্তম বলিয়া
গ্রহণ করিতে হইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে নৃত্যাদ্য অতি
সামান্য রূপে লিখিত হইয়াছে। নৃত্য-
াদ্য অতি রমণীয় সামগ্রী। ইহার
ইতিহাসের, এবং প্রচলিত এবং প্রাচীন
প্রণালীর, এবং সম্ভ্রমায় সকলের বিস্তা-

রিত বিবরণ সাধারণের পশ্চিম উপকার-
সাধক হইবেক। ভরসা করি, সমুদ্র এই
অধ্যায়ের উচিত সমালোচনা হইবেক।

রত্নাকরের শেষে যে পরিশিষ্টটি লি-
খিত হইয়াছে, তাহা পুরম উপকারের
হইবেক সন্দেহ নাই, কেবল রাগমালার
মধ্যস্থত কোনও রাগ রাগিণী প্রত্যেকরূপ
এবং কোন কোন রাগ রাগিণী লুপ্ত হই-
য়াছে, কোনও রাগ রাগিণী দেশীয়, এবং
কোনওটি বিদেশী, অথবা মিশ্রিত, ইহার
পৃথকঃ শ্রেণী থাকিলে আরও উপকা-
রের হইত।

হরিবংশ। শ্রীযুক্ত রুক্মিণ বিদ্যারত্ন
কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত
হইয়া হোগলকুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহ-
ভবনহইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায়
কর্তৃক প্রকাশিত। বেদব্যালকৃত মহাভা-
রত অন্তর্গত খিল হরিবংশ পর্ব অতি
পবিত্র গ্রন্থ। হিন্দুগণ সাদরে হরিবংশ
অধ্যয়ন ও পৌরাণিকগণের সমীপহইতে
ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, আপনাদিগকে
কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ
পর্যন্ত ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত
হয় নাই। সম্ভ্রতি এই অভিনব বাঙ্গালা
হরিবংশ দ্বাদশ খণ্ড উপহার প্রাপ্ত
হইয়া, কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম,
অনুবাদ মূলানুযায়ী ও বিশ্বদ হইয়াছে।
ইহা আর চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

বিষয়ক।

জয়প্রিংশন্তম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার চিত্রযন্ত্রণ।

কাপাসবস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গুরের ন্যায়,
দেবেশ্বরের নিরুপম মূর্তিহীনার অন্তঃকর-
ণকে স্তবেরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার
হীনার ধর্মভীতি, এবং লোক লজ্জা, প্রণয়
বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল;
কিন্তু দেবেশ্বরের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পার
চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বন্ধ
মূল হইল। হীরা চিত্ত সংযমে বিলক্ষণ
ক্ষমতাশালিনী। এবং সেই ক্ষমতা ছিল
বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্মভীতা না হই-
য়াও এ পর্যন্ত আয়তন সহজেই রক্ষা
করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবিত,
সে দেবেশ্বরের প্রতি অবলাহরণ, অপাত্র-
ন্যাস জানিয়া সহজেই শাস্ত করিয়া
রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সহ-
পায় স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুন-
রবার দাস্যরক্তি অবলম্বন করিবে। পর-
গৃহের গৃহকর্মাদিতে অহুদিন নিরত
থাকিলে, সে অন্য মনে, এই বিফলাহ-
রণের রশ্মিক দংশন স্বরূপ জ্বালা জ্বলি-
তে পারিবে। নগেন্দ্র যখন, কুন্দ-
নন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য-
টনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা জুতপূর্ণ
আহরণের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল।
কুন্দের অতিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র
হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত
রাখিয়া গেলেন।

হীরাও পুনরবার দাস্যরক্তি স্বীকার

করার আর একটা কারণ ছিল। হীরা
পূর্বে অর্থাৎ কামনায়, কুন্দকে নগে-
শ্বরের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া
স্বীয় ধর্মীভূতা করিবার জন্য যত্ন পাইয়া-
ছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের
হস্তগত হইবে; কুন্দের হস্তগত অর্থ
হীয়ার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের
গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন
বিশেষ আশিপতা জন্মিল না, কিন্তু এখন
সে কথা হীয়ারও মনে স্থান পাইল না।
হীয়ার অর্থে আর মন ছিল না, মন
থাকিলেও কুন্দহইতে লব্ধ অর্থ বিয়ড়লা
বোধ হইত।

হীরা, আপনার নিম্নল প্রণয় যন্ত্রণা,
সহ করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর
প্রতি দেবেশ্বরের অহুরণ সহ্য করিতে
পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে,
নগেন্দ্র বিদেশপরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন,
কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকি-
বেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে
হীয়ার মহাভয়সংসার হইল। হীরা হরি-
দাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের প্রথমে কাঁটা
দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া
একটি অভিসন্ধি করে নাই। হীরা স্বর্গ্যা-
বশতঃ কুন্দের উপরে একপ্রকার জ্ঞাতকোশ
হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গল চিন্তা দূরে
থাকুক, কুন্দের নিপাতদৃষ্টি করিলে পর-
মাখ্যাদিত হইত। পাছে কুন্দের সুখে
কুন্দের সাফল্য হয়, এইরূপ স্বর্গ্যা-

জাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে
প্রহরিতে রাখিল।

হীরাবাণী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া
উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যন্ত্র,
মমতা বা প্রিয়বান্ধিনী নাই। দেখিল,
যে হীরা দামী হইয়া তাহার প্রতি
সর্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এবং তিরস্কৃত
এবং অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত
শান্ত স্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত
শীড়িত হইয়াও কখন তাহাকে কিছু
বলিত না। কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা
গরম প্রকৃতি। একদা কুন্দ প্রচুপ্তী
হইয়াও দামীর নিকট দামীর মত থা-
কিতে লাগিল, হীরা দামী হইয়াও প্রচু-
প্ত হইয়া বসিল। গুরবাসিনীরা
কখনও কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরা-
কে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাধ্য হীরা
নিকট তাল কাঁদিতে পারিত না। দেও-
য়ানজী, এ সকল রহস্য শুনিয়া, হীরা-
কে বলিলেন, “তুমি দূর হও। তোমাকে জ-
বাব দিলাম।” শুনিয়া হীরা রোম-
বিচ্ছারিত লোচনে দেওয়ানজীকে ক-
হিল, “তুমি জবাব দিবার ক্ষেত্রে আমাকে
হুমি বরাখিয়া গিয়াছেন। কুন্দের কথা
নছিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব
দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে
জবাব দিবার আমার সেই ক্ষমতা।” শুনিয়া
দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্য
বাক্য করিলেন না। হীরা তাপন জোরেই
রহিল। স্বর্গমুখী নহিলে কেহ হীরা-
কে শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন, নগেন্দ্র বিদেশে যাত্রা
করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসমি-
হিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করি-

য়াছিল। নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ
করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপে হীরা-
রই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন
সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায়
পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে; উদ্যানের ভা-
ষের রূপকল্পে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত
হইতেছে। লতাপল্লবযুক্ত গম্বু হইতে
অপস্রত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেত অন্তরময়
হৃদয়ালে পতিত হইয়াছে এবং সশীপস্র
দীর্ঘাকার প্রদোষবাসুস্তাভিত স্বচ্ছ-
লোর উপর নাচিতেছে। উদ্যান পুষ্পের
সৌভাগ্যে আকাশ উদ্গারক হইয়াছিল।
পুষ্পগন্ধে সুরভি বায়ু যেমন উদ্গারক,
প্রকৃতিস্থ কোন সামগ্রীই তরুণ নহে।
এমত সময়ে হীরা অকস্মাৎ লতা মণ্ডপ-
নধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাট্টিয়া
দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদূর-দেবেন্দ্র ছদ্ম
বেশী নহেন, নিজকেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, “আপনার
এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পা-
ইলে, আপনি মারা পড়িবেন।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “যে খানে হীরা
আছে, সে খানে আমার ভয় কি?” এই
বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন।
হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে
কহিল, “কেন এখানে এসেছেন? যার
আশায় এসেছেন, তার দেখা পাই-
বেন না।”

“তা পাইয়াছি। আমি তোমারই
আশায় এসেছি।”

হীরা লজ্জা চাট্টিয়ারে কপালাপে-
প্রতারণিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল,
“আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে,
তা ত জানি না। বাহা হউক, যদি আমার

ভাগাই কিরিয়াছে, তবে যে খানে নিহ-
কিত বসিয়া আপনাকে দেখিয়া যনের
তুলি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন।
এখানে অনেক বিষয়।”

দেবেন্দ্র বলিলেন, “কোথায় যাইব?”
হীরা কহিল, “যেখানে কোন ভয়
নাই। আপনার সেই নিকৃষ্ট বর্ন চলুন।”

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয়
করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না
থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়।
আমাকে আপনার কাছে এ অবস্থায় কেহ
দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,
“তবে চল। তোমাদের স্তনন গৃহিণীর
সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে
হয় না?”

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি
দেইর্যমানল জ্বলিত কটাক করিল, দে-
বেন্দ্র অঙ্গকালোকে ভাল দেখিতে পাই-
লেন না। হীরা কহিল,—

“তোমার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্র-
কারে?”

দেবেন্দ্র বিনীত ভাবে কহিলেন, “তুমি
কুপা করিলে সকলই হয়।”

হীরা কহিল, “তবে এখানে আপনি
সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন। আমি তাঁ-
হাকে ডাকিয়া আনিতেছি।”

এই বলিয়া হীরা লতা মণ্ডপ হইতে
বাহির হইল। কিয়দূর আসিয়া এক রূক্ষ-
স্তরালে বসিল, এবং তখন তাহার কণ্ঠ-
সংকল্প নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া
বহিতে লাগিল। পরে গাভোস্থান করিয়া
বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দ-

নন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে
গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, “তোমরা
শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসি-
য়াছে।”

তখন দোবে, পাঁড়ে এবং
তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে
করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া ফুলবাগানের
দিগে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহা-
দের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর
হইতে কালোৎ, গালপাটা দেখিতে পা-
ইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে
গলায়ন করিলেন। তেওয়ারি গোষ্ঠী কণ্ঠ-
দূর পশ্চাৎবাহিত হইল। তাহার দেবে-
ন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিলেন না। কিন্তু
দেবেন্দ্র ক্রিপিত পুরস্কৃত না হইয়া পে-
লেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আঘাত
তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা
নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবানগণ কর্তৃক
“খশুরা” “শালা” প্রভৃতি প্রিয় সম্ব-
সূচক নানাবিধ সম্বোধনের দ্বারা অভি-
হিত হইয়াছিলেন, এমত আমার শূনি-
য়াছি। এবং ঠাঁহার ভৃত্য একদিন
তাঁহার প্রসাদি ভ্রাতৃ খাইয়া পরদিস
আপন উপগপ্তীর নিকট গম্প করিয়া-
ছিল যে, “আজি বাবুকে তেল মাখাইবার
সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা
কালশিরা মাগ।”

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই-রিষয়ে স্থির-
কম্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে
তিনি আর দজ বাড়ী যাইবেন না। দ্বি-
তীয়, হীরা-কে ইহার প্রতিফল দিবেন।
পারিণামে তিনি হীরা-কে গুরুতর অভি-
ফল প্রদান করিলেন। হীরা-র লঘুপাতি
গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি

প্রান্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেশেন্দ্রেরও পাবাংজন্য বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুঃশিংশতম পরিচ্ছেদ।

পরিণামে।

বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার দুটোয়ের উপর একটু একটু পিছলে হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়াং কে পথ চলে? এক জন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ত্রক্ষচারির বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন রেখা—জুতার আড়ম্বর কিছু নাই, কুত্রং কেশ গুলি কতকং শেতবর্ণ। এক হাতে পেলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ত্রক্ষচারী ভিজিতে চলিয়াছেন। একে তদিনেই অন্ধকার, তাহাতেই আবার পথে রাজ হইল—অগনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় আপথ, কিছু অজ্ঞতব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অভিযান্ত্রিক করিয়া চলিলেন—কেননা তিনি সংসারতাপী ত্রক্ষচারী। যে সংসারতাপী, তাহার অন্ধকার, আলো, সুপথ, স্বপথ সব সমান।

রাজ অনেক হইল। ধরনী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণবগুঠন। রুকণগণের শিরোমালা কেবল গাভীর অন্ধকারের কৃষ্ণরূপ লক্ষিত হইতেছে—সেই রুকণ

শিরোমালায় বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অজ্ঞত হইতেছে। বিম্বুং বৃষ্টি পড়িতেছে। একে বার বিছাৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আবার ভালো। অন্ধকারে কণিক বিছাতালোকে খড়ি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

“মাগো!”

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ত্রক্ষচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দ শুকক দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিছু তথাপি মনুষ্য কণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় বাধাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ত্রক্ষচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতকণে আবার বিছাৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘনত বিছাৎ হইতেছিল। বিছাৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথ পার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মানুষ? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিহ্বলের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয়বার বিছাতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক তাকিয়া বলিলেন, “কে তুমি পথ পড়িয়া আছ?”

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অক্ষট কাত-রোজি আবার মুহূর্ত্ত জমা করো—এবেশ করিল। তখন ত্রক্ষচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রচার করিতে লাগিলেন। অচিরে কোমল মনুষ্য দেহে করস্পর্শ হইল। “কে গা তুমি?” শিরোদেশে

হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। “দুর্গে! এবে স্ত্রীলোক!”

তখন ত্রক্ষচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্ত অথবা অচেতন স্ত্রীলোক-সীকে, দুই হস্তদ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ত্রক্ষচারী পথ ভাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া প্রাণাভিমুখে চলিলেন। ত্রক্ষচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট প্রায় বিলকণ জানিতেন না শরীর বলিষ্ঠ নহে; তথাপি শিশু সন্তানদের সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গমপথ ভাঙিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেম্যে বলবান, তাহারা কখন শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না। এানের প্রান্তভাগে ত্রক্ষচারী এক পর্ণ কুটারে প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞা স্ত্রীলোককে কোড়ে লইয়া সেই কুটারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, “বাছা হর, ঘরে আছ গা?” কুটার মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক কহিল, “এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?”

ত্রক্ষচারী এই আশুচি। শ্রীত দোর খোল—আমি বড় বিপদগ্রস্ত।

হরমণি কুটারের দ্বার খোলা করল। ত্রক্ষচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে-স্ত্রীলোকসীকে গৃহ মধ্যে মায়ীর উপর পোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বালে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকসী প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অব-

স্থা, তাহাতে তাহার বয়স অজ্ঞতবর্ণা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সমগ্র বিশেষত্ব তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্য বস্ত্র অত্যন্ত মলিন—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আঙ্গুলায়িত আর্য কেশ চিরকক্ষ চক্ষু কোটার প্রস্থিত। এখন সে চক্ষু নিম্নলিখিত। নিঃশ্বাস, বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, “একে কোথায় পেলেন?”

ত্রক্ষচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, “ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।”

তখন হরমণি ত্রক্ষচারীর আদেশ মত, তাহার আর্য বস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুভবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুভবস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ত্রক্ষচারী বলিলেন, “বোধ হয়, অনেককাল অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু-কোরে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।”

হরমণির গৌর ছিল—ঘরে দুধ ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া, অম্প অম্প করিয়া স্ত্রীলোকসীকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উভয়ে দুধ প্রবেশ করলে সে চক্ষুস্বাভাৱন করিল। দেখিয়া, হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, “—

“মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে?”

সজ্জলজ্ঞা স্ত্রী কহিল, “আমি কোথা?”

ব্রহ্মচারী কহিলেন, “তোমাকে পথে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?”

স্ত্রীলোক বলিল, “অনেকদূর।”

হরমণি। তোমার হাতে ক্লান্ত রয়েছে।

তুমি কি সখ্যা?

পীড়িতা জড়স্ত্রী করিল। হরমণি অপ্রতিত হইল।

হর। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

“হাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?”

তোমার নাম কি?”

অনাথিনী কিংবা ইতস্তত করিয়া কহিল, “আমার নাম সূর্য্যমুখী।”

পঞ্চবিংশতম পরিচ্ছেদ।

আশাশুনাথ।

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না।

ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়িত লক্ষণ বুঝিতে

না পারিয়া পর দিন প্রাতে গ্রামস্থ

বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বয়ঃ বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে

বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাও গ্রামে তাঁহার

বিশেষ বশ্য ছিল। তিনি পীড়িত লক্ষণ

দেখিয়া বলিলেন, “ইহার কাশ রোগ।

তাঁহার উপর দ্রব হইতেছে। পীড়া

সাংঘাত্যকর বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে

পারেন।”

“এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে

হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন

—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের

কথাটা রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন

না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপাশাচ ছিলেন

না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হর-

মণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ

কথাপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট

বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন,

“ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত

যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য

ক্লেশের আবশ্যক নাই।”

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আ-

মার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি

ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম।

আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না

থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কা-

হারও কাজে থাকিতাম।”

সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া,

আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত

হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে

পারিবেন—আমার আপনি উপকার

করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার

নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রি

বখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নি-

ভাঙ আশা করিতেছিলাম যে, মরিতা।

আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা

আমি জানিনা—কিন্তু দুঃখ যতই হউক

না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ

আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পর-

হত্যাভূতাপাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার

চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য

ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও

আমার আনন্দ নাই।

“মরণে আনন্দ নাই” এই কথা বলিতে

সূর্য্যমুখীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া

জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, “যতবার মরিবার

কথা হইল, ততবার তোমার চোখে জল

পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে

চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সন্তুষ্ট।

আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের

দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে,

আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব

বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জনে

তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথা

বার্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্র ঘরের

কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃ-

পীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন

তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না?

আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।”

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন,

“এখন মরিতে বসিয়াছি—জন্মাই বা

এ সময় কেন করি? আর আমার মনো-

দুঃখ কিছুই নহ—কেবল, মরিবার সময়

যে স্থানীর মুখ দেখিতে পাইলাম না,

এই দুঃখ। মরণেই আমার স্বপ্ন—কিন্তু

যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে

করণেও দুঃখ। যদি এ সময় এক বার

তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই

আমার স্বপ্ন।”

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন,

“তোমার স্বামী কোথায়? এখন তো-

মাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়ার উ-

পায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সখ্যা দিলে

এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি

তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সখ্যা দিই।”

সূর্য্যমুখীর রোগাক্রান্ত মুখে হৃৎকোশ

হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হই-

কা কহিলেন, “তিনি আসিলে আসিতে

পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি

না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপ-

রাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার

পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে

পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন।

—আমি তত দিন বাঁচিব কি?”

ত্র। কতদূর সে?

স্ব। হরিপুর জেলা।

ত্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম

লইয়া আসিলেন। এবং সূর্য্যমুখীর

কথা মত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখি-

লেন।—

“আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত

নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে

আছি। আপনি কে, তাহাও আমি

জানি না। কেবল, এই মাত্র জানি, যে

শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা।

তিনি এই মধুপুর গ্রামে শঙ্কটাপম রোগ-

গ্রস্ত হইয়া হরমণি ঠৈক্ষণীর বাটীতে

আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—

কিন্তু বাঁচিবার আশা নহে। এই সখ্যা

দ্বারা আমার আপনাকে এ প্রজা লিখি-

লাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে এক

বার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ

করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা

করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে

আসিবেন। আমি ইহাকে ‘মাতৃ সখ্যা’

দান করি। পুত্র স্বরূপ তাঁহার অমৃত

ক্লেমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

যদি আমি মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অস্থস্থান করিয়া ক্রীমান মাধবচন্দ্র গোস্বামির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অতীত সিদ্ধি হইবে না। ইতি

আশীর্বাদ শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মাণ্যং।
পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কুহার নামে শিরোনাম দিব।”
স্বর্য়মুখী বলিলেন,—“হরমণি আসিলে বলিব।”

হরমণি আসিলে নগেন্দ্র নাথ দত্তের নামে শিরোনাম দিয়া ব্রহ্মচারী পত্র খানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।
ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন স্বর্য়মুখী সজ্জনমণ্ডনে, যুক্ত করে, উর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন,—“হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্র খানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই করি না—ইহাতে যদি—পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাই না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামির মুখ দেখিয়া মরি।”

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল,

তাঁহার অনেক পূর্বে নগেন্দ্র দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে ‘দিয়া গেল।
দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল, যে আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেই-খান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেই খানে আমার নামের পত্র গুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে,—“আমি নৌকাপথে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।”
দেওয়ান সেই স্থানের খ্রীতিক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্স মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে রহস্য দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া সর্বাঙ্গতঃ হইয়া, অঙ্গলিঙ্গারা কপাল টিপিয়া ধরয়া, কাতরে কহিলেন,—“জগদীশ্বর! ক্ষুর্ভ জ্ঞান আমার চেতনা রাখ।” জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল—যুহুর্ভ জ্ঞান নগেন্দ্রের চেতনা রহিল। কৰ্ম্মধাক্কে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—“আজ রাতেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বমুখ করিয়াও তুমি তাহার বন্দনা বস্ত কর।”

কৰ্ম্মধাক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল।
নগেন্দ্র তখন ভূতলে গুলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাতে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে

করিলেন। ভুবনমুন্দের বারাগসি, কোন সুখীজন এমন শারদ রাতে ভূগু ভোচনে ভোমাকে পশ্চাত্ত করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীন; আকাশে সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গন্ধারদত্তে তরবারি উপর দাঁড়াইয়া যে দিগে চাও, সেই দিগে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ত তেজ অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—বীলাধর বৎ স্থিরনীল তরঙ্গণী জয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্বতশ্রেণীতে অট্টালিকা, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এই রূপ আলোক রাজি শোভিত অনন্তশ্রেণী। আবার সমুদ্র সেই স্বচ্ছ নদীনাগের প্রতিবিম্বিত আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ম্ময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ক মুদিলেন।
পুখিয়ার সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র, বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পরে পৌঁছিয়াছে—এখন স্বর্য়মুখী কোথায়?

মজিৎশব্দে পরিচ্ছেদ।

হীরার বৃষভ মুকুলিত।

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাক্সা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে বড় হাসি হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অধিক পশ্চাত্ত করিতে হইল। হীরা মনে ভাবিত লাগিল,—“আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি, মনে আমার

উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই না; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।”

দেবেন্দ্রও আপন ঝলজলিত হীরার মণ্ডলিধানের মনকায় সিদ্ধির অভিলାষ সম্পূর্ণ করিতে প্ররত হইলেন। মালতীর দ্বারা হীরাকে ডাকিলেন। হীরা, হুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ভাগ্য করিয়া তাহার মনিত মিষ্টালাপে প্ররত হইলেন। যেমন উর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমন দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুক্কায়িত হীরা মক্ষিকা সহজেই সেই জালে গুড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরাভাষে মুগ্ধ এবং তাহার কৈবর্ত্য বাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপাধিনি হইল না। প্রাচীন কবিগণের শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধি ভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বীরাধী কর্তিত করিয়াছিলেন, সেই শক্তির অভাবে হীরার বুদ্ধিলোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ভাগ্য করিয়া, তানপুরা লইলেন। এবং সুরাপান সমুদেব সাহিত হইয়া নীতারম্য করিলেন। তখন দেবকণ্ঠ কৃতবিদ্যা দেবেন্দ্র এক প্রণায় সম্মতলহরী স্বজন করিলেন যে, হীরা প্রতিবাত্যাক্ষ হইয়া একবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার জয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রেরে মবিজাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বস্বাস্রস্বন্দর,

সর্কারীশার, রমণীর সর্কারদণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষু প্রেমবিযুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সমস্তে আপন বসনাগ্রভাষে হীরার অশ্রুবাকি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পূলক কর্তৃকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপা-নোদীপ হইয়া, এক্রপ হাস্য পরিচাস সংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখন বা এক্রপ প্রকৃত প্রশংসার অস্বরূপ, যেহিস্ত, অস্পষ্টালঙ্কার বচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জানিনা, অপরি-মার্জিত-বাগবুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্ণমুখ। হীরা তখন এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সংসংসর্গ পরিমার্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বি-ষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্চিত চরমে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের যুগে প্রেমের অনির্কলচর্য্য সহিয়া কীর্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমায়ুষ্যচিন্তনপন্থা মনে করিল—স্বয়ং আপাদ কবরী প্রেমসমার্সা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথম বসন্তপ্রেরিত এক মার্চ ভাসর স্বচ্ছারবৎ গুণ্ডা-সম্মোহিতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দমনীয় প্রণয়কর্তৃক প্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কাসিনী মূলভবনলগ্ন-ধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িত অর্ন্তরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্জ চিত্তে, সুরারাগ রঞ্জিত

কমল নেত্র বিক্ষারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ জয়গবিনাসে মুখমণ্ডল প্রস্থল করিয়া, প্রশুটমুখে সম্ভাষিতাম্ব করিল। চিত্তকর্ষিত বশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চস্বর উঠিল। হীরা বাহ্য গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমমোহিত্য পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপ মণ্ডপে বসিয়া, পাশাস্তব্রণ হই জন্মে, পাশাভিলাষ বশীভূত হইয়া, চিরপাপ রূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিপ্রকৃত হইল। হীরা চিত্ত সংযত করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার অরুচি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বিমুগ্ধে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্ররম্ভ হইয়াছিল, তাহাও অস্পন্দময়; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অস্বাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে-হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও অকলৌপিক তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া-ছিল। আবার সেই পুণ্যগত কীটাক্রম হৃদয় বৈধিকারী অসুরাণ কেবল পরমুগ্ধে কার্য উপলব্ধ করিয়া শমিত করিয়া-ছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্ররুজি রহিল না। এই অপ্রত্নভিহেতু বিবর্তকে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাশুপদ মণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হাঁক বা না হাঁক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্ত সংযমে অপ্ররম্ভ ব্যক্তি ইহলোকে বিবর্তকের ফল ভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশতম পরিচ্ছেদ।

স্বাধুযুগীর সম্বাদ।

বর্ষাকাল গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাই-
য়াছে। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রা-
তকালে রক্ষপল্লব হইতে শিশির বরিতে
হয়। সন্ধ্যাকালে মাঠে ধূমাকার
বাষ্প। এমতকালে কার্তিক মাসের একদিন
প্রাতঃকালে মধুপুরে রাস্তার উপরে
একখানা পালকি আসিল। পল্লীগ্রামে
পালকি দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা
ফেলে পালকির ধারে কাতার দিয়া
দাঁড়াইল। গ্রামের ঘি বড় মাগী ছাগী
জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ
দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল
—স্বাক হইয়া পালকি দেখিতে লাগিল।
বড় গুলি ঘোমটার ভিতর হইতে
চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—
আর আর স্ত্রী লোকেরা ফেলং করিয়া
চাহিয়া রহিল। চাসারী কার্তিক মাসে
ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে
কাপ্তে, মাভায় পাগড়ী, হাঁকিয়া পালকি
দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডয়া মাতঙ্গর
লোকে অমনি কথিত্বিতে বসিয়া গেল।
পালকির ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা
পা বাতির হইয়াছিল। সকলেই সিজ্ঞাস্ত
করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা প্রব
জানিষ্ঠ, দ্বী আসিয়াছে।

পালকির ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ
বাহির হইলেন। অমনি তাহাকে তাঁচ
মাত জন্মে সেলাম করিল—কেননা তাঁচ
হার পেটালুন পরা, টুপি মাভায় ছিল।

কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল,
বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে
সম্বোধন করিয়া, নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ
ব্রহ্মচারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।
জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই
কোন ধূনি মাসারার সুরতহাল হইবে—
অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে
বলিল, “আজ্ঞে, আমি শশাই ছেলে
মানুষ, আমি অত জানি না।” নগেন্দ্র
দেখিলেন, এক জন ভক্তলোকের সাক্ষাৎ
না পাইলে কার্য সিদ্ধি হইবে না। গ্রামে
অনেক ভক্তলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্র
নাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের
বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের ধারী রাম-
কৃষ্ণ রায় করিাজ। রামকৃষ্ণ রায়, এক
জন বারু আসিয়াছে দেখিয়া, যত্ন করিয়া
একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে
বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সম্বাদ
তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রামকৃষ্ণ
রায় বলিলেন, “ব্রহ্মচারী তাঁকুর এখন
নাই।” নগেন্দ্র, বড় বিষম হইলেন।
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কোথায় গি-
য়াছেন?”

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই।
কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি
না। বিশেষ, তিনি এক স্থানে স্থায়ী
নহেন; সর্বদা নানা স্থানে পর্যটন
করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেঁহ
জানেন?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমরা
নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এ জন্য
আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম।

কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নরেন্দ্র বড় বিশ্বয় হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কতদিন এখান হতে গিয়াছেন?”

রামকৃষ্ণ। তিনি প্রাণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাত্র মাসে গিয়াছেন।

নরেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি ঐক্যবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘরে জ্ঞান্ডন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর ঘরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরমণি কোথায় আছে?”

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। কেহও এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে স্নাননি আগুন দিয়া পালাইয়াছে।

নরেন্দ্র ভয়স্বর হইয়া কহিলেন, “তাহার ঘরে কোন প্রীলোক থাকিত?”

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, “না; কেবল প্রাণ মাসে হইতে একটি বিদেশী প্রীলোক পীড়িত হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ী রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম স্বর্গমুখী। প্রীলোকটি কাশরোগ গ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া ছুটিয়াছিলাম—এমন সময়ে—”

নরেন্দ্র হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন সময় কি—?”

রামকৃষ্ণ বলিলেন, “এমন সময় হরমণিবীর গৃহদাহে ঐ প্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।”

নরেন্দ্র নাথ ঢৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মুহুর্ন্ত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিদ্যরক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাণ। কে ভাল বাসিতে চাহে? সে আপনার স্থাপিত ছিন্ন করিয়া দম্ব করুক। কেন, বিধাতা! এ সংসার সুখের কর নাই? ভূমি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে স্বথের সংসার স্বজিতে পারিতে। সংসারে এত সুখ কেন?

অটত্রিশতম পরিচ্ছেদ।

এত দিনে সব ফুরাইল।

“এত দিনে সব ফুরাইল।” সন্ধাকালে যখন নরেন্দ্র দন্ত মধুপুর হইতে পালকিতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনেই বলিলেন, “আমার এত দিনে সব ফুরাইল।”

কি ফুরাইল, স্বথ? তা ত যে দিন স্বর্গমুখী গৃহভাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যত দিন রাষ্ট্রবের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না; আশা ফুরাইলেই সব ফুরাইল।

নরেন্দ্রের আজ আশা ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন

না; গৃহধর্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয় আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারী, ভদ্রাসন বাড়ী, এবং অপরাপর ষোপাঙ্কিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সমীক্ষাচক্ষুকে দান পত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখা পড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছু নাও কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকিবেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ধারিত হইবে। কুন্দনদিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয় আশয়ের আয় ব্যয়ের কাগজপত্র সকল ক্রীষককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর স্বর্গমুখী যে খাতে শুইতেন, সেই খাতে শুইয়া এক বার কামিবে। স্বর্গমুখীর অলঙ্কার গুলি নাই। আসিবেন। সে গুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেই গুলি দেখিতেই যাবেন। এই সকল আশাশীল্য কর্তৃক নির্ধারিত করিয়া, নরেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ভাগ করিয়া পুনর্বার দেশ পর্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোকে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন। শিবিকারোহণে এই রূপ ভূমিভেদে নরেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাজ্যিকর্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে

তার; বাতাসে রাজপথ পার্শ্ব টেলিগ্রাফের তার পলিত হইতেছিল। সে রাজ্যে নরেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কণ্ঠ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থ নাত্রই চক্ষুশূল বনিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহর করিয়াছিল, আজ সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতুণে চক্ষুরিণ প্রতিবিশিত হইয়া হৃদয় সিদ্ধ হইত, আজ সে দীর্ঘতুণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি জীড়াশীল। পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসার শ্রোতঃ তেমনি অপ্রতিবর্ত্তিত! জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রকেশবিকা সমেত গ্রাস করিল না?

নরেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেজিষ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে বাঁচা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। বাঁচাতেই মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রার্থনা করিতেই যেন না। ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ট হইয়া অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে মুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কাপুরুষ করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা জুটি

করেন নাই—উঁহার তুল্য শ্রমিকিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রাণশীলতা, তাহাও ত অসুখিত ভাষাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রাণশালিনী মাষী ভাষা—ইহাও তাঁহার প্রথম কপালে ঘটিয়াছিল। স্বর্ষের সমগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অস্বস্থী পৃথিবীতে কে? আজি যদি উঁহার সন্নিধি দিলে, ধন সম্পদ, রূপ, যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি, সব দিলে; তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণ স্বর্ষ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন,—“এই দেশের রাজকারণারে এমন কে নয়র পাণী আছে, যে আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে। আমি হুর্ষ্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্ৰিয় দমন করিলে, হুর্ষ্যমুখী বিশেষে আসিয়া কুটীরদ্বারে সরিলে কেন? আমি হুর্ষ্যমুখীর বধকারী—কে এমন গিণ্ডু, মাড়ুয়, পুরুষ আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাণ্ডি? হুর্ষ্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? হুর্ষ্যমুখী আমার সব। সমস্তে স্ত্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপন্নায়িত করিতে কুটীরবিনী, যেহে মাতা, ভবিষ্যৎ কর্ম্মী, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যা দাসী। আমার হুর্ষ্যমুখী—কাহার? এমন, ছিল? সংসারের সমগ্র, যুগে লক্ষী, স্বর্ষের স্বর্ষ, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, বেহের জীবন, জীবনের সন্নিধি!

আমার প্রমোদে হর্ষ, বিবাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি সঙ্গীত? আমার দর্শনে আলোক, প্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্তমানের স্বর্থ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতে আশা, পরলোকে যুগ্ম! আমি শূন্য, রত্ন চিনিব কেন?”

হঠাৎ উঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি মুখ্য শিবিকারগণকে বাইতেছেন, হুর্ষ্যমুখী, পথ হাঁটিয়া, পাঁড়িত হইয়াছিলেন। অমন নগেঙ্গ শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদতলে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন সেইখানে শিবিকা ভাগ্য বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদতলে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, ইহ জীবন এই হুর্ষ্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্ত উৎসর্গ করিয়া দমন করিলে, হুর্ষ্যমুখী যুগ ভাগ্য করিয়া—যে সকল মুখে বাক্যতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল স্বথতোগ তাগ করিয়া। প্রের্ষা, চাপ্প, দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধবের আর কোন সংশ্রব রাখিব না। হুর্ষ্যমুখী যুগভাগ্য করিয়া অবশি যে সকল ক্লেষ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেষ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুত্র হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে শুনি আর গমন পদতলে, তোমার কদম, শাসন রক্ততলে বা পর্বকটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানেই আশিখী জলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার

ক্রীশ। সে সকল কাল বলিব।

নগে। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেষ রক্তি হইবে। এ ক্লেষণ আর রক্তি নাই। তুমি বল।

তখন ক্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকটপ্রত উঁহার সঙ্গিত হুর্ষ্যমুখীর সঙ্গে, পথে সাক্ষাতের কথা, পাঁড়ার কথা, এবং চিকিৎসা ও প্রায়োযোগালভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন,—হুর্ষ্যমুখী কৃত-দ্রষ্টব্য পাইয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেঙ্গ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ক্রীশচন্দ্র সঙ্গে বাইতেছিলেন, কিন্তু নগেঙ্গ বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথের নগেঙ্গ রক্তি দুই প্রহর পর্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতামধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন সন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্বার ক্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরায়া আসিলেন। ক্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বিশেষে, নগেঙ্গ বলিলেন, “আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবস্থা উঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?”

ক্রী। আজি আর সে সকল কথায় কাল কি? আজ ভ্রাতৃ আজ, বিশ্রাম কর। নগেঙ্গা অজুতি ক্রীশা মহাপরম কণ্ঠে কহিলেন,—“বল।” তখন নগেঙ্গের মুখপ্রতি চাহিয়া দেরিলেন, নগেঙ্গ পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যাবর্গের মেঘের মত, উঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত

হইয়া ক্রীশচন্দ্র বলিলেন, “বলিতেছি।” নগেঙ্গের মুখ প্রসন্ন হইল; ক্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, “গোবিন্দপুত্র হইতে হুর্ষ্যমুখী স্বলপণে অক্ষত করিয়া প্রথমে পদতলে এই দিগে আসিয়াছিলেন।”

নগে। প্রত্যহ কৃত পথ চিন্তিত? ক্রীশ। এক কোশ দেড় কোশ। নগে। তিনি ত একটা গয়মাও লইয়াও বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইতে কিমে?

ক্রী। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি প্রাগল!!

এই বলিয়া ক্রীশচন্দ্র নগেঙ্গকে তড়ান করিলেন। কেননা নগেঙ্গ আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠেরা করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, “মরিলে কি হুর্ষ্যমুখীকে পাইবে?” এই বলিয়া নগেঙ্গের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেঙ্গ বলিলেন, “বল।”

ক্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিবে আমি আর বলিব না। কিন্তু ক্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেঙ্গের কণ্ঠ প্রবেশ করিল না। উঁহার চেতনা বিভ্রূত হইয়াছিল। নগেঙ্গ মৃদনয়নে স্বাধীকৃত হুর্ষ্যমুখীর রূপদান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজারাজী হইয়া বসিয়া আছেন; চারি দিগ হইতে, শীতল মুগন্ধায় পূর্ণ উঁহার অলঙ্কারে গুলাইছে; চারি-দিগে পুষ্পানিধিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণাবাদ গান করিতেছে। দেখিলেন, উঁহার পদতলে শত শত কোকনুদ ফুটিয়া রহিয়াছে, উঁহার সিংহাসন চন্দ্রাভয় শীত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারি

পার্শ্ব শতং নক্ষত্র জ্বলিতেছে। এদিক-
লেন, নগেন্দ্র যথং এক অক্ষরার্থ স্থানে
পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্বাঙ্গে বেদনাঃ
অথর্ব তাঁহাকে প্রকটভাবে করিতেছে;
স্বর্ঘ্যমুখী অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহারিগকে
নিষেধ করিতেছেন।

অনেক বয়েশ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনা
বিধান করিলেন। চেতনাগ্রাণ্ড হইয়া
নগেন্দ্র উঠকম্বরে ডাকিলেন, “স্বর্ঘ্য-
মুখি! আগ্রাণিক! কোথায় তুমি?”
চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং
ভীত হইয়া নীরব হইয়া বসিলেন।
ক্রমে নগেন্দ্র ভভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া
বলিলেন, “বল!”

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, “আর
কি বলিব?”

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই
প্রাণত্যাগ করিব।
ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনঃবার বলিতে লাগি-
লেন, “স্বর্ঘ্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট
পান নাই। এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ মপ-
রিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি
কলিকাতা পর্যন্ত নৌকাপথে আসিয়া ত-
ছিলেন। এক দিন নদীকূলে স্বর্ঘ্যমুখী
রক্তমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা
সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন।
দুর্গিণীর সহিত স্বর্ঘ্যমুখীর আলাপ হয়।
স্বর্ঘ্যমুখীর অবস্থা বৈয়োগ্য এবং চিরজৈ
প্রাণী হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা তাঁহাকে
নৌকায় তুলিয়া লইলেন। স্বর্ঘ্যমুখী
তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে,
তিনিও কাশী যাইবেন।

নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি, ও বাচী
কোথায়?

নগেন্দ্র মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন
রূপে তাহার সন্ধান করিয়া প্রত্যুপকার
করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার
পর?”

শ্রী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার পরি-
বারস্থার নায, স্বর্ঘ্যমুখী বহিঃ পর্যন্ত গিয়া-
ছিলেন। কলিকাতা পর্যন্ত নৌকায়,
কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল,
রাণীগঞ্জ হইতে বুলকট্টেনে গিয়াছিলেন;
এ পর্যন্ত হাটিয়া রেল পান নাই।

ন। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
বিদায় দিল?

শ্রী। না; স্বর্ঘ্যমুখী আপনি বিদায়
লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন
না। কতদিন তোমাকে না দেখিয়া
থাকিবেন? তোমাকে দেখিবার মানসে
বহিঃ হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে
জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখ পানে
চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের
জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল।
তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠে প্রশ্ন হইয়া, তাঁহার
বাক্যে মাতা রাখিয়া, রোদন করিলেন।
শ্রীশচন্দ্রের বাচী আসিয়া এপর্যন্ত নগেন্দ্র
রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদ-
নের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ
বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্বক্কে
মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন
করিলেন। ইহাতে বঙ্গদ্বার অনেক উপ-
শম হইল। যে শোকের রোদন নাই,
সে যমের দূত!

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র
বলিলেন, “এ সব কথায় আজ আর
আবশ্যক নাই।”

নগেন্দ্র বলিলেন, “আর বলিবেই বা
কি? অবশিষ্ট যাঁহা যাঁহা ঘটয়াছিল,
তাঁহা ত চক্ষু দেখিতে পাইতেছি।
বহিঃ হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে
মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটার
পরিভ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র রক্তিত,
নিরাশ্রয়ে, আর মনের রেষে স্বর্ঘ্যমুখী
রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে
পড়িয়াছিলেন।”

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে
কহিলেন, “ভাই, রূথা কেন আর সে
কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই।
তুমি তাঁর অমতে বা অবধ্য হইয়া কিছুই
কর নাই। যাঁহা আত্মদোষে ঘটে নাই,
তাঁর জন্যে অহুতাপ বুদ্ধিমানের করে না।”

নগেন্দ্রনাথ বুলিলেন না। তিনি জা-
নিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন
বিবরণের বীজ ছাড়্য হইতে উচ্ছিন্ন করেন
নাই?

চন্দ্রাবিশ্বময় পরিচ্ছেদ।

হীয়ার বিয়রক্ষের ফল।

শ্রী। মহারত্ন কপর্দকের বিনিময়ে
বিক্রয় করিল। ধর্ম চিরকর্তে রক্ষিত হয়,
কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিমর্ষ
হয়। হীয়ার তাহাই হইল। যে যমের
লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল,
সে এককড়া কানা ব্যক্তি। কেননা দেবে-
ন্দ্রের প্রেম, বন্যার জলের মত; যেমন
পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে
বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাতে কানায়
বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোনে২
রূপণ অথচ যশোবিন্দু বাক্তি বহু কানায়
বধি প্রাপণে সফিয়ার রক্ষা করিয়া,

পুজোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে
একদিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে,
হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম, রক্ষা
করিয়া, একদিনের স্মৃতির জন্য তাহা নষ্ট
করিয়া উৎসর্গার্থ রূপণের ন্যায় চিরস্ম-
রণোৎসবের পথে গণ্ডারমান হইল। জীবা-
শীল বালক কর্তৃক অপোপাঙ্কৃত অপক-
চূত ফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক
পরিভ্রান্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ
বাথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিতাপ্ত-
নশে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যে রূপ অপ-
মানিত ও মর্ষণ পাইত হইয়াছিল, তাহা
স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, শেষ সাক্ষাৎ দিবসে, হীরা
দেবেন্দ্রের চরণাবলুপ্তিত হইয়া বলিয়া-
ছিল যে, “দাসীর পরিত্যাগ করিও না,”
তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে,
“আমি কেবল কৃন্দনন্দিনীর ঘোটে তো-
মাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—
যদি কৃন্দনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা-
ইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার
আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্যন্ত।”

হীরা কোথায় অর্দ্ধকার দেখিতে লা-
গিল। যখন তাহার মস্তক ঘূর্ণন পির-
হিল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়া-
ইয়া, জরুতি কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত
করিয়া, যেন শতযুগে দেবেন্দ্রকে ভি-
স্মার করিল। দুখরা, পাণিষ্ঠা স্ত্রীলো-
কেই যেরূপ ভিত্তিকার করিতে জানে,
সেইরূপ ভিত্তিকার করিল। তাহাতে
দেবেন্দ্রের ঠেংখাচূত হইল। তিনি হীরাতে

পদ্মখাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাঘত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষফিরি দ্বারা যো লোকের প্রাণ সংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষফড়ি অস্ত্র-করার জন্য উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজবিষ, সপণবিষাদি নানাপ্রকার সদ্য প্রাণা-পহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রকমে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, “একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি, সেই শিয়ালেটাকে নো মারিলে তজ্জিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজ হাঁড়ি খাইতে আসিলেই খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে; সদ্য প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?”

চণ্ডাল শিয়ালের গল্প বিশ্বাস করিল না। বলিল, “আমার কাছে খাড়া চাহ, ডাছা আছে; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিধি বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরবে।”

হীরা কহিল, “তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্ট দেবতা আর গন্ধার দিবা করিয়া বলিতেছি।

ছইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।”

চণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ স্বরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চণ্ডালকে দিল। চণ্ডাল তীব্র মাতৃব্যথা হলাহল কাগজে মুড়িয়া, হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, “দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।”

চণ্ডাল কহিল, “না! আমি তোমাকে চিনিও না।” হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া, মনে কহিল, “আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা সন্দেহ আছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেমসী কুন্দ-নন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয়, মরিব।”

একচন্দ্রাবংশমত পরিচ্ছেদ।

হীরার আবি।

“হীরান আমি বুড়ী।

গোবরের শুড়ি।

হাঁটুও গড়ি।

দাঁচে ভাঙ্গে নুড়ি।

কাঁচাল গার দেববুড়ি।”

হীরার আবি লাঠি ধরিয়া গুড়িৎ-হাই-

তেছিল, পঞ্চাশ বালকের পাল, এই অপরূপ কবিতাটি পাঠ্য করিতে, করতালি দিতে, এবং নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নির্দার কথা ছিল কি না, সম্ভেদ—কিন্তু হীরার আমি বালকগণ কোপবিশিষ্ট হইয়াছিল। সে বিলকিগণের যমের বাড়ী যাইতে অসুখা প্রদান করিতেছিল—এবং তালা-দিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অনায়াস ব্যবস্থা করিতেছিল। এই রূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আমি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবানদিগের ভয়-কুট শাস্ত্রাঙ্গি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়ন কালে কোন বালক বলিল;—

রামচরণ মোহে,

সন্ধ্যাবেলা শোরে,

চোর এলে কোথায় পলাবে?

কেহ বলিল;—

রাম সিং পাড়ে,

বোড়ার লাঠি ঘাড়ে,

চোর দেখিলে দৌড়মারে পুকুরের পাড়ে।

কেহ বলিল;—

লালটান সিং,

নাচে ডিঙ্গি মিড়ি,

ভালকটির মম, কিন্তু কাজে মোড়ার ডিম।

বালকেরা দ্বারবানগণ কর্তৃক নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আমি লাঠি ঠকুৎ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তার খানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া, বুড়ী কহিল;—

“হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা?” ডাক্তার কহিলেন, “আমিহে ডাক্তার।” বুড়ী কহিল, “আর বাবা, চোকে দেখতে পাইনে—বয়স হইল পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোনই হয়—আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটি বোটা ছিল তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও—” বলিয়া বুড়ী—হাঁউ—মাউ—খাঁউ করিয়া উচ্চৈশ্বরে কান্দিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হই-গাছে তোর?”

বুড়ী সে কথা র উত্তর না দিয়া আপ-নার জীবন চরিত আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং অনেক কাঁদা কাঁটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল—“এখন তুই চাহিস কি? তোর কি হইয়াছে?”

বুড়ী তখন পুনর্বার আপন জীবন চরিতের অপরূপ কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাটার, ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবন চরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্মার্থ বুঝিলেন—কেননা তাহাতে আখ্য পরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহ্যক।

মর্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে, রোগ বাতিকা হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাবালাল হইতে অত্যন্ত দুঃখিত। তাহাতে কখন মাতৃব্যাপির কোন লক্ষণ

মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখন কখন একী হাসে—একা কঁাদে, কখন বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচ। কখন চীৎকার করে। কখন মুচ্ছা বায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধি চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার নাতিনীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।”

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, “তা বাবা! ইষ্টিরিসের ঔষধ নাই?”

ডাক্তার বলিলেন, “ঔষধ আছে বৈকি। উহাকে খুব গরমে রাখিষ, আর এই ক্যাম্‌ব্র-য়েল টুকু লইয়া যা—কাল প্রাতে খাওয়াইস। পরে অন্য ঔষধ দিব।”

বুড়ী ক্যাম্‌ব্র-য়েলের দিসি হাতে, লাঠি ঠেক করিয়া চলিল। পাতে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি গো হীরের আয়ি; তোমার হাতে ও কি?”

হীয়ার আয়ি কছিল যে, “হীরের ইষ্টিরিস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলাম, সে একটু ফেটুরস দিয়াছে। তা হাঁগা? কেটুরসে কি ইষ্টিরিস ভাল হয়?”

প্রতিবাসিনী অনেক ভাণিয়া চিন্তিয়া বলিল—“তা হবও বা। কেটেইত সফল হইত। ত তাঁর অচুগ্রহে ইষ্টিরিস ভাল হতে পারে। আচ্ছা, হীরের আয়ি, তোমার নাতিনীর এত রুম হয়েছে কোথা থেকে?” হীরের আয়ি অনেক ভাণিয়া বলিল, “বয়স দোষে এমন হয়।”

প্রতিবাসিনী কহিল, “একটু কৈলে বাতুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনেছি, তাতে বড় রস পরিপাক পায়।”

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সমুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, “মর! আগুন কেন?” বুড়ী বলিল, “ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।”

রিচদ্বারিংমন্তম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারপুরী—অন্ধকার জীবন।

গোবিন্দপুরে দর্শনদিগের রহৎ অট্টালিকা, হয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র স্বর্য়ামুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধুলার রাশি, কার্ণিসে পায়ার বাসা, ক্রান্তিতে ভুজ্জী। বাগানে শুকনা পাতার রাশি, পুকুরেতে পান। উঠানেতে শিয়াল, ফলবাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইমুর। জিনিসপত্র সব ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেই ছাড়া ধরেছে। অনেক ইমুরে কেড়েছে, ছুঁছা বিছা বাহুড় চামচিকে অন্ধকারে দিব্য রাজ বেড়াইতেছে। স্বর্য়ামুখীর পোষা পাখী গুলাকে প্রায় বিভূলে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও উচ্ছ্রিষ্টাবশেষ পাখাগুলি, পড়িয়া আছে। হাঁস গুলি শূণ্যে মরিয়াছে। ময়ুর গুলি বুনে হইয়া গিয়াছে। গোরু গুলার হাড় উচ্চি-

কন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে, কন্দই অনর্থের মূল। কন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কৃষ্ণে নগেন্দ্র কন্দকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। যেমন উপাস রক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কন্দ ভাবিত, “স্বর্য়ামুখীর এই দশা আমাকেই হইল। স্বর্য়ামুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে পথের কান্দাণী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখনও মরি না কেন?” আবার ভাবিত, “এখন মরিব না। তিনি আশ্রন—তাকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?”

কন্দ স্বর্য়ামুখীর মৃত্যু সহ্যদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, “এখন শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি স্বর্য়ামুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার মুখের কাঁটা হব না।”

জিচ্ছারিংমন্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাত নাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বন্দি রহিল। তাহা হরিপুরে রেকর্ড হইবে, এই কারণে দানপত্র সমাপ্ত করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। ক্রীশচন্দ্রকে যথোচিত খাদ্যে অহম্বর করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন।

ক্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দান পত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন, ইত্যাদি কার্য হইতে বিরত করবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে বদ্ধ নিম্নল হইল। অগত্যা তিনি নদীপথায় তাঁহার অল্প গামী হইলেন। সত্ৰী ছাড়া হইলে কলি মণির চল না, স্তবরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসা বাদে সত্ৰীশকে লইয়া ক্রীশচন্দ্রের নৌকা গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি স্বর্য়ামুখী গৃহভাগ করিয়া গিয়া ছিলেন, সেই অবধি কন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জয় কোধ; যুধ দেখিতে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া কন্দনন্দিনীর শুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ মূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কন্দনন্দিনীকে প্রহুঁলিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন—নগেন্দ্র আসিতেছেন, সখাদ মিয়া কন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। স্বর্য়ামুখীর মৃত্যু সহ্যদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কন্দ কঁাদিল। একথা শুনিয়া, এ প্রস্তুর অনেক সন্দেহী পাঠকারিণী মনে হইল; আর বলিলেন, “মাছ মরেছে, বেরাল কঁাদে।” কিন্তু কন্দ বড় নির্দোষ। সন্তান মরিল যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সন্তানের জন্যও একটু কান্দিল। আর ভূমি ঠাকুরাণী! ভূমি যে হেমে বলতেছে, “মাছ মরেছে বেরাল কঁাদে”—তোমার সন্তান মরিলে ভূমি যদি একটু কান্দ, তাহলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

রাছে—আর চুপ দেয় না। নগেন্দ্রের কুকুর গুলার ক্ষুধি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা কেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পালাইয়া গিয়াছে। ঘোঁটা গুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আন্তাবল বেধানে সেখানে ঝড়কুটা; শুকনা পাভা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখন পায়, কখন পায় না। সচিবেরা প্রায় আন্তাবলযুগ্ম হয় না; উপপত্নীর যুগ্মেই থাকে। অটালিকার কোথা আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট থনিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথাও ঝড়ঝড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। নেটিঙ্গের উপর রক্তির জল, দেয়ালের পেটের উপর বন্ধারি, বুককেশের উপর কুমীরকার বাসা, ঝাড়ের ফালসের উপর চড়াইয়ের বাসার ঝড়কুটা। যুগ্মে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বাসি বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মী ছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মাঝী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখন একটি গোলাপ কি একটি স্বপ্নপদ্ম ফুটে, এই যুগ্ম মধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজন খাইত পবিত্র; কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে ঘৃণিতা ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় ভাবিয়া করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক ছুঁত করিত। “বাসিক কুন্দ দেওয়ানজিরে, বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখ-

তেন না; স্তবরাং নগেন্দ্র দেওয়ানকে যে পত্র গুলন লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না—সেই গুলন পাঠ তাহার সন্ধ্যাপায়জী হইয়াছিল। সন্ধ্যা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্র গুলি ফিরাইয়া ন্যূন। এই ভয়ে দেওয়ানের নয়ম শুনিতেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এক কথা জানিয়াছিলেন। পত্র গুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক, স্বর্ঘ্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? স্বর্ঘ্যমুখী স্বামীকে ভাল বাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই কুন্দ হৃদয় খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা কুন্দের নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় মতত সে হৃদয়ে আচ্ছাদিত করিত। বিবাহের আগে, বালা-কালারি কুন্দ বগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাতাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারিত নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনাতঃ নৈরাশা আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ মধ্য হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে তেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাজ দিন ভাবে, রাজ দিন কানে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভাল বাসুন—তাকে ভাল বাসিয়েন কুন্দের এম। কি ভাষা—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন,

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কমল অনেক দিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, “কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে খ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত স্বর্ঘ্যমুখী ফিরবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন স্বর্ঘ্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না?” এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ভাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি খ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, “এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ভাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বট পাত্রে শোবেন?”

খ্রীশচন্দ্র বলিলেন, “এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।”

অনিন খ্রীশচন্দ্র, রাজ মজুর, ফরাশ, নলী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এ দিকে কমলমণির দৌরভ্রষ্টা ভুঁটা বাড়ু চামচকে মহলে বড় কিচিমিচি পড়িয়া গেল; পায়রা গুলি “বকমং” করিয়া এ কার্ণিক ও কার্ণিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ই গুলি পলাইতে ব্যাকুল—যেখানে মাগী বন্ধ, সেখানে ছার খেলা মনে করিয়া, চোটে কাঁচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারকারা ঝাঁটা হাতে জিনেং দিকেং দিগবিকরে ছুটিল। অচিরে অটালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিষেবক নগেন্দ্র আসিয়া পঁছলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী,

প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবর্তী, কিন্তু জ্যেয়ার পুরিলে পড়ীর জল শান্তভাবে ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে চুপ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অসুখের ভ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে, পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি স্বর্ঘ্যমুখীর প্রসন্ন করিলেন না—কিন্তু তাহার দীরভাব দেখিয়া সকলেই তাহার চুপে চুপিত হইল। প্রাচীন ছুতোরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরজুগুপ্তি কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুর্শত্কারিংশতম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত প্রদীপে।

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকার স্বর্ঘ্যমুখীর শয্যাগৃহে তাহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে, পৌরজন সকলে প্রসুপ্ত হইলে নগেন্দ্র স্বর্ঘ্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। স্বর্ঘ্যমুখীর শয্যাগৃহে অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের মঞ্চ মুখের মন্দির—এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কক্ষটা প্রশস্ত এবং উচ্চ, হৃদয়তল বেতকৃষ্ণ মণ্ডর প্রস্তুতের রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল

লোহিত লতা পল্লব ফল পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র বিহঙ্গম সকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। এক পাশে বহুমূল্য দারু-নির্মিত হস্তিস্থরচিত কারু কার্য বি-শিষ্ট পর্য্যাক, আর এক পাশে বিচিত্রবস্ত্র-নুভিত নানাবিধ কাঠামন এবং রত্নদ্বন্দ্ব প্রভৃতি দুইসজ্জার বস্ত্র বিস্তার ছিল। কয় খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতি নহে। স্বর্ঘ্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনিবেশ করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করায়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরাজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভুল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। এক খানি চিত্র কুমারসমূহ হইতে নীর। মহাদেব পর্লত-শিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চারণ করিতেছেন। লতা গৃহদ্বারে নন্দী, বাম একোষ্ঠাগ্রিত হেম-বেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—জমরের পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মুগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে স্বরধান ভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সন্দেশ বসন্তের উদয়। অগ্রে, বসন্তপুষ্পাতরঙ্গময়ী পার্শ্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শব্দসমূহ প্রণামজনা নত হইতেছেন, এক জাহ্নু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জাহ্নু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত সুরক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত। মন্তক নমিত হওয়াতে, অলক-বন্ধ হইতে ছুই একটি কণবিলম্বী কুরুবক

কুম্ব খসিয়া পড়িতেছে; বক হইতে বসন ঝেং ঝেং হইতেছে; দুই হইতে মম্বাং সেই সময়ে, বসন্ত প্রকলনমধ্যে অন্ধ লুপ্তায়িত হইয়া এক জাহ্নু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধ্বংস চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধ্বজে পুষ্পসংযোজিত করিতেছে। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে কিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্য মার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা, নিম্নে, পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান চতুঃস্পার্শ্বে নানা বর্ণের মেঘ,—নীল, লো-হিত, খেত,—ধুমন্তরশ্লোংক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে, আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—স্বর্ঘ্য-করে তরঙ্গ সকল হীকর রাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে—“সৌধকিরীটিনী লঙ্কা”—তাহার প্রাসাদ-বতির স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল স্বর্ঘ্যকরে জ্বলিতেছে। প্রদূর পারে, শ্যাম শোভাময়ী “তমাল তালবনরাজিলীলা” মনু-লেলা” মধ্যে হব্যশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে ভুলিয়াছে। রথ শূন্যপথে সেব্যমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাতে অগণিত যাদব-বীসেনা ধাবিত হইতেছে, দুইে তাহা-দিগের পতাকা শ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সাগরি হইয়া রথ চালাইতেছেন; অশ্বেরা যুগ্মায়িত করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে; সুভদ্রা আপন

সারথ্য নৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া যুগ্ম কির-িয়া অর্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিতে-ছেন, ক্রুদ্ধমত্তে আপন অপর দংশন করিয়া টিপিত হাসিতেছেন; রথবেগ-জনিত পবনে তাঁহার অলকা সকল উড়িতেছে—ছুই এক গুচ্ছ বেশ যেদ বিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকার লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর এক খানি চিত্র, মাগরিকা বেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমাল তলে, উদ্-দমনে প্রাণভাগ্য করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্প-ময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গম্বুদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্কর জল মুছিতেছেন; লতা পুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপরূপ শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর এক খানি চিত্রে, শকুন্তলা দ্ব্যয়ন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাপনিক কুশাঙ্গুর মুক্ত করিতে-ছেন—অস্থূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুগ্ধ হইতে-ছেন না—দ্ব্যয়ন্তের দিকে চাহিতেও পারি-তেছেন না—স্বাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসঙ্কিত হইয়া, সিংহ-শাবক তুলা প্রতাপশালী কুমার অভি-মত্না উত্তরার নিকট যুদ্ধ যাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে-দিয়েন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর যেমন করিয়া অবলীলাক্রমে বৃত্তদেহ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্র-ভাগের দ্বারা আঙ্গুত করিয়া দেখাইতে-

ছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্রে ছুই হস্ত দিয়া কান্দিতেছেন। আর এক খানি চিত্রে সত্যভামার তুলা-ব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত অন্তর-নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণ; তাহার পাশে উচ্চ সৌমপরিধাভিত রাজপুত্রী ষষ্ঠদ্বার সমিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যন্ত রক্তনির্মিত তুলা বস্ত্র স্থা-পিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্বীর্ণ নীরদ খণ্ডবৎ, নানা-লঙ্কার ভূষিত, প্রৌঢ় বয়স্ক দ্বারকাধি-পতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাবস্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে, নানা রত্নাদি সজ্জিত সুবর্ণ রাশি স্থপকৃত হইয়া রহিয়াছে, তুলাপি তুলাবস্ত্রের সেই ভাগ উদ্ধোখিত হইতে-ছেন। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্ক, সুন্দরী; উগ্রদেহ, পুষ্টকায়, নানাতরঙ্গ ঝুঁঝিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাবস্ত্রের অস্ত্রা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অস্ত্রের অলঙ্কার গুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চপকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কণবিলম্বী রত্নভূষা গুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিম্বৎ ঘর্ষ হইতেছে, মুগ্ধে চক্রে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারক্ত বিকারিত হইতেছে, অপর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমা-রূপিনী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহা-রও মুখে লেশ, তিনিও আপনার অস্ত্রের অলঙ্কার গুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামীপ্রতি আস্পন্দে দৃষ্টি-

পাত করিয়া, ইয়খাৎ অথবা প্রান্তে হাসি হাসিতেছেন; কিন্তু ত্রীকক্ষ সেই হাসিতে নগপঞ্জীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। ত্রীকক্ষের মুখ গম্ভীর স্থির, তবু কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপেক্ষে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একই হাসি আছে। মধ্যে শব্দবন; শব্দকান্ধি দেবর্ষি নারন; তিনি বড় আনন্দিতে নায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং ক্ষুদ্র উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্ণ নানা প্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহু সংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত পুরস্করণ প্রাপ্ত ধামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী যথেষ্ট লিখিয়া রাখিয়াছেন, “যেমন কর্ষ তেমনি কল। স্বামির সঙ্গে সোনা রূপার তুলনা?”

নগেন্দ্র যখন কক্ষ মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাজি জগদ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাজি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অপর রুচি হইতেছিল। এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে কখনে রুচি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবচে খোঁচায়ে মুক্ত ছিল, সেই খানে বজ্রতলা শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল বন শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শব্দসমূহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাতানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাতের পার্শ্বে ভাঙ্গ একটা দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া, কত মুখের কথা বলিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভ্রমের সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রায়চিহ্নগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; যুগে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাঁহার চক্কল রশ্মিতে সেই সকল চিহ্ন পুত্তলী সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিহ্নে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উনার কুসুমশয্যা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপনি তুল পরিতে সাধ করিয়া ছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া যথেষ্ট সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী মাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন রমণী রত্নময়ী মাজিয়া তত সুখী হয়? আর একদিন সজ্জার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র বাসে দুইটি ছোট বর্ষা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বলগা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সজ্জার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দর্শনশিতাধরে চিপিত হাসিতে লাগিলেন। এই

অবকাশে অশ্বেরা কটক নিকটে দেখিয়া একবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোক লুচ্ছায় জিয়মাণ হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বলগা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনি-লেন। এবং উভয়ে আবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সজ্জার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, “তুই সর্বনাশী হইত বত আপদের গোড়া।” নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাভোঁথান করিয়া প্লাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিত্র। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়া-ছিল—সূর্য্যমুখী তাঁহার অক্ষরকণ মানেসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি “বিমান” রহিয়াছে। একদিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামিকে কুসুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুসুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া, ধোলে লাগিয়াছিল। আজিও আখিরে চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী এক স্থানে যথেষ্ট লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন।

“১১০ সন্ন্যাসের।

ইহা দেবতা স্বামির স্থাপনা জন্য এই মন্দির তাঁহার দানী সূর্য্যমুখী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।”

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—টক্কর জলে দৃষ্টি পুনঃ লোপ

হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়াই পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোককণী হইয়া আসিতেছে। ফিরাই দেখিলেন, দীপ নির্ভাণোমুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাসভাগ করিয়া, শয্যা শয়ন করিতে গেলেন। শয্যা উপবেশন করিয়া বাজ অকস্মাৎ প্রলবেগে বর্ধিত হইয়া ব্যক্তি ধাক্কা ধাক্কা হইল; চারিদিকে কবচে তাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ভাণ হইল—অপমান্য খন্দোতের নায় আলো রহিল। সেই অন্ধকার তুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঋক্সা বাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাতের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্ত দ্বার পথে, দীপালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীজাপিনী; কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কটকিত, এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীজাপিনী মূর্তি, সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্ট। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্তি হইলেন।

পঞ্চদশাব্দীর শ্রম পুরিচ্ছেদ।

ছায়া।

যখন নগেন্দ্রের তৈলনাশ প্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়াঙ্ককার। ক্রমে

ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃ সঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মুহুরার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিশ্বাসের উপর আরও বিশ্বাস জন্মিল। তিনি জুইলে মুহুরার হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান-কোথা হইতে আসিল? আবার এক সম্ভেদ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন মহুয়ার উরুদেশ! কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মুহুরার অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কখনদিনী?

সম্ভেদ ভঙ্গনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি?” তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেল ছুই তিন বিন্দু উকবারি নগেন্দ্রের কপোল দেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাঁহার স্বল্পস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিজ্য হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত কলকাল পাড়িয়া রহিলেন। পরে, ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় হুটী বামিয়া গিয়াছিল। একদোশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ণদিগে প্রভাতোয় হইতেছিল। দ্বারিচের বিলকর্ণ আলোক প্রকাশ হইয়াছিল—গৃহ মধ্যেও আলোকরঞ্জ দীপ্ত অঙ্গ অঙ্গ আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দক্ষিণেদন ঘে, রমণী পাশোপান করিল—ধীরে দ্বারোদেশে চলিল।

নগেন্দ্র তখন অস্থির করিলেন, এ ত কখনদিনী নহে। তখন এমত আলো নাই যে মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আঁকার ও ভঙ্গী কতক উপলব্ধ হইল। আঁকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহুরাকাল বিলকর্ণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরধরে, অশ্রুপরিপূর্ণ দোচনে বসিলেন,

“তুমি দেবতাই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।”

রমণী কি বলিল, কপাল দোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তাঁরবৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর ছুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্বার রক্ষাত্য বসীবে সেই মোহিনীর পদপ্রস্রাভে পড়িয়া গেলেন। আর কথা করিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উথিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। কক্ষপার্শ্বে উদ্যান মধ্যে রক্তক পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরস্ত্র আলোকপঙ্খ হইতে বায়ুস্ব্যয়ের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, দ্বারার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রাখিয়াছে। চক্ষু না চাওয়া বসিলেন, “কুদ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ

মস্তক রাজ সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিত, তবে কি স্বপ্ন হইত?” রমণী বলিল, “সেই পোড়ার মুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত স্মৃতি হও, তবে আমি সেই পোড়ার মুখীই হইলাম।”

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ স্মৃতিবনত করিয়া, মুছত আঁকার আপনি বলিতে লাগিলেন, “আমি কি পাণল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাণল হইলাম!” এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাসায়ী হইয়া বাহ্যমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদমুগল ধরিলেন। তাঁহার পদমুগলে মুখাভ করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষেক করিলেন। বলিলেন, “উঠ, উঠ। আমার জীবন সর্ব্বশঃ মাতি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ। আমি মরি নাই। আবার তোমার পদমেঘ করিতে আসিয়াছি।”

আর কি অর্থ থাকে? তখন নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীকে পাচ আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, দিনা ব্যতীক অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্বন্দ মস্তকান্ত করিয়া কত রোদন করিলেন।

কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি স্বপ্ন!

যাইচাওয়াংশও পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বস্তান্ত।

যথা সময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কোতুলক নিবারণ করিলেন। বলিলেন, “আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ত্রক্ষচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া আমিত্তে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য রাত্তা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ত্রক্ষচারী আমাকে এখানে হইতে তিন কোশ দূরে, এক ত্রক্ষণের কাঁড়িতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশে গেলেন। তিনি এখানে কলিকাতায় গিয়া ত্রিশচন্দ্রের গহিত মাফাৎ করিলেন। ত্রিশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিত্তেছে। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে আসিলেন যে, দুদিন আসার ভ্রমণের বাটী হইতে আমি, সেই দিনেই তাহার গৃহ দাখ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। এতে লোকের দৃষ্টি দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে না। তাহার সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার

একটি মরিয়া রহিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে ক্ষমণ, সে পলাইতে পারে নাই। এই রূপে তাহার সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। বাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জন-বলে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। গ্রামের গোমাস্তার নিকট হরমণির কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। হরমণির মৃত্যু বার্তা হইলে টাকা সে নিকটকে ভোগ করিতে পায়। স্বতরাং সে সেই কথা বলিয়া প্রচার করিল। বলিল ‘আমি চিনিয়াছি, হরমণিই বটে!’ সেই প্রকার মূঢ়ত্বাল করািয়া দিল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন, যে তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যু সম্বন্ধ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কাজেই বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। এই প্রতাপপুরে আমি পরম্ব দিন এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্রোশ দূর না—পথ হাঁটিতে শিথিয়াছি। পরম্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া

গেলাম, আবার কালি ব্রহ্মচারির সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছাইলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কী দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে, সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাভায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। রূপাটের আড়ালে হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে সেইয়া বসিয়া আছি। এ স্থখ যে আমার রূপালে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভাল বাসনা। তুমি আমার পায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার পায়েয় বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।”



৩
৬

সাংখ্য দর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বিবেক।

আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাই প্রকৃতিভিন্ন আর কিছুই আমারে ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটা মনুষ্য-দেহ ভিন্ন, “তুমি” বলিব, এমন কোন নামও দিই দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই স্থখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার স্থখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তাহাণি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখ ভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এই রূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়গোচর, কিয়দংশ অদৃশ্য মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং স্থখ দুঃখাদির ভোগ কর্তা। যে স্থখ দুঃখাদির ভোগ কর্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কছেন, যে, আমাদেরই স্থখ দুঃখ মানসিক বিকার—মাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে

কষ্টকর বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থান স্থিত মায়া তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্যে মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল কে? যে ভোগ করিল, সেই আত্মা।” একবার আর অন্য সম্ভাব্যায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেই রূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই স্থখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। উহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা বাহাকে অন্তরীন্দ্রিয় বলেন, উহারা মস্তিষ্কে তাহাই বলেন।

এই মত পরিশুদ্ধ বলিয়া আমার গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমরা সে মতাবলম্বী নহি। মস্তিষ্ক ভিন্ন, আর কাহারও অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই—প্রমাণভাবে আত্মার রূপনা করিতে বলি না। বহুকাল পূর্বে প্রচারিত সাংখ্য দর্শনে, এই আপত্তিও অব্যবহিত ছিল না। সাংখ্যদর্শনে মনোরাগী সকল আত্মা হইতে ভিন্ন। মন, বুদ্ধি, “মহৎ” এ সকল আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণের মতের ন্যায় প্রাকৃতিক পদার্থ (Matter) বলিয়া সাংখ্যে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ এ সকল হইতে ভিন্ন।

শরীরাদি নাতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শরীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। বাহ্যিক মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি স্তম্ভমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রা-

কৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণজিয়ের দ্বারা ভূমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তেঁ-
নার হুইয়। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন
দ্রুত্ব নাই। কিন্তু প্রকৃতি ঘটিত দ্রুত্ব
পুরুষে বর্ডে কেন? “অসম্ভোজস্পন্দঃ”
পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গ বিশিষ্ট
নহে। (১) অধ্যায় ১৫ সূত্র) অবস্থাদি,
সকল শরীরের, আত্মার নহে। (৫ ১৪
সূত্র) “ন বাহ্যাস্তরয়োক্রপেরক্সোপারল্লক
ভাবোপি দেশব্যবধানাৎশ্রুত্যা পাতলি-
পুজস্যয়োরিব।” বাহ্য এবং আন্তরি-
কের মধ্যে উপরজ্ঞা-এবং উপরজ্ঞক ভাব
নাই, কেননা তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে;
দেশ ব্যবধান বিশিষ্ট। যেমন এক জন
পাতলীপুত্র নগরে থাকে, আর এক জন
শ্রুত নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের
ব্যবধান তজ্ঞ। তবে পুরুষের দ্রুত্ব
কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের
দ্রুত্বের কারণ। বাহ্যে আন্তরিক, দেশ
ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার
সংযোগ নাই, এমন নহে। যেমন স্ফটিক
পাত্রের নিকট জবা কুসুম স্থাপিতলে, পাত্র
পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং
পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা
যায়, এ সেই রূপ সংযোগ। পুষ্প এবং
পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পা-
ত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও
সেই রূপ। এ সংযোগ নিশ্চয় নহে, দেখা
গাইতেছে। স্বতরাং তাহার উচ্ছন্ন হ-
ইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছন্ন হই-
লেই, দ্রুত্বের কারণ অপনীত হইল।
অতএব এই সংযোগের উচ্ছিন্নই দ্রুত্ব
নিবারণের উপায়। স্বতরাং তাহাই

পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদ্ব্যক্তিঃ পুরুষার্থ-
স্তদ্ব্যক্তিঃ পুরুষার্থঃ” (৬, ৭০)

সাংখ্যের মত এই। ঊনবিংশ শতাব-
্দীতে ইহার যথার্থ নিরূপণ জনা কষ্ট
পাইতে হয় না। তবে, ইহা বক্তব্য যে,
যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যদি
আত্মাই স্বত্ব দ্রুত্বভোগী হয়, যদি আত্মা
দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হ-
ইতে বিযুক্ত আত্মার মুখ দ্রুত্বাদি ভো-
গের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্য দর্শ-
নের এ সকল কথা মতার্থ বলিয়া স্বীকার
করিতে হইবে। কিন্তু এই “যদি” গুলিন
অনেক। আধুনিক পঞ্জিটবাদী এখনই
বলিলেন,

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে
জানিতেছে? শরীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হই-
তেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ
বিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে স্বত্ব দ্রুত্বভোগী,
তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি স্বত্ব
দ্রুত্বভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহ-শাশ্বতের পর যে আত্মা থা-
কিলে, তাহা ধর্মপুস্তকে বলে; কিন্তু ত-
স্ত্রিম অগম্য প্রমাণ নাই। আত্মার
নিত্যত্ব জানিতে হয়, মানিব, কিন্তু ধর্ম-
পুস্তকের আত্মাহুসারে; দর্শন শাস্ত্রের
আত্মাহুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহ ধ্বংসের পর আত্মা থা-
কিলে, তাহার যে আবার জ্বর মরণাদি
দ্রুত্বের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু-
না প্রমাণ নাই।

অতএব বাহ্যের আত্মার পার্থক্য ও
নিত্যত্ব মানেন, তাহারও সাংখ্য মানি-
বেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে

গ্রাহ্য হইবে, এমন বিবেচনার আমরা
সাংখ্য দর্শন বুঝাইতে এরূপ হই নাই।
কিন্তু এক্ষণে বাহ্য অপ্রত্য, দুই সহস্র
বৎসর পূর্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত।
সেই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত্য কি, ইহাই
বুঝান আমাদের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিন্নই
অপর্ণণ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে
প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা।
কিন্তু কোন প্রকার বিবেকের দ্বারা
মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে
অবিবেক, সকল অবিবেক তাকার অন্ত-
র্গত। অতএব প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয়
জ্ঞানে দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য
সভাতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি”
(Knowledge is Power) হিন্দু সভাতার
মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি।” দুই জাতি,
দুইটি পুণ্য উদ্দেশ্যাহুসন্ধানে এক
পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের
শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি
পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক
ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তির অহুসারী,
ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আ-
মরা শক্তির প্রতি বসন্তী, ইহাই আ-
মাদের অবনতির মূল। ইউরোপীয়
দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে
জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক
—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম
না। পরকালে হইবে কি না, তদ্বিষয়ে
মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হই-

লেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম
লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন
বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আচার্য্যেরা
প্রাকৃতিক শক্তির পূজা এক মাত্র সম্ভা-
ল্য বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক
শক্তি সকল অতি প্রবল, অশ্রি, অশা-
সনীয়, কখন মহা মল্লকর, কখন মহা
অমল্লকর করণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা
তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুত, অগ্নি
প্রভৃতি দেবতা রূপনা করিয়া তাঁহাদি-
গের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে
তাঁহাদিগের ঐতীর্ঘ্য যোগ যজ্ঞাদির বড়
এলোতা হইল। অবশেষে সেই সকল
যোগ যজ্ঞাদি মনুষ্যের প্রধান কার্য্য
এবং পারত্রিক সুখের এক মাত্র উপায়
বলিয়া, লোকের একমাত্র অমুচ্যে হইয়া
পড়িল। শাস্ত্র সকল কেবল তৎসমুদা-
য়ের আলোচনার স্তুতি হইল—অন্য-
জ্ঞানের প্রতি আর্ধ্যজ্ঞাতির তাদৃশ প্রকো-
ষোপ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ,
উপনিষৎ, আগারক, এবং সূত্রগ্রন্থ সকল
কেবল ক্রিয়া কলাপের কথাই পরিপূর্ণ।
যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইতে, তাহা
কেবল বেদের আত্মচর্চ্চা বলিয়াই।
সে সকল শাস্ত্র বেদান্ত বলিয়া খ্যাত
হইল। জ্ঞান এই রূপে ক্রিয়ার দাসত্ব
শুখলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি
হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস
ভারতকূলে অপ্রতিহত থাকিতেই একপ
ঘটিয়াছিল। ইহার ফল মহা ভয়ঙ্কর
হইয়া উঠিল। অসুত জ্ঞানের আলো-
চনার অভাবে বৈদিক আরও প্রবল
হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একবারে
লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেক-

শস্য মন্ত্রযুক্ত শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার প্রথম বলিলেন, কর্ম, অর্থাৎ হোম যামাদির অল্পটান, পুরুবার্য নহে। জানই পুরুবার্য। জানই যুক্ত।

কালিদাস।

বঙ্গদর্শনে, প্রয়াসসম্বলিত বিচিত্র স্বর-প্রথিত যে চুল্ল্যেবা নবংশ জালে কালিদাস আরত হইয়াছেন, তাহার কিয়দংশমাত্র উত্তোলন করিয়া কবির মুখ নিরীক্ষণে প্রয়াস পাইয়াছি।

দক্ষিণাবর নাথকৃত রঘুবংশের প্রথম ধর্গের টীকা আমি দেখিয়াছি। তিনি উচ্চাতে রামায়ণ, মহা, পরাশর, ভগবদ্গীতা, দণ্ডী, অমরকোষ, ধরণি, শাশ্বত, হল্যদ্বয়, সংসারাবর্ষ, কামদক, মাঘ, ভটি প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং টীকার পর্বভাগে লিখিয়াছেন;—

“টীকাম্ অজ্ঞোঃ রঘুবংশকাব্যে
শ্রীনাথকো যাং কৃতবান বিদ্যা।
তস্যাম্ অগাং চারুদ্রায়ঃ সমগুঃ
নগঃ প্রসিদ্ধঃ পৃথগঃ পুথিগ্যাং ॥
রূপাদি সমদেহমো বিহন্তঃ
কাব্যার্থং চান্তু মূরহন্তঃ ॥
একৈব কার্যদ্রষ্টাধিপাটী
টীকা বুধানাং তদ্রূপাংকঃ মে ॥”

কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, ইতি, “শ্রীমদ্রোপাধ্যায় কৌলচল মল্লিনাথ স্বরিরচিতয়াং

কর্মপীড়িত ভারতবর্ষে সে কথা শুনিল।
জানের আলোচনার সূত্রপাত হইতে লাগিল। অন্যান্য দর্শনের স্ফুট হইতে লাগিল। শাকা সিংহের পথ পরিষ্কার হইল।

রঘুবংশ টীকায়াং বশিষ্ঠাপ্রমতিগমনো
নাম প্রথমসর্গঃ ॥ ১ ॥”

অল্প লেখকেরা প্রায়ই এই রূপ জমে পতিত হন। আচার্য গোলাড়ক্যাকার লিখিয়াছেন যে, ইষ্টইণ্ডিয়া হাউস গ্রন্থালয়ে তিনি কুমারিল ভাষ্য সমেত মানব রূপস্বত্র প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থের উপরি ভাগে “রূপেদ কুমারেলভাষ্য সং” লেখা থাকায় উহার অস্তিত্ব বহুকাল অপ্রকট শিত ছিল। “জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিন” ইত্যাদি ধ্রুবাক্ষর একটা স্বন্দর ভবানীস্তোত্র আছে। কাশ্মীর ও কাশ্মীর-দেশস্থ হস্তাক্ষরগ্রন্থে উক্ত শঙ্করার্যাকৃত বলিয়া নির্দিষ্ট; কিন্তু সম্প্রতি একটা গ্রন্থ পাইয়াছি, যাহাতে স্তোত্র রচয়িতা আপনাকে ত্রিপতির পুত্র রামকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

মল্লিনাথ স্বীয় টীকায় মাধব রত্নির উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবভাচার্য্য ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় জন্মিত হন। অতএব মল্লিনাথ তদপেক্ষা প্রাচীনতর নহেন।
লার্সেন মতে কালিদাস খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের সভায় বর্তমান ছিলেন।

কালিদাস ৩২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন, স্বীকার করিলে এ নির্ণয় তাদৃশ অসম্ভব নহে। কিন্তু “কবিরন্ধু,” “কাব্য-প্রিয়” প্রভৃতি উপাধি মাত্র অবলম্বন করিয়া, এক জন নির্দিষ্ট কবি তাঁহার সভায় ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তিসম্মত নহে।

বেটলি যে বিক্রমাদিত্যকে ভোজের পরকালবর্তী করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। ভোজপ্রবন্ধের মধ্যেই একাধিকবার বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। অতএব “শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত,” এ সিদ্ধান্তও অমূলক। উক্ত প্রবন্ধে ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ আছে, যথা,—“ভট্টিনটোভারবীর্যোঃপিনটঃ” ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেখগিরি শাস্ত্রীর মতে ভোজ-প্রবন্ধ ১২০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তাহা হইলে বল্লালকে ভবিষ্যৎ ও অতএব অপ্রামাণিক বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে ভব-ভূতি ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রারম্ভিত হন, কিন্তু তাহার ৬০০ বৎসর পূর্বে বিরচিত গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ!

শব্দরূপক্রম সম্বন্ধন কর্তৃকগণের মতে সিংহাসন দ্ব্যবস্থাপিত প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহার বিক্রমাদিত্যের বিবরণ উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধ্যয় বলিয়া দ্বন্দ্ব হইয়াছেন।

* বুজাকরের ভ্রমবশতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গবর্ননে কালিদাস বিষয়ক প্রস্তাবে ১২০ পরিবর্তে ১২০ খ্রীষ্টাব্দে সূত্রিত হইয়াছে। এটি সাধারণ করিয়া লক্ষ্যেই কোন জয় থাকিলে না। কালিদাস সম্রাটের প্রভাব লেখক শ্রীমুদ্র বাবু রায়দাস সেনএকটি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাহাতে ভ্রমটি সংশোধিত হইয়াছে। ২৭ দৃঃ ১।

গম্প মাত্রেয় ঐতিহাসিক বিষয়ে অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সেই রীতি অনুসারে কথাসরিৎসাগরের অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা কর্তব্য। যাহাঁরা কথাসরিৎসাগরের প্রমাণানুসারে কাত্যায়নকে পানিনির সমকালবর্তী বলেন, তাঁহাদের ঐতিহ্য আচার্য্যের প্রভা-ত্তর কি বিশ্বস্ত হইয়াছেন?

মহাত্মা কোলক্রক লিখিয়াছেন যে, কিম্বদন্তী আছে, শেষ তীর্থঙ্কর বুদ্ধমান ২৪০০ বৎসর পূর্বে নির্মাণ প্রাপ্ত হন। এরূপ দীর্ঘকালের কিম্বদন্তী যে একবারে জমশূন্য হইবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বর্তমান বৎসর হইতে গণনা করিলে খ্রীঃ পূঃ ৫৮ লক্ষ হইল। অতএব খ্রীঃদেব কৃত বিক্রমচরিত মতে তাহার ৪৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্য বর্তমান ছিলেন। এ নির্ণয় কি অত্যন্ত অসম্ভব?

জ্যোতির্বিদ্যাতরুণের ২০ নং প্লোটে যে “কিয়দকৃতিকর্মবাদের” আছে, তাহা তর্কব্যাচস্পতি মহাশয়ের মতে উৎকল দেশপ্রচলিত স্মৃতিচক্রিকাভিধ বেদোক্ত রূপে প্রতিপাদিত গ্রন্থ।

ঘটকর্ণর নামে কোন কবি ছিলেন না, এ কথা আপাততঃ সম্ভব বোধ হয় না। যমকব্য ব্যতীত নীতিসার নামক ২১ গ্লোকাব্যক কাব্য আছে। কালিদাস কুমারসম্বরের প্রথমসর্গের তৃতীয় শ্লোকে হিমালয়ের হিমের বিষয় লিখিয়াছেন যে, “একচ্চিৎ সৌভাগ্যে সপ্তিপাতে, নিম-জ্জতীন্দোঃ কিরণমিবাস্বঃ ॥” এই উপমা লক্ষ্য করিয়া ঘটকর্ণর নীতিসারে করিয়াছেন, “একাহিহোদ্যোঃসপ্তিপাতে নিম-

অতীন্দোরিতি বোঝাবে। সুনং ন দুইং
কবিনাপি তেন, দারিত্র্য দোষাণ্ডণ-
রাশিনাশি। ” বমকবাবরশেষেতেও
“ভৈরব বহুরমুকং ঘটকপূর্ণেণ” বলিয়া
শ্লেষঃ আয় পরিচয় প্রদান করিয়া-
ছেন। এতদ্বাতীত-নবরত্নগোত্রোজ্জ্বলিত
অন্য কতিপয় ব্যক্তিরও গ্রন্থ প্রচলিত
রহিয়াছে। স্বকল্পিত আয়ুর্ষেদ, অমর
সিংহরচিত অমরকোষ, বেতালাভট্ট প্র-
ণীত নীতিপ্রদীপ, বরাহমিহিরকৃত লঘু-
জাতকাদি জ্যোতিঃশাস্ত্র, বররুচি প্রণীত
প্রাকৃত প্রকাশ ও নীতিরত্ন, এ বিষয়ে

অমাণ। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া
শঙ্করাচার্যের আজ্ঞাপ্রসারে তাঁহার
অন্যান্য কাব্য ধ্বংসিত হয়। ক্ষণকালের
নাম দেখিয়া অসুখমান হয় যে, তিনিও
বৌদ্ধ।
কিন্তু সম্ভ্রান্তি দুইটী হস্ত লিখিত বমক
কাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি; একটি মূল মাত্র,
দ্বিতীয়টী সটীক। উভয়েতেই উহা কালি-
দাস রচিত বলিয়া নির্দিষ্ট। বিস্তৃত বিব-
রণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা
রহিল।

ঐপ্রাণনাথ পণ্ডিত।

পরশমণি।

কে বলে পরশমণি অলীক যখন?
অই যে অদীনীজলে, পরশমাস্তিক জলে-
বিধাতা নির্মিত চাক মানব নহন।
পরশ মণির সনে, লেহঅঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ তাক্সন হয়, প্রবান বচন—
এ মণি পরশে যায়, মাণ্ডি বুলন তার,
বরষে কিরণধারা নিখিল ভূতন।
কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশণ্ডে মানব বসন
নেবকুল রূপ ধরে, আছে ধরা আলো করে,
মাস্তিক অঙ্গুষ্ঠে মাখা সোনার কিরণ।

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শব্দধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে মুদ্রিত।
কে রাখিত চিত্তকরে চাঁদের মালতী ধরে,
তুরঙ্গ মেঘের অঙ্গ করিয়া রঞ্জিত?
কে আনিত ধরাতে বিমল গদ্যার জল—
ভীরতভূষণ করি ছড়াবে রাখিত?

কে দেখাত তরুতুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিশ, মুগে পৃথিবী ঢাকিত?
ইন্দ্রদনু-আলো তুলে, মাঝারে বিদম্বকুল,
কে বলে শিখির পুঙ্খ শাশ্বত আঁকিত?
দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
যর্গের উপমাশ্রয়, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর ভাই হয়েছে ধরণী।
কি আছে ধরণীঅঙ্গে, নয়ন মণির সঙ্গে,
না হয় মানবচক্ষে আনন্দদায়িনী! —
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা ফেলে,
চড়াতে বালুগা ফুটে, ঘাসেতে হিমালী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপিলী শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে ত্বার পড়ে, স্নিগ্ধে চিকণী,
তাতেও আনন্দ হয়,—অরুণ কুঙ্কুমিয়ার,
জলন্ত বিদ্যাং লতা, তমিস্রা রজনী।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে;
ইহারি পরশ বলে সখার সখার গঠন

পুরায় প্রেমের হার প্রস্থল অন্তরে;
শিখিরা প্রেমের বৈদ, মুচায় মনের ভেদ,
পুণ্য আঁকি করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, পেয়-মালিনীর জল
পবিত্র করেছে হারে খুলিয়া নিধারে;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ার ছুটি,
সমারূপে মনোমুগে পৃথিবী উপরে।
কোন পৃথ্যে হেন নিধি, পায়ের মৌনে বোধি,
গেল চলে চিরদিন এই-আশা ধরে।

৫

অপূর্ণ মাণিক এই পরশ-কাক্ষন।

স্নেহরূপ কত ফুল, ছুটায় ইহার মূল;
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন।
জননীবদনীকুল, জগতে তরুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জ্ঞানার বদন,
শতশিখি রুমিমাখা, চাক ইন্দীদর আঁকা,
পুত্রের অধর গুণ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বাম-মুগ নিরমল,
পরিব পুণ্যপাণ্ড গৃহীর কাক্ষন—
এই মণি পরশনে, হয় মুগ্ধ দরশনে,
মানব জনম সার সফল ভীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক যখন?

বররুচি।

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব আলো-
চনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুস্তাপ্য সং-
স্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ
“নবং প্রবন্ধ প্রাচীন পুরাতত্ত্বপ্রিয় পাঠ-
কবর্গের করকমলে উপহার প্রদান
করিতেছি। এ সকল অসুস্থদান জন-
বীহীন হইবেক, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে
বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অসু-
স্থদানের পর, প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ
করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন
জন্ম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা
জ্ঞাপন করিলে বাঞ্ছিত হইব। গতবারে
কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন
কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত
হইয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ নাই।

• সাক্ষ্যত বিদ্যাসুন্দর। মহাকবি বররুচি বিচিত্র-
তম। নানা সাখ্যানুগতঃ। কলিকাতা রাজধান্য
প্রাপ্ত যজ্ঞে মুদ্রিতঃ।

ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন
মতেই উচিত নহে। সে বাহা হউক,
একধে “প্রকৃতনমস্কারামঃ”
নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লর্ড বায়-
রন, থ্যাংবারী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি-
গণের ভূতবৈশিষ্ট্যবিবরণ প্রস্তাব কলাপ
প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সং-
স্কৃত বিদ্যাসুন্দর দুটো বোধ হইতেছে,
বররুচির ভূতবৈশিষ্ট্য এখানি রচনা করিয়া
প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধু-
নিক আদিরস যত্নিত গল্প “নবরত্নের”
রত্ন বিশেষ-বররুচিকৃত কখনই হইতে
পারে না। ইহার রচনাচার্য্য কিছুই
নাই। বরং স্বানে স্বানে সংস্কৃত
ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের ঐতি-
কর সংস্কৃত “অশ্লীল কবিতা” দুটো, এই

• Strange Visitors.

কৃষ্ণ পুস্তকখানি প্রদান করিব রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গ-দেশীয় ভট্টাচার্য্য এণীত প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভীরতচ্ছন্ন কৃত বিদ্যা-সমুদ্রের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে “চোর-পঞ্চাশৎ” আছে, তাহা চোর কবি বিরচিত। বররুচি ছুই ব্যক্তি। কাভায়ন বররুচি ও বররুচি। ভট্ট মোক্ষমূলর এই ছুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার “ইতিগুণা হাউসের” পুস্তকখান স্থিত আশ্রানন্দরুত স্বক্বেদ কাভায়া, “সর্দাহুমানি” মধ্যে “অত্র শৌনকাদি মতসংযুহীত বররুচেরুজ্জ-মণিকা” এই পঙ্ক্তি পাঠে অম হইয়াছে। “সর্দাহুমানি” কাভায়ন বররুচিকৃত, তৎকৃত মাধাদিন প্রাতিশাখাও প্রসিদ্ধ। ইনি পাণিনির বার্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কপ্পহিত প্রণেতা। “কথাসরিং সাগরে” লিখিত আছে, পুস্তকস্ত নামক মহাদেবের অমূল্য শাপভট্ট হইয়া মর্ত্তা লোকে কাভায়ন বা বররুচি নামে কৌশলী নগরীতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় “এই বালক ঋতঙ্গর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাত হইবে; বিবেচ্যতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জ্ঞানিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম

বররুচি হইবে” ● যথা মূল সংস্কৃত আছে;—

এক ঋতঙ্গরো জাতো বিদ্যাং বর্ষদ্বাপাসাতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে পুতিষ্ঠাং পাণিনিয়তি।
নাম্ভা বররুচি লোকে তদগৈ হি প্রোচতে।
মহাভারতং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুকা বাপ্ত পারমহং।

তিনি জতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল কণ্ঠস্থ বলিয়াছি-লেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ ঋতঙ্গর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখা গ্রহণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আরজি করিয়া ছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনির ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহা-দেবের ক্রুপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিলেন। কাভায়ন, পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর তাহার বার্তিক প্রণত করেন। এই “কথা সরিৎ সাগরের” মতাহুসারে তিনি নন্দের মঞ্জীর কার্যও করিয়াছিলেন। স্তবরাং তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ “রহৎ কথা” রাসায়ণ ও মহা-ভারতের ন্যায় সম্ভান করিয়া থাকেন, কিন্তু মিথ্যা গম্পের পুস্তকের এত মান্য করিতে হইলে “আরব্যোপন্যাসও” প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি যুনি[†] কখনই কাভায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না।

● যথা কথার বাহালা অনুবাদ পৃঃ ১৩, ১৪ম ভাগ।

† খ্রীস্টাব্দে ভারত দুইৎ কথানাং কইদমুদমঃ হি জ্যোতা ইবসময়া সরযতা ক্ষু রতিবেদিতা।

● তৃতঃ স মর্ত্তবুধা পুণ্যবধা পরিব্রতঃ। নাহা বররুচি কিঞ্চকাভায়ন ইতিব্রতঃ।। যেমজ্ঞ কোমে কাভায়ন-এবং বররুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

এ জনা “রহৎ কথা” প্রমাণ অগ্রাহ হইতেছে। আচার্য্য গোলাড়কু[†] করের মতে তিনি পতঞ্জলির সম সাময়িক এবং ১৪০ ও ১২০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বররুচি, সন্দুগ[‡] শিখের মতে “কর্ম্ম প্রদীপ” প্রণেতা। উহা আদ্যোপান্ত অমৃতপঞ্চন্দে রচিত। একদে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সম্ভান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাই-য়াছি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্বয় শক প্রমদক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য “রাজতরঙ্গিণী” মতে যদিও শুকদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্গদা দৌরাধ্যা করিত, এ জনা হিন্দু ভূপালবর্গ সর্গদা লগজিত থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ বিক্রমানামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় অঙ্গ প্রাচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে “কালিদাসের” বিবরণে শক প্রমদক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। “জ্যোতির্বিদ্যার” নামক কাল-জ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সভার “নবরত্নের” অন্তর্গত, কিন্তু যখন উহা এক জন জ্ঞান কালিদাস কৃত, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অনেক প্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য বোধ

করা অন্যায়। “ভোজ প্রবন্ধে” লিখিত আছে, “অথ ধার্ম্মানগরে ন কোপি মুখ্যে নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেনস্তে বিজুবাং খ্রীভাজম্। বররুচি স্ববন্ধু-বাণ মন্তুর রামদেব হরিবংশ শব্দর কলিক কর্পুর বিনায়ক মদন, বিদ্যাধিবনোদ কৌ-কিল তারেজ প্রমুখাঃ।”

এই ভোজ যুগ্মের আত্মপুত্র, খ্রীসাহ-সাক নামে খ্যাত, যথা রাজ শেখর;—
ভাশো রামিল সৌমিলো বররুচিঃ,
খ্রীসাহসাকঃ কবি মেঘো ভারবি কালি-দাস তরলাঃ স্বন্ধঃ স্বরুক্ষচয়ঃ।

একদে নীমাংসা করা আবশ্যক। বর-কচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্ববন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় (●)। ইহাদিগের উভয়ের নাম এবং কালি-দাসের নাম বজাল মিশ্র এবং রাজ শেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা খ্রীসাহসাকের পার্শ্বদ স্থির করিয়া-ছেন। ভোজ বা খ্রীসাহসাক, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবর সেনর ত্রয়সাময়িক, উজ্জয়িনীর খ্রীষ্টীয় বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহা ইউরো-পীয় পাণ্ডিত্যগণ কর্ত্তক স্থির হইয়াছে। স্ববন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, ও তাঁহার রাজ্য লোকবিস্তারগত হইলে বাসব সভা রচনা করেন (†) এবং বাসবভট্ট

● ইতি জীবরুচি জাণিনেয় বৃদ্ধ, বিরাচিত্য বাস-বদবাখ্যায়িকা সমাপ্ত।

† কবিয়াং বিক্রমাদিত্য সভাঃ। গুণিন রাজী লোকায়তঃ প্রাপ্তে এতৎ নিবন্ধং স্তব্ধতয়া। নারসিংহ ত্রিখা।

‘প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানবকীল সম্বরণ
করিতে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন;
যথা—

সারসবজা নিহতা নবজা রিলসস্থিতরনোতি নোক্তকঃ
সরসীবদীপ্তি শেষং গভবতি কুবি বিক্রমাদিত্যে ॥

‘অই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে,
কবি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর স্বপুত্র
কালিদাস এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে
উৎসাহবান ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করি-
য়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি
ভোজ রাজ্যের পৌরোহিত্য করিতেন এবং

তাহার এক মাত্র আশ্রয়পাদপ ভো-
জের মৃত্যুর পর ভৎকৃত “ভোজ চম্পু”
সম্পূর্ণ করেন। বররুচি প্রণীত “প্রাকৃত
ঐক্যশ” এক খানি উপাদেশ্য প্রাকৃত
ভাষার ব্যাকরণ। তাহার কৃত “লিঙ্গ
বিশেষ বিধিকোষ” অতি প্রসিদ্ধ। মেদি-
নৌকার এবং হল্যুধ তাহার বিশেষ
উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিধি তাহার
নামে “নীতিরত্ন” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচা-
রিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

ঐক্য।

পাণ্ডবের শ্রীযুক্ত গিজে বসিয়াছেন
যে, উন্নতিই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ।
‘তাহার’ বিবেচনায় হিন্দুজাতি সভা
বলিয়া গণ্য নহে। এ বিষয় লইয়া বাদা-
নুবাদ করাতে কোন মূল নাই। কারণ,
গিজোর মস্তক এই যে, সভ্যবত্তে যোকে
যে সকল জাতিকে সভা বলিয়া গণনা
করে, সেই সকল জাতির প্রকৃতিই সভা-
তার লক্ষণ। ইউরোপীয়েরা সকলেই
কেবল আপনাদিগকে সভা এবং অন্যান্য
জাতিকে অসভা জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক
কালে হিন্দুরাও অহিন্দু জাতিকে অসভা
ব্রহ্ম বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং
উভয় সম্প্রদায়ের মতে সভ্যতার লক্ষণ
স্ফীত হইবেক, ইহাতে বিচিত্র কি?
ফলতঃ সভ্যতা পদার্থের যদি কতগুলি
বিশেষ লক্ষণ থাকে, তবে সভ্যতা শব্দে

সকল ভাষাতেই ঐ সমস্ত লক্ষণ
বুঝান উচিত বটে। কিন্তু উহার মধ্যে
কোনই অল্প সভ্যতার লক্ষণ নহে বলিয়া
জাতিবিশেষ সভা পরিভাষা করিলে,
সভ্যতা পদার্থটা কখন অজ্ঞান হইবেক
না; কেবল উক্ত জাতির ব্যবহৃত ভাষা
দ্বারা সভ্যতা শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পা-
দিত হইবেক। অতএব ইউরোপীয়দিগের
মতে হিন্দুরা সভ্যপদের বাচ্য নহেন,
এ কথা বলিলে হিন্দুদিগের অবমাননা
না হইয়া ইউরোপীয় ভাষা সমগ্র সভা
শব্দের অর্থ বিভিন্ন, এই রূপ সিদ্ধান্তও
হইতে পারে। ইহাতে স্বজাতির গৌরব
করা আশাদিগের উদ্দেশ্য নহে; কারণ
পঞ্চাশতের ব্রহ্ম শব্দের নিন্দাও এই
হেতুতে অপনীত হইবেক। কাশীর
ব্রহ্মজ্ঞানীকে দেখিলে ইউরোপীয়

মাত্রই অসভ্যপ্রধান বলিয়া অভিযা-
বিত্ত হইবেন, মদেন নাই। কিন্তু জাপান
হইতে তুরস্ক পর্যন্ত যে কোন বিবেচক
ব্যক্তি ইহাকে অবলোকন করিবেন, তিনি
ইহাকে ভক্তিই না করুন, তাহার সহি-
ষ্ণুতা গুণের ভূয়সী প্রশংসা অবশ্যই
করিবেন। ইহার নিম্ন এই যে, ‘কাহাকে
দোষ এবং কাহাকে গুণ বলে, তদ্বিষয়ে
সকলের একমত নাই।’ সদগুণের সং-
স্কার হওয়াই সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ।
যাহারা সভ্যসমাজে থাকিয়াও সদগুণ
অভাস করিতে পারে নাই, তাহারা
কুলান্ধার এবং কদাচ সভ্যপদবীর যোগ্য
নহে। আবার সকল পাত্র সমস্ত গুণ
কখনই যুগপৎ পাওয়া যায় না—অত-
এব সকলে তুল্যরূপ সভা বলিয়াও
গণ্য হইতে পারে না। পৃথিবীস্থ
নানা জাতির আচরণ অবলোকনপূর্বক
প্রত্যেক জাতির সদগুণ সমূহ একত্রিত
করিয়া সভ্যতার লক্ষণ স্থির করা
কর্তব্য। এরূপ করিলে প্রকাশ হইবেক
যে, সদগুণ অভাসই সভ্যতার লক্ষণ-
সমূহের সাধারণ প্রকৃতি।

সভ্যতা যে অভাসগত গুণ, একাধর্ম
বিষয়ে বাস্তবিক সহিত ইউরোপীয়
জাতিগণের তুলনা করিলে তাহার এক
প্রাকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়। একা
সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অবশ্যই গণ্য।
আমরা সকলেই একাকৈ ভাল বলি; একা
লাভ করিতে লোককে পরামর্শ দিই—
কিন্তু কার্যে এক হইবার সময়ে জ্ঞান-
দিগের পৈতৃক অযোগ্যতা স্পষ্টই
দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচজন সামান্য
ইংরাজ নানা বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী

হইলেও প্রয়োজন স্থলে অনায়াসে মল-
বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহায়তা করিবে;
কিন্তু দুই জন ভদ্র বাঙ্গালি পরস্পর
হইলেও দশ দিন কাল উদ্য-নির্দিষ্ট
কোন নিয়ম যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন
করিতে পারিবেন না। অসভ্য জাতি-
গণ সরদারের আদেশানুসারে কর্তৃক করে।
এবং সর্বত্রই নির্দোষ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ
এ রূপে কার্য্য করিয়া থাকে; এতদৃশ
লোকের একাধারের মূলীভূত হেতু
এই যে, ইহাদিগের মন নানা বিষয়ের
প্রতি ধারমান হয় না, সুতরাং সময়
বিশেষের জাগরুক বাসনা একমাত্র বলিয়া
সকলে তাহারই অগ্রগামী হয়। কিন্তু
ইহারা কিছু কাল পরেই আবার সতি-
ক্ষম হইয়া পরিশেষে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য
হইয়া পড়ে।

যাহারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধ-
নার্থে যুদ্ধোত্তার মনন করিয়া সকলে এক
মতে কার্য্য করেন, তাহারাই ‘প্রকৃত
একাধর্ম্মধারী।’ ইচ্ছা করিলেই যুদ্ধো-
ত্তার রক্তি মনন করা যায় না। ইচ্ছা
সকল সময়ে তুল্য প্রকার বল ধারণ
করে না; অতএব ভিন্নই ব্যক্তির মনে
একই ইচ্ছা একই সময় প্রবলা হইবার
সম্ভাবনা অতি বিরল। তবে কোন কারণ-
বশতঃ কোন জাতির বহুলাংশ পর্য্যন্ত
অগত্যা একাধর্ম্ম করিতে হইলে তা-
হার ‘ক্রমশঃ’ এই গুণ অভাস করিয়া
লায়। আর যে সমাজ লোকে সর্বদা এক
বাক্যে কার্য্য করে, তাহাদিগের সংসর্গে
থাকিলে ঐ গুণ সহজেই অভাস হইয়া
যায়—এবং পুরুষাত্মকে এই রূপ অভাস
হইলে একেবারে প্রয়োজন স্থলে লোকে

সামান্য বিরোধ বিস্তারিত করিয়া শত্রুর সঙ্গেও এক বাক্যে কার্য্য করিতে পারে।

একোঁর দুই লক্ষণ। উদ্দেশ্যের একতা এবং কার্য্যকারকদিগের পরস্পরের সহায়তা। লক্ষণদ্বয় সর্বতোভাবে পৃথক। প্রথমটী থাকিলেই যে দ্বিতীয়টী সহজে উপস্থিত হয়, এমন নহে। এক উদ্দেশ্য অনেক লোকের থাকে, কিন্তু তৎসামর্থ্য পরস্পরের সাহায্য করিতে সকলেই ইচ্ছুক বা সক্ষম হয় না।

একা রক্ষার জন্য দলের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত এতদূশ সংগ্রহ হওয়া আবশ্যিক, যেন তিনি ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইবে না। গুরুতর কার্য্য এক ব্যক্তির দ্বারা নির্বাহ হওয়া দুষ্কর বলিয়াই একোঁর প্রয়োজন হয়। থাকে; তাহাতে যদি কার্য্যকারকেরা স্বতন্ত্র ক্রমতঃ অংশ-মাত্র নিযুক্ত করেন, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন উপকার দর্শে না। কার্য্য নির্বাহ করাই একোঁর উদ্দেশ্য, তাৎপরিবর্তে প্রায় লাভবকে উদ্দেশ্য জ্ঞান করিলে কার্য্যের ক্ষতি অবশ্যই হইবেক। কারণ লোক বৃদ্ধিতে স্বাভাবিক অনেক দৌর্লভ্যের হেতু উপস্থিত হয়। মনুষ্যের মন নানাদিকে জগন করিয়া থাকে। যদি দুই ব্যক্তিকে এক বিষয়ে নিবদ্ধ করিতে কোন নিষ্ফল-পরিমাণ পরিশ্রম আবশ্যিক হয়, তবে তিন জনের স্থলে তাহার তিন গুণ এবং চারি জনের স্থলে ছয় গুণ পরিপ্রায় প্রয়োজন হইবেক। অতএব বহুসংখ্যক ব্যক্তির মনে একটী উদ্দেশ্য জাগরুক রাখিবার জন্য যে অতিরিক্ত প্রয়াস আবশ্যিক, তজ্জনিত ক্ষয় পূরণার্থ তাবৎ লোককে উদ্ভিষ্ট করি

নিরূপ হইয়া একটী নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। এতদূশ জ্ঞানাত্মক লোককে একোঁ রাখিতে অনেক রূপা প্রম ব্যয় হইয়া থাকে। স্বতরাং তাহার কৰ্ম্মহানি করে। বাহারা এক বাক্যে যোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, তাঁহাদিগের পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজনীয় কি না, তাহা অগ্রা নির্ণয় করা উচিত। যদি উদ্দেশ্যটী এতদূশ সহ্য হয় যে, লোক যত অধিক হইবেক, ততই সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা হইবেক, তবে উদ্দেশ্যের পূর্ণাবস্থা অসংখ্য লোকেরও অসাধ্য বলিতে হইবেক; স্বতরাং এক ব্যক্তির পূর্ণ আশ্রয়ের বিপরীতমাত্র ব্যতিক্রম হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তদনুযায়ী ব্যাঘাত হয়।

এই সামান্য কথা এতদূশ বাহুল্য ভাবে লিখিবার হেতু এই, আমাদের মধ্যে অনেক, প্রত্যেকের আয়াস অল্প হইবেক, মনে করিয়া দলবদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন এবং পরিণামে বিফলপ্রয়াস করেন। একরূপ কার্য্য কুসংস্কার-মূলক। বহুলোকের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমতঃ উদ্ভিষ্ট কর্ম্মের অল্প প্রত্যক্ষ গুলিকে পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিতে হয়, এবং লোকবল থাকিলে এক একটী বিশেষ কার্য্যের তার পর্যায়ক্রমে তিন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে প্রদান করা কর্তব্য; তাৎপা এক জনের কার্য্য দুই জনের হস্তে প্রদান করা উচিত নহে। কার্য্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি প্রণালীতে বিভাগ করিলে কার্য্যটী সুচারুরূপে নির্বাহ হইবেক, কোনও বিষয়ে সহকারিগণ

অধ্যক্ষের আদেশ অবলম্বন এবং কোনও স্থলে তাঁহার স্ব-অভিলাষ অনুসরণ করিলে তাৎপরের বলসমষ্টি সর্বাংশে ক্ষাণ্য হইবেক, এ বিষয়ের গীমাংসা করাই অধ্যক্ষের কার্য্য। নতুবা কেবল কর্তৃত্ব বাসনার বশীভূত হইয়া অনেকের প্রতি নানাবিধ আদেশ করিলে কেহ অস্বাক্ষ হয় না। বাস্তবিকায় সকলেই কর্তৃত্বপ্রিয়। পরের গোলামি করিতেছি, তাৎপাি স্বযোগে পাইলেই হীনতর গোলামের উপর আতুধ করিবার বাসনা আমাদের এক প্রকার জাতীয় ধর্ম। পাঁচ জন একত্রে সমবেত হইলে সকলেই পরামর্শ দিতে তৎপর। তাহাতে তত দোষ নাই; কিন্তু কেহই যে কৌশল বিনা জানিয়া শুনিয়া, পরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং আপন বিবেচনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী পূর্বক কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা আমাদের আন্তরিক দৌর্লভ্যের লক্ষণ।

পূর্বকালে আমাদের সমাজ মধ্যে রাজা সর্বময় কর্তা ছিলেন। তদনন্তর পূর্বক কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা আমাদের আন্তরিক দৌর্লভ্যের লক্ষণ। পূর্বকালে আমাদের সমাজ মধ্যে রাজা সর্বময় কর্তা ছিলেন। তদনন্তর পূর্বক কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা আমাদের আন্তরিক দৌর্লভ্যের লক্ষণ। পূর্বকালে আমাদের সমাজ মধ্যে রাজা সর্বময় কর্তা ছিলেন। তদনন্তর পূর্বক কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা আমাদের আন্তরিক দৌর্লভ্যের লক্ষণ।

হইতেন না। নিরন্তর পরকাল ভয়-সঙ্কলের মনোমধ্যে জাগরুক থাকিতে সকলেই একাগ্রচিত্তে ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞা পালন করিতেন; কাজেই একা সাধনের উভয় উপকরণই বর্জন্য ছিল। এবং ব্রাহ্মণেরও সর্বসাধারণের সাহায্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষে বিশ্বদ্বন্দ্বীদিগের হস্তগত হইয়াবাক্ত ব্রাহ্মণেরা পদচ্যুত হইয়া পরে ধর্মচ্যুতও হইলেন। দ্ব্যর্থার্থ বশতঃ তাঁহারা আপনাদিগের উপজীবিকাের জন্য কেবল তত্র ব্যক্তিগণের দয়াগুণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু কিংবা কলাপ মাতে ব্রাহ্মণকে দান করিবার বিধান দেখিয়া বাহারা শাস্ত্র প্রণেতাগণকে অর্থলোলুপ মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত অদুরদর্শী। আজিকে ইনকমটাক্স এবং পণ্য ব্যবহার শাস্ত্র রূপ টাক্স লইয়া যে বিসংবাদ চলিতেছে, ব্রাহ্মণেরা বহুকাল পূর্বে তাহার গীমাংসা করিয়া একরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে, অর্থযাজক প্রতিপালনার্থ রাজাকে কর-সংগ্রহ পূর্বক তাহা হইতে বেতন নির্দ্ধিষ্ট করিয়া দিতে হইবেক না। লোককে যেহা পূর্বক পণ্যভিত্তিতে ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে দান করিবে এবং তদ্বারা দাতাগণের দানশীলতা এবং পারলৌকিক মঙ্গলকামনাও বন্ধমূল হইবেক।

তখন রাজার সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইতেন এবং সামান্য লোকদিগকে ভিক্ষা দানের নিমিত্ত শীড়ন করিতে হইত না। কিন্তু রাজভাণ্ডার বিশ্বদ্বন্দ্বী হস্তগত হইলে ব্রাহ্মণ মাঝেই

নিম্ন হইয়া পড়িলেন। আহা! ন চলিলে
এক বৈদ পাঠ কে করিতে পারে?
তাহার ধর্মচ্যুত হইলে হিন্দুসমাজের
শুশ্রূষ ভগ্ন হইয়া পেল। বাহুবল, এবং
পরিণামে অর্থবলই সর্বত্র মানা হইয়া
উঠিল। লোকে রাজার অনাচার দেখিয়া
হিন্দু ধর্মে আস্থা হইল এবং শ্রদ্ধার
পাত অত্যন্ত বেহাচাটী হইল। ব্রাহ্মণি
দিগের আবার বাহুবলও নাই, স্বত-
রং এখানে অনৈক্যের সমস্ত কারণ
একত্রিত হইল। পূর্বের ধর্মরক্ষা এতদ-
শীঘ্র লোকের এক মনঃ উদ্দেশ্য ছিল।
রাজকায়ে কেহ কখন হস্তক্ষেপ করিত
না; যে রাজা উপস্থিত হইতেন, ব্রাহ্মণ
আদেশানুসারে তাঁহাকেই কর দিত।
দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্ম-
ণেরাই তাহার সত্ত্বা হইতেন। বিদগ্ধ
রাজার বাহুতঃ কেবল কর গ্রহণ
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কার্যসকলের
হিন্দুদিগের পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণের অভাব
হইল। অল্পকাল না হইলে হিন্দুরা আয়
কখনই কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না—
বুতরাং ব্রাহ্মণের স্থলে মৃতন কর্তা
সংস্থাপন করিতে পারিলেন না, এবং
তাহার প্রকরণও কেহ জানিতেন না।
ধর্মলোপ হওয়াতে হিন্দুদিগের এক মাত্র
উদ্ধাতিলা—ধর্মরক্ষা—তাঁহাও নিস্তেজ
হইল; স্বতরাং দুর্বলতার স্বভাবসিদ্ধ
ধর্মাহুসারে বঙ্গালিয়া কেবল শরীর রক্ষা
বাণীর বশবর্তী হইয়া পরস্পরের
প্রতি বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ক্রিয়
ধর্ম—শিষ্ট পালন দ্রুত দমন—কৃষ্টি
দ্রুত হইত এবং এই মহৎ কার্যের ভার
দুর্বল, মুর্থ, ধর্ম জ্ঞানবঞ্চিত, ব্রাহ্মণ-

সহায়বিনী কর্মদিদারগণের হস্তে পতিত
হইল। অতএব ঐক্য অভ্যাসের সুযোগ
কোথায়?

বরং যুদ্ধ ব্যবসায়ের নিত্যন্ত বেতন
ভোগী হইলেও এই মহৎগুণ কৃষ্টি
অভ্যাস করিতে পারে। সমুখে শত্রু—
কেন্দ্র অমাকে নছে, সমস্ত সৈনিক দল
বিশেষের জন্যই উহারায়। পলায়-
নের সম্ভাবনা নাই। নির্যাসিত অসি
হস্তে পার্শ্ববর্তী সিপাহীকে আঘাত
করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে কার্যাস্তরে
ব্যাপ্ত। এক্ষণ সময়ে তববায় উত্তোলন
করিবার জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না।
কিন্তু এই সময়ে কতগুলি মহৎ গুণ
অভ্যাস হইয়া যায়! যাহারা যুদ্ধ কালে
প্রাধান্য প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের
মনে সাহস, যত্নিতা ও বাবলধন এবং
পেরাপকারবাসনা প্রদীপ্ত হয়। যাহারা
এ সকল ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হন, তাহারা
কৃতজ্ঞতা অভ্যাস করেন, এবং
এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা, সাহায্য
করিবার ক্ষমতা এবং সাহায্য প্রাপ্তির
আশ্বাস বর্জিত হয়। সৈনিক পুরুষ-
দিগের প্রধান ধর্ম কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা
পালন। যুদ্ধকালে ইহার চালনার
দ্বারা একদিগে কর্তৃত্ব, অন্যদিকে অধীনত্ব
কণ বিষয়ে সকলেই উৎকর্ষ লাভ
করেন।

যে স্থলে যোদ্ধাগণ বেতনলাভসার
পরিবর্তে ধর্মের রক্ষা বা তদ্রূপ অন্য
কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যুদ্ধে
রত হন, সেখানে পরাজিত হই-
লেও তাহাদিগের সাহায্যের ইয়ত্তা
থাকে না। ইহার পদে অগ্রসংযম

এবং পরোপকার ধর্ম অভ্যাস করেন।
রাজ্য রক্ষার্থেই এরূপ প্রয়োজন।
কিন্তু এতাবশ্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মতাব-
লম্বী লোক সমূহকে একত্র করিয়া মৃতন
রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারেন।

যুদ্ধের দ্বারা এক্ষণ অসাধারণ ফল-
লাভ হয় যে, যাহারা যোদ্ধাগণের সহিত
একত্রে আলাপ, একত্রে ভাষণ, একত্রে
জয় করে, তাহাদিগের মনেও এই সকল
ধর্মের সংস্কার হইয়া উঠে।

ইংরাজদিগের ঐক্য দেখিয়া আমরা
আপনা আপনি কতই না থিঙ্ক করিয়া
থাকি! কিন্তু ঐক্য সাধনের এক মহৎ
পাঠ্য ভক্তি; তাহা আমাদের প্রায়
নাই বলিলেই হয়। ব্যক্তি বিশেষকে
দেখিয়া একবারও এমন মনে হয় না যে
ইনি আমার অতীতমান্য; ইহার আদেশ
মতে আমার পুঙ্খের মস্তকে করাতে দেও-
য়াও কর্তব্য এবং সর্বদা হইয়া দায়া
রহিত অবলম্বন করিলেও দোষ নাই। পুন-
রায় ব্রাহ্মণ হকি না হইলে তাহারা
আর পূর্বপদ প্রাপ্ত হইতেন না—অতএব
তাঁহাদিগের সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা।
এখনে সর্বত্র বিবেক শক্তি প্রকাশ এবং
সদগুণ অভ্যাস ভিন্ন আমাদের উপা-
য়াস্তর নাই। কাপ্পনিক আচরণ পরি-
তাগ করিলে, আমরা ক্রমশঃ পরস্পরে
বিষাদ পাত হইতে পারিব। কোন উ-
দ্দেশ্য সকলের মনে জাগরক হইতেছে
না বলিয়া উৎকর্ষিত হইবার আবশ্য-
কতা নাই; কারণ অবস্থার সামান্য না
ঘটিয়ে উদ্দেশ্যের একতা হয় না। কিন্তু
পরস্পরের সাহায্যার্থ কর্তৃত্ব, অধীনত্ব

এবং সমকক্ষের প্রতি বিশ্বাস, এই তিনটি
গুণ অভ্যাস করা আবশ্যক। কর্তৃত্ব
করিতে হইলে অধিনের সুবিধা চেষ্টা,
এবং অধীনত্ব করিতে গেলে কর্তার নিকট
বিনয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রয়োজন। সামা-
কিঞ্চ বিনয়ে আমাদের অসম্ভাব নাই,
কিন্তু আমাদের অস্থিরতা নিত্যন্ত
বিনয়-বিনীত এবং অস্থির হইয়া উঠি-
য়াছে। শ্রদ্ধার পাত্র নাই বলিয়া কাহা-
কেই কর্তৃত্ব পদে অধিবেশ করিব না—
ইহাতে আমাদের বিনয়ভাব এবং
কর্তৃত্বপাঞ্জিদিগের অযোগ্যতা, উভয়
দোষই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বৎ
কর্তব্য সাধনে অব্যর্থ এবং পরের প্রত্যাশা
করা আমাদের আন্তরিক দোষলোভের
প্রমাণমাত্র।

এতাবত এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে,
আমরা প্রাচীন কালে যে প্রণালিতে
ঐক্য সাধন করিতাম, এখনে তাহা
পুনরুৎপাদন করিবার সম্ভাবনা নাই—
কর্তাবিনীত হইলে যে সমস্ত গুণ এবং
উপায়ের দ্বারা ঐক্য লাভ করা যায়,
তাহার অনেক গুলিতে আমাদের
নিত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আর ঐক্য
অভ্যাসের এক প্রধান উপায় যুদ্ধ
ব্যবসা।

অতঃপর পরামর্শ এই যে, দলবদ্ধ
হইবার জন্য পদে এক্ষণ নিয়ম নির্দিষ্ট
করা উচিত, যেহেতুকে আপন কর্তব্য
কর্ম স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারে এবং তাহা
প্রতিপালন করা সকলের পক্ষে সম্ভাব্য
হয়।

প্রাণুগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পদ্যময়। প্রথম ভাগ। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এন্স-স্ক্রিপ্ট।

এখানি বালকের পাঠোপযোগী পদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বালক শিক্ষা, কবিত্ব নহে। ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই ব্যক্তব্য নাই।

পদ্যমালা। উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, ঈশ্বরপায়ন যন্ত্র।

এই পদ্যগ্রন্থ বানি খুলিয়াই আমরা গ্রন্থারম্ভে পড়িলাম,

ওহে নরগণ।

একভাবে ধর্ম পুত্তি রাখ সব মন।

সত্য সনাতন শিব, সুন্দর বরন।

কেমন কোশলে সৃষ্টি করুন কুচন।।

তার পরে ২৫ পৃষ্ঠা খুলিলাম। পড়িলাম,

উলিত জনম কুমি স্বরয়ে যখন।

তখনি আমার হয় বিচলিত মন ॥

জান না জনমভূমি স্বর্ণ পুরন্দরী!

কি সুখের স্থান যথা যজ্ঞন পুরন্দরী।

ইত্যাদি।

আবার এক স্থানে খুলিলাম—৩৮ পৃষ্ঠা,

মন্দ মন্দ সমারণ, বহিঃতেজ অনুক্ষণ

দেখিয়া আমার মন,

মিষ্ট প্রতিশ্রুতি

বক্তাব্যের শোভা ঘেরি,

শৌক দূরে রয়গা

ইত্যাদি।

অন্যান্য অনেক স্থান পড়িয়া দেখিলাম—সকলই এরূপ।

আমরা গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, এই রূপ কথা, তিনি কত লক্ষ বার পাড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা করতে পারেন? যাহা দৃষ্টি বার লিখিত, পঠিত, কথিত, শ্রুত, চর্চিত, উল্লীর্ণিত হইয়াছে, তাহা আবার উল্লীর্ণ করিয়া লাভ কি? লাভ দূরে থাকুক, স্বর্থ কি?

কবিতাকুসুম। প্রথমভাগ। ত্রিটিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা জি, পি, রায় এও কোম্পানির যন্ত্রে।

আমরা উপেক্ষা বাবুকে বাহা বলিলাম, তিনকড়ি বাবুকেও তাহাই বলি। এই বানি কবিতা কুসুমের প্রথমভাগ। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ না করিলেও হয়। সম্ভাব্যকুসুম। ত্রিটিনাথচন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা। প্রাচীন ভারতযন্ত্র।

এই কবিতা গুলিন নিতান্ত অপাঠ্য নহে। স্থানেই মধুর। কিন্তু কবিতার অমৃত বাস্পাঙ্গ দেশে আজকাল ছড়া ছড়ি যাইতেছে। এরূপ সাধুর্য্যও ভাল লাগে না। এ গ্রন্থেও বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু নাই।

প্রথম চরিতাটক। শ্রীকালীময় ঘটক কর্তৃক সঙ্কলিত। ছপলী বুধোদয়-যন্ত্র।

দেখিলাম, এখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

বিবরক।

মন্তুদ্বারিংশতম পরিচ্ছেদ।

সরল। এবং সর্প।

যখন শয়নাগারে, স্বপ্নসাগরে ভাসিতেন নগেন্দ্র স্বর্ধায্য এই প্রাণসিদ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের 'অংশান্তরে' এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্বে, পূর্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ্যনাস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকা-মুগ্ধত রোদন নহে। মর্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাছ-কে কাছকালে অকস্মেৎ আসিয়াসম্মুখ হইয়া, যেখানে অমূল্য জন্ম দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনয়সে কেবল তাহা ছাড়া প্রাণ হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অতীব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, কেন আমি স্বাসিদ্দর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম। আরো ভাবিল যে, এখন আর কোন সুখের আশা প্রাণ রাখি?

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তত্ত্বা আসিল। কুন্দ উদ্ভাতিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্বে পিতৃগবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়ন কালে, যে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার

রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণমুখ নীল নীরদ মধ্যে আরোহণ, করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুর্পার্শ্বে অন্ধকার-ময় ক্লম্বকাপের তরলোৎক্ষীপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকারমধ্যে এক মহাব্য-মূর্ত্তি অঙ্গত হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণেই সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সময়ে দেখিল যে, ঐ হাসানিরত রজন-মণ্ডল, হীরার মুখাভ্যুপেক্ষা আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গভীর ভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন,—

“কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন চুপে দেখিলে তু?”

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, “বলি-মাছিলাম, আর একবার আসি। তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসার-সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।”

তখন কুন্দ কাদিয়া কহিল, “মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চুক। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।”

ইহা শুনিয়া মাতা, অসম হইয়া বলিলেন, “তবে আইস।” এই বলিয়া

তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিজা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, “এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।”

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই ঘূহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কান্দিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাবে দারূণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সম্বাদই ইহার কারণ। পূর্বদরুণ বাবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আত্মকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপটা সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্য সরলা এবং আশ্চর্য্যকথা—সুতরাং হীরার এই মৃত্যু প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্ট হইত না। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্বসত, বিশ্বাসভাজিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রক্ষাভাবিনী ভিন্ন অবিশ্বাসভাজিনী মনে করেন।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, “খাঠাকরাণি, কান্দিতেছ কেন?”

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বাণিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, “এ কি? সমস্ত রাজিই কেঁদেছ না কি? কেন, বারু কিছু বলেছন?”

কুন্দ বলিল, “কিছু না।”

এই বলিয়া আবার সম্বন্ধিত বেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের

ক্লেশ দেখিয়া, আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ স্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বারু, বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথা বাড়ী কহিলেন? আমার দাশী, আমাদের কাছে তা বলিতে হু।”

কুন্দ কহিল, “কোন কথাবাড়ী বলেন নাই।”

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, “সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলেন না?”

কুন্দ কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।”

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অস্বাভাবিক হইল।

হীরা মনে-বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, “ছি মা! এত কি কান্দিতে হয়? কত লোকের কত বড়-ছোট মাতার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কান্দিতেছ!”

“বড়-ছোট” আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, “আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিন তুমি আশ্রয় হইতে।”

“আশ্রয় হইতা,” এত মহা অমঙ্গল-জনক শব্দ কুন্দমন্দিরীর কানে দারূণ বাজিল; সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেক বার সে আশ্রয় হওয়ার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরান্নিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, “তবে আমার ছুগেখের কথা বলি শুন। আমিও এক

জনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা তুমির কাছে লুকালেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।”

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণ প্রবেশ করিল না। তাহার কানে সেই “আশ্রয়তা” শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কানে-বলিতেছিল, “তুমি আশ্রয়ভাঙিনী হইতে, পারিবে। এ যন্ত্রণা মহা ভাল, না মহা ভাল?”

হীরা বলিতে লাগিল, “সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামির অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমাকে ভাল বাসিত না। আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভাল বাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শত গুণে নিষ্ঠুর আর এক পাপিষ্ঠাকে ভাল বাসিত।” ইহা বলিয়া হীরা নতময়না কুন্দের প্রতি এক বার অতি তীব্র কোপকটাক করিল; পরে বলিতে লাগিল, “আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু এক দিন আমাদের উভয়েরই হৃদয় ছি হইল।” এই রূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারূণ বাধার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেজের নাম, কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তৎক্ষণাৎ, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অন্বিত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। ইশবে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, “বল দেখি, তৎক্ষণে আমি কি করিলাম?”

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “কি করিলে?” হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, “আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবা মাত্র মানুষ মরিয়া যায়।”

কুন্দ ধীরতার সহিত, যত্নতার সহিত, কহিল, “তার পর?”

হীরা কহিল, “আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কোটায় পুরিয়া বাক্সেতে তুলিয়া রাখিয়াছি।”

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মূনবি বাড়ীর প্রসাদ পুরস্কার এবং অপহরণের জন্য লুকাইবার জন্য সেইখানেই রাখিত।

হীরা সেই বাক্সেতে নিজস্বকৃত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কোটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আশিষ লোলুপ মাক্কারবৎ কুন্দ, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনঃ বশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে জুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবেশ দিতে লাগিল। এমত সময়, অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে, মঙ্গলজনক শব্দ এবং হস্তধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দমন্দিরী সেই অবকাশে কোটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অটুচ্ছারিংশতম পরিচ্ছেদ।
কুন্দের কার্যতৎপরতা।

হীরা আসিয়া শংখ স্নানির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা রহস্য ঘরের ভিতর, গৃহস্থ বাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক, এবং বালিকা সকলে মিলিয়া, কাধাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহা কমলব করিতেছে। বাধাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুগন্ধি তৈল নিসিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। বাতারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ষন করিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে, এবং করতালী দিতেছে। সকলকে বেড়িয়াই কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন, ও হলুদনি দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখনও একিক ও দিক চাহিয়া, একবার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডল মধ্যে গলা বাড়াইয়া উকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময় বিল্বলা হইল। দেখিল যে, স্বর্ঘ্যমুখী হস্ত্যন্তলে বসিয়া, সুদাময় সন্দেশ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহাদের রূপ কেশভার কুমুদ-বাসিত তৈলনিসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে, কেহ বা আর্জ গন্ধিফ্রণীর দ্বারা তাহার গাভ পরি-

মার্জিত করিতেছে। কেহ বা তাহার পূর্ণপরিভাষ্য অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। স্বর্ঘ্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিছু লজ্জিতা—একটু সাপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসি পড়েছে। তাহার গণ্ডে ঘেহমুগ্ধ অঙ্গ পতিতছে।

স্বর্ঘ্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অক্ষুণ্ণভাবে একজন পৌরস্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ পা, কেণা?”

কথা কৌশল্যার কানে গেল। কৌশল্যা কহিল, “তেন না নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার ঘর।” কৌশল্যা, এত দিন হীরার ভয়ে চোরেমন না ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে, এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, স্বর্ঘ্যমুখী কমলের কানে বলিলেন, “চল, তোমরা আমার একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।”

কেবল কমল ও স্বর্ঘ্যমুখী কুন্দের সভ্যভাবে গেলেন।

অনেক দূর তাহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিষ্কিষ্ট বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতি ব্যস্ত নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধুরা ডাকিতেছে বলিয়া

তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তথ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে স্বর্ঘ্যমুখী সঙ্গে সাগাং হইল। স্বর্ঘ্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?”

স্বর্ঘ্যমুখী বলিলেন, “সর্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জীনিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও মুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবা মাত্রই এমন সর্বনাশ হইবে কেন?”

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন “কি হইয়াছে?”

স্বর্ঘ্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, “কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের নায়ে তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়া-ছিল। আমার সে মাখে ছাই পড়িল। কুন্দ বিধপান করিয়াছে।”

নগেন্দ্র। সে কি?
স্ব। ভূমি তাহার কাছে থাক—

আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।
এই বলিয়া স্বর্ঘ্যমুখী নিম্নভাষা হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দ নন্দিনীর মুখে কালিনা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

উনপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ।
এতদিনে মুখ ফুটিল।
কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাটা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে

নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বস্ত্রীয়া তাহার পদখান্ডে মাটা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “একি এ কুন্দ! ভূমি কি দোষে আমাকে তাগ করিয়া বাইতেছ?”

কুন্দ কখন স্বামির কথা উত্তর করিত না—আজি সে অস্থিরকালে মুগ্ধকণ্ঠে স্বামির সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, “ভূমি কি দোষে আমাকে তাগ করিয়াছ?”

নগেন্দ্র তখন নিরন্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, “কাজ যদি ভূমি আসিয়া এমন করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমন করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।”

এই প্রীত পূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জামুর উপরে লমটা রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজি বড় মুখেরা, সে আর ত স্বামির সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, “ছি! ভূমি এমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। ভূমি তোমার হাসি মুখ দেখিতেও যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণও অস্বপ্ন নাই।”

স্বর্ঘ্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্ত্যকালে সবাই সমান।
নগেন্দ্র তখন নরুণীভিত্ত হইয়া কাতর

স্বরে কহিলেন, “কেন ভূমি এমন কীজ করিলে? ভূমি আমার একবার কেন ডাকিলে না?”

কন্দ, বিলয়ভূমিতে জলদান্তরীর্ভিনী বিছাডের নায় মুহুমুদুর দিয়া হাসি হাসিয়া কহিল, “তাঁহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাঁহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আশিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার স্বথের পথে কীটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।”

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি, বালিকা অবাক পুটু, কন্দনন্দিনীর নিকট নিরন্তর হইলেন।

কন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। যত তাঁহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুজ্ঞানাক্রমকার-মান মুখগুলের মেধাক্ষয়িতা দেখিতে ছিলেন। তাঁহার সেই আশিষ্টিক্ত মুখে, মন্দবিদ্যাদিগদিত যে হাসি তখন দেখিয়া ছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাঁহা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল।

কন্দ আশ্চর্যকিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, অপরিস্রবের নায় পুনরপি ক্লিষ্ট নিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল, “আমার কথা কহিবার ত্যাগ নিবার হইল

না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই। এই বলিয়া কন্দ, পর্য্যঙ্কালম্বন তাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গের মাতা রাখিল এবং নয়ন মুদিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া অবধি দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া, মানমুখে প্রভাববর্জন করিল।

পরে সময় আসে ব্রিথিয়া, কন্দ স্বর্ঘ্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কন্দনন্দিনী ষাশির পদযুগল মধ্যে যুগ লুকাইল। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া দুইজনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু কন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে চৈতন্যজটী হইয়া, বাহিঃচরণ মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীনযৌবনে কন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্রব কন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন মথন করিয়া স্বর্ঘ্যমুখী মৃত্যুসপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ভার্গবতি, তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক! আমি যেন এই রূপে ষাশির চরণে মাতা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।”

এই বলিয়া স্বর্ঘ্যমুখী বোরুদ্যমান ষাশির হস্ত ধারণ করিয়া, স্থানান্তরে

লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র পৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক কন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সংস্কারের সহিত, সেই অভুল স্বর্ঘ্যপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

মসাপ্তি ।

কন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কন্দনন্দিনী বিধ কোথায় পাইল। তখন সকলেই মদেহ করিল যে, হীরার এক কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্য হইয়া ছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। একবার মাত্র, বৎসরের পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোগিত বিষরকের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদম্বী রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তত্ত্বপরি, মদা সেবায় বিরতি না হওয়ায়, রোগ হ্রসিবার্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিল।

কন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্বে সে গৃহমধ্যে রুগ শয্যায় উপানবস্থিত রহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাঁহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,

“কি?” ততোরা কহিল যে, “এক জন পাগলী আপনাকে দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। বারণ মানে না?” দেবেন্দ্র অজ্ঞমতি করিল, “আয়ুক!”

ঊষাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে এক জন অতি-দীন ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাঁহার উন্মাদে লক্ষণ বিশেষ কিছু বৃদ্ধিতে পারিল না—কিন্তু অতিদীন। ভিখারিনী বলিয়া বোধ করিল। তাঁহার বয়স অল্প, এবং পূর্বলাভব্যের চিহ্ন সকল বর্জ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত দুর্দশ। তাঁহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট, এবং এত অপসারিত যে তাঁহা জাহুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাঁহার কেশ রুক্ষ, অবনীবন্ধ, ধূলি ধূসরিত—কদাচিত্ত বাঁজটাযুক্ত। তাঁহার তৈলবহীন অঙ্গের বড়ি উঠিতেছিল। এবং কান পড়িয়াছিল।

ভিখারিনী দেবেন্দ্রের নিকটে আসিয়া একপা তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বৃদ্ধিল, ভূতাবিরের কথাই সত্য—একো ঊষাদিনী।

ঊষাদিনী অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “আমার চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।”

দেবেন্দ্র তখন চিনিল, যে হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তোমার এমন দশা কে করিল?”

হীরা রোমপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুখিবন্ধ হস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। কিন্তু মৃদতা হইয়া কহিল, “ভূমি আমার জিজ্ঞাসা কর—

আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা ভুমিই করিয়াছ। এখন চিন্তেছ—না—কিন্তু এক দিন আমার খোঁসামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া, আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপরে পা রাখিল) গায়িয়াছিলে—

‘‘স্বরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মগুনং
দেহি পদপল্লবমুদারং’’

এই রূপ কত কথা মনে করিয়া দিয়া, উদ্গাদিনী বলিতে লাগিল, ‘‘যে দিন তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়া নাতি মরিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আচ্ছাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কৃন্দকে খাওয়াইব। সেই স্মরণায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উগ্ৰ হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম করিতাম। শেষে তোমার কৃন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের ছুখ মিটাইলাম। তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না দেখিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অম হইল না—পাণলকে কে অম দিবে?

সেই অবধি শিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আচ্ছাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।’’

এই বলিয়া উদ্গাদিনী উগ্র হাস্য করিয়া উঠিল। দেবেজ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পাশে গেল। হীরা তখন নাচিতে২ ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

‘‘স্বরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মগুনং
দেহি পদপল্লবমুদারং’’

সেই অবধি দেবেজ্রের মৃত্যু শয্যাকর্তৃকময় হইল। মৃত্যুর অপ্পথুর্বেই স্বরকালীন প্রলাপে দেবেজ্র কেবল বলিয়াছিল, ‘‘পদপল্লব মুদারং’’ ‘‘পদপল্লব মুদারং’’

দেবেজ্রের মৃত্যুর পর কত দিন তাহার উদ্যামমাধ্যে নিমীষ সময়ে রক্ষকে ভীত চিত্তে শুনিয়াছিল যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে,—

‘‘স্বরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মগুনং
দেহি পদপল্লবমুদারং’’

আমরা বিষব্রুক সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

সমাপ্ত।

বঙ্গদেশের কুবক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
প্রাকৃতিক নিয়ম।

আমরা জমীদারের দোষ ব্রহ্মি, বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কুবকের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অহুগ্রত ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্বক্তি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কুবকদিগের দুর্দশার স্বরূপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্মিত হয় নাই। এদেশের কুবকদিগের দুর্দশাও ছুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দু রাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন কুবক না যে তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌভব ছিল। এখন রাজার প্রতি-নির্দিষ্টরূপ অনেক জমীদার প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে সীড়িত করিত। তাহার কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অন্য আমরা তাহার অনুসন্ধান প্ররক্ত হইব। বঙ্গদেশের কুবকের অবস্থানসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্ররক্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতিকর্ষে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতিকর্ষে ততদূর বর্জ্য; বঙ্গদেশে তৎ

সমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ড মাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কুবজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, অন্য নহে; প্রমজীবীমাত্রেই সমুদায়ে সে ফলভোগী। অতএব আনাদিগের এই প্রশ্নাব, ভারতীয় প্রমজীবী প্রজামাত্র সন্ধক্ষে অভিপ্রোক্ত, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় প্রমজীবীর মধ্যে কুবজীবী এত অধিক যে, অন্য প্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা, সমান।

জ্ঞান রক্ষিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বন্ধ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বন্ধ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, এবং এই বন্ধদর্শনে অন্য লেখক কর্তৃক সে কথার প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অভিশয় প্রমজাত। কেহ যদি বিদ্যালোচনার রত না হয়, তবে সমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। ‘‘বিদ্যালোচনার পূর্বে উদরপোষণ চাই; অন্যাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই

আহারাবেগে ব্যতি বাঁধ থাকিতে হয়, তবে কাহারও জানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার স্বস্তির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজ মধ্যে একটি সম্ভ্রদায় শারীরিক প্রম ব্যতীত আত্ম ভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্তো পরি-প্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবে। যদি প্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণ পোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপাদন করে, তাহা হইলে একরূপ ঘটিবে না, কেননা বাহ্যাজ্ঞানিবে, তাহা প্রমোপজীবীদের সুব্যয় বাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্ম ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণ পোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্বারা প্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাভূশীলন করিতে পারেন। উৎখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদন করে বাইয়া পরিয়া বাহা রহিল, তাকাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশ বিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। স্তত্রাং প্রমোপজীবদিগের

ভরণপোষণেরপার আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতলতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অপোহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলি বাতাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বন্ধের গ্রন্থের প্রমবর্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতুহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ ক্ষুদ্র খায়ের প্রয়োজন, সে দেশে শীতল যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বহু এই বলেন, যে তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজলের সঙ্গে শরীরস্থ রক্তের কার্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্বন। অতএব শীতল প্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিছু পশু-চরন কটুমাংস, এবং ভোজ্য পশু দুইটি। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীত ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্বরা। স্তত্রাং ভারতবর্ষে অতি শীত ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বে কাজেই সভ্যতার আত্মদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটা সম্ভ্রদায় কায়িক পরিপ্রম হইতে অবসর হইয়া, জানালোচনাচ্ উৎপন্ন হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এই রূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুর্ভাগ্যের মূল। যেই নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না;—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্ভাগ্য ঘটিল। প্রভাতেই সেখানকার বালক ফলবান হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ প্রম করে; এক ভাগ প্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের প্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহার করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাঁহারা প্রম করে না, তাঁহারা কেবল সাবকাশ; স্তত্রাং তাঁহাদের চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাঁহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাঁহা বুঝি মার্জিত হয়, সে অন্যদেপক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী

হয়। স্তত্রাং সমাজ মধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাঁহারা প্রমোপজীবী, তাঁহারা ইহাদিগের বশবর্তী হইয়া প্রম করে। তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা প্রমোপজীবীর উপকৃত হয়, পুরস্কার যরূপে তাঁহারা প্রমোপজীবীর অর্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; প্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য বাহ্য প্রয়োজনীয়, তাঁহা অতিরিক্ত বাহ্য জন্মে, তাহা উচ্চরসেই হাতে জন্মে। অতএব সমাজের “যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদিগেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ প্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধোপজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন,” দ্বিতীয়ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা।”^৩ আমরা, “বেতন” ও “মুনাফা,” এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকি। “মুনাফা” বুদ্ধোপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। প্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। প্রমোপজীবীরা সংখ্যা যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেই টিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফা” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাঁহারা পাইবে না।

যখন কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন,” পঞ্চাশ লক্ষ “মুনাফা।” যখন কর, দেশে পৃষ্ঠি লক্ষ প্রমোপজীবী। তাঁহা হইলে এই

• “ভূমির কর” এবং “সমুদ্র” ইহার বঙ্গবর্ষন এখানে বিবরণে করিতে হইবে।^৩ সংক্ষেপে পণ্ডিতের আশা কর বা মূদ্রের উল্লেখ করিবার না।

পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন,” পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপকীর্ষীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপকীর্ষীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপকীর্ষী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাঁহা “মুনাক্কা”, তাঁহার এক পয়সাও উদ্ধারে প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। স্বতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপকীর্ষীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু, দুই মুদ্রাই ভরন পোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাঁহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রামাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দশা হইবে। যদি ঐ লোকাগমের সময়ে আর হোটি মুদ্রা দেশের ধনরক্ষি হইত, তাহা হইলে এক কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভোগের স্থানে লোক মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া ক্লাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক সংখ্যা রক্ষি শ্রমোপকীর্ষীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোক সংখ্যা রক্ষি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও রক্ষি পায়, তবে শ্রমোপকীর্ষীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোক সংখ্যা রক্ষির অপেক্ষাও ধনরক্ষি শ্রমরতর হয়, তবে শ্রমোপকীর্ষীদের শ্রমরক্ষি—যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়।

আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটায়, ধনরক্ষির অপেক্ষা লোক সংখ্যা রক্ষি অধিক হয়, তবে শ্রমোপকীর্ষীদের দুর্দশা। ভারতবর্ষে অধমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোক সংখ্যা রক্ষি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাঁহার একটির সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মহাব্যবস্থার দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিবার্যতার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সলুপায় আছে। প্রকৃত সলুপায় সময়ে ধনরক্ষি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজারক্ষি, সে পরিমাণে ধন রক্ষি প্রায়ই যটিয়া উঠে না। ঘটবার অনেক বিষয় আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি যাক। এক উপায়ে দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অমে কল্যাণ, অন্য দেশে অথ বাহ্যিক লোক নাই। প্রত্যেক কতক দেশের লোক শেখোত দেশে যাউক—তাহা হইলে প্রথমেই দেশের লোক সংখ্যা কমিবে, এবং শেখোত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহত্বপূর্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, আন্ত্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীরক্ষি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও সম্বল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রতির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজারক্ষির সমা

ধাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজারক্ষির লাভ হয়। যে দেশে জীবনের সমুদ্রতা লোকের অভ্যন্ত, সেখানে জীবিকা নির্বাহের সামগ্রী অল্প পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আশ্রয়ণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহ প্ররত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে, এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উক্ত শরীরে শৈথিল্যজনক, পরিশ্রম অপ্ররত্তি দায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিপ্রসার কাঁজ। বিশেষ প্রকৃতিও তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলপ্য পর্ন্ত, এবং বাঁতাশসমূল সমুদ্র মধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের নায়সংহর এবং প্রাচীন দেশের এই রূপ সামান্য উপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহ প্ররত্তির দমন বিধিতে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। নারী পাঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরে উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানির্ভর এবং জীবন ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহ্যমায় আবশ্যকতা নাই। স্বতরাং অপকৃত জীবিকা অতি সুলভ। এমন অবস্থায় পরিবার প্রতিপালন অসম্ভবভাবে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহ প্ররত্তি দমনে প্রজা পরিপূর্ণ হইল। প্রজারক্ষির নিবারণের কোন

উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাঁহার বেগ অপ্রতিরহত হইল। কাজে কাজেই সঁভারার প্রথম অজ্ঞানদের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপকীর্ষীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে জমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতু সঁভারার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থা কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলম্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপকীর্ষীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ। কিন্তু কদার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপকীর্ষীদের যে পরিমাণে দুরবস্থা রক্ষি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের ভারত্যা অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের ভারত্যা—তৎফলে অধিকারের ভারত্যা। শ্রমোপকীর্ষীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধোপকীর্ষীদিগের প্রজ্ঞা বড়িভিতে লাগিল। অধিক প্রজ্ঞা ফল অধিক অভ্যাস। এই প্রজ্ঞাই শূন্যপীড়ক স্থিতি শাস্ত্রের মূল।

সামান্য যে সকল কথা বলিলাম, তাঁহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপকীর্ষীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাঁহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, প্রেমের বেতনের অপত্তা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অপত্তা হইলেই পরিপ্রসার আধিক্য আশঙ্ক হয়; কেননা যাঁহা “কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ক্ষম। অবকাশের অভাবে বিদ্যা-

লৌচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মুখ্যতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধোপজীবিরদিগের ঐ-
বুদ্ধ এবং অত্যাচার রক্ষি। ইহার নামা-
স্তর দাম্ভ।

দারিদ্র্য, মুখ্যতা, দাম্ভ।

২। এই সকল ফল একবার উৎপন্ন হ-
ইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক
নিয়ম গুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উদ্যত
হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভা-
তার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধন-
লিপ্সা সভ্যতা রক্ষির নিত্য কারণ, তাহা
হইলে অত্যাচার হইবে না। সামাজিক উন্ন-
তির মূলীভূত, মনুষ্য জন্মের দুইটী স্বভি ;
এখন জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধন লিপ্সা।
এখনোজটী মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতী-
য়টী স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত।

কিন্তু, "History of Rationalism in Eu-
rope" নামক গ্রন্থে লেখি সাহেব বলেন
যে, দুইটী স্বভির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনু-
ষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে।
বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎ, ধনলিপ্সা
সম্পর্কসামান্য; এখন অপেক্ষাকৃত মূল্য-
পায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধা-
রণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে
বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না।
সর্বদা সূতনং পুথের আকাঙ্ক্ষা জন্মে।
পূর্বে বাহা নিপ্রদ্যোজনীয় বলিয়া
বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয়
বোধ হয়। তাহা পাইলে জ্বাংবার অন্য
সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকা-
ঙ্ক্ষার চেট্টা, চেট্টায় সফলতা জন্মে।
স্বতরার স্বখে এবং মঙ্গল রক্ষি হইতে

থাকে। অতএব মুখ সঞ্চয়দাতার আকা-
ঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা রক্ষির পক্ষে নিতান্ত
প্রয়োজনীয়। বাহুস্বখের আকাঙ্ক্ষা পরি-
তুষ্ট হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা,
সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহি-
ত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার
উৎপত্তি হয়। যখন লোকের মূল্যলাভসার
অভাব থাকে, তখন পরিপ্রবেশে প্রবৃত্তি
দুর্বল হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থা-
কেনা, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তদ্রিক্তন
যে দেশে খাদ্য মূল্যত, সে দেশের প্রজা-
ন রক্ষির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের
অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কা-
বিরগণ অশেষ অসুখসার স্বাস, তাহা
সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক;
কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের
হানাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টিভাব, ভার-
তবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে সহজেই
ঘটিত। এ দেশে, তাপের কারণ অধিক,
কাল ধরিয়া এককালীন পরিপ্রভম অসহ্য।
তৎকারণ পরিপ্রভমে অনিষ্টা অভাসগত
হয়। সেই অভাসের আরও কারণ
আছে। উৎকর্ষে শরীর মধ্যে অধিক
তাপের সমুদ্রাবের আবশ্যক হয় না,
বলিয়া ভুখার লোকে যে মৃদুপানিতে
তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্বে কথিত
হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে
হইলে পরিপ্রভম, সাহচ, বল এবং কাব্য
তৎপরতা অভাস্ত হয়। ইউরোপীয়
সভ্যতার একটি মূল, পূর্বকালীন তাদৃক
অভাস। অতএব একে প্রসার অনাব-
শ্যকতা, তাহাতে প্রসার অনিষ্টা, ইহার
পরিণাম আশঙ্ক্য এবং অসুখসাধ; অভা-
স

সগত আশঙ্ক্য এবং অসুখসাধেরই
নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয়
প্রজার একবার দুর্বল্য হইলে, সেই দশা-
তেই তাহারা সন্তুষ্টি রহিল। উদ্যমভাবে
আর উন্নতি হইল না। স্বপ্ননিঃস্বপ্নের স্বখে
আহাৰ্য্য পশু বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরুরাজ্যলোচনায় সন্তোষ
সম্পদে অনেক গুলি বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া
যায়। ঐহিক স্বখে নিপ্পৃহতা, হিন্দু ধর্ম
এবং বৌদ্ধধর্ম উদয়কর্তৃক অস্বীকার্য।
কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত কি দার্শ-
নিক, সকলেই প্রামাণ্যে ভারতবাসীদি-
গকে শিক্ষাইয়াছেন, যে ঐহিক স্বখ অনা-
দরগীয়। ইউরোপেও ধর্ম ব্রাহ্মণগণ-
কর্তৃক ঐহিক স্বখে আনন্দের তত্ত্ব প্রচারিত
হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা
লোপের পর সচস্রবৎসর মহোদয় ঐহিক
অবস্থা অনুভব ছিল, এই রূপ শিক্ষাই
তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে
প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের
পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষা
নিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে
মলীভূত হইল। সমস্ত সভ্যতারও ভঙ্গি
হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বহুমূল
হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা
মহোদয় দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত
হইয়াছে। যে ভূমি যে স্বদেশের উপযুক্ত,
সেইখানেই তাহা বহুমূল হয়। এদেশের
ধর্মযাজক কর্তৃক বৈরিত্বজনক শিক্ষা প্রচা-
রিত হইল, দেশের অবস্থা তাহার মূল;
আবার সেই ধর্মযাজকের প্রদত্ত শিক্ষায়
প্রাকৃতিক অবস্থা অনা নিরীক্স আরও
দূরীভূত হইল।

৩। প্রামোপজীবিরদিগের দুঃখবস্থা যে

চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তদ্রি-
বন্ধন সমাজের অন্য সমুদ্রাদয়ের দো-
কের দোরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক
ভাণ্ডে দুইটি ছুই এক পিঙ্গ অন্ন পড়িলে,
সকলি চক্ষু দৃষ্টি হয়, তেমনি সমাজের এক
অধঃপ্রণেয়ীর দুর্বল্যায় সকল প্রণেয়ীরই
দুর্বল্য জন্মে।

(ক) উপজীবিকাক্রমের, প্রাচীন আ-
র্য্যের চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া-
ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।
শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্ব-
ল্যার কথা-এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য
বানিজ্য ব্যবসায়ী। বানিজ্য, প্রামোপজী-
বীর প্রামোপ্য প্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর
নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক
সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়,
সে দেশে বানিজ্যের উন্নতি হয় না।
বানিজ্যের উন্নতি না হইলে, বানিজ্য
ব্যবসায়িদিগের সৌভাগ্যের কানি। লো-
কের অভাব রক্ষি, বানিজ্যের মূল। বর্ষা
আবাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী
গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য
দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে
আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে
দেশের লোক অভাববশত, নিজ প্রামো-
প্য সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বানি-
জ্যের জ্ঞানি অশা হইবে। কেহ
জিজ্ঞাস্য করিতে পারেন যে, তবে কি
ভারতবর্ষে বানিজ্য ছিল না? ছিল বৈকি।
ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের ভূলা বিস্তৃত
উর্ধ্ব ভূমিবিধি বহুধনের আকরস্বরূপ
দেশে যেক্ষণ বানিজ্য বাহ্যক প্রয়ো-
গ্য সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীনকালেই যে
সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই।

অদ্য করেক বৎসর তাহার স্বরূপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা ধর্ম শাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা, রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাতন কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হয় যে, তবো সে কথাটি এই, যে সাধারণ প্রজা সমাজে, এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই খেজুরাচারী হইলেন। খেজুরাচারী হইলেই, আয়স্বত্ব, কার্যে শিথিল, এবং দুষ্কিয়ারিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নর, অসুস্থ-সাহী, অবিরোধী, সেই খানেই রাজপুরুষদিগের প্রকৃত স্বভাবগত অবনতি হইবে।

অথবা প্রজা দুঃখী, অস্বস্তের কান্নাল, অস্বাস্থ্যপূর্ণ হইলে, এবং সম্ভবতঃ স্বাভাবিক, সেইখানেই তাহার নিস্তেজ, নর, অসুস্থ-সাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহা-ভারত কীর্তিত বলশালী, ধর্মী, ইন্দ্রিয়-কায়ী রাজ্যচাির হইতে মধ্যকার রাজ্যনাটিকা, চিত্ত বলহীন, ইন্দ্রিয়-পরবশ, ঔজ্জ্বল্য, অকর্মণ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের অর্থ দুর্গতি ঘটে না। তাহার রাজ্যের উন্নতি দেখিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উত্তরপক্ষের

উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মনুষ্যেই বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণ সকলের ক্ষতি এবং শক্তি হয়। নির্বিরোধেই তৎসমুদায়ের যোগ। শত্রুর দাসত্বে, ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, খ্রিস্টীয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কননদিগের বিবাদে প্রভৃতিদিগের ষাট্কারিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধ্যাপকের প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিনবর্ণের অসুস্থতাকে ব্রাহ্মণের গ্রন্থে অসুস্থ রক্তি হয়। অপরবর্ণের মানসিক শক্তি হানি হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপ-ধর্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্বল্য থাকিলেই ভয়াবহ হয়। উপ-ধর্ম ভীতিকা; এই সংসার বলশালী অথচ অনতিকারক দেবতা পূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম। অতএব অপরবর্ণের, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিক-তর উপধর্ম-পীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্মের রাজক, মৃতরাং তাহাদের প্রভুত্ব রক্তি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যাবস্থা জ্ঞান বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়িয়া পড়িল—নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের জ্ঞান কুর্য্য না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশায়ন প্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ, প্রভৃতি

হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, ভ্রাম্য, ব্রোমন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিতবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। “আমায় যে রূপে বলি, সেই রূপে শুইবে, সেই রূপে খাইবে, সেই রূপে বসিবে, সেই রূপে হাঁটিবে, সেই রূপে কথা কহিবে; সেই রূপে হাসিবে, সেই রূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।” জালের এইরূপ স্বত্র। কিন্তু পরকে জ্ঞাত করিতে গেলে আপনিও জ্ঞাত হইতে হয়, কেননা জ্ঞানির আলোচনায় জ্ঞানি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতেই যথার্থ বিশ্বাস ঘটয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা জড়িত হইলেন। পৌরী-রক্তিক প্রাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে, মাহুয়ের খেজুরবস্তিতার প্রয়োজনান্ধিতরুণ রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দু সমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি। তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রাধান্য, জ্ঞানিগণ জ্ঞান্যমান। ইচ্ছাতে রক্ত এবং রোপকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি ক্ষতি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাবনির ব্যাকরণ, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বাসবদত্ত, কামদায়ী প্রভৃতির অগ্রনয়ন গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষম-

তাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র নরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটা-প্রাকৃতিক কারণ ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িকতার কারণ। প্রথম ভূমির উর্বরতাপ্রদায়ক, দ্বিতীয় বায়ুদিগের তাপপ্রদায়ক। এই দুই কারণে অতি পূর্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক ভারতময় উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম প্রথম অসাম্প্রদায়িকদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) যুগ্মতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুঃখী ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

একবে ক্ষিত্তা না হইতে পারে যে, যদি এক মকল অলপ্তা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য টাঁকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ নীত দেশ হইবে, না জমিদার প্রজাপীড়নে কান্ড হইলে জুগি অসুস্থ হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য, যে যদি অন্য নিয়মের ফল প্রতিক্রিয়া না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সকল ফলোৎপত্তি করারান্তরে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। যে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ক্রমোদয় শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাম্রাজ্য-

দির আবিষ্কৃত্য না হইত, তবে একদিকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর

শীতোষ্ণতা বা জ্বরের উন্নয়নতা বা অন্য বাহ্যপ্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্তন হইত না।

ধূলা।

আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই—বড়ই বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অম বস্তুর অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্মনির্ভর, এ সকলকি অভাব নাই; চান্দনীর চক্রে জুতা কিনিলে বিনা মূল্যে অনায়াসে শিক্ষিতে পারা যায়। জুতা বঁধা কাগজ পড়িলেই হইল। ক্ষুদ্রের ছেলে বিস্তর উদ্দেশ্যেও অনেক; সকলের ঢাকির জুটে না; কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেননা কেহ পরিশোধের প্রত্যাশা করে না; মুদ্রা-বস্ত্র অতি মূল্যবত। লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযুক্তি—সুতরাং অম বস্তুর বাদ্যুশ অভাব—বড়ই বিষয়ে প্রবন্ধের ভাদ্যুশ অভাব নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিবেচনা হইয়াছিল যে, দর্শন বিজ্ঞানাদির কথা—যাহাই হউক, কাব্য শিখালেচনা, কিছু লেখা; কেননা দর্শনাদি নির্ণালে ভবিষ্যৎ লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাদিগের দেশের

সমালোচনা যে, তাহারই কিছু ছড়াছড়ি অধিক। মা সরস্বতীর অঙ্গপ্রস্থ! দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি এবং অপজ্ঞান, স্বতরাং গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম। কোন সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রস্তাব লিখিব। এই প্রতজ্ঞা করিয়া সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। ‘অহু’ সন্ধান কালে আমাদের সমুখে এক জন “ঝাড়ুদার” সম্মার্জনী হস্তে, রাজপথ পরিষ্কার করিতেছিল, বড় ধূলা উড়াইতেছিল। দেখিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, যাহার তত্ত্ব করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি—আমরা ধূলা সহজেই লিখিব। ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই।

ভাবিলাম যে, ধূলা সহজে অনেক স্তূতন কথা লিখিতে পারিব, যথা; প্রথমতঃ, ধূলায় জল ঢালিলে কাঁদা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ধূলা চক্রে গেলে কবু কর; তৃতীয়তঃ, ধূলা দাঁতে গেলে কিচু কিচু করে; চতুর্থতঃ, রেইলে বড় ধূলা লাগে ইত্যাদি

নানাবিধ স্তূতন এবং বিশ্বয় জনক তত্ত্বের আবিষ্কৃত্য করিত, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সকল স্থানে রাস্তা ঘাটে ভাল জল দেওয়া হয় না বলিয়া মিউনিসিপাল কর্তৃকারিদিগকে ক্রিষ্ণং স্বেদতা গালিগালাজ করিব, এমনও ইচ্ছা ছিল। মনে করিয়াছিলাম, কাবালঙ্কারেও ধূলার প্রয়োজন দেখা-ইতে পারিব, যথা, “ধূলায় ধূবর অঙ্গ,” “ধূলায় নিশাবে দেহ” ইত্যাদি। বস্তুতঃ আমরা কপ্পনা করিয়াছিলাম যে, কোন এককরে পাঠক মহাশয়ের “চক্ষু ধূলা” দিব। পারিত, আপনারাও কিছু “ধূলা বাকস পাঠক” উপার্জন করিব।

চূর্তীকার্কে আমাদিগের স্মরণ হইল যে, আচার্য টিগুন ধূলা সহজে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিয়া ধূলা সামান্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অতি গুরুতর এবং চূর্তী বিষয় বলিয়া যীকার করিতে হয়। আচার্য স্মরণং এক জন ইউরোপের মান্য বিজ্ঞানি মহা মহোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন অবধি পরিপ্রমুদ করিয়া ধূলাতত্ত্বের কিয়দংশ জানিতে পারিয়াছেন। স্বতরাং সামান্য বিষয় বলিয়া ধূলার উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাবণ হইল। আমাদিগের কপাল ক্রমে ধূলাও সামান্য বিষয় নহে।

বোধ হয়, এতক্ষণে পাঠকের কৌতুহল জন্মিয়া থাকিবে, যে, ধূলার ন্যায় সামান্য পদার্থ সহজে আচার্য কি এমন স্তূতন কথা লিখিয়াছেন। আমরা ভীষ্মকে কৌতুহল নিবারণ করিব। বিশেষ, অশ্চর্য্যের এই প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং চূর্তী, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি

কঠিন কর্ম। আমরা কেবল টিগুন সাহেব রুত সিদ্ধান্ত গুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, বিনি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাস্য হইবে, উহাকে আচার্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক একার সর্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত “বানুগিরি” করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃত নাই। যে বায়ু, অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়া মধ্যে কোন রক্ত নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই যে, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে একরূপ ধূলাপূর্ণ তাহা জানিবার জন্য আচার্য টিগুন রুত দেশের আবশ্যক নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁক বায়ু। আচার্য বহুধি উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটি করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোদ্দার ভিতর জ্বালানি পুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। এই রূপ ধূলা অদৃশ্য, কেননা তাহার কণা সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য। অবশ্যক বস্তুর দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রদীপের আলোক এই ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্ করিতেছে। যদি এত বস্ত্র পরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকের যে

ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়া মধ্যে রোজ না পড়িলে রোজে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রোজ মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে রেখা প্রেরণ করিলে এ ধূলা দেখা যায়। অত-এব আমরা যে বায়ু মুহুর্তে মুহুর্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ, কেননা বায়ুহিত ধূলিরাশি বিবারণ, সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পারিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অসংখ্য জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলি কণার কথা উপরে বর্ণ্য পেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট; এক্ষণে তাহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অত-এব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। জলের সঙ্গে সহস্র পান করি; এবং রাসায়নিক অনেককে আহাৰ করি। লওনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিঙল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্বিধে তিনি আরো অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা সম্ভব সাধ্যাতীত। যে জল ক্ষাটিক পাত্র রাখিলে রহৎ হীরক

খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও মলমল, কীটানুপূর্ণ। ইক্সেরা একথা স্বয়ং রাখিবেন।

৩। এই সর্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অন্যত পূর্বে, সর্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নিষ্ক্রীণ জৈব পদার্থ (Malaria) কর্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হয়। থাকে। এ মত ভারতবর্ষে এদাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস একপ্রকার উদ্ভিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিঙল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সক্রীণ পীড়াবীজ (Germ)। এ সকল পীড়া বীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরের মধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকৃণ, উদরে দুগি, ফতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু প্রভেদেই পাত্ন মধ্যে কীট সহস্রের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারণিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে, বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে “পীড়াবীজ” বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীর বাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতা “শক্তি” অতি ভয়ানক। যাহার শরীর মধ্যে এ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াপ্রাপ্ত হয়। ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে অর

উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়া বীজে কেবল সংক্রামক রোগ শুভায় না, জমে পড়ে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণা রূপী পীড়া বীজের জন্য। কত বৃষ্টি কখনই এমত আশ্রয় রাখা যাইতে পারে না, যে অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিত্যস্থ পক্ষে তাহা ডাক্তারের অন্ত মুখে কত মধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অন্ত পরিষ্কার রাখুন না

কেন, অদৃশ্য ধূলি পুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। ক্যাথোডালিক আশিড নামক দ্রব্যক বীজঘাতী; তাহা জল নিশািহায়া ক্ষত মুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ সকল মরিয়া যায়। ক্ষত মুখে পরিষ্কৃত ডূলা বাধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেননা ডূলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

THREE YEARS IN EUROPE.

আমরা যীকার করিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থখনি সমিতির সমালোচিত করিব। অবকাশভাবে এ পর্য্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারি নাই। পাঠকেরা ক্রটি মার্জনা করিবেন।

এদেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, মন ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিত করেন। ইংলণ্ড হইতে মহোদরকে পত্র লিখিতেন। তিন বৎসরে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ক্রিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।

এই রূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ শিক্ষার প্রসারে আমরা ইংরাজি গ্রন্থাদি হইতে

ইংলণ্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। তথাপি, অল্প যেমন স্পর্শের দ্বারা হস্তির আকার অল্পভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমাদের অনেক বিষয়ে স্নেহরূপ ভান। ইংরাজি গ্রন্থ বা পত্রাদি ইংরাজের গণিত। ইংরাজের চক্ষু যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরূপ চিত্রিত। আমাদের চক্ষু ইংলণ্ড কি রূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পায় না। আমরা ইংলণ্ডের চক্ষু ইংলণ্ড দেখিয়া, তদেব বিবরণ একখানি

* Three years in Europe, being Extracts from Letters sent from Europe. Calcutta, L. C. Bose & Co. 1872.

গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজের চিত্রিত ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র তাইনের চিত্রিত ইংলণ্ড জনক বিষয়ে স্তম্ভ। ইংরাজ ও ফরাসীতে বিশেষ সাহস; আনাদিগের চক্ষে দেখিতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, একজাতি, এক ধর্মীকান্ত; উভয়ের এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, একপ্রকার স্বভাব। যদি কৃষ্ণারি লিখিত চিত্রে ইংলণ্ড এই রূপ মৃতন বস্ত্র বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কৃত ভারতয়া ঘটবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালীর হস্ত লিখিত একখানি ইংলণ্ডের চিত্র দেখিবার আমাদের বড় বাসনা ছিল। “এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পূরাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একটু অল্পকুল চক্ষে দেখিয়াছেন। আনাদিগের দেশের লোকের চক্ষু, যে ইউরোপ অতি আশ্চর্য দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে দেশের জন কয়েক লোকসংখ্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাঁচ সহস্র মাইল দূরে আসিয়া প্রত্যাহ হৃদন্তন বিস্ময়কর কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের সংশয় যে আমাদের নিকটে বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব তাঁহার স্বভাব দ্বৈববিশিষ্ট নহে, তিনিই ইংলণ্ডে এক অল্পকুল চক্ষে দেখিবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি বিদেশে গেলো বিদেশের সকল বিষয় ভাল ভাবে না। ইউরোপে কিং আমাদিগের ভাল লাগে না, সেই ইচ্ছা

শুনবার জন্য আনাদিগের বিশেষ কোচু-হল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না।

সেই ইচ্ছা আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি মান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আনাদিগের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাষা নহে। একথা সত্য কি না, তাহা আমরা চিকিৎসি না; কিন্তু প্রত্যাহ শুনিতেন আমাদের উচ্চ সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। উঠিতেছে। “সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশ-ভক্তি, স্বজাতির প্রতি প্রজ্ঞার হাস হইতেছে। বাহাতে কিছু ভাল নাই—তাহা কে ভাল বাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালী দেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আনাদিগের দেশ বাৎসল্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সঙ্গীরা ইচ্ছা করে যে, সভ্যতাস জাতি অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শুন। কিন্তু কোথায় তাহা শুনিতে পাই না। বাহা শুনি, তাহা সত্যপ্রিয় স্ববিবেচকের কথা নহে। বাহা শুনি, তাহা শুদ্ধ স্বদেশ-পিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যাদ্রব্যপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা—তাহাতে বিশ্বাস হয় না—বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি এই লেখকের নাম স্বশিক্ষিত, সুবিবেচক, বহুদেশে মর্মী ব্যক্তির নিকট সে কর্ণানন্দ-দায়িনী কথা শুনিত পাইতাম—তবে

স্বখ হইত। তাহা যে শুনিলান না, সে লেখকের দোষ নহে—আমাদের কপালের দোষ। লেখক স্বদেশশত্রুদ্বৈবী বা ইংরাজ প্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশবৎসল, স্বদেশ বাৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রশংসা হইতে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতা গুলন লিখিয়া জাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ণন করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণগ্রাহী মাতার প্রতি সংপূজের যে রূপ ঘেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই ঘেহ, সে ঘেহ কোথায়? এই স্বদেশের প্রতি সে ঘেহ কোথায় আছে? সে ঘেহ কিসে হইবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জগদ্ধর্মি সমক্ষে আমরা যে “স্বর্বাদিপি গরিয়মী” বলিবার অধিকারী নই, আমরা মনে সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায়, আমরা এ অক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে “স্বর্বাদিপি গরিয়মী” মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মধ্যে হত ভাষ্য। যে জাতি জগদ্ধর্মিকে “স্বর্বাদিপি গরিয়মী” মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হত-ভাষ্য। আমরা সেই হত ভাষ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। লেখক যদি আনাদিগের মনের ভাব বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনিও আনাদিগের সঙ্গে রোদন করিবেন। যদি কেহ সত্যপ্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন।

আমরা গ্রন্থ সমালোচনা ভাগি করিয়া একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা ভুলিয়াছি, কিন্তু

কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নহে। আমরা যে ভাব ব্যক্ত করিলাম, এই গ্রন্থের আলোচনায় সেই ভাবই বাঙ্গালির মনে উদয় হইতে পারে। যদি সাধারণ বাঙ্গালির মনে ইহা হইতে সেই ভাব উদ্ভিত হয়, তবে এ গ্রন্থ সার্থক। তাহা হইলে ইহার মূল্য নাই।

এই গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা সমুদ্রে না। কেননা, ইহা সাধারণ স্রমিণে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থমে গ্রন্থিত হয় নাই। সুতরাং রচনা চাটুর্ঘ্য, বা বিষয় ঘটটি পারি পাঠা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভাষার সঙ্গে সরল কথাপকথনের যন্ত্রণা ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব সমালোচক যে সকল দোষ গুণের সন্ধান করেন, ইহাতে ক্রোধের সন্ধান কর্তব্য নহে। কিন্তু সন্ধান করিলেও দোষভাগ পাওয়া কঠিন হইবে, গুণ অনেক পাওয়া যাইবে। ভাষা সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। লেখক কেহ জদয় যে সরল এবং আড়ম্বরশূন্য, এই গ্রন্থ তাঁহার পরিচয়। লেখক সর্বদ্বৈ গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল, এবং সুপ্রাণ। তাঁহার রূচিও স্বন্দর, বুদ্ধি মার্জিত, এবং বিচারক্ষমতা অনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি গুণ দেখিয়া আমরা বড় আশীত হইয়াছি। চিত্রেরা খোদিত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা আরই তাহা অনুভূত করিতে পারেন না। “বালকে বা চাঙ্গায় “সং” দেখিয়া যে রূপ স্বখ বোধ করে, মুশিক্ষিত বাঙ্গালিরাও চিত্রাদি দেখিয়া সেই রূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালী নহেন। তিনি চিত্রাদির যে সকল সমা-

লোচনা পর মধ্যে নস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ রসাত্মকতা এবং সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্যটন করিলে, ক্ষুব্ধে অতুল্য চিত্রাদি দর্শনে, এবং তত্ত্ববিষয়ের বিচক্ষণ বিচারকদিগের সহবাসে যে বুদ্ধি যজ্জিতা, এবং রসগ্রাহনীর শক্তি ক্ষুরিত হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্রাহনীর শক্তি স্বভাবজাতও বটে। তিনি ইউরোপে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মাল্টা নগরে “Charity”র গঠিত মূর্তি দেখিয়া লিখিয়াছেন;—

“It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness and tender paths that dwells in the placid and unclouded face of the mother as she gazes with a loving and affectionate look at the sweet heaven of her infant's face. I stood there I know not how long, but this I know I could have stood there for hours together, and not have wished to go away.” p.11-12.

পুস্তকের মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে সকল গ্রন্থকারের লিপিশক্তির পরিচয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনটি উদ্ধৃত করিলাম—

“From Ionia we went to the small uninhabited island of Staffa containing several wonderful caves, of which Fingal's cave is the most magnificent. This cave with its splendid arch 70 feet high, supporting an intabulation of 30 feet additional,—its dark basaltic pillars, its arching roof

above, and the sea ever and anon rushing and roaring below, is a most wonderful sight indeed. The sea being calm we went in a boat to the inner end of the cave. The walls consist of countless gigantic columns sometimes square, often pentagonal or hexagonal, and of a dark purple color which adds to the solemnity of the aspect of the place. The roof itself consists of overhanging pillars; and every time that the wave comes in with a roaring sound, the roof, the carvings, and the thousand pillars return the sound increased tenfold, and the whole effect is grand.” p.48.

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্য গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, ভাঁহার চক্ষু সৌন্দর্য্য-সুসজ্জী—যে খানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তিনি কালিদানীর খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন; তিনি লিখিয়াছেন;—

“On both sides of us were continuous chains of mountains, and it being very bad weather, dark clouds hanging over our heads served as a gloomy canopy extending from the ridges on our right to those on our left. As far as the eye could reach, before or behind, there was nothing but this gloomy vista,—the dark clouds above, dark waters below, and high mountains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can

assure you. I would not have changed that gloomy scene of highland grandeur for the neatest and prettiest spot in the earth, nor ever for the sunniest sky, the dark rolling clouds which added to the gloom and sublimity of the scene.” p.50.

লেখক মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া জাতিকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালি হইয়া বিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখন তাহার প্রশংসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। সুতরাং ভাঁহার কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে লেখকের নিকট আমাদের পুস্তকের বিশেষ অহুরোধ এই যে, এই পুস্তক খানি বাঙ্গালায় অজ্ঞান করিয়া প্রচার করুন। বাঁহার ইংরাজি জ্ঞানেন না, ভাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বাবুশ মনোরঞ্জন এবং উপকারী, ইংরাজি অভিজ্ঞদিগের নিকট তাদৃশ নহে। বাঁহার ইং-

রাজি জ্ঞানেন, ভাঁহার ইউরোপের বিষয় কিছু জ্ঞানেন। বাঁহার ইংরাজি জ্ঞানেন না, ভাঁহার ইউরোপের বিষয় কিছুই জ্ঞানেন না। বিলম্বিত; কি—মরুভূমি কি জলবায়, ভূত প্রেত কি রাকসের বাস, তাহার কিছুই জ্ঞানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অহুরোধ করি যে, বঙ্গসুন্দরীদিগের পাঠার্থে ইহা বাঙ্গালায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক, তাহা কটকটক হইবে না; কটকটক হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালিদিগের চেয়ে এমন শক্তি হইয়াছে, যে এক্ষণে গ্রন্থ পাড়িয়া মগ্নগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, ভাঁহাদের শয়নস্থলের পত্রাতে কি আছে। তাহা জ্ঞাত করায়। সুতরাং অনেকেরই বাধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালিতে মোট বয়, বাঙ্গালিতে ভুলি চলে; কেননা সাঁহেব কি নোট বহিষে, না লালস ধরবে?

সাঁখ্যাদর্শন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রকৃতি।

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া, এক প্রকার ভাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য? অন্যদিকাল

এই রূপ আছে, না কেহ তাহার স্বজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা এক জন আছেন। সামান্য ঘটপটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সমুদায়ের লোক আছেন;

ভাঁহার বলনে যে, এই জগৎ যে সৃষ্টি বা ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বল; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। ভাঁহার বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুঃস্থ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক তত্ত্ব, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আর একটি পৃথক তত্ত্ব। ঈশ্বর-বাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টি কিয়ামানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ভাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাবিরুদ্ধ সৃষ্টির কথা আশ্চর্যবলিতে পারি না।”

একণকর কোনও জীবিয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন মত অর্থার্থ, কোন মত বার্থার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। ইহার বাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সর্ববিষ সর্বকর্তা” পুরুষ মানেন, এরূপ পুরুষ মানিয়াও ভাঁহারে সৃষ্টিকর্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক কিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(কর কারণ ষী); (খর কারণ গী); (গর কারণ ঘূ); এই রূপ কারণ পরস্পরা অসম্বন্ধান করিতেই অবশ্য এক

স্থানে অস্ত্র পাওয়া যাইবে; কেননা কারণ শ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি উৎপন্ন করিতেছি, ইহা অমূলক রক্ষণ জন্মিয়াছে; সেই রক্ষণ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য রক্ষণের ফলে জন্মিয়াছিল; সে রক্ষণও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল, এইরূপে অনন্তাহ-সম্বন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিব বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে বাহ্য আদিব বীজ, যেখানে কারণসম্বন্ধান বহু হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিব কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১, ৭৪)

জগৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে মূল কারণ বাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়ববাহী প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

- ১। পুরুষ
- ২। প্রকৃতি
- ৩। মহৎ
- ৪। অহঙ্কার
- ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ পঞ্চতম্মাজ
- ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
- ১৮, ১৯, ২০ একাদশপ্রিয়।
- ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ স্থূলভূত
- ফিতি, জল, তেজ, মরুৎ, এক আকাশস্থূলভূত। পাঁচটি কণ্ঠপ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং অন্তরীন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ পাঁচটি তম্মাজ। “আদি” জ্ঞান, “অহঙ্কার।” মহৎ মন।

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতম্মাজের জ্ঞান।

আমরা শুনিতে পাই, জ্ঞান শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এ জ্ঞান দৃশ্য অর্থব্য রূপ আছে। ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চয়, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। হুতে “আমিও” আছি। অতএব তম্মাজ হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অস্বত্ব হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জ্ঞান। তবে মনও আছে। (Cogito ergo Sum) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব দ্বিতীকৃত হইল।

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতম্মাজ এবং একাদশপ্রিয়, পঞ্চতম্মাজ হইতে স্থূলভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সূত্রত বা অর্থ-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে বাহ্য আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন সাংশ্য নাই। কিন্তু অসম্বন্ধবিশী পুরাণ সকলে যে সৃষ্টি কিয়াম বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের নীচে ত্রুটিগতের কথার সংযোগ নাই। যথা বিখ্যাপুরাণে;—

আকাশবারুহেজামি সলিলং পৃথিবীতথা।
শব্দানিভিগুণৈশ্চৈক্যং মনুজানুত্তরোত্তরৈঃ।
কালকর্মণ্যোপাপত্তৌ জগদবিরূপপিতং।
প্রাণপ্রাণমহত স্থিলেন্দ্রো দৈবতৌদিভ্যং।
জাতঃ সমজ্জজ্জানি বিদ্যাদিহিনি পঞ্চাশং।
পূনশ্চ ভাগবত পুরাণে;—
এতান্যমহাশয়ান মহানিনি সমুদর।
কালকর্মণ্যোপাপত্তৌ জগদবিরূপপিতং।
ততঃসনানুদৈবতৌ যুদ্ধকোপাতম তেজম।
উদিতং পুরুষো বস্মাদুদিতৌদিতৌবিরাজি।

সম্যেতান্য যোমসংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়ঃ।
এক সম্যগতিকশ্চ সম্পূর্ণৈক্যং অশেষতঃ।
থলুবাধিতিক্রমজ প্রভাবানুগুণেতৎ।
মহাদান্দ্রো বিশেষতঃ অগম্যপাদয়তি তে।
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধজ্জগদুদৈবতমসং।
ভূতৈভ্যোঃ মহাবুদ্ধে বৃহদবদনকেশরঃ।
প্রাকৃতং ত্রুণরূপমিহৈক্যং মনুজমমম।
তত্রাশ্রয়রূপোমৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিমুক্তকর্মরূপেণ ধরামের ব্যবস্থিতঃ।
মেরুভূতামমুভূতাম জরাশ্চ মহীধরঃ।
গর্ভোদকং সনুদুশ্চ ত্যাসান সুমহায়ানঃ।
মানুদীপমসুদুশ্চ মেরুভূতিলোকসংগুহঃ।
তম্মিরগুণ্ডবদ্রপ মেরুবাসুরমানুঃ।
বারিবর্জানিলাকণ্ঠশতভূতাদিনববহিঃ।
দৃশ্য দশগুদৈবতং ভূতাদিমহতঃ তথা।
অব্যাক্ষেপ্যগতোত্রকং তৈবদৈবতমিহৈক্যমহান।
এতিরাহরনৈবতং মনুজিতপুত্রৈবতমম।
নাবিকেলকমস্যাত্মজং বাহ্যমলৈবির।
জ্ঞান রজোগুণভবং স্বং বিধেখেরা হরিতঃ।
ত্রুণভূতাসংজগতোবিসৃষ্টৌ সম্পূর্ণভূতঃ।
পূনশ্চ লিঙ্গপুরাণে;—
মহাদানি বিশেষতঃ অগম্যপাদয়তি চ।
জলবুদ্ধবদম্মাদবর্গঃ পিতামহঃ।
মএবভগবানুদৌ বিমুক্তবিশ্বতঃ প্রভুঃ।
তম্মিরগুণ্ডবদ্রপ মেরুবাসুরমানুঃ জগৎ।
অগম্যদশাশ্রয়নৈব নভস্বাযাতোত্তরঃ।
“আকাশশব্দভূতবৃহদহঙ্কারেণ শব্দজঃ।
মহতশ্চ কণ্ঠৈবপ্রদেয়নৈবতং যমঃ।
পূনশ্চ ভাগবত পুরাণে;—
বৈদেহে দূরিতকর্তে মেরুভূতানিমিহৈব চ।
জাতকোভ্যন্তরভূতৌ মহানানিভবত্রাণঃ।
রজঃ প্রভাবমহত স্থিলেন্দ্রো দৈবতৌদিভ্যং।
জাতঃ সমজ্জজ্জানি বিদ্যাদিহিনি পঞ্চাশং।
পূনশ্চ ভাগবতে;—
এতান্যমহাশয়ান মহানিনি সমুদর।
কালকর্মণ্যোপাপত্তৌ জগদবিরূপপিতং।
ততঃসনানুদৈবতৌ যুদ্ধকোপাতম তেজম।
উদিতং পুরুষো বস্মাদুদিতৌদিতৌবিরাজি।

এ সকলের আলোচনয় দুইটি কথা অমূল্য হয়;—

১ম। বেদে কোথাও সাংখ্য দর্শনা-
চর্চারী হুঁত্ব কবিত্ব হয় নাই। ঋগ্বেদে,
অথর্ববেদে, শত পথত্রাঙ্কণে হুঁত্ব কথন
আছে, কিন্তু তাহাতে মহাদিগের কোন
উল্লেখ নাই। মহত্তেও হুঁত্ব কথন
আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐ
রূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব
বেদ মত, রামায়ণের পরে ও অন্তত
বিশ্ব ভাগবত এবং লিঙ্গ পুরাণের পক্ষে

সাংখ্য দর্শনের হুঁত্ব। মহাভারতেও
সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভার-
তের কোন অংশে হুঁত্ব, কোন অংশে
পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার।
কুমার সম্বদের দ্বিতীয় অর্থে যে ব্রহ্ম-
সত্ত্ব আছে তাহা সাংখ্যানুকারী।

২য়। সাংখ্য প্রবচনে বিষ্ণু, হরি
রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। স্পষ্টই দেখা
যাইতেছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাং-
খ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া
লইয়াছেন।

বারু।

জন্মেজয় কহিলেন, 'হে মহর্ষি! আ-
পনি কহিলেন যে, কলিযুগে বারু নামে
এক প্রকার মল্লযোরা পৃথিবীতে অবি-
দ্য হইবে। তাঁহারই এক প্রকার মল্লযা
হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া
কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড়
কৌতুহল জন্মিতেছে। আপনি অল্পগ্রহ
করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'হে নরবর,
আমি সেই বিচিত্রযুগি, আহারনিব্রা-
কুলী বারুগণকে আখ্যাত করিব, আ-
পনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চমৎ-
কামল, উদারচরিত্র, বহুবাহু, সন্দেহ-
প্রিয় বারুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করি-
তেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন,
যাঁহার চিত্তবসনারত, বেজহস্ত, রঞ্জিত

কুণ্ডল, এবং মহাপাণ্ডুক, তাঁহারাই বারু।
যাঁহার বাক্যে অজয়, পরভাষা, পার-
দর্শী, মাভূত্যা-বিদ্যেণী, তাঁহারাই
বারু। মহারাজ! এমন অনেক মহাব্যক্তি
সম্পন্ন বারু জন্মিবেন যে, তাঁহার মাত্র-
ভাষায় বাক্যলাপে অসমর্থ হইবেন।
যাঁহাদিগের দশেম্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব
অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনে-
ম্রিয় পরজাতিনিবীচনে পবিত্র, তাঁহারাই
বারু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্ত্রি বিহীন
শুদ্ধকাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে
সক্ষম;—হস্ত দুর্বল হইলেও ক্লেখনী
ধারণ এবং বেতন গ্রহণে সুপটু;—চর্য
কোমল হইলেও সাগর পার নির্মিত
জয় বিশেষের প্রহার সহিষ্ণু; যাঁহা-
দিগের ইন্দ্রিয়মাজেরই এক্রূপ প্রশংসা

করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বারু।
যাঁহার বিনা উদ্দেশ্যে সপথ্য কবি-
বেন, সপথ্যের জন্য উপার্জন করিবেন,
উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন,
বিদ্যাধ্যয়নের জন্য শ্রম চুরি করিবেন,
তাঁহারাই বারু।

মহারাজ! বারু শব্দ নানার্থ হইবে।
যাঁহার কলিযুগে ভারতবর্ষের রাজ্যা-
ভিভক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত
হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট “বারু” অর্থে
কেরানী বা বাজার সরকার বুঝাইবে।
নির্ধনদিগের নিকটে “বারু” শব্দ অপে-
ক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভুতোর নিকট
“বারু” অর্থে ঐশ্বর্য বুঝাইবে। এ সকল
হইতে পৃথক, কেবল বারু জন্মনির্ভী-
তিল্যধী কতক গুলি মল্লযা জন্মিবেন।

আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন
করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন,
তাঁহার উই মহাভারত শ্রবণ নিম্বল
হইবে। তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া
বারুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাদিপি! বারুগণ দ্বিতীয় অগ-
স্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ
করিবেন, ক্ষাটিক পাঁজ ইহাঁদিগের
গণ্ডব। অগ্নি ইহাঁদিগের আজবহ
হইবেন—“তানাকু” এবং “চুতট” নামক
দুইটি অভিনব বাণবকে আশ্রয় করিয়া
রাত্রি দিন ইহাঁদিগের মুখে লাগিয়া
থাকিবেন। ইহাঁদিগের যেমন মুখে অগ্নি,
তেমনি ক্ষত্রেও অগ্নি জলিবেন, এবং
রাত্রি তৃতীয় গ্রহের পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের
রশ্মত যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইহাঁদি-
গের আলোচিত সম্মীতে এবং কৈর্যেও
অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি “সমন-

আগুন” এবং “সনাগুন” রূপে পরিগত
হইবেন। বারুবিলাসিনীদিগের মতে ইহাঁ-
দিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করি-
বেন। বায়ুকে ইহাঁরা ভক্ষণ করিবেন—
ভক্ষ্য করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্যের নাম
রাখিবেন, “বারু সেবন।” চন্দ্র ইহাঁদের
গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজ-
মান থাকিবেন—কদাপি অবগুষ্ঠনারত।
কেহ প্রথম রাজে কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র, শেষ
রাজে শুক্ল-পক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ
তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য ইহাঁদিগকে
দেখিতে, পাইবেন না। যম ইহাঁদিগকে
ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমার-
দিগকে ইহাঁরা পূজা করিবেন। অশ্বিনী-
কুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে “আ-
স্তাবল।”

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে
বঞ্চিত, সংগীতে দম্ব কোকিলাহারী,
যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবভাষ্য প্রহৃত,
যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা
করিবেন, তিনিই বারু। যিনি কাব্যের
কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং
সমালোচনায় প্রসক্ত, যিনি ব্যর্থোব্যর্থের
চাংকার মাত্রকেই সম্মীত বিবেচনা করি-
বেন, যিনি আপনাকে সমরজ্ঞ এবং
অজান্ত বাম্যা জানিবেন, তিনিই বারু।
যিনি রূপে কার্ত্তিককয়ল, কনিষ্ঠ, গুণে
নিগুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত, এবং
বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বারু। যিনি উৎ-
সর্বাথ দুর্ভাগ্যপূর্ণ করিবেন, গৃহিণীর স্ত্র-
রোধে অকর্ম্মপুত্রা করিবেন, উপগৃহিণীর
অরোধে সরস্বতী পুত্রা করিবেন, এবং
পাঁটার লোভে গল্পাপুত্রা করিবেন,
তিনিই বারু। যাঁহার গমন বিচিন্নরথ,

শয়ন সাধারণ গৃহে, পানি প্রাক্করস, এবং আহার কদলী দক্ষ। তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের ভূলা মানকপ্রিয়, প্রাক্কর ভূলা প্রজ্ঞা বিশ্বক্ষ, এবং বিষ্ণুর ভূলা লীলা-পটু, তিনিই বাবু। যে কুসুম কৃত্রিম। বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁদের লক্ষী এবং সন্তস্তুতা উভয়েই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁরা ও অনন্ত শয্যাসাগরী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরানী, মাষ্টর, চৌধান মাষ্টর, ব্রাহ্ম, যুৎসন্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, এবং নিরুপদ্র। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরা সকল অবতारेই অমিতবল পরাক্রম অন্তরগণকে বধ করিবেন। কেরানী অবতারে বধ অস্ত্র দগুৱী; মাষ্টর অবতারে বধ ছাত্র; চৌধান মাষ্টর অবতারে বধ টেকটাইন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ চালবুলা প্রত্যাশী পুরোহিত; যুৎসন্দী অবতারে বধ বন্ধু ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ রোগী; উকীল অবতারে বধ মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ প্রজা; এবং নিরুপদ্রাবতারে বধ পুষ্করিণীর মৎস্য। মহারাজ। পুনশ্চ প্রবণ করুন। বাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কখনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। বাঁহার বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ, পৃষ্ঠে শত গুণ, এবং কার্যকালে

অদৃশ্য, তিনিই বাবু। বাঁহার বুদ্ধি বালো পুস্তক মধ্যে, যৌবনে খোতলমধ্যে, এবং বাল্কে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। বাঁহার ইচ্ছাশক্তি ইংরাজ, গুর ব্রাহ্মার্থ-বেতা, বেদ দেশী সমাদ পত্র, এবং তীর্থ “নেশানাল থিয়েটার,” তিনিই বাবু। যিনি শিশুর নিকট খ্রীষ্টীয়ান, কেশব-চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে গুপ্ত জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যা গৃহে গালি খান, এবং মুনব সাহেবের গৃহে গলা দ্বারা খান, তিনিই বাবু। বাঁহার মান কালে তৈলে ঘৃণা, আহার কালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাছুতাব্যকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। বাঁহার যন্ত্র কেবল পরিষ্কৃত, তৎপরতা কেবল উমেদারিত্তে, তত্ত্ব কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদগ্রহের উপর, নিঃশব্দে রু তিনিই বাবু।

হে মরনাথ! আমি বাঁহাদিগের কথা বলিলাম, উঁহাদিগের মনেব বিশ্বাস জগায়ে, যে আমরা তাহুল চর্চণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দৈর্ঘ্যভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাক সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনী পুত্রব! বাবুদিগের জয় হউক! আপন অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

এক দিন।

১ এক দিন—প্রায়শ্চেষ্ট! আছে কি মরণ?

নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত, পেরোছিনু এক দিন যে সুখ রতনে, এ জনমে আর নাহি পাইব চেতন।

২ কার্যস্থান হতে অতি দ্রুত কলেবরে, প্রায় অবসর প্রাপ্তে, দীর্ঘ দিবা অবসানে, আশিয়াছি, অর্থে ভাবি, বিসর অন্তরে, অস্ত্র নার দিন মলি অমল অন্তরে।

৩ হায়! ওই অস্ত্রাটিল-বিলম্বী ভাস্কর, কত বাহাদুরি মুখ, মুক্তিমান চির দুখ, সেগে মদা মসিজীবী হত ভাণা নহ, দায়ী দিন খেতে যবে ফিরে আসে ঘর।

৪ ছেঁয়নি রিকল অস্ত্রে, এক দিন হায়! কর্ম ফের পরিহরি, মসি মুক্ত শেষ করি, আশিয়াছি,—সে যে দুখ কথা নাহি যায়, বর্ধে কর্মচারী বিনে কে জানে ধরায়?

৫ নাহি প্রবেশিতে পণ্য কুপীরে ঘর, “জাজি এত বেরি কেন, মলিন বদন হেন, বল নাথ?” শুনিলাম, দেখিলাম আর প্রেমের প্রতিমা থানি সন্মুখে আমার।

৬ সুশীতল সুবাগিত বাসন্ত অনিল, সুকোমল পরশনে, পরিমল কিতরনে, মরস মধুরে যথা জাগার কোকিল, সুদীপ্তে ঘোষিত করি কানন অখিল।

৭ তথা বীণা-বিনিমিত্ত সুমধুর যর, তথা অভ্যাসমারে, জনমের প্রেমভিত্তরে, মধু জনমের যর বাজিল সজ্জর, নাড়িতে লাগিল রক্ত ধমনী ভিতর।

৮ ঘুরিল নরনে ধরা, ঘুরিল গগন, সুই বাছ প্রসারিত, ঘুড়াতে তাপিত হিতা, জ্বরে জ্বর-নিধি করিনু আপন, কাহ্নাল পাইল যেন কুবেরের ধন।

৯ জগত-মোক্ষিণী হাসি ভাসিল বদনে, অধর অমৃতাধার, বর্ষিল পীযুষাসার, মৃত-সঞ্চিত-সুধা পশিল মরমে, কহিল শীতল ধারা দার দহ বনে।

১০ বহু কুল-নারী কুল মল্লজ কমলে, যদি এই সুধাসার, না থাকিত অনিবার, নিবাটে রোগ শোক দারিদ্র্য অনলে, বাহালির সুখ কোথা থাকিত ভুলে?

১১ হুটে হুজ অস্ত্রপূরে যে কম কামিনী, তার কি তুলনা হয়, উদ্যান কুমুদচর, প্রত্যেক বাতাস যারে করে কলঙ্কিনী, দুখী বঙ্গবাসিনের রমণীই মনি।

১২ কুমল ব্যক্তি কেহ কুলে আগমন, শ্রুতি সমরের শেষ, শ্রম শেষে নিদ্রাবেশ, নহে তত প্রাতিভুর, লিনাশে যেমন, দুখী বঙ্গবাসিনের পিতা মণ্ডলিন।

১৩ সেই দিন—সেই সুখ—আবার আবার, পড়িতেছে মনে প্রিয়ে, তোমারে জন্মে নিতে, বলেছিনু পেড়ে ছেঁ—“প্রেমসি আমার—আমার মৃত্যু সুখী কেহ নাহি আর।”

১৪ পশিল কি সেই কথা বিধাতার কানে, সেই সুখ-বীণার, নিদারুণ বিধাতার, না পারিল সহিতে কি পামণ পরানে? তাহে কি যে এত দুখ সহি গ্রাসে গ্রাসে?

১৫

সেই দিন—এই দিন—কি বলিব আর ?
নহে বহু দিন গত, পটে চিত্রাঙ্গিত মত,
দেখিতেছি সেই রূপ—এ রূপ গুণোন্নত;
সেই প্রেমমূর্তি, এই হৃৎস্রব আকার।

শ্রীহর্ষ।

ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ নামা দুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইহাদিগের উভয়ে এক ব্যক্তির করিয়াছেন, কিন্তু এই অল্পমানে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা, পাঠকগণ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দুইজন শ্রীহর্ষের পৃথক জীবন চরিত পাঠে, উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিব্রহ্ম নামা ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটা গৃহ পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিষ আশঙ্কায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে তাহার কোন উপায় নির্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তত্ত্ব বনে বৃথগণ সকলেই গৃহের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃহস্থ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক ভূসুর কহিলেন যে, তিনি সম্ভ্রতি কানা কুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তৎস্বয়ং এতাদৃশ রাজত্ববনে গৃহপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি দ্বারা

সেই দিন, গিরতম! থাকিবে আরণ,
জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত,
পেরোছিব এক দিন যে সুখ রতন,
ধরাতলে আর নাহি পাইব ডোমন।
শ্রীঃ

মন্ত্র বলে গৃহস্থ করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বস্মাধিপ আদিব্রহ্ম এই কথা শুনিয়া কিয়দিবস মধ্যেই কানা কুব্জ হইতে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদ পারগ পঞ্চবিপ্রকে সত্ৰীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ খাঁকাদায় নির্মিত একটা ভবনে বাস করিতে অহুসিত করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট নারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সংকবি।

শ্রীহর্ষ দেব শ্রীহরী উরুলে এবং মামল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য এট্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। নৈমধ চরিতের প্রত্যেক সর্বের শেষে তিনি গল্পোক্ত সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বলা প্রথম সর্বের শেষ শ্লোকঃ—

শ্রীহর্ষ কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কারদীপসুতঃ
শ্রীহরীঃ সুবৈষ্ণব জিহেঙ্গিয় চরণামাল দেবীচরণঃ
তজ্জিহাঙ্গি মন্ত্র চিত্রন ফলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যমহা-
কাব্যে চাক্রনি নৈমধীয় চরিত সর্বগে হর
মালিঙ্গতঃ।

অর্থৎ “কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কার দীপ সুরূপ শ্রীহরী এবং মামল দেবী যে জিহেঙ্গিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিত্রামণি মন্ত্র চিত্রাঙ্কল যন্ত্রণ অথচ শৃঙ্গার রস প্রাদান্য জন্য অতি মনোহর নৈমধীয় কাব্যের প্রথম সর্ব গত হইল”

পুনরায় গ্রন্থের শেষে কানা কুব্জাধিপতির সমীপ হইতে শ্রীহর্ষ, তাদুল-দ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লিখিয়াছেন বলা “তাদুলদ্বয় মাসনঞ্চ লভতে যঃ কানা কুব্জেশ্বরশ্চ। পূর্বে ও উত্তর ভাগ “নৈমধ” এবং “বর্ত্তন খণ্ড খান্দ” মধ্যে আমরা এই মাত্র কবি রজাত প্রাপ্ত হইলাম।

“বিশ্বগুণাদর্শ” গ্রন্থে কবী বেদাস্তাচার্য্য এবং বহুল মিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোক্তাদেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত একা হইতেছে না।

স্ববিখ্যাত জৈন লেখক রাজ শেখর ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে “প্রবন্ধ কোষ” রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহরী পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তৎপাশ্চাত্য নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্ত চন্দ্রের আদায় নৈমধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছেন। রাজ শেখর জয়ন্ত চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপি বন্ধ করিয়াছেন।

শ্রীজয়ন্ত মহুৎপাদ কবীক অনুবাহিত নৈমধ চরিত। দেখা।

জয়ন্ত চন্দ্র, পঞ্জল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পুত্রনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহার বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাভিষারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কছেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র কাটু কুট কত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কানা কুব্জ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজ শেখরের বিবরণ প্রামাণ্যিক বোধ হইতেছে, কেন না, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের একা আছে।

শ্রীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। তাঁহার নৈমধ চরিত দ্বাবিংশ সর্বের সম্পূর্ণ, রহৎ গ্রন্থ। তাহার স্থানে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সর্বের পরস্বতী কবুর্ক পঞ্চল বর্ণনে ব্যাক্যলঙ্কারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্ব “নলস্যা সন্ধ্যা বর্ণনং” “ভনো বর্ণনং” “চন্দ্র বর্ণনং” প্রভৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ এক জন আত্মীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার রচনা অত্যন্ত অত্যাশ্রিত দোষে দূষিত। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক হলের প্রায় “উদিত নৈমধ কাব্যে ক্লামাঃ ক্লেচ ভারবিঃ” বলা “নৈমধ” পদলিখিতাং” বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক শম্ভুভট্ট বিলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার “নৈমধ” কাব্য প্রকাশ” রচনার কিছু কাল পূর্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈমধের শ্লোক হইয়া

সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেন।
এ রূপ কিংবদন্তী আছে যে শ্রীহর্ষ তাঁহার
মাতুলদেবের অবস্থিতি করিয়া কাব্য
লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করি-
য়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন করিতেন,
তৎক্ষণে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে,
এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল
মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ; এজন্য
তাঁহার মার্কিত বুদ্ধি জনিত সাদৃশ্য চিত্ত
বাহাতে আর না থাকে, ওজ্জ্বল তাঁহার
কে প্রত্যহ মাস কলাই “ভোজন করিতে
দিতেন, ইহাতে শ্রীহর্ষের পুষ্টি ক্রমে
স্থূল হইয়া উঠিল এবং কাব্য গুলির
রচনা সহশোভন আশংক্য হইল না।
শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির অপরতা ভ্রাস হও-
য়া অক্ষিপ করিয়া কহিলেন, “অশেষ
শেষমুখী মোঘ-মাস সন্ধ্যা কিংবা
অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাস কলাই
মাজ খাইতেছি। মাস কলাই খাইয়া
যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেক
হাস্য করিতে পারেন এবং তাহা হইলে
নিচাম মাস কলাই ভোজী রাত্ৰ দেশীয়
অধ্যাপকগণ যৌর মুখ হইতেন।

শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে
এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা
যায় না। তাঁহার “খণ্ডন খণ্ড খান্দা”
গোভর্মীয় নায় শাস্ত্রের খণ্ডন গ্রন্থ।
এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি
অপ্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন।
শ্রীহর্ষ “নৈনদ্য” এবং “খণ্ডন খণ্ড খান্দা”
ব্যতীত “শ্রেষ্ঠা বিবরণ,” “গোড়বিসি-
প্তাংশস্তি,” “অর্ঘ্য বর্নন,” “ছন্দ
প্রসঙ্গ,” “বিজ্ঞাংশস্তি,” “শিব শক্তি
সিদ্ধি বা শিবভক্তি সিদ্ধি” এবং “নবশা-
সুদ চরিত” রচনা করিয়াছেন। এ গুলি
অত্যন্ত বিরল গ্রন্থ।

শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশীয় চট্টোপাধ্যায় বং-
শের আদি পুরুষ; কিন্তু চুখের বিষয় যে
কুলচাচাধ্যক্ষ তাঁহার পরিচয় কিছু মাত্র
জ্ঞাত নহেন।

কাম্বীরাদিগণিত শ্রীহর্ষ দেব “রত্নাবলী
নাটিকা” প্রণেতা। কেহ বলেন, ধাবক,
শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার
নামে “রত্নাবলী” প্রতিষ্ঠিত করেন,
যথা;—

শ্রীহর্ষদেবদাকানীমিব ধনম্। কাব্য
প্রকাশ শ্রীহর্ষে রাধা। ধাবকেন রত্ন
বলীং মাতাচাণ্ডায়া কুজা বহুধনং
লভম্। ইতি প্রকাশাদর্শনং মনোমদা।
ধাবক কবিঃ। সহ শ্রীহর্ষান্না রত্নাবলীং
কুজা বহুধনং লভমান। শ্রীহর্ষাখ্যায়
রাজো নাম্না রত্নাবলী নাটিকা কুজা
নাগেশ ভট্টঃ। ধাবকাখ্য কবিরঞ্জনং
লভমান ইতি প্রসিদ্ধম্। প্রকাশ প্রভুগায়
বৈদ্যনাথঃ তথা “ধাবকনাম্য কবিঃ যতুতাং
রত্নাবলীং নাম নাটিকাং, বিজ্ঞীয় শ্রীহর্ষ
নাম্নো নৃপাঃ বহুধনং প্রাপেতি পুরান
বহুতম্” ইতি প্রকাশ তিলকে জয়রাম।

এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা
“রত্নাবলী” ধাবক রচিত বলিতে অপারক
হইতেছি; কেননা ধাবক মহা কবি
কালিদাসের পূর্বে বর্তমান ছিলেন;
যথা কালিদাসের “মালবিকাগ্নি মিত্রের”
প্রস্তাবনায়—

—প্রতিভাশালং ধাবক সৌমিল কবিশূ-
রানাম্। প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্নমান কবে
কালিদাস্য কৃতে কিং কৃতে বহুমান।
ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার রচিত
কোন গ্রন্থ এখনও বর্তমান নাই। শ্রীহর্ষ

তাসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ
আছে। সাহিত্যসাধারে লিখিত আছে,
ধাবক মস্ত্র বলে কবিত্ব শক্তি লাভ করি-
য়াও অতি দরিদ্র ছিলেন; তৎপরে
এক শত সর্গে “নৈনদ্য” রচনা করিয়া
রাজা শ্রীহর্ষের সন্থীপ হইতে পুরস্কার
রূপে নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। ইহা
কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে
পারি না।

আমাদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী
“রাজ রত্নাবলী” মতে শ্রীহর্ষ নানা
দেশ ভ্রাজ্ঞ ও সংকবি যথা চ তরঙ্গ—
মোগেশ দেশ ভ্রাজ্ঞঃ সর্গভাষ্যমুদয়কবিঃ।
কংস বিদ্যাদির্নিধি প্রাপখ্যাতিং দেশান্তরে
বুপি।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম “রাজরত্নাবলী”
মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী
ও নৃগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তদ-
বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়া। বাণ ভট্টকে
কেঁহ কেঁহ “রত্নাবলী” রচক বলেন।
তাঁহার এই মাত্র কারণ তৎকৃত “হর্ষ-
চরিতের” প্রারম্ভে এবং “রত্নাবলীর”
স্থলধর মুখে “দ্বীপাদানন্দাদপি” এই
এক রূপ শ্লোকোক্ত দেখিয়াই সংশয়
হইয়াছে। ইহাতে বাণভট্টকে রত্নাবলী
প্রণেতা বলা কতদূর সম্ভব, বিজ্ঞ পাঠক
বর্ণ বিবেচনা করিবেন। মহা মহোপাধ্যায়
উইলসন সাহেব কছেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩
হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাম্বীর
রাজাশাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূ-

পণ আমাদিগের মুক্তি সম্ভব বোধ
হইতেছে না, কেননা মালবেশ্বর নৃপের
মভাসদ ধনঞ্জয় রূত “দশরূপ” এবং
ভোজদেব প্রণীত “সুরভী কণ্ঠভরণ”
মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ হইতে উদা-
হরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার
গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষান্ত বৎসর
পূর্বে রচিত, অন্তরায় তাহা হইলে শ্রী-
হর্ষের দৃশ্য কাব্য দ্বয় উইলসন সাহেবের
আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন, “শ্রীহর্ষো
নিপুণঃ কবিঃ” এবং শ্রীহর্ষদেবের না
পূর্ববস্ত্র রচনালঙ্কৃত রত্নাবলী।

তথা শ্রীহর্ষ দেবেন পূর্ববস্ত্র রচনালঙ্কৃত
বিদ্যাদর চক্রবর্তী প্রবিরুদ্ধং নাগানন্দং
নাম নাটক।

এ কথা যথার্থ—

“নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতিমম্যকার।
কাব্য-পিতৃগণে বহু মূল্য রত্নাবলী ॥
“রত্নাবলী”—(যার কিবা মূল্যক গুণন ৬)
কোথা রম্য তার কাছে হীরক রত্ন ॥

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হর-
পূর্ণভট্টকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু
তাঁহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন।
তাঁহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া
মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ
হয়, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছি-
লেন।

শ্রীরামদাস সেন।

বানরচরিত ।

বঙ্গদর্শনের অসংখ্য সমালোচকের মধ্যে কোন এক জন (বাচনিক কি সমাদ পত্র, তাহা আমাদেরিগের স্মরণ হয় না) আমাদেরিগের উপদেশ দিয়াছিলেন, যে সাময়িক পক্ষে দেশ বিপ্লবত ব্যক্তিরের জীবন চরিত লিখিত হয়। সেই উপদেশ বাক্য অন্য আমাদেরিগের স্মরণ হইয়াছে। আমরা অদ্য উপদেষ্টার প্রাজ্ঞা-স্ববর্তী হইয়া কোন “দেশবিপ্লবত” মহা-দ্বাদিগের চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই মহাদ্বাদ্যাকে, তাহা প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিলে বুঝা যাইবে। বঙ্গীয় সমালোচকদিগের কথায় যে আমাদের অচলাভক্তি, এই প্রস্তাব তাহার প্রমাণ স্বরূপ।

বানরদিগকে কেবল উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। ডার্কইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানর বংশ সত্ত্বত। এক কল্পায় যিনি হাস্য করিবেন, তিনি ডার্কইন সাহেবের প্রশংসা পড়েন নাই, বা বুঝিতে পারেন নাই, বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে সম্যক অধিকারী নহেন। সেই আশ্চর্য্য গ্রন্থের সম্যক আলোচনা করিলে এই বিষয়ে অল্প সংশয় থাকে।

জাতের পূর্বকালিক বানরেরা মনুষ্য-জাতির পূর্বপুরুষ, এবং বর্তমান বানরেরা আমাদেরিগের কুটুম্ব। ভয়লা পরি, ভবিষ্যতে ক্রিয়া করে, উদ্ভিদদিগের নিমন্ত্রণ হইবে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, অনেক

মনুষ্য কুটুম্ব অপেক্ষা উঁহারা সুসভ্য। সুন্দরী পাঠকারিণীদিগকে স্মরণ করিয়া দিই, যে ইহাদিগের সম্বন্ধে উঁহাদের ভাই সম্বন্ধ—আত্মহতীয়ার দিন জুল না হয়।

রহস্য তাগ করিয়া আমরা পাঠকদিগকে অল্পরোধ করিতেছি যে, যিনি সক্ষম, তিনি ডার্কইনের বিশদ্রকর গ্রন্থ যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে পাঠ করিবেন। বাঁহারা সক্ষম নহেন, উঁহাদিগকে আমরা অবকাশ ক্রমে তদ্বিষয়ী সমালোচনা উপহার প্রদান করিব, ইচ্ছা আছে। এক্ষণে আমরা তাহার স্থল মূল ভাগ করিয়া, তাহার আত্মবাক্য কথ্য হইতে বানরদিগের স্বভাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি এসম্পন্ন সঙ্কলিত করিলাম।

মনুষ্যদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার ছই একটি কোনও পশুরও হইয়া থাকে—খণ্য বংশস্ত। কিন্তু অনেক গুলি না মাহুতিক পীড়াই অন্য পশুর হয় না। সে রূপ পীড়া কতকই কেবল বানরদিগেরই হইয়া থাকে। রেঙ্গর দেখিয়াছেন যে, আমেরিকা নিবাসী এক জাতীয় বানরের (*Cebus Azarae*) “সরদি” হয়। মনুষ্যের মত, তাহার পোশাকপোষা যক্ষা-দ্বিত্ব হইয়া থাকে। মৃগী, অস্ত্রপ্রদাহ, ও চক্ষু ছানিও উঁহাদের রোগ। “দুখে দাঁত” পড়িবার সময় এই জাতীয় অনেক বানরশাবক স্বরযোগে মরিয়া যায়। মনুষ্য বাবাহর্য্য ঔষধে তাহার অরোগ্য লাভ করে।

অনেক জাতীয় বানর, চা কাকি এবং মদ্য ভাল বাসে। ডার্কইন সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, বানরেরা তামাক সেবন করিয়া মুখ বোধ করে। ইহা পড়িয়া আমাদিগের বড় দুঃখ হইয়াছে। নাজানি, এই তামাক প্রিয় বাবুরা ইঁকা কলিকা তামাক এবং টিকার অভাবে বনমধ্যে কতই কষ্ট পান। বাঁহারা দানশৌণ্ড, উঁহাদিগকে অল্পরোধ করি, বৎসরত কিছুই ইঁকা, কলিকা, টিকা ও তামাক বনমধ্যে প্রেরণ করিবেন। অধিক বেতন মিলে খানসামাও নিযুক্ত হইতে পারে। সে যাহা হউক, এই বানবেরা যে অনেক বি, এ, এম, এ প্রভৃতি পাণ্ডিত্যভিনাদী মনুষ্য অপেক্ষা বিজ্ঞ, এবং সুসভ্য, তদ্বিষয়ে আমাদেরিগের সংশয় নাই।

ব্রেক্সেলেন যে, পূর্ব দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী “বিয়ার” নামক মৃগের বোভ দেখাইয়া বন্য বানরদিগকে ধৃত করে। পাকেরিয়া “বিয়ার” বাহিরে রাখিলে, বন্য বাবুরা আসিয়া তাহা পান করিয়া উন্মত্ত করেন। এ টুকু উঁহাদের স্নাহেবি স্নেহজ্ঞান বলিতে হইবে—বান্দাজি মোজাক হইলে, ব্রাণ্ড ভাল বাসিতেন। ব্রেক্সেলেন এই রূপ মনোমাত্ত বানরদিগের “নেমা” দেখিয়াছেন—এবং ভদ্রবস্ত্র তাহাদিগকে ধরিয়া অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন। নেমায় যে রূপ তাহার রঙ্গ ভঙ্গ তর, ব্রেক্স তাহার অতি রহস্য জনক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদ্যপানের পরদিন প্রাতে এই মদ্যপদিগের ও “বোণ্ডারি” মন্তব্য হইয়াছিল। তখন তাহার বিমর্ষ ভাবে রহিল, সহজে রুট হইতে লাগিল, দুই হস্তে পীড়িত।

শিরঃ ধরিয়া, অত্যন্ত দুঃখব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিয়া রহিল, পুনশ্চ মদ্য প্রদত্ত হইলে তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিল; কিন্তু লেবুর রস ইচ্ছা পূরক খাইতে লাগিল। আমেরিকার এক জাতীয় বানর এক বার মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, পরে তাহাকে মদ্য প্রদান করিলে সে আর স্পর্শ করিত না। মনুষ্য পশু অপেক্ষা এই বানর পশুকে বিজ্ঞ বলিতে হইবে। অন্ততঃ ইহা সীকার করিতে হইবে, যে, বঙ্গদেশে এই রূপ দুই চারিটি বিজ্ঞ বানর থাকিলে, টেম্পেলের সোসাইটির বিশেষ উপকার দর্শিত।

এই সকল পাঠ করিয়া অনেকের শাস্তিপুরের বিখ্যাত অধিক্ষেপপ্রিয় বানরের কথা মনে পড়িবে। সে গম্প অলীক কি না, তাহা আমরা জানি না—কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য বটে। বানরের চমস গাঁজা কখন খাইয়াছে কি না, তাহা জানা নাই, কিন্তু সুন্দর বনে আবকারির দোকান করিলে কি রূপ দাঁড়ায়, বলা যায় না।

বানরের “ইয়ারিক” সম্বন্ধ এই রূপ। তাহাদিগের মেহ ও বলের কয়েকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইতেছে।

রেঙ্গর কোন বানরকে শাবকের অঙ্গ হইতে সম্বৃত্ত মাছ ভোড়াইতে দেখিয়াছেন। দুবসেল দেখিয়াছেন যে Hylobates জাতীয় কোন বানর নদীর জলে সন্তানের মুখ ধৌত করিয়া দিতেছে। ব্রেক্স উত্তর আফ্রিকা দেখিয়াছেন যে কয়েকটি বানরী অগত্য শোকে প্রাণ তাগ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কে “মনুষ্য” লইয়া গর্ভ করিবে? কে বা অজি

বানর বলিলে গালি এমন করবে ?
বানরেরা যদ্যপি স্মৃতি অধ্যয়ন করি-
য়াছে ক্রি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু
তাহারা পৌষাপুঙ্ক গ্রহণ করিয়া থাকে ।
মাতৃ পিতৃহীন বানর শিশু অন্য বন্যর
বানর কর্তৃক প্রতি পালিত হইয়া থাকে ।
এক সদাশয়্য বানরীর চরিত্র বিশেষ
কৌতুকাবহ । সে কেবল অন্য জাতীয়
বানর শিশু পালন করিত, এমত নহে ;
কুকুর এবং বিড়ালের শাবক তুরি করিয়া
আনিয়া লালন পালন করিত এবং গুপ্তে
বহন করিয়া বেড়াইত । এই রূপে দলক
দৃষ্টীত একটি মাক্কীর শিশু দৈবাৎ এই
স্নেহময়ীকে আঁচড়াইয়াছিল । স্নেহময়ী
তাঁহাতে বিস্মিত হইয়া কারণসম্বন্ধানে
প্রস্তাবা হইলেন । আশ্চর্য্য হইয়া দেখি-
লেন যে মাক্কীর শাবকের নথ আছে ।
সে এই রূপ কৃতঘ্নতায় আর দ্বিভিত না
হইতে পারে, এই আশয়ে তাহার নথ
গুলি দংশন করিয়া ছিন্ন করিয়া দিল ।
মহুঘোর পৌষাপুঙ্কের দৌরাভায়া নিবার-
ণের এ রূপ কোন উপায় হয় না ?

C. Chacma এক জাতীয় বানর ।
Drill অন্য জাতীয় বানর ; কিন্তু Chac-
ma'র নিকট কুটুম্ব । Rhesus আর এক
জাতীয় বানর । লণ্ডনের পশুনিবাসো-
দ্যানে একটি প্রাচীন Chacma নিবাস
করিতেন । নিকটে একটি যুবা Rhesus
ছিল । রক্ত তাহাকে পৌষাপুঙ্ক গ্রহণ
করিলেন । তৎপরে সেখানে দ্রুতি Drill
মানীত হইলে প্রাচীন দেখিলেন যে
চুইঘরে ছেলে আয়িয়াছে ; অতএব
তিনি ভৎসনাপূর্ণ Rhesusকে ভাগ করিয়া
গিয়া চুইটিকে গ্রহণ করিলেন । ইহাতে

রাজা ড্রু যুবরাজ যে ক্ষুধা মনা হইবেন,
বিচিৎ কি ? যুবরাজের নানা প্রকার
ক্ষোভ প্রকাশক কার্য্য ড্রুইন স্বয়ং
দেখিয়াছেন । যুবরাজ Drill দুইটিকে
নানা প্রকার পীড়া দিতেন ; তাহাতে
রক্ত দংশন প্রকোপ প্রকাশ করিতেন ।

বানরেরা ক্ষেপাইলে ক্ষেপে । লণ্ডনের
পশু নিবাসোদ্যানে একটি বানর ছিল,
তাহাকে কিছু পড়িয়া শুনাইলে সে বড়
রাগ করিত । পত্র বা গ্রন্থ পাঠে তাহাকে
ক্ষেপিতে ড্রুইন স্বয়ং দেখিয়াছেন ।
একবার এমন রাগিয়াছিল, যে আপনার
চরণ দংশন করিয়া রক্তপাত করিল ।
ইহাতে বানরটিকে দোষ দেওয়া অনায়াস ।
গ্রন্থ বিশেষ পাঠ করিলে, অনেক মহা-
শয়ই এই রূপ রাগ করিয়া থাকেন ।
মেঘনাদ বধ পড়িয়া অনেক অধ্যা-
পককে এই রূপ বানর করা যায় ।

বানরেরা যুদ্ধ পাই । একদা ড্রু অব
কৌণ্ড-গণা অল্পচর বর্ষ সমভিযাহারে
আবিসিনিয়া প্রদেশে নেঙ্গা নামক পা-
ক্ষ্যতা পথ আরোহণ করিতেছিলেন,
এমত সময়ে বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া
ভাঁহার পথ অবরোধ করিল । রেস্তর
সম্মুখ ছিলেন । তখন নর বানরে ড্রুইন
সংগ্রাম উপস্থিত হইল । সাহেবেরা
বন্দুক চালাইলেন, বানরেরা শিলা খণ্ড
বর্ষণ করিতে লাগিল । প্রথমে বানরের-
রাই জয়ী হইয়াছিল । শেষে কি হইল,
তাঁহা ইতিহাসে লেখে না । স্কাঙ্কায় রা-
ববী সেনার কীর্ত্তি নিতান্ত অমূলক না
হইবে ।

পাগোয়ে নিবাসী Cobus Azarco
নামক বানরেরা ছয় প্রকার শব্দ ব্যবহার

করে, ভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভাব, তাহা
বানর জাতির বোধগম্য । অতএব উহা
এক প্রকার বানরী ভাষা ।

পাঠকদিগের বিরক্তির আশঙ্কায় আ-
মরা আর-অধিক লিখিলাম না । এক্ষণে

জিজ্ঞাস্য যে, বানর বলিলে গালি হয়
কেন ? বানরদিগের যদি ভাষা থাকে,
তবে তাহারা পরস্পরকে মহুঘ্য বলিয়া
গালি দেয়, সন্দেহ নাই ।

বিরহিণীর দশ দশা ।

প্রথম দশা দিনে, বেরি বেরি রোগল,
শেজে পাড়ি কঁদে ভূমি লুট ।

দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখি মেলি ঘেরল,
শেজ ছাড়ি গা দুলিল উঠি ॥

তৃতীয় দশা দিনে, মৃদু মৃদু হাসিল,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ ।

চতুর্থ দশা দিনে, সিনান করি আগল,
হাঁড়ি পাড়ি খাওল পাখা ভাত ।

পঞ্চম দশা দিনে, বাঁকি চাকু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের ।

ষষ্ঠম দশা দিনে, পিঠা পুলি বানাগল,
কাঁদিতো তার গিলিস তিন সের ॥

সপ্তম দশা দিনে, সড়িনা খাড়া হাঁখিল,
বলে প্রাণ বঁধু কোথা গেলে ।

যে খাড়া রেখেছি ভাই, ভূমি বঁধু কাছে নাই,
যদি পেট কাঁপে একা খেলে ॥

অষ্টম দশা দিনে, বিরহ বিবাদিনী
মদ দুখে কানিল ইলিন ।

তিত্বা নয়ন জলে, ভাকায় ঝোলে অয়েলে,
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ ॥

নবম দশা দিনে, পেট কঁপে ঢাক হলো,
আইল কানাই করিরাঙ্গ ।

সই বলে কর্ম্মক্ষেপণ, এ ঘোর বিরহ রোগ,
কবিরাজে নাই ইথে কাজ ॥

দশম দশা দিনে, তিরিহি মরে নরে,
আই চাই বিজ্ঞানার পড়ি ।

কাতরে কহিছে সতী, কোথা শাব প্রাণপতি,
কোথা পাব প্যাকের বড়ি ॥

বিরহীর দশ দশা, পন পন করে মশা,
মাছি উড়ে ফেলে কঁদে কোলে ।

চাকরানীর চাঁচকার, সইমান্তির টিঁকার,
খেলে কবি ছন্দোবদ্ধ তোলে ॥

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ঐতিহাসিক যবন্যাস। অষ্টখণ্ড।
নাথসোহিনী। ত্রিগুণপতি রায় দ্বারা
সঙ্কলিত। কলিকাতা সুচার প্রস্তুত।
এই প্রকার ভূমিকায় লিখিতাচ্ছেন, “অগ্র
ধনাতা লোকের একই জন্ম করিয়া কথক
(পঞ্চবজ্র) থাকিত, প্রতি দিবস সন্ধ্যার
পূর্ব নগর ও গ্রাম ভেদে “পল্লীস্থ ও
গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্বই বৈদিক
কার্য সমাধা করিয়া এই ধনাতা স্বাক্ষরে
বৈঠকখানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গ-
রস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া
উপজীবিকার প্রায় দূর করিত। একদে
সে চাল আর নাই, একদে স্বই প্রধান
“আপনি আর কপনি” কিন্তু উপজীবিক-
কার্থে সেই প্রকার পরিগ্রহ করিতে হয়,
সন্ধ্যার পর “বাটা আসিয়া গ্রাম দূর্য্য
ইচ্ছা সেই প্রকারে বলবতী, কিন্তু উপায়
অভাব, সেই অভাব পূরণার্থে “নবন্যাসা-
দির উৎপত্তি।”

বোধ হয়, এই কথাটির পর গ্রন্থের কোন
পরিচয় দিতে হইবে না। যদি এমন
প্রণয়ী কোন পাঠক থাকেন, যে এরূপ
উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা
করেন, তিনি পাঠ করুন। কিন্তু আমরা
কায়মনোবাক্যে অর্থনাশকারি, যে এরূপ
নীচাশয় লেখকদিগের সংখ্যা দিন দিন
রূপ হইক। এরূপ লেখকদিগের দ্বারা
সাধারণের কোন সম্ভল সিদ্ধ হয় না
বরং অসম্ভল জন্মে।

এ শ্রেণীর লেখক ও পাঠক উভয়কেই
আমাদিগের একটি একটি কথা বলিবার

আছে। লেখকদিগকে বক্তব্য এই যে,
যতই যত্ন করুন না কেন, তাঁহারা কখন
ভাঁড় ও কথকদিগের সমকক্ষ হইতে
পারিবেন না। কেননা ভাঁড়েরা মুখ-
ভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, স্বরবিকৃতি প্রভৃতির দ্বারা
যে প্রকার লোকের মনোহরণ করিত,
যাহানই করিয়া এ প্রকারের উপন্যাস
পাঠ করিয়া কাহারও সে রূপ চিত্তরঞ্জন
হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এই রূপ
উদ্দেশ্য করিয়া যাহারা উপন্যাস লেখেন,
ভাঁড়দিগের স্থান কথক ও ভাঁড়ের নিম্ন
পদবীতে।

এ শ্রেণীর পাঠকদিগের প্রতি আশী-
র্বাদ বক্তব্য এই যে, যে অভাব পূরণ করি-
বার অভিপ্রায়ে তাঁহারা এরূপ গ্রন্থ পাঠ
করিলেন, সে অভাব তাস খেলা প্রভৃতির
দ্বারা তাৎপেক্ষা উত্তমরূপে পূর্ণ হইতে
পারে। একখানি গ্রন্থ এক টাকা বায়
আনার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না,
এক জোড়া তাস চারি আনার পাওয়া
যায়। গ্রন্থখানি একবার পড়িলে আর
ভাল লাগে না; কিন্তু এক জোড়া তাসে
প্রত্যহ খেলা যায়, নিত্যই সমান আ-
মোদ পাওয়া যায়। বিশেষ, তাস খেলায়
কোন অনিষ্ট নাই, ভাঁড়ামি বা ভাঁড়া-
মির স্থলাভিষিক্ত উপন্যাসে অনিষ্ট
আছে।

বলা বাহুল্য যে, যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য
এরূপ, তাঁহা আমরা অদ্বার করিয়া
পড়িতে প্রস্তুত হই নাই। কেবল কর্তৃ-
বাহুরোধে পড়িতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

কিন্তু কর্তৃবাহুরোধেও সমুদায় গ্রন্থখানি
পড়িতে পারিলাম না—ইহা নিতান্ত
অপাঠ্য বোধ হইল। এমন হইতে পারে
যে, সমুদায় গ্রন্থখানি পড়িলে তাহার
কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যা-
ইত। যদি এ গ্রন্থের এমন কোন গুণ
থাকে, তবে গ্রন্থকার আমাদিগের এই
ক্রটি মার্জন্য করিবেন—আমরা ইচ্ছা
পূর্বক এ ক্রটি করি নাই। ইহা আমরা
বলিতে পারি যে যত্নপূর্ণ পড়িয়াছি, তত
দূরমধ্যে গ্রন্থে বিশেষ গুণ কিছুই দেখিতে
পাই নাই। দোষ বাহ্য দেখিয়াছি,
তাহা লিখিতে গেলে “ঐতিহাসিক নব-
ন্যাসের” আকারের আর একখানি গ্রন্থ
লিখিতে হয়। ছই একটি উদাহরণেই
যথেষ্ট হইবে।

১। গ্রন্থের নাম “ঐতিহাসিক।”
লেখকের “ঐতিহাসিক” ক্লানের পরিচয়
একমাত্র দিলে যথেষ্ট হইবে, যে যৎকালে
মুগধে হিন্দু রাজা, তৎকালের একজন
লোক জয়দেব হইতে “দেহি পদ পল্লব
মুগধর” আওড়াইতেছে।—২৭ পৃষ্ঠা,
শেষ পংক্তি দেখ।

২। অসভ্যতা। পূর্বগামী লেখক-
দিগকে “বান্দর, হস্তমান, জাবুবান”
বলিয়া, গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।
(ভূমিকার শেষভাগ দেখ) ভদ্রলোকের
স্মরণ করিবেন যে, বাবু ভূদেব মুখোপা-
ধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র দিবা-
সাগর প্রভৃতি পূর্বগামী উপন্যাস
লেখক।

৩। শ্রেণী বিশেষের লোকের অস-
ভ্যতা, তাঁহা আমরা অদ্বার করিয়া
পড়িতে প্রস্তুত হই নাই। কেবল কর্তৃ-
বাহুরোধে পড়িতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

দেখ।) ভদ্রলোক এবং শ্রীলোকের পাঠ্য
এই বঙ্গদর্শনে উহার সবিশেষ নির্দীচন
অসম্ভব।

৪র্থ। সদস্যজ্ঞান ব্যতীরাই অভাব।
উদ্বোধন বরূপ নায়ক নায়িকার অধিরা-
হিতাবস্থার একদিনের বাহ্যেই উজ্জ্বল
করিলাম—

“মাধবলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া,
● ● ● মনোহরণে মস্তক নত করিয়া
শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন ● এমন সময়ে
কে একজন শুভ্রের পার্শ্ব হইতে আসিয়া
তাঁহার হস্ত ধরিল। চমকিয়া দেখি-
লেন, মোহিনী সম্মল নয়নে তাঁহার হস্ত
ধরিয়া যুথালোকন করিতেছেন। ● ●
● ● মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে
হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাথবের গল
দেশে দিয়া নন্তক পরিণত করাইয়া
বন্ধজে রাখিলেন। কপোল স্পর্শে, যে
প্রকার ক্ষণিক ক্ষণিক তৈল দানু শীতল
হয়, মাথবের দক্ষ জ্বর শীতল হইল,
বাহুপ্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বহের
টানিয়া লইলেন, বাহা অনায়াসে করেন
নাই, মুখচূষন করিয়া কহিলেন, ‘মো-
হিনী’ ইত্যাদি। ● ● ● এমন সময়ে
স্বমতী (নায়কের যুগতী ভগিনী) শীঘ্র
আসিয়া কহিল, ‘দাদা, ও দিগে কে
আসে?’ মাধব প্রদান পুনর্বার মুখচূষন
করিয়া মোহিনীকে বন্ধ হইতে সরাইয়া
প্রস্থান করিলেন।” (২—২২ পৃষ্ঠা)

আমরা শুনিয়াছি যে, যেখানে রাধা-
শ্যাম, যেখানে রমদাহতীর স্তম্ভা নাই।
কিন্তু শ্যামচাঁদের ভগিনীই যে রমদাহতী,
এইটী স্মৃতি ন।

৫। দেশীয় আচার বাহ্যের নিম্ন

গ্রন্থকারের বড় বিবাদ। তাঁহার নায়ক ই যুবতী ভগিনীর ললাট চুম্বন করিয়া থাকেন। ভগিনীও “দাদার হস্ত ধারণ” করেন। (২১ পৃষ্ঠা ১১১২ পংক্তি) মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বকার হিন্দু উজ্জ্বলকে বাগু পদে বাচা হইয়াছেন। রাজপুত্রের নাম “মাধব বাবু।” সর্দারপেক্ষা “রাজা বাবু” সর্ভদারপেক্ষা আমাদিগের নিম্ন লাগি-
য়াছে।

৩৪। আমরা লেখকের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার একটি গুণ আছে—ভাষা অতি সরল। বাঁহারা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ এবং পদ তাগ করিয়া সচরাচর পরিসুদ্ধ কথোপকথনের ভাষা অবলম্বন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার ভাষা ভালই করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইতর লোকের ভাষা অবলম্বনীয় নহে। এ গ্রন্থে যেখানে ভাষার অশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার অনেকই বোধ হয়, মুদ্রাকরের দোষ। বালান্দ্রাগ্রন্থের মুদ্রাক্ষন কার্য পরিসুদ্ধ রূপে নির্দ্বাি হওয়া দুর্ঘট। আমরা অনেক যত্ন করিয়া দেখিয়াছি, তাহা ঘনিষ্ঠ নহে। উজ্জ্বল আমরা সর্দারদি পাঠকদিগের নিকট লক্ষিত। সকল গ্রন্থেই এইরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু এ দোষ এই গ্রন্থে বিশেষ চক্। ৯ পৃষ্ঠা হইতে আমরা অসম্পূর্ণ চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

“পাণ্ডাজী উপর কের বার পরাশ হইয়া মনেই তাঁহার উপর অত্যন্ত আক্রোশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভয় বশতঃ কথ্য বা-
হ্যিক বলিতে সক্ষম হইতেন না; লুকা-

ইয়া লোকের নিকট নৈয়াইক বলিয়া মানী করিতেন।”

চারিটি ছন্দে চারিটি ভুল—যথা প-
রাশ, অত্যন্ত, নৈয়াইক, মানী। এই
গুলি মুদ্রাকরের দোষ বিবেচনা করিতে
পারি, কিন্তু “পাণ্ডাজী পরাশ হইয়া
—আক্রোশ জন্মিয়াছিল,” “বাহ্যিক
বলিতে” ইত্যাদি দোষ মুদ্রাকরের নহে।
যে ভ্রমটি একবার ঘটে, তাহাই মুদ্রা-
করের, কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে
দেখিলাম, কথ্যবাক্যের স্থানে “কথ্যবাক্য”
আবার ২২ পৃষ্ঠার ২৩ ছন্দে “কথ্যবাক্য”
ইহাতে কি বিবেচনা হয়? এই গ্রন্থে
“বাল্যপোষারত” পুরুষের কথা পড়ি-
লাম। এই রূপ দোষ অসংখ্য।

একদেব অনেকে মাছু ভাষার বিশেষ
আলোচনা না করিয়াও গ্রন্থের প্রণয়নকে
গ্রন্থত, এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থলক্ষণকে
সময়ে ভাল হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে
ভ্রমোৎসাহ করিতে আমরা অনিচ্ছুক;
কিন্তু যে সকল দোষ আমরা দেখাইলাম,
তাহা কাহারও ঘটে না।

৩৫। গ্রন্থকারের অগীত চিত্র গুলি
মধ্বে কি বলিব? এ গ্রন্থে রাজপুত্র
নাগরীগণের জলের কলস ভাঙ্গি-
তেন, (১৩ পৃ) তাঁহার বিমাতার
সঙ্গে বিবাদ হইলে ব্রহ্ম পাইতেন না,
পৌড়া পাইতেন না, জল খাবার পাই-
তেন না। রাজকুমারী সোমনা দাঁড়া-
ইয়া খেলানার মত করেন। ১৯ পৃষ্ঠায়
রাজা এবং রাজপুত্রের যে কথোপকথন
হইয়াছে, সর্দারপেক্ষা তাহাই আমা-
দিগের মনোহরণ করিয়াছে। রাজা
বলিতেছেন, “আমি আমার রাজ্য

কুমারকে দিয়া যাইব, তখাচ তোমাকে
দিব না।” তাঁহার পুত্র উত্তরে বিমাতা
মধ্বে বলিতেছেন, “অমন স্ত্রীকে হেঁ-
টায় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁত্ৰি
ফেলুন, পাণ্ডার মন্তক মুণ্ডন করিয়া
উল্টা গাদায় চড়াইয়া দেশান্তর করিয়া
দিন।” “ঐতিহাসিক নব্যাদেশের” “ঐতি-
হাসিক ভাগ পিতামহীদিগের নিকট
প্রাপ্ত।

৮ ম। গ্রন্থকার এত্ৰি পরিক্ষেদে,
একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া বসাইয়াছেন।
তাঁহা দাস রায়, গোপালে উড়িয়া
অভুতি হইতে সংগৃহীত। ইহা লেখকের
রুচি এবং শিক্ষার পরিচয়।

একুণ তালিকা করিতে গেলে
শেষ হইবে না। আমরা যাহা বলিলাম,
তাঁহা গ্রন্থের অভ্যুৎপাদন মধ্বে।
গ্রন্থের বিশেষ মনো গুণ দেখিলে
এককল দোষ সামান্য বলিয়া গণনা করি-
তাম।

জ্ঞান কুসুম। প্রথমভাগ। ত্রি-
তিন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অগীত।

পাঠা পুস্তক, স্মরণ শক্তি, যৌবন,
স্বভাব, ধর্মবিজ্ঞান অভুতি কয়েকটি
প্রস্তাব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহা
হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ-
কে উপহার দিই।

“পুস্তক পাঠ জ্ঞান বৃদ্ধির এক প্রধান
উপায়।” ১ পৃষ্ঠা।

“যিনি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন
না, তিনি জ্ঞান হইতে এক প্রকার ব-
ঞ্চিত।” ২ পৃষ্ঠা।

“জ্ঞান মধ্বেয় নিমিত্ত স্মরণ এক
প্রধান স্মারন। এই স্মারন না থাকিলে,

আমরা কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতাম
না।” ৩ পৃষ্ঠা।

“আমরা স্বভাবের হস্ত হইতে স্মরণ
পাইয়াছি। কিন্তু তিনি সকলকে সমান
স্মরণ দান করেন নাই।” ৪ পৃষ্ঠা।

এই রূপ ৫, ৬, ৭, ৮ বধ্যক্রমে
শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখিয়া আমরা কেবল
একুণ স্মৃতি এবং ছন্দেয় তত্ত্বই পাই-
লাম। গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, কোন
উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ খানি প্রচারিত হই-
য়াছে?

শিশুপাঠ বাল্যলার ইতিহাস।
বর্ণীর হাল্কা হইতে লাভ নর্থক্রকের
আগমন পর্যন্ত। ত্রিকোণনাথ বন্দো-
পাধ্যায়ের অগীত। কলিকাতা ভারত
বন্দ।

১১১ পৃষ্ঠায় পড়িলাম, “প্রিন্স অব
স্মালফুড” এখানে আসিয়াছিলেন।
গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে তাঁর অব ই-
তিহাস “উপাধি” দান করেন। তিনি
আয় করটি উঠাইয়া দিয়া যান নাই
বলিয়া তাঁহার সম্মদার্থে যে অর্থ ব্যয়
হইয়াছিল, তাহা অপব্যয় হইয়াছে। যে
গ্রন্থে একুণ পাণ্ডিত্য, তাহা শিশুদিগের
বা কাহারও পাঠ্য নহে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা এ গ্রন্থে আরও
গুরুতর দোষ আছে। ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত
হইয়াছে, “এমন কোন গ্রন্থকারই নাই,
যিনি স্বর্ণময়ী পারিতে তালিক প্রাপ্ত হন
নাই।” কেবলমাত্র খাবু কে, তাঁহার
কি অভিপ্রায়, তাহা আমরা কিছুই জা-
নিনা; বোধ করি, তিনি ভ্রম লোক
এবং অসাবধানতা বশতঃই এমত লিখি-
য়াছেন; কিন্তু যদি তিনি ইহা না বুঝিতে

পারিয়া থাকেন, যে কথীতি মিথ্যা লেখা হইল, এবং অর্থলোভুপ ভিক্ষকের তোষা-নোদের মত শুনাইবে, তবে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। লেখক মাত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপবাদ প্রচার করিতে তাঁহার লজ্জা হইল না? আমরা জানি, মহারানী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত নানাপার্যায়ণ এবং অনেক ভিক্ষুক গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার দ্বারস্থ, মহারানীও অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশের লেখক মাহেই যে তাঁহার পারিতোষিক ভোক্তা নহেন, তাহা বলা বাহুল্য। সেভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এখন অনেক গ্রন্থকার আছে, যে তাঁহার অন্যকে ভিক্ষা দেন, অন্যের নিকট ভিক্ষার্থী নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের নাম এমন দেশব্যাপী, যে এখানে নাম করিবার আবশ্যক নাই। এই লেখক, বোধ হয়, স্বর্ণেশীর লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও চেনেন না। তিনি বাহাদিগের কথা বলিবার অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, সেই স্বর্ণেশীর লোক গ্রন্থকর্তা নামের অধিকারী বলিয়াই বঙ্গদেশে ভুললোকে সন্মতচর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালী গ্রন্থ লেখা কাজে কাজেই আজিও অনেকের কাছে ইতর রুচি বলিয়া গিয়া। এই লেখকের উক্ত বিচারগারে এবং অন্য একারে দণ্ডনীয়।

যে সকল গ্রন্থকার ভিকার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহাদিগকে ইহা বলিয়া বিবাক আবশ্যক হইল যে, মহারানী স্বর্ণময়ীর নিকট প্রাপ্ত কামনায় পরিন্দ্রাঘটিত তোষানোদের প্রয়োজন

নাই। বিনা তোষানোদেও তিনি দান করিয়া থাকেন।

সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রী উমেশ চন্দ্র বক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এখানি কাব্য। ইহাতে প্রশংসার কিছুই পাইলাম না। অনেক স্থানেই চর্চিত চর্চণ। মধ্যেই অজ্ঞানসমের দটা। তজ্জন্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গান্ধারী বিলাপ কাব্য। শ্রীভুবন মোহন ঘোষ প্রণীত। কুরুক্ষেত্র সমরে রাক্ষা চূর্ণোদ্যান হত হইলে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গান্ধারীর বিলাপ এই কাব্যে সমিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, ঐ সম্বাদ পাইলে গান্ধারী যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পুত্রের জন্য মাতার বিলাপ ৪০ পৃষ্ঠা দিখিলে কখনই ভাল হয় না। স্থানেই নির্ভীক মন্দ হয় নাই। অনেক স্থান ভাল নহে। ছন্দোবদ্ধ ভাল।

প্রমীলাবিলাস। গুণপল্লী নিবাসী শ্রীমহিন্দাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফোর্ড প্রেস।

এখানিও কাব্য। কাব্য খানি কোন অংশে ভাল নহে। লেখকের কবিত্ব এবং তাঁহার ভাবের নবীনত্বের পরিচয় স্বরূপ হয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

“হেরিয়া দেবীর শোভা, জগজ্ঞান মনোভোভা,
বিবরে হুঁকার ফণী হইয়া অধীর।

হমন না হোলে আর, মাথা কুটি বার বার,
করিয়াছে চক্রময় আপনার শির।
কামের ধনুক ভিনি, ভুলু ধরে বিলাসিনী,
হস্তম বেদিকা সম ললাট ক্রান্তর।

হেরিয়া চিকুর চর, কানদ্বিনী পেয়ে ভর,
বাতাসে উড়িল শোবে হইয়া অধির।”

নলদময়ন্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা, ফুলবুক প্রেস। অশুদ্ধকণ্ঠে মহাভারতকার নলদময়ন্তীর উপাখ্যান সেই মহাভারত মধ্যে নাস্ত করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসের প্রাণীয় মুদ্রায়ত্ত্ব দুইখণ্ড হইয়া উঠিল। বাঁহার কোন বিশেষ কার্য না থাকে, তিনিই নলদময়ন্তীর কথা লেখেন। এক্ষণে জলের কল, মিউনিসিপল বিল, রোড সেস, প্রভৃতি অনেক লিখিবার বিষয় হইয়াছে—ভরসা করি, আর কোন কাব্যকার নলদময়ন্তীকে লইয়া টানটানি করিবেন না।

বর্ধমান গ্রন্থের একটি গুণ আছে,— গ্রন্থ পরিচায়ক বিজ্ঞাপনটি ক্ষুদ্র। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বহুদর্শন পর্য্যন্ত আমার একখানি কাব্য রচনা করিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু অনবকাশ বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। সম্ভ্রতি এই ক্ষুদ্র কাব্য খানি সজ্জনগণের সন্তোষ সাধনার্থ ও তরুণ বয়স্কদিগের সমুদয় উপদেশ লাভার্থ প্রণয়ন করতঃ বিদ্বানগণের পরিতোষ প্রতীক্ষায় সিদ্ধকাম হইতে পারিলাম কি না, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকিলাম।”

এতসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা আছে।

১। বহুকাল হইতে কিশোরী বাবুর কাব্য রচনার অভিলাষ ছিল। সকল অভিলাষই কি পূর্ণ করিতে হয়? যিনি

পারেন, তিনি আশঙ্কায়ী। আমরা কিশোরীলাল বাবুকে পরামর্শ দিই, তিনি ভবিষ্যতে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন না। তাহাতে যে এতাদ্য, নলদময়ন্তী কাব্যই তাহার প্রমাণ।

২। তাঁহার উদ্দেশ্য দুইটি দেখা বাইতেছে, “সজ্জনগণের সন্তোষ সাধন,” এবং “তরুণবয়স্কদিগের সমুদয় উপদেশ লাভ।” প্রথম উদ্দেশ্যটি বুঝিতে পারিয়াছি—গ্রন্থকার সজ্জনগণের সন্তোষ সাধন করিতে চাহেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি বুঝিতে পারি নাই—তিনি কি “তরুণবয়স্কদিগের সমুদয় উপদেশ লাভ” করাইতে চাহেন? যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারি না। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান হইতে “সমুদয় উপদেশ” লাভ করিতে পারে, এমন ছেলে প্রায় আমরা দেখি নাই।

৩। তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য নহেন। অন্য বিষয় জিজ্ঞাস্য করেন। “বিদ্বানগণের পরিতোষ প্রতীক্ষায় সিদ্ধ কাম হইতে পারিয়াছেন কি না?” তাহাই জিজ্ঞাস্য করেন। “প্রতীক্ষায় সিদ্ধ কাম” কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না, সুতরাং আমরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তবে, এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে বাহাতে “সজ্জনগণের সন্তোষ” হইবে তাহাতেই তরুণবয়স্কদিগের সমুদয় উপদেশ লাভ হইবে,” প্রাণীর তাহা হইবে “বিদ্বানগণের পরিতোষ” হইবে। ওরূপ আকাঙ্ক্ষা করা বড় দুঃশাসীর কাজ বিশেষ, বিদ্বান গণের পরিতোষ কিছুতেই

হয় না। সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহাদের পরিচোষ জন্মে না। নিউটন বলিয়াছিলেন যে, আমি বালকবৎ মনুষ্য ভাবে কেবল চেলো সুড়াইতেছি মাত্র।

তিনি সাত ছত্র পদ্য লিখিতে অক্ষম, তিনি নৈলময়সত্তী কাঁচ না লিখিলে ভাল হইত। শ্রীহর্য ইহা লিখিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে “সম্বন্ধগ-
ণের সম্ভাব্য সাধন” হইবে না—কেননা,

অনর্থক কিশোরী বাবুর সময় নষ্ট হই-
য়াছে জানিয়া তাঁহার্য্য মুগ্ধিত হইবেন।
বিদ্বানগণের পরিচোষ লাভ হইবে না,
কেননা তাঁহার্য্য ইহা পড়িবেন না। তবে
“তরুণ বয়স্কদিগের কিছু উপদেশ লাভ
হইতে পারে বটে,” “ভরসা করি” তাঁহার্য্য
দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ বহু কালের
অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই-
বেন না।



ভাষার উৎপত্তি।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবের মধ্যে কেবল
মনুষ্যই উন্নতিশীল। পুরাকালে যেরূপ
কৌশলে পক্ষীগণ নৌদ্ব নির্মাণ করিত,
মৎস্যমৎস্যকানিকর মৎস্যচক্র রচনা করিত,
উর্বনাত নৃতাত্ত্ব জাল বিস্তার করিত,
একগণেও তরুণ করিতেছে। কিন্তু কালে
কালে মানব জাতির অবস্থার কত পরি-
বর্তন হইয়াছে। গিরি গম্বর বা তরু-
শাখা বাহাদিগের পৃষ্ঠপুরুষদিগের
আশ্রয় ছিল, তাহার্য্য ইটক বা অন্তর
নির্মিত মুরমা হঠাৎ বাস করিতেছে।
ধনের ফল বা অশ্রু মাংস বাহাদিগের
আহার ছিল, বাহার্য্য উল্লভ থাকিতে
লজ্জা বোধ করিত না, বাহার্য্য অজ্ঞানতা
বশতও পদে পদে প্রাকৃতিক কার্য্য পর-
স্পরায় ভয়ঙ্কর দৈব শক্তির লক্ষণ দেখিয়া
ভীত হইত, তাহার্য্যদিগের বংশজাত
সভ্যজাতিগণের কৃষি সমুৎপন্ন পরিপক্ব
ভক্ষ্য দ্রব্যের পারিপাট্য, সুবিচিত্র বেশ
ভূষার আভরণ, উনমার্গিক নিয়ম জ্ঞান
জানিত পার্শ্বিৎ প্রভৃৎ নিরীক্ষণ করিয়া
বিশ্ময়াব্বিত হইতে হয়। বিবেচনা করিয়া
দেখিলে প্রতীতি হইবে, ভাষাই এই
অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির মূলীভূত। ভাষার
প্রভাবেই অজ্ঞিত জ্ঞান বিনষ্ট হয় না।
ভাষার প্রভাবেই উত্তর কালবর্তী জন-
গণ পূর্বস্বিকৃত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া
নূতন সভ্যতার অনুসন্ধানে প্ররুষ্ট হইতে
পারেন। সুতরাং ভাষার প্রভাবেই
পার্দর্শ্য বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্যের
কমতার, বুদ্ধি এবং অবস্থার উন্নতি হয়।

ভাষা শক্তিগুণে মানব জাতির ঈদৃশ
মহত্ত্ব সম্ভব করিয়া কোন কোন পণ্ডিত
ভাষা শক্তিকেই নর কুলের বিশেষ লক্ষণ
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাষা
না থাকিলে মনুষ্য পশুতে কি বিভেদ
থাকিত? উপস্থিত পদার্থ পৃষ্ঠেই চিত্ত
আকৃষ্ট হইত। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত তত্ত্ব
নিচয় হৃদয়ঙ্গম হইত না। সঙ্গীপস্থ
ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়
পরিভূতি করাই জীবনের উদ্দেশ্য হইত।
জ্ঞান, ধর্ম ও নীতির উন্নত ভাব সকল
মনে স্থান পাইত না। কবির রসময়ী
কবিতা লহরী, দার্শনিকের পরমার্থ বিম-
ল্য তাৎপর্য্য বাখ্যা, ইতিহাসের উদ্দীপক
দৃষ্টান্তমালা, বিজ্ঞানের অকাট্য উপপত্তি,
ধর্মের গম্ভীর উপদেশ, ঐগণের অসমু-
খাশা প্রকাশ, এই সকল মনুষ্যগোঁরব
হুচক সভ্যতাচিহ্ন কোথায় থাকিত?

এই মানব-মহিমা-প্রস্তুতি ভাষার কি
রূপে উৎপত্তি হইল, আমরা এই প্রস্তাবে
নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। কি বাস্তব
কি হিম্মত, কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি, কি
অরবি, কি পারসি, কোন ভাষা যখন
ছিল না, মনুষ্যগণ কি রূপে আদৌ ভাষা
শিক্ষা করিল, আমরা ঐবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন
করিব। নরজাতির খণ্ডন সংক্ষেপে থাকা
কিছু আমরা জানি, তাহার সাহায্যে
অতীত কালের গাঢ় তিনির ভেদ করিয়া
ভাষার প্রথম সঞ্চার বর্ণনা করাই আমরা
দিগের উদ্দেশ্য।

মনোভাব-বাক্য পরিস্ফুট বর্ণনায় শব্দ মাল্যার নাম ভাষা। এই লক্ষণের দ্বারা প্রথমতঃ, অতিপ্রায় প্রকাশক অক্ষ ভঙ্গিগুলি বাদ বাইতেছে। যে কথা কহিতে পারে না, বাহার শব্দের অকুলান আছে, বা যে দেশ বিশেষের ভাষা না জানিয়া কার্যোপলক্ষে ভাষায় উপস্থিত হয়, সেহ সম্বলনই তাহার প্রধান সম্বল। মুক, শিশু, অমতা বা ভাবানভিজ্ঞ পর্য্যটক, হাত পা মুখ প্রভৃতি নানিষ্টা কোন রূপে আপনার মনের বাক্স জাপন করিতে চেষ্টা পায়। "কিন্তু এবিধ শারীরিক ক্রিয়া সমুদায় ভাষাপদ ব্যাচ নহে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের পরিস্ফুট বর্ণনায় ভাষা অপর জীবগণের অস্ফুট শব্দ সমূহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হইতেছে। অধিকাংশ জন্তাই যে শব্দ বিশেষ দ্বারা স্বজাতির মধ্যে স্বথ দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাহাদিগের শব্দ গুলি পরিস্ফুট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা যায় না। সে গুলি অপরিষ্কৃত স্বর মাত্র। সত্য বটে, কোন কোন পাখিতে মানব ভাষার অনুরণন করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের স্বাভাবিক ভাষা প্রায় অধিকাংশ অস্ফুট, অথবা একটা বাঁধা মুর মাত্র।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়দ্বাবাদ ২য়

সম্মতিবাদ, ৩য় অনুরূপিত বাদ। আমরা যথাক্রমে এই তিনটার পর্যালোচনা করিব।

অপৌরুষেয়দ্বাবাদী বলেন যে, ভাষা মনুষ্য-নির্ধৃত নহে, ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাহাদিগের মতে স্বথ, দুঃখ, জ্ঞান, বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশার্থে প্রথমস্ফুট নর-কুল-পিতা স্বন্দর ভাষা-জ্ঞান-বৃত্তিগণে দেবাদিদেবের জগৎপতি কর্তৃক বিদ্যুতি হইয়াছিলেন। বাঁধার ভূত কালের অন্ধকারময় গর্ভে জ্যোতির্ময় সত্যমুখ নিরীক্ষণ করেন এবং বাঁধার কাল সহকারে মানব-জাতির বিদ্যা ও নীতি বিষয়ে অশেষগতি সম্বন্ধন করেন, তাঁহার। এই মতো প্রধান প্রতিপোষক। তাঁহার বিশ্বাস করিতে পারেন না যে জগৎকারণ যাহাকে ভূমণ্ডলের আদিপতা প্রদানার্থে স্বজন করিলেন, সেই নবসৃষ্ট আদিপুরুষের কোন আভাব ছিল। শব্দানুরণ-শক্তি-বিশিষ্ট অথচ ভাষা-বিবর্জিত, বিজ্ঞান শূন্য, নীতি শূন্য, ধর্ম শূন্য অসভ্য চুড়ামণির আদি পিতা বলিতে তাঁহাদিগের লজ্জা হয়; এজন্য সঙ্গুণবিশিষ্ট মনোহর মূর্ত্তি কল্পনা করেন। কিন্তু এরূপ কবির চিত্তে প্রত্যয় স্থাপন না করিয়া, যথার্থতত্ত্ব নিরূপণার্থে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদিগের কর্তব্য। দেখ, ইতিহাস পাঠে কি জানা যায়। মনুষ্যের ক্রমাগত অবনতি নহে, উত্তরোত্তর উন্নতি। "জ্ঞান ও নীতি" বিষয়ক প্রস্তাব প্রদ-

শিত হইয়াছে যে কালক্রমে নরজাতির জ্ঞান ও নীতির বৃদ্ধি চইতেছে। সত্য বটে, কোন নির্দিষ্ট-দেশ-বাসীদিগের প্রভাবের উন্নয়ন আছে; যেমন তাহাদিগের এক সময়ে উন্নতি হইতেছে, তেমনই অপর সময়ে অবনতি হইতেছে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সমগ্র মানবজাতি ক্রমেই উন্নত চইতেছে, অবনত হইতেছে না। জ্যোয়ার আরর হইলে যেমন অপর ক্ষণের মধ্যে জল রুদ্ধ বুঝা যায় না, বরং ভাটাই হইতেছে সম্ভব থাকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সলিলের উচ্চতা বিলম্ব উপলব্ধি হয়; তেমনই অপর কালের মধ্যে মনুষ্য জাতির উন্নতি নয়নগোচর না হইয়া অবনতি প্রতীয়মান হইলেও অধিক সময় ব্যবধানে দেখিলে উন্নতি অস্বত্ব হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষাও উন্নত চইতেছে। সভ্যতা জনিত স্মৃতি ভাব প্রকাশার্থে স্মৃতি শব্দ সৃষ্ট হইয়া ভাষার কলবের বৃদ্ধি করিতেছে, অথবা ভাষার ভাব প্রকাশিকা শক্তি বিস্তার করিতেছে। স্মৃতিভাষা ঈশ্বরপ্রদত্ত সঙ্গীত-সুন্দর পদার্থ, সঙ্গ গুণ বিশিষ্ট আদিমানবের অল্পপ্রাঞ্জিত সম্পত্তি, এমনটী ঐতিহাসিক-প্রমাণ-বিরুদ্ধ। ইহার আর ও অনেক দোষ আছে। আমাদিগের কি না ঈশ্বর-প্রদত্ত? কিন্তু ঈশ্বর শক্তি ও উপকরণ দিয়াই দ্বন্দ্ব হন। তিনি অটলিকা-নির্দোষ করিয়া দেন না; প্রস্তুত, মূর্ত্তিকা, তুর্ক, প্রভৃতি, বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং

তাহাদিগকে স্রষ্টবিত্ত করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। সেই রূপ হয়ত তিনি আমাদিগকে শব্দানুরণও শব্দ স্রষ্টবিশেষ শক্তি দিয়া থাকিবেন। তাহারা যদি আমরা ভাষা প্রস্তুত করিতে পারি (পারি যে ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া যাইবে), তবে ভাষা মনুষ্য-নির্ধৃত নহে, ঈশ্বর প্রদত্ত, কেন ভাবিবে? এই রূপ রথা কল্পনা দ্বারা অসম্বন্ধানুর পথ রুদ্ধ করা হয়, এই মাত্র। যাহা কিছু লোকে বুঝিতে পারে না, তাহা হইতেই ঈশ্বরকে আনিয়া ফেলে। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অগ্নিতে পূর্ণের ঈশ্বরের হস্ত দৃষ্ট হইত; কিন্তু বিজ্ঞান তাহাদিগকে প্রকৃতির নিয়মের অধীন করিয়াছে। যদি মানব বংশের আদি পুরুষ হাত, পা, মাক, কান, চোক, প্রভৃতির ন্যায় ভাষাও পাইতেন, তাহা হইলে আর একটা বিপদ ঘটতি। যে ভাষা সম্পূর্ণ, তাহাতে প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক আদিপিতার এক একটা নাম চাই। যখন আদি পিতার অধম জ্ঞান হইল, সকল পদার্থ একবারে তাঁহার প্রত্যেক গোচর হইয়াছিল, বিশ্বাস করা যায় না; যদি না হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম গুলি কি রূপে তাঁহার স্মরণে রহিল, এবং স্থল বিশেষে তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে বা শিখিলেন? ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গুরিয়া এক একবার সমুদায় বস্তুর নাম না বলিয়া দিলে, তাঁহার শব্দ-প্রয়োগ-জ্ঞান জগিবার আর কোন উপায় এই মতালুসারে উদ্ভাবিত হয় না।

সম্মতিবাদ পঞ্চাবলম্বীদিগের মতে

* আমাদিগের দেশে বাঁধার বৈষম্য অপৌরুষেয় বস্তু, তাহাদিগের মধ্যে কেহও ভাবেন, বৈষম্যময় বিদ্যুতি নহে, ঈশ্বর প্রদত্ত; কেহ বিবেচনা করেন যে বৈষম্য, কাহারও রচিত নহে। শোকার মতে

ভাষার নিত্যতা কল্পিত হইতেছে; কিন্তু এমনটী এরূপ অসম্ভব, যে ইহার বিষয়ে কিছু লেখা আবশ্যক প্রায় হইল না।

কতকগুলি লোকে পুর্নজালে একত্রিত হইয়া নিষ্কারিত করিয়াছিল যে এই এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। কিন্তু ভাষার স্ফূর্ত্যভাবে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কি রূপে তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জানিল? এমনটা স্বতরাং ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে খাটে না। অনেক লোকে কেন একটি বস্তু বুঝাইতে একই শব্দ প্রয়োগ করে, ইহাই এমতের প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায়? ইতিহাসে ত নাই। সঙ্কল্প বা সম্মতি ভাষা পরিবর্তনে অতি অল্প কার্যই করিয়াছে। প্রতিযোগী শব্দ ও ভাষারদ্বন্দ্ব আমাদের সম্মুখেই চলিতেছে; এই মারাত্মক বিরোধে সম্মতি বা সন্ধি কিছুই দৃষ্ট হয় না। বাহা স্বভাবতঃ মিষ্ট, বাহা বহুজন-পরিগৃহীত, বাহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি-গণ কর্তৃক ব্যবহৃত, বাহা বল, ঐশ্বর্য বা ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, বাহা পার্শ্ববর্তী সভ্যতার উপযোগী, তাহা ক্রমশঃ বহিষ্কৃত হইয়া জয় লাভ করে।

এক্ষণে আমরা অস্বকৃত বাদ প্রকটনে প্রস্তুত হইতেছি। এই মতে কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক চিত্তা-বেগ বশতঃ আমাদের গুরুত্ব হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয়, সেই রূপ শব্দ বা স্বরের অঙ্করণে ভাষার উৎপত্তি। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত প্লেটোর একই মতের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইদানীন্তন কাদীন গ্রন্থকার দিগের মধ্যে ফরাসীদেশীয়

রিনান্ট এবং ইংলও নিবাসী ফ্যারার † এই মত সমর্থন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই মতের মূল কেবল দুইটা কথা; প্রথম মহাব্যের শব্দাক্করণ শক্তি আছে, দ্বিতীয় বিশ্বায় হর্ষ প্রভৃতি চিত্তা-বেগ-বশতঃ মহাব্যের মুখ দিয়া স্বভাবতঃ শব্দ বিশেষ বিনির্গত হয়। এই দুইটাই যে সত্য, প্রতি দিনই জানিতে পারা যাইতেছে। অঙ্করণশক্তি-প্রভাবেই আমরা ভাষা শিক্ষা করিতে পারিতেছি; অঙ্করণশক্তি থাকাতোই বিভালের শব্দ শিখিবার পূর্বক অনেক বালকে মাঝারূপে “ম্যাও ম্যাও” বলে। চুৎখ, ঘৃণা, চমক, আহ্লাদাদির আভির্ভাষ্য হইলে যে আপনাআপনিই আসা হইতে শব্দ নিঃসৃত হয়, ইহাও কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আবেগ-বাক্য শব্দসঙ্কেত-যেরূপ সাধারণ বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় দৃষ্ট হয়, তাহাও বোধ হয় এই স্বাভাবিক বেগের ফল।

অস্বকৃত বাদ মতে স্বতরাং এই মাত্র অস্বকৃত হইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল শক্তি থাকতে মানব জাতির ভাষা রক্ষা হইতেছে, সেই সকল শক্তি প্রভাবেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে যে শক্তি থাকতে শিশুগণ মহাব্যোচ্ছারিত শব্দের অঙ্করণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, এবং সময়ে সময়ে কথার অকুলান বশতঃ স্তনন স্তনন শব্দ সৃষ্টি করে, সেই শক্তি থাকাতোই আদিম পিতৃগণ

* Renan.

† Farrar.

পক্ষীগণের সঙ্গীত, অপর জীবের রব, জলের কল কল, পত্রের সর্ধর প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক শব্দের অঙ্করণ করিয়া ভাষার মূল পত্তন করেন।

কখন এই অস্বকৃত শক্তি মহাব্য জাতির মধ্যে প্রথম বিকাশ পায়, আমরা অজ্ঞান। করিতে যাইব না। মহাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরিণামবাদ সত্য হউক বা বিখ্যা হউক, নরকুলের পূর্বপুরুষগণ ভাষা বিহীন পশুত্ব অবস্থায় ছিল না, তাহা আমাদের নির্ণয় করবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান মানব প্রসূতি স্থলত শব্দাক্করণ শক্তি যাহার ছিল না, সে এপ্রক্সে মহাব্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে যদি অস্বকৃতবাদই সত্য, তবে কেন সংস্কৃত বা ইংরাজি প্রভৃতি উন্নত ভাষাতে অঙ্করণোৎপন্ন-লক্ষণ-যুক্ত শব্দ অধিক পরিমাণে দেখা যায় না? কেন আমরা ম্যাও ম্যাও না বলিয়া বিভাল বা কাট বলি, খাওং বা বলিয়া মার-মেয় বা ডগ্ বলি, ইতাদি? দ্বিতীয়তঃ কেনই বা বিবিধ ভাষার বহু বিস্তীর্ণ শব্দ মাত্রা স্বাভাবিক শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইয়া গুটিকতক দাঁড় হইতে সসুৎপন্ন দৃষ্ট হয়? নিম্নে এবিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, ইহা মনে রাখা উচিত যে সংস্কৃত ও ইংরাজিতে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহাদিগকে স্পষ্টই অস্বকরণোৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কাক ও ইংরাজি কুক, সংস্কৃত কোকিল এবং ইংরাজি কুক, সংস্কৃত কুকুট ও ইং-

রাজি কক, এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচ্য যে সংস্কৃত বা ইংরাজির ন্যায় স্বন্দর-ভাব-প্রকাশক ভাষা পাইয়াও মহাব্যের মন অদ্যাপি অস্বকৃতির পক্ষপাতী আছে। যখন আনন্দাত্তিকেরা বলেন যে যজ্ঞপ ভাব, তজ্ঞপ শব্দ বিন্যাস করিবে, যখন উৎকৃষ্ট কবিগণ তদুচ্চায়া কাব্য করিতেও বিশেষ প্রয়াস পান, তখন বক্তিতে হইবে যে আমাদেরগণ অস্বকরণে একটি নিগূঢ় বিশ্বাস-আছে যে, ভাষার উদ্দেশ্য তখনই সর্বাধিক সাফল হয়, যখন বর্ণিত পদার্থের সহিত ব্যবহৃত পদের শব্দগত সাদৃশ্য থাকে। তৃতীয়তঃ ইহাও দৃষ্টব্য যে যদি কোন কথা বাস্তবিক অস্বকৃতিজাত হয়, তাহা নির্ণয় করাও বড় কঠিন কাজ, কারণ অঙ্করণোৎপন্ন হইলেও দেশভেদে নামগত অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য ঘটে। দেখ, সংস্কৃত কল কল ও ইংরাজি মর্স, সংস্কৃত শুন শুন ও ইংরাজি হিসিং, একই স্বাভাবিক শব্দের অস্বকৃতি; কিন্তু তাহাদিগের রূপ কত ভিন্ন। প্রাকৃতিক শব্দ ও তৎপ্রকাশক কথার পরস্পর, সম্বন্ধ অতি দূরবর্তী ও কম্পনামূলক। যখন একটি পাখি ডাকিতেছে, অস্বকৃতি করিলে দৃষ্ট যে তাহার স্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্ণে ভিন্ন প্রকার লাগে। লোকের ইচ্ছায়াবোধের তাহাভাষা আছে। উপস্থিত মনের গতিতে বহির্লক্ষণকে স্তনন ভাব প্রদান করে। যে বিহঙ্গম-রব এক সময়ে মধুর সঙ্গীত বোধ হইবে, অন্য সময়ে তাহাই অস্বাভাবিক শোকসিক্ত হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি জ্ঞান হইবে। যে শব্দে ভাবুক ঐশ্বরিক

পাদ্বীর্ঘ্য দেখিবেন, সে শব্দ হয় ত বিরহী মদনোদীপক ভাবিবেন। রঞ্জিত কাচের ন্যায় আবাদিগের সন্মোর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে স্ববর্ণে আচ্ছাদিত করে; স্বতরাং একই শব্দ যে ভিন্নভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিয়া অন্ধকরণ করিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। চতুর্থতঃ, অন্ধুতি-মূলক শব্দ যখন প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা সম্ভবতঃ একটি বিশেষ পদার্থের নাম মাত্র ছিল; পরে তৎসমূহ অপরূপ বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া ইহা জাতিস্বরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যে সাদৃশ্য লইয়া ঈদৃশ অর্থবিস্তার ঘটে, তাহা শব্দগত না হইয়া আকার গত বা অন্য কোন কল্পিত লক্ষণ গত হইতে পারে। এই রূপে কল্পিত উহার প্রাকৃতিক শব্দ মূলক অর্থ লুপ্ত হইবে, এবং উহা উক্ত জাতি-গুণদ্ব্যক্ট ঋতু বলিয়া গণ্য হইবে, আশ্চর্য্য নহে। কি রূপ প্রকিয়া দ্বারা বিশেষ নাম সাধারণ নাম হইয়া পড়ে, সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান যাইতে পারে। দেখ, তৈল শব্দের প্রকৃত অর্থ তিল নামক একটি বিশেষ পদার্থের নির্ঘাস; কিন্তু রূপগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা সরিষা বাদাম প্রভৃতির নির্ঘাসকে সরিষার, তৈল, বাদামের তৈল, ইত্যাদি বলিয়া তৈল শব্দকে জাতিনাম করিয়া লইয়াছি। স্বতরাং এক্ষণে তৈল শব্দের অর্থ পূর্ণাঙ্গীকরণ বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বালকেরা কিরূপে শব্দ প্রয়োগ করিতে শিখে, তাহা দেখিলেও অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। মনে

কর, একটি শিশু ঘোড়া ও কুকুর বাটীতে দেখে ও তাহাদের নাম শিখিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে সে কিড়াল বা ছাগল দেখিলে তাহাকে কুকুর বলিবে, এবং গোয়াল কি উট দেখিলে ঘোড়া বলিবে। যদি একজাতীয় জীবের রব শুনিয়া তদনুসারে তাহার নামকরণ হয়, এবং বিভিন্ন-রব-বিশিষ্ট অপর জন্তুর প্রতি আকৃতি, গতি বা অন্য কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া সেই নাম বিস্তার করা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক রবানুগত অর্থ যে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

অগোস্ত কোমত বলিয়াছেন যে, সকল বিষয়েই জ্ঞানের তিনটা অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কার্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে অবদর্শনজির আশ্রয় লই; পরে এমন কোন কারণ নির্দেশ করি, যাহার সম্ভার প্রমাণ নাহি; পরিশেষে পরিজ্ঞাত তত্ত্বগত নিয়ম অবলম্বন করি। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তিনটা মতের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে কোমতের ব্যাখ্যার পোষকতা হইতেছে। ঈদৃশ মন্তব্যকে ভাষা দিয়াছেন, ঐতিহাসিক-প্রমাণ-স্থানা বর্ত্তমান-ব্যবহার-বিস্তৃত লৌকিক সম্মতি হইতে ভাষা জন্মিয়াছে, এক্ষণে মন্তব্যের যে শব্দানুসরণশক্তি দৃষ্ট হইতেছে, সেই শক্তি প্রভাবেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনটা মত জ্ঞানোন্মিত সংজ্ঞাত তিনটা অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গালা ভগ্নাংশ।

গণিত শাস্ত্রবেত্তারা সংখ্যা মাত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভাজ করেন। বাঙ্গালাতে তাহার বিশেষ কোন নাম নাই, তবে অভিনব অঙ্ক পুস্তক প্রণেতাগণ এক শ্রেণীর প্রতি “অবছিন্ন” এবং অন্যের প্রতি “অনবছিন্ন” নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ নাম বাহাই হউক, শ্রেণীদ্বয়ের লক্ষণ এই যে, ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা গুলি যখন কোন পদার্থ বিশেষের সংখ্যা বলিয়া প্রকাশিত হয়, যেমন ৫ টাকা, ৭ পয়সা, ১২টা কলম, তখন উহা অবছিন্ন সংখ্যা নামে একটি পৃথক শ্রেণী রূপে গণ্য হয়, এবং যখন কোন পদার্থ বুঝায় না—নিরবছিন্ন সংখ্যাই ব্যক্ত করে, যেমন পাঁচ আর সাতে বারো, তখন সেই সংখ্যাগুলি অনবছিন্ন সংখ্যা নামোদ্ধৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়।

অবছিন্ন সংখ্যার মধ্যে কতক গুলির বিশেষত্ব ভাগ নির্দিষ্ট আছে যথা, দশ, পল, বিপল; মন, সের, পোয়া, ছটাক, কীচা; টাকা, আনা, পয়সা, পাই ইত্যাদি। যে সকল সংখ্যার দ্বারা এগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার নাম মিশ্র রাশি।

তদ্রূপ অনবছিন্ন রাশির ভাগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ইংরাজিতে সামান্য ও দাশমিক ভগ্নাংশ নামক সংকেত প্রচলিত আছে। প্রায়জান মতে এই সংকেত মিশ্ররাশি প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিশ্ররাশি ভিন্ন অন্য স্থলে অব-

ছিন্ন সংখ্যার অংশ প্রকাশের তাৎপর্য্য আশঙ্ক্যতা উপস্থিত হয় না, যেমন আধ খানা কেদারা। কিন্তু ইচ্ছা করিলে এক্রূপ স্থলেও উল্লিখিত সংকেত নিযুক্ত করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালাতে অনবছিন্ন রাশি ভাগের সংকেত কি?

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিশ্ররাশি প্রকাশ করিবার জন্য বাঙ্গালাতে দুই প্রণালি অবলম্বিত হয়। তন্মধ্যে একটিতে পণ, চৌক, গণ্ডা নামক সাম্প্রতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, এক মন বারো সের সাতে ছটাক লিখিতে হইলে ১২১/১০ এইরূপ অঙ্ক পাত করিতে হয়, আর ৩ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন অথবা ৭ দশ ১২ পল ৩ বিপল লিখিতে হইলে জন্মায় “৩৫০৭” দিন “এবং ৭১২১০ বিপল” লিখিতে হয়। এক্রূপ অঙ্ক লিখিবার ইংরাজি প্রণালী এই, যথা, “১ ম—১২ সে—৭ ছ; ৩ ব—৫ মা—৭ দিন” এবং “৭ দ—১২ প—৩ বি।”

লেখকের অস্থান এই যে, বাঙ্গালাতে মিশ্র রাশি প্রকাশ করিবার জন্য স্থান বিশেষে যে পণ-চৌক আদি চিহ্ন প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা কোন বিশেষ পদার্থের সংখ্যা প্রকাশ করে না, কেবল অনবছিন্ন সংখ্যা, অঙ্কের ভগ্নাংশ প্রকাশ করে। অতএব পণ চৌক লিখিবার দ্বারা মন্তব্যকে বাঙ্গালা ভগ্নাংশের সংকেত বলিয়া গণনা করা কর্তব্য।

বাঙ্গালীতে অনবর্নন সংখ্যা বিভাগের
নিমিত্ত প্রধানতঃ ছটা পর্যায় (table)

প্রচলিত আছে এবং তদুভয় পরস্পরের
অনুরূপ। যথা—

(১) এক কাহন বা পূর্ণসংখ্যা একের	চতুর্থাংশ এক চৌতাল।	ইহার সাংখ্য- চিহ্ন চিহ্ন	১০
এক চৌতালের	এ	এক পণ	চিহ্ন ১০
এক পনের	২০ ভাগের ১ ভাগ	এক গড়া	চিহ্ন ১০
(২) এক গড়ার	চতুর্থাংশ	এক কড়া	চিহ্ন চৌতাল
এক কড়ার	এ	এক তাল	চিহ্ন পণ ১০
এক কালের	২০ ভাগের ১ ভাগ এক তাল	চিহ্ন গড়া	(২)

অতএব ভাষাংশের বিষয় বিচার ক-
রিতে গেলে কড়া, কাল, তিল, এবং
চৌক-পণ গড়ার মধ্যে কোন প্রভেদ
নাই, স্বীকার করিতে হইবেক। গড়ার
বাম পার্শ্বস্থ এবং কাহনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ
চিহ্নকে ইলেক বলে; স্বয়ং ইহার দ্বারা

কোন সংখ্যা প্রকাশ হয় না, কেবল
পার্শ্বস্থিত অঙ্কের নাম ব্যক্ত হয়।
নিম্নোক্ত মিশ্রাংশির পর্যায় গুলি
দৃষ্ট করিলে প্রকাশ হইবেক যে, তাহা
লিখিবার জন্য চিহ্ন উল্লিখিত নিয়মালু-
সারেই পণ চৌক গড়া ব্যবহৃত হইয়া
থাকে।

(১) ১ টাকার	(১) চতুর্থাংশ	১ সিকি	চিহ্ন ১ চৌক	১০
১ সিকির	এ	১ আনা	চিহ্ন ১ পণ	১০
১ আনার	এ অর্থাৎ ২০ ভাগের ৫ ভাগ	১ পরসা	চিহ্ন ৫ গড়া	(৫)
(২) ১ মনের (১/১০)	চতুর্থাংশ	১০ সের	এ ১ চৌক	১০
১ সেরের (১/১)	এ	১ পোয়া	এ	১০
১ পোয়ার	এ	১ ছটাক	এ ১ পণ	১০
১ ছটাকের	এ অর্থাৎ ২০ ভাগের ৫ ভাগ	১ কাঁটা	এ ৫ গড়া	(৫)
(৩) ১ কাহন (১) শস্যের চতুর্থাংশ	এ	৪ শলি বা দিশ	এ ১ চৌক	১০
৪-বিশের	এ	১ শলি বা দিশ	এ ১ পণ	১০
১ কাহনের ১৬ ভাগের ১ ভাগ	এ	১ পালি	এ ১ গড়া	(১)
১ দ্রিশের ২০ ভাগের ১ ভাগ	এ	৫ কাটা	চিহ্ন ১ চৌক	১০
[পালির বিভাগেও আবার যথা	এ	১ পোয়া	এ ১	১০
(৪) ১ বিহার (১/১০) চতুর্থাংশ	এ	১ ছটাক	এ ১ পণ	১০
১ কাটার (১/১)	এ	১ পোয়া	এ ১	১০
১ পোয়ার	এ	১ ছটাক	এ ১ পণ	১০

মন সংখ্যার দক্ষিণ এবং সের পোয়া
সংখ্যার বাম পার্শ্বস্থিত চিহ্নটা পণের

অনুরূপ, কিন্তু কার্যে ইলেকের সমুদ্র, এই
জন্য উহার দ্বারা পণ-চৌক-সংখ্যাক

ভাষাংশের নিয়ম অতিক্রান্ত হয় নাই।
বিধা এবং কঠার সংখ্যাতো এই
প্রকার, পণের অনুরূপ ইলেক প্রয়োগ
হইয়া থাকে।

এ সংখ্যক পর্যায়ালুসারে দীর্ঘ এবং দীর্ঘ
প্রশ্ন কালি উভয় প্রকার মাণ্ড ও তাহার
অঙ্ক পাঠ করিতে হয়। জুমির কালি
করণ বিষয়ে ইংরাজি প্রণালিতে বাঁহা-
দিগের গাঢ় সংখ্যার হইয়াছে, তাঁহা-
দিগের পক্ষে উপরিলিখিত পর্যায় অঙ্ক-
সারে হিসাব করিতে গোলাযোগ অর্থাৎ
এক কাঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ পোয়া-
গণ্য করিয়া, লিখিবার সময়ে পোয়ার
অঙ্কপাঠ করিতে হয় এবং এতদ্বারা
সংখ্যা ভাগ করিতে হয়। যথা চারি
কাঠা প্রশ্ন এবং ছয় কাঠা দীর্ঘ জুমির
ধাকিত, তাহা হইলে অনেক মিস্রি
হইত। কিন্তু প্রচলিত প্রণালি অলুসারে
এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। দীর্ঘ নাপাই
হউক বা দীর্ঘ প্রশ্ন কালিই হউক, ১
বিহার বিংশতি ভাগের এক ভাগের
নাম ১ কাঠা। এই জন্য কালি ১ কাঠা
শব্দে, দীর্ঘ ২০ কাঠা এবং প্রশ্ন ১ কাঠা
বা তৎসুল্য পরিমিত জুমি বুঝিতে হয়।
সুতরাং যে জুমি ষণ্ড দীর্ঘ প্রশ্ন
উভয় দিক কেবল ১ কাঠা মাত্র, তাহার
কালি, এক কাঠার ২০ ভাগের ১ ভাগ
হইবেক। কিন্তু উপরিলিখিত পর্যায়
কাঠার চতুর্থাংশ পোয়া এবং বোড়শ
অংশ ছটাক বাক্য পাওয়া যায়। অতএব
দীর্ঘ প্রশ্ন ১ কাঠা জুমির মাণ্ড প্রকাশ
করিবার উপায় কি? শুভঙ্কর কহেন,

“কাঠার কাঠার ধূল পরিমাণ,
দশ দিশ গড়া কাঠার মান।”
অর্থাৎ দশ গড়া কাঠার প্রমাণ।

এই বচনানুসারে ছয় প্রকার হিসাব
হইয়া থাকে।

কাঠার কাঠার গুণ করিয়া যে গুণ ফল
হয়, তাহাকে গড়া কঁহে। কিন্তু পণের
বিংশ ভাগ গড়ার সহিত তাহার কোন
সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

১ ম প্রকার হিসাব। সামান্যতঃ
কাঠার কাঠার গুণ করণান্তর গুণফল
৫ গড়া কি তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ ইত্যাদি
কোন সংখ্যা হইলে প্রত্যেক ৫ গড়াকে
এক কাঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ পোয়া-
গণ্য করিয়া, লিখিবার সময়ে পোয়ার
অঙ্কপাঠ করিতে হয় এবং এতদ্বারা
সংখ্যা ভাগ করিতে হয়। যথা চারি
কাঠা প্রশ্ন এবং ছয় কাঠা দীর্ঘ জুমির
কালি করিতে হইলে-চারি ছয়ে ২৪
গড়ার মধ্যে ৪ গড়া ভাগ করিয়া ২০
গড়ার স্থলে ১/১ এক কাঠা কালি গণনা
করিতে হয়। আবার দীর্ঘ প্রশ্ন পাঠ
কাঠা ও চারি কাঠা হইলেও সেই ১/১
এক কাঠা কালি হয়।

২য় প্রকার। এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম হিসাব
করিতে হইলে গড়া প্রতি, ৪ কড়া গণনা
করিয়া উপরিলিখিত ৫ গড়ার চতুর্থাংশ
অর্থাৎ প্রত্যেক ৫ কড়ার স্থলে ১/১ এক
ছটাকের অঙ্ক পাঠ করিতে হয় এবং
তদনন্তর কড়া প্রতি, ৪-তিল পরিয়া
ছটাকের অঙ্কের পরে শতিকা
দ্বারা সেই ত্রিগুণ লিখিতে হয়। যথা, দীর্ঘ
প্রশ্ন ছয় কাঠা ও চারি কাঠা হইলে
১/১৫ এক কাঠা তিন ছটাক চারিতিল
কালি হইবেক।

এখল পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন
যে এই তিল, ১/১ কাঠার ৩২০ ভাগের ১

ভাগ; স্বতরাং ৮০ ভিলে যে ১ কড়া হয় সে ভিলের সহিত এই ভিলের কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্য আমরা অল্পমান করি যে উল্লিখিত শুভঙ্কর বচনে “দশ বিশ গণ্ডা কাঠার যান” এই পাঠই প্রাচীন। এবং এ স্থলে “গণ্ডা” শব্দ বচনোক্ত ধূল শব্দের প্রতিস্থাপন মাত্র। আর এই পাঠ ধরিলে খুব বা গণ্ডা পরিভাষণ করণ বিষয়ে যে প্রকার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও মুক্তিদর্শিত হইতে পারে। ইদানীন্তন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি সহকারে ক্ষমতর গণনা আবশ্যক হওয়াতে “বিশ গণ্ডা কাঠার প্রমাণ” এই পাঠান্তর ও তাহার আভ্যন্তরিক কড়া ভিলের নিয়ম প্রচলিত হওয়া অসম্ভব, নহে, তথাচ অনাবস্থিগ রাশির ভিলের সহিত কাঠার ভিলের একা রুকা হয় নাই।

যাহা হউক এতদ্বারা এই প্রকাশ হইতেছে যে কাঠার ভগ্নাংশ গণ্ডা, কড়া, ভিলই হউক বা পোয়া ছটাকই হউক, উভয় প্রকার রাশি লিখিবার জন্য কেবল পণ চৌকরেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। এবং কাঠা কালির অন্তর্গত কড়া গণ্ডার কোন পৃথক চিহ্ন নাই।

এক কাহনের সমান দ্বিমত প্রকার আদ্যের ফল—

৪ পোয়া = ২ ^৪
১৬ পোয়া = ২ ^৪
৩২০ গণ্ডা = ২ ^৪ × ৫
১,২৮০ কড়া = ২ ^৪ × ৫
৬,৪০০ জাতি = ২ ^৪ × ৫ × ১০
৫,১২০ কাঠ = ২ ^৪ × ৫
৬,৪০০ তাল = ২ ^৪ × ৫
৬,২২৪ হাঁপ = ২ ^৪ × ৫ × ৭
১১,৫২০ দহী = ২ ^৪ × ১০ × ৫

উপরিলিখিত পর্যায় সমূহ ভিন্ন অন্য কোন মিশ্র রাশিতে ণৈ চৌক প্রয়োগ হয় না। কেবল ভূমি সম্পত্তির স্বত্ব বিভাগের নিমিত্ত মুদ্রা প্রকাশ করিবার পর্যায় ও চিহ্ন গুলি ব্যবহৃত হয়। অতএব এতদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে চৌক পণ গণ্ডা সর্বত্র এক নিয়মে পর পর ৪, ৪, ২০ ভাগ প্রকাশ করে, স্বতরাং উক্ত নামের চিহ্ন গুলি অনবচ্ছিন্ন রাশির ভগ্নাংশ জ্ঞাপক বলিয়া গণ্য।

উল্লিখিত পর্যায় গুলি ব্যতীত মুদ্রা ভাগ বিষয়ে আর কতিপয় নিয়ম প্রচলিত আছে। তৎসমুদায় কড়ার ভাগ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের বিবেচনা মতে এক কাহন বা ১এর ভাগ বিশেষকৈ কড়া কহে, এই জন্য ঐ ভাগ গুলি কাহনের অংশ রূপেই প্রকাশ করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত ফল দেখিলে পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালা মতে কি কি প্রকার এবং কতদূর সূক্ষ্ম ভাগ হইতে পারে। ফলদের লিখিত বিভাগ গুলির মধ্যে কেবল পণ চৌক এবং ক্রান্তির পৃথক মুদ্রি আছে।

১৪,৮০০ কড় = ২ ^৪ × ৫ × ১১
৫৪,১০০ বট = ২ ^৪ × ১০ × ৫
১৬,৩৪০ খিণ = ২ ^৪ × ৫ × ১০
৭৭,২০০ ভূতন = ২ ^৪ × ৫ × ৭ × ৭
৩৪,৫০০ মর = ২ ^৪ × ১০ ^৩ × ৫
১,২০,৪০০ ভিল = ২ ^৪ × ৫ ^৩
৫,৩১,৩০০ রেণু = ২ ^৪ × ৫ ^৩ × ১০ × ৭
১৬,০৪,৪০০ মণ = ২ ^৪ × ৫ ^৩
৩,২৭,৬০,০০০ বিন্দু = ২ ^৪ × ৫ ^৩

এই ফলদের দক্ষিণ ভাগের অল্প গুলির দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইবে যে বাম ভাগের অল্প সমূহ কি কি সংখ্যার গুণফল।

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্দারিকারী কৃত বাণী গণিত-অবলম্বন পুস্তক এই ফলদের রেণু, ঘণ এবং বিন্দুর সংখ্যা লেখা গেল, কিন্তু ভুলিষয়ে মতভেদ আছে।

যাহা হউক ফলদীপ্তি প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনেক গুলি কথা স্মরণস্থ হইবেক। বাঙ্গালা ভগ্নাংশ লিখিবার প্রণালিমতে কোন সংখ্যার বা মুদ্রার ৩২৭, ৬৮০০০, তিনকোটি ২৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ভাগের ভাগ প্রকাশ করা যায়, তাহাঁই যায় না। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রভাগ সহসা প্রয়োজন হইতে দেখা যায় না, তথাচ তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই বলিয়া প্রণালীকে অবশ্যই নিন্দা করিতে হইবেক। এই প্রণালির ভগ্নাংশের আরো

কতিপয় দোষ আছে। তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

২। ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ এই ছয়টি সংখ্যা ঘটতি কতক গুলি সংখ্যার দ্বারা অন্তঃ ৩২৭৬৮০০০ দিয়া বাঙ্গালা প্রণালিতে ১ বা ১ কাহনকে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু উহার স্থান অনেক সংখ্যা দিয়াও ভাগ করা যায় না। যথা—

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা শ্রেণীর মধ্যে ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ইত্যাদি কতকগুলি একুপ সংখ্যা আছে যে, তেঁহা ১ ভিন্ন অন্য সংখ্যার দ্বারা ভূলাভাগে বিভক্ত হইতে পারে না। এগুলিকে ইংরাজিতে Prime number অর্থাৎ অবিভাজ্য সংখ্যা কহে; ইহার মধ্যে কেবল প্রথম ছয়টি অল্প ঘটতি সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোন সংখ্যার দ্বারা বাঙ্গালা ভগ্নাংশ প্রণালিমতে অপর সংখ্যার বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে না।

৩। ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ইত্যাদি। আর এই রূপ অবিভাজ্য সংখ্যার সহিত অন্য কোন সংখ্যা গুণ করিলে যে গুণ ফল হয়, তাহা দিয়াও কোন সংখ্যাকে বিভাগ করা বাঙ্গালা সঙ্কেতের অসাধ্য।

এই দোষে কোন সম্পত্তির ১৭, ১৯, কি ২৩ কি তদধরূপ অঙ্গ প্রাণ অবিভাজ্য সংখ্যার ভাগ বাঙ্গালা প্রণালিমতে ব্যক্ত করা অসম্ভাবিত। এবং বৎসরের পরিমাণ ৩৬০ দিনের পরিবর্তে ৩৬৫ দিন অথবা মাসের পরিমাণ ৩০ দিনের পরিবর্তে ২৯ বা ৩১ দিন ধরিলে দৈনিক বেতন বা সূদের হিসাব হয় না।

৩। পুনশ্চ, অবিভাজ্য নহে একুপ

“কাক চতুর্ভুজ (৪) হইতে জ্ঞানি,
ভিন্ন ক্রান্তে বট বাধানি,
নব দহী করিয়া সার,
সাতাশ ঘরে বট বিচার,
আশি ভিলে বট কর,
লেখার গুরু শুভঙ্কর,”

অনেক সংখ্যা দিয়াও ১ কব্জনকে বিভাগ করা যায় না। যথা—৩, অর্থাৎ ৮১, ৫, অর্থাৎ ৬০৫, ৭, অর্থাৎ ৪৯, ১১, অর্থাৎ ১২১, ১৩, অর্থাৎ ১৬৯, ১৭, অর্থাৎ ২৪১৮৮ ইত্যাদি।

৪। ৩, ৭, ১১, ১৩, ২৫ বা এতাদৃশ কতকগুলি সংখ্যার দ্বারা কোন সংখ্যা বিভাগ করা বাঙ্গালা প্রণালিমতে সুসাধ্য হইলেও তন্মিহিত অনেক অল্পপাত কুরিতে হয় এবং সমধিক প্রাণ ও সময় আবশ্যক করে।

৫। ইতি পূর্বে বলা গিয়াছে যে ভূমি সম্পত্তির অংশ প্রকাশ জন্য মুদ্রা বিষয়ক বিভাগ গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময়ে এইরূপ কথা পাওয়া যায়—যথা “অনুক সম্পত্তির, ঘোল আনয় ৯৫১২ দুই আনা পাঁচ গণ্ডা দুইকড়া বারো ভুবনকে ঘোলআনা গণ্ডা করিয়া, তাহার ১/৪তিনআনা চারিগণ্ডার ১/৩৯=পাঁচআনা ছয়গণ্ডা দুইকড়া দুই কান্তিরকম হিসাব।” কিন্তু ইহা পাঠ করিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে এতদ্বারা মূল সম্পত্তির সপ্তম অংশকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের তৃতীয়াংশ বৃদ্ধিতে হইবেক। অপর প্রাপ্তক ১/৩৯=অংশ যে মূল সম্পত্তির ১০৫ ভাগের ১ ভাগ, তাহাও বাঙ্গালা প্রণালিতে সহজে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজি সামান্য ভগ্নাংশ প্রণালিমতে ইহার প্রক্রিয়া যৎপরোনাস্তি সহজ।

৬। পণ-চৌক সংঘটিত ভগ্নাংশ প্রণালির এক সুবিধা এই যে, যুক্তিভেদ থাকতে ইহাতে অল্পপাতের গোলযোগ

হইতে পারে না—এবং সেই কারণে যোগ বিয়োগ (তেরিজ জমা খরচ) প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সমস্ত অঙ্ক গুলি, কড়া কাক তিল অথবা ক্রান্তি দস্তি-যব অথবা দ্বীপ ভুবন রেণু এইরূপ এক একটা পর্যায়ের অন্তর্গত না হইলে হিসাব কুরা যায় না। বাঁহারা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অস্ব-রোধ করি যে ৯ কড়া, ৭ দস্তী, এবং ১২ ভুবন, এই তিনটা সামান্য অঙ্ক একত্র ক্রি দিতে চেষ্টা করিবেন। ইহার যোগ ফল দুই কড়া এবং এক কড়ার একশত ছাংশি ভাগের সত্তের ভাগ। কিন্তু বাঙ্গালা প্রণালিতে তাহা কোনমতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৭। সমগ্রাচর এক পয়সা প্রকাশ করিবার জন্য এক বুড়ি অর্থাৎ ৫ গণ্ডা লিখিতে হয়, ইহাতে যে কিঞ্চৎ অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু সম্ভ্রতি যেক্ষণ প্রস্তাব হইয়াছে, তদনুসারে গবর্ণমেন্ট, প্রচলিত পয়সা উঠাইয়া দিয়া যদি ১ টাকার সমান ১০০ সেন্ট মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাহা হইলে ১ সেন্ট লিখিবার জন্য ৩/৪ তিনগণ্ডা তিন কাক চারিতিল এইরূপ অল্পপাত করিতে হইবেক এবং ২ হইতে ৯৯ সেন্ট পর্যন্ত পদেপদ ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া উক্ত অঙ্কের গুলি লিখিতে হইবেক। এই রূপ গণ করিতে এবং তদনুসার তাহার যোগ বিয়োগ করিতে কত আয়স আবশ্যক, তাহা কিয়ৎকাল চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

অনন্তর এই অবস্থার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্তব্য। বাঁহারা এই প্রবন্ধে এতদূর পাঠ করিয়াছেন, ভরসা করি যে তাঁহারা ভগ্নাংশ লিখিবার ইংরাজি প্রণালি না জানিলেও বুদ্ধিতে পারিবেন যে কড়া কাক ক্রান্তি আদির অস্বরূপ যত প্রকার বিভাগের পর্যায় সংস্থাপিত হউক, তাহাতে কখনই হিসাবের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবেক না। অতএব এরূপ কোন প্রণালি অবলম্বন করা কর্তব্য যে তদ্বারা যে কোন ভাগ ইচ্ছা সহজে ব্যক্ত করা যায়। আমরা মনে করি যে ইংরাজি প্রণালি অবলম্বন করাই সুবিধা। বাঁহারা ঐ প্রণালি অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এতদ্বিষয়ে দ্বিধাজ্ঞি করিবেন না। কিন্তু লেখকের বাসনা এই যে শুভক্ষরী বিদ্যা বাবসায়ীগণও এই কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।

ইংরাজি দাশমিক বা সামান্য ভগ্নাংশ লিখিতে শতিকার অঙ্ক ভিন্ন অন্য কোন চিহ্ন প্রয়োগ করিতে হয় না। এই জন্য তাহা পণ চৌকের পার্শ্বে লেখা কর্তব্য নহে।* লিখিলে ৯/৬ বা ইহার অস্বরূপ ১৯ হইবে কিন্তু তাহাতেও একট পনের অংশ কি গণ্ডার অংশ ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পরিশেষে অক্ষরের দ্বারা লিখিতে হইবেক। অন-

* কোন২ বাঙ্গালা অঙ্গ পুস্তক প্রণেতা এ.বি.বোসের প্রতি লক্ষ্য করেন না। যথা—“৩৯৬৬৬ ক” “৩৯৬৬৬ ক” ইত্যাদি প্রথম বাবুর পাঠ্যপুস্তকের পরিশিষ্ট ১৪ পৃ। ১৫শ সংস্করণ। “১০৬০১০৬ ক” “২৩৯৮৪ ক” ইত্যাদি সারদাপ্রসাদ সরকার কৃত গণিতাঙ্ক ১ম সংস্করণ পরিশিষ্ট ২৭ পৃষ্ঠা।

স্তর আর একটা অঙ্কে ৯ পণ ৬ গণ্ডা লিখিলে এক সারির অঙ্ক অন্য সারির সহিত পরিগণিত হইতে পারে। এবং এতোক সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালা ও কতকগুলি ইংরাজি প্রণালির ভগ্নাংশ থাকিলে, শেষোক্ত অর্থাৎ সামান্য ভগ্নাংশের অঙ্ক গুলির যোগ বিয়োগ কিম্বা পুনঃ করিতে হইবেক। তাহাতে কেবল উভয় প্রণালির অসুবিধা বৃদ্ধিই একত্রিত হইবেক। ফলতঃ ভগ্নাংশ লিখিবার একাধিক প্রণালি একত্রিত করা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। ইহার ভুলনার স্থল দেখাইবার জন্য আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যে কারণে ইংরাজিতে সামান্য ও দাশমিক ভগ্নাংশ একত্র প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ এবং যে কারণে বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত ইংরাজি অক্ষর অথবা ইংরাজি অক্ষরের পার্শ্বে টা বা বাঙ্গালা ভাষার অন্য কোন মাত্রেতিক চিহ্ন প্রয়োগ করা অকর্তব্য, সেই কারণে পণ চৌকের সহিত সামান্য বা দাশমিক ভগ্নাংশ সংযুক্ত করাও সুচিত।

তবে কি আনা পোয়া ছটাক প্রভৃতি রাশি গুলি ভাষা হইতে দূরীকৃত করিতে হইবেক? তাহা নহে। স্কেল এই মাত্র আবশ্যক যে বৎসর মাস দিন বা মণ্ড পল বিপল ইত্যাদি সংখ্যা গুলি যে ধারা মতে লিখিতে হয়, অন্যান্য মিশ্ররাশি গুলি লিখিবার জন্যও পণ চৌক কড়া কাক আদি চিহ্নের পরিবর্তে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবেক। ভূমি সম্পত্তির অংশ প্রকাশ করিবার জন্য কোন বিশেষ মিশ্ররাশির পর্যায়

অবলম্বন না করিয়া সীমানা ভগ্নাংশ ব্যবহার করিতে হইবেক।

আমাদিগের ভাষা এই কেবল উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতেছেন, এখনও পদবিন্যাস বা অক্ষর সংক্রান্ত এখা এতদূর বদ্ধমূল হয় নাই যে তাহার অবস্থান্তর করা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীক রোমীয়েরা সভা প্রাধান্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু তাঁহাদিগের অল্প লিখিবার প্রণালি এত জঘন্য ছিল যে তদ্বারা সামান্য প্রক্রিয়া গুলি সহজে নির্দিষ্ট হইতে পারিত না। কথিত আছে যে এই কারণে হেরোডোটস নামক ইতিহাস বেত্তার সংখ্যা বিষয়ে এত প্রমাদ ঘটয়াছে যে তাঁহার অপর সমস্ত কথা সর্বত্র গ্রহণ হইলেও সংখ্যা বিষয়ে তিনি কন্দ্ৰাচ বিশ্বাস্য নাহেন। বড় ছুৎখের কথা যে, যে দেশের শতিকা সংখ্যা প্রবালি জুনহেলর সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে, সেখানে ভগ্নাংশ প্রকাশ করিবার জন্য পণ চৌক আদি চিহ্ন গুলি অদ্যাপি ভরোহিত হয় নাই।

এখনও পাটীগণিতের নিয়মাবলী কেহ বিষয় কর্শে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন নাই, অতএব এই সময়ে গণিত শাস্ত্র বিষয় এই সংশোধন প্রসঙ্গ করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। পাটীগণিত লেখকগণ যদি পণ চৌক সংঘটিত ভগ্নাংশ পৃথক প্রদর্শন করেন এবং উহার দোষ সমগ্র দেখাইয়া ব্যবহার নিষেধ করেন, তবে বাঞ্ছালা বিদ্যালয় মন্ডলের অধ্যাপক মহাশয়েরা তাহা দূরীকৃত করিতে না পারেন, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন। আর আদ্যাত্মের অধ্যক্ষ অর্থাৎ উচ্চ নিম্ন শ্রেণিগত জজ কালেক্টর মহাশয়েরা - যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়া সেরেস্তার পুস্তকাদিতে পণ চৌকের পরিবর্তে ইংরাজি প্রণালিতে সিগ্জাশি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন, তবে অচিরে উহা সর্বত্র প্রচলিত হইবে এবং সেই সময়ে দশমিক ও সামান্য ভগ্নাংশ প্রয়োগের সুযোগ হওয়াও অসম্ভবিত নহে।

ইন্দিরা।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর, আমি স্বস্তর বাড়ী হইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে ডিয়ারছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত স্বস্তরের

খর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, স্বস্তর দরিদ্র, বিবাহের কিছু দিন পূর্বেই স্বস্তর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইছেন না। বলিলেন, “বিবাহকে বলও,

বে, আগে আমার জ্ঞাত্যাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তার পর বধু লইয়া বাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?” শুনিয়া আমার স্বামির মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং অর্ধোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদত্রেজ, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অভিব্যক্তি করিয়া, পঞ্চায়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থ উপার্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্ধোপার্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সহায় লইলেন না। যে সময়ে আমার ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্বে তিনি বাড়ী আসিলেন। রব উজিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট বটে ত?) কর্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার স্বস্তর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আপনার আশীর্ষকে উপেক্ষা (আমার স্বামির নাম উপেক্ষা—নাম পরিলাস, প্রাচীনরা যাক্জন করিবেন; ভাল আদর্শে তাঁহাকে আমার “উপেক্ষা” বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—উপেক্ষা বধুযাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পালকী বেহারা পাঠাইলাম, বধুযাতাকে এ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আত্মা ক-

রিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্ভব করিব।”

পিতা দেখিলেন, স্মৃতন বড়মাহুৎ বটে। পালকী খানার ভিতরে কিংখাপ মৌড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁশে রূপার হাল্লরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরম পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা মোনার দানা। চারিজন কালো দাড়িওয়ালা ভোকপুয়ে পাল্কির সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড় মাহুৎ। হাসিয়া বলিলেন, “মা, ইন্দির! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র তোমাকে লইয়া আসিব। দেখ, আত্মল ফুলে কলাগাছে দেখিয়া হাসিও না।”

তাই আমি স্বস্তর-বাড়ী বাইতেছিলাম। “আমার স্বস্তর বাড়ী মনোহর-পূর। আমার পিতালায় মহেশপূর; উভয় গ্রামের মধ্যে দশ কোশ পথ। স্বতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌছিতে পাঁচ সাত দণ্ড ব্রাজ হইবে, জন্মিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক রহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্ধ-কোশ। পাছাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পাশে বট গাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মহুয়ার সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে এক খানি দোকান আছে না? নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে একা লোকজন আসিতে

ভয় করিত। দম্যতার ভয়ে এখানে দল-বন্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে “ডাকাতে কলানদী” বলিত। দোকানদারকে লোকে দম্যদিগের সহায় বলিত। আমার সে গঁকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ঘোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

কখন আমরা এইখানে পৌঁছিয়াছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল, যে আমরা, কিছু জল চান না খাইলে আর যাইতে পারি না। দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, এ স্থান ভাল নয়। বাহকেরা উত্তর করিল, আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি? আমার সঙ্গে লোক জন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীর্ঘর ঘাটে—বটতলায় আমার পাঙ্কী নামাইল। আমি অনেক পরে, অতঃপরে বুঝিলাম যে লোক জন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অঙ্গ দ্বার খুলিয়া দীর্ঘ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বট রুক তলে বসিয়া জলপান করিতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতিদূর্নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে। চারিপার্শ্বে পর্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ, অথচ সুকোমল শ্যামল ভূবারণ শোভিত “পাহাড়”—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ রুকশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোধূস চারিতেছে—জলের উপরে

জলচর পক্ষীগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু তরঙ্গ হিলোলে স্ফটিক ভঙ্গ হইতেছে—কুপ্রোখ, প্রোখাঘাতে কদাচিত্ত জলজ পুষ্প পত্র এবং শৈশাল ছলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্বান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গ চালনে তড়িত হইয়া শ্যামলিলে খেত মুক্তাহার বিকস্প হইতেছে। দেখিলাম যে বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গে লোক সকলেই এক কালে স্বানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—এক জন শশুর বাড়ীর, এক জন বাগের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধু, মুখ ফুটিয়া লোক ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাঙ্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপর হইতে বটরকের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিগের কপাট অঙ্গ খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, যে এক জন রুকবধু বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতেই আর এক জন মানুষ পাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর এক জন, আবার এক জন। এই রূপ চারিজন প্রায় এককালীনই পাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—পাঙ্কি ক্ষুদ্রে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া উচ্চাশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা “কোন হায়া রে! কোন হায়া রে!”

নই পাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—

তখন বুঝিলাম যে আমি দম্যদের

পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে! পাঙ্কির উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম যে আমার সঙ্গে সকল লোকে অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য রুক হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহু সংখ্যক দম্য দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটরকের শ্রেণী। সেই সকল রকের তেঁতে দিয়া দম্যরা পাঙ্কি লইয়া বাইতেছিল। সেই সকল রুক হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোক সংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গে লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতশ্রাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যে রূপ দ্রুত বেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাঙ্কি হইতে নামিলে আমায় প্রান্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এক জন দম্য আমাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল যে, “নামির ত মাতা ভাঙ্গিয়া দিরা!” যতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, এক জন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাঙ্কি ধরিল, তখন এক জন দম্য তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া স্তম্ভাকারে পড়িল। তাহাকে অঙ্গ উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ভীক

লইয়া গেল। রাজা এক প্রহর পর্যন্ত তাহার এই রূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাঙ্কি নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার দম্যরা একটা মশল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, “তোমার বাঁহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মরিব।” আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহার এক খানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহু মূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দম্যরা আমার সর্গস্ব লইয়া, পাঙ্কি ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে আমি জালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দম্যতার চিহ্ন মাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়। সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাত্রি, আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায়। দেখিয়া, আমি কাদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, “তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।” দম্যর সংসর্গে আমার স্তম্ভন্য হইল।

এক প্রাচীন দম্য সক্রমণ ভাবে বলিল, “বাহা! অমন রাস্তা মেয়ে আমরা কোণায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই মোহরত। হইবে—তোমার মত রাস্তা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।”

এক জন যুবা দম্য কহিল, “আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।” সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না। সে এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই

প্রাচীন দম্মা এই দলের সর্দার। সে বুঝকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, “এই লাঠির বাড়ি এই খানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের নয়?” তাহার। চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথাবার্তা শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তার পর সেই খানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন বাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপাত্রব-
চ্ছেদে বাল্যকণ করণ ভ্রমে পতিত হই-
য়াছে। আমি গাভ্রোপান করিয়া গ্রাম্যস্থ-
সন্ধান্নে গেলাম। কিছুদূর গিয়া এক খানি
গ্রাম পাইলাম। আমার পিতামহ যে
এসে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম;
আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে, তাহারও
সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম
না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা
বনে বিলাম ভাল। একে লক্ষ্যায় বুথ
কুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি
না, যদি কই, তবে সকলেই আমাকে
মুন্ডেই দেখিয়া আমার প্রতি সমুখ
কটাক করিতে থাকে। কেহ বায়
করে—কেহ অপমানসূচক কথা বলে।
আমি মনেই প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই
খানে মরি, সেও ভাল; তবু আর
পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিব না। স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে
পারিল না—তাঁহারাও আমাকে জন্ত
মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেননা

তাঁহারাও বিম্মিতের মত চাহিয়া রহিল।
কেবল এক জন প্রাচীনা বলিল, “মা,
তুমি কে? এমন স্বন্দর মেয়ে কি পথে
ঘাটে একা বেরতে আছে? আহা মরি,
মরি, কি রূপ গা? তুমি আমার ঘরে
আইস।” তাহার ঘরে গেলাম। সে
আমাকে ক্ষুধাভুরা দেখিয়া বাইতে
দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে
আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেও-
য়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইস।
তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সং-
সার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন
সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে
গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ হাঁটলাম—
তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল।
এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম,
“হাঁ গা, মহেশপুর এখন হইতে কত
দূর?” সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের
মত রহিল। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া
কহিল, “তুমি কোথা হইতে আসিচ্ছে?”
যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া
দিয়াছিল, আমি সে গ্রামের নাম করি-
লাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, “তুমি
পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উলটা আসি-
য়াছ। মহেশপুর এখন হইতে দুই
দিনের পথ।”

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কো-
থায় বাইবে?” সে বলিল, “আমি এই
নিকটে গৌরাগ্রামে যাইব।” আমি
অগত্যা তাহার পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রাম মধ্যে অবেশ করিয়া সে আমা-
কে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানকার
বাড়ী বাইবে?” আমি কহিলাম, “আমি

এখানে কাছকেও চিনি না। একটা গাছ
তলায় শয়ন করিয়া থাকিব।”

পথিক কহিল, “তুমি কি জাতি?”
আমি কহিলাম, “আমি কায়স্থ।”
সে কহিল, “আমি ব্রাহ্মণ। তুমি
আমার সঙ্গে আইস। তোমার, ময়লা
মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড়
ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ
হয় না।”

ছাই রূপ! রূপ, রূপ, শুনিয়া আমি
জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু
এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে
গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই
দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম।
পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে
আমার অত্যন্ত গাভ্র বেদনা হইয়াছে।
পা ফুলিয়া উঠিয়াছে; বসিবার শক্তি
নাই।

যত দিন না গাজের বেদনা আরাম
হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই
ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ
ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া
রাখিল। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন
উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই
পথ চিনিত না, অথবা বাইতে স্বীকার
করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল
—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একজনী
বাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ
ও নিবেশ করিলেন। বলিলেন, “উচ্চা-
দিগের চরিত্র ভাল নহে, উচ্চাদিগের
সঙ্গে বাইও না। উচ্চাদের কি মতলা বলা
যায় না। আমি ভদ্র সম্ভান হইয়া তো-
মার মায়ার স্বন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে

কোথাও পাঠাইতে পারি না।” স্ততরাং
আমি নিরন্তর হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে এ গ্রামের কৃষ্ণ
দাস বহু নামক একজন ভদ্রলোক স-
পরিবারে কলিকাতায় বাইবেন। শুনিয়া
আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করি-
লাম। কলিকাতা হইতে আমার পিতামহ
এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু
সেখানে আমার জাতি খুলতাত বিষয়
কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি
তাঁহালায় যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য
আমার খুলতাতের সন্ধান পাইব। তিনি
অবশ্য আমাকে পিতামহে পাঠাইয়া
দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সমাদ-
দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাই-
লাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এ উত্তম বিবে-
চনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে
আমার জানা শুনা আছে। আমি তো-
মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া
আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল
মানুষ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে
লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, “এটি
ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া
পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়ি-
য়াছেন। আপনি যদি ইচ্ছা করে সঙ্গে
করিয়া কলিকাতায় লইয়া আন, তবে এ
অনাধিনী আপন পিতামহে পৌছিতে
পারে।” কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন।
আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পর
দিন তাঁহার পরিবারের স্ত্রীলোকদের
সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথম
দিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে

আসিতে হইল। পর দিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পঁছছিলাম। রুহদাস বাবু কালীঘাটে পুজাদিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?”

অর্থাৎ আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কলিকাতার কোন কারাগার তাঁহার বাসা?”

তাঁহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর এক খানি গুণগ্রাম, কলিকাতা ভেমন এক খানি গুণ গ্রাম মাত্র। এক জন ভদ্র লোকের নাম ফরিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অউলিকার সমুদ্র বিশেষ। আমার জাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। রুহদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সামান্য গ্রাম্য লোকের ও রূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

রুহদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী হইলেন—কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে গণপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতো লাগিলাম। তিনি কহিলেন, “ভূমি আমার কথা শুন। রাম রাম দত্ত নামে আমার এক জন আত্মীয় লোক ঈশানীয়ায় বাস করেন। কল্যা তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে মহাশয় আমার পাচিকার

আভাবে বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ী রাখিয়া থাকে। আমাকে একটি দিতে পারেন?” আমি বলিয়াছি, ‘চেষ্টা দেখিব।’ ভূমি এ কার্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমন শক্তি নাই যে তোমায় আমার খরচ পত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে? বয়ঃ এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।”

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রি দিন “রূপ! রূপ!” শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

“রাম রাম বাবুর বয়স কত?”

উ। “তিনি আমার মত প্রচীন।”

“তাঁহার স্ত্রী বর্তমান কি না?”

উ। “হুটিটি।”

“অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়ীতে কে থাকে?”

উ। “তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুঁজি অবিনশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।”

আমি সম্মত হইলাম। পর দিন রুহদাস বাবু আমাকে রাম রাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ী পাচিকা হইয়া রহিলাম। শবেকপালে এই ছিল। রাখিয়া থাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমে মনে করিলাম, যে আমার দেবতনের টাকা গুলি সংগ্রহ করিয়া

শীঘ্রই পিজালয়ে যাইতে পারিব। কিন্তু মহেশপুর কোথায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন স্বযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন জেলা, কোন দিগে যাইতে হয়, আমি কুলবধ, এ সকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিলাম না। এই রূপে এক বৎসর রাম রাম বাবুর বাড়ীতে কাটিল। তাহার পর এক দিন অকস্মাৎ এ অন্ধকার পথে প্রদীপের আলো পড়িল, মনে হইল। প্রাণের রাজে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল।

এই সময়ে রাম রাম দত্ত আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, “আজ একটি রিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমার মহাজন, আমি খাদক,—আজিকার পাক শাক যেন পরিপাটি হয়। নহিলে বড় প্রমাদ হইবে।”

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আমারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রামরাম বাবু আমারে বসিলেন।

আমি অগ্রে অমবাঞ্ছন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহার আসিলাম। তাহার পর মাংস দিতে গেলাম। আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্ভাব্য ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশবৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণী মনেছি বলিয়া বোধ হইল। বলিতে

কি, আমি মাসের পাজ লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, এবং সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন, যে অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিলেন। তিনি একটু মাথা ঘূহ হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় নাকস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিত, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্তি একটুই সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারী জন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিব লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতা মণ্ডলী আমার উপর জড়পী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, “পাণিষ্ঠে, এ যে অমুরাগ।” আমি স্বীকার করিতেছি, এ অমুরাগ। কিন্তু আমি মগধ হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামী সন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রস্তুতি সকল অপরিচুত ছিল। এমন পতির জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই “বৎ” তরঙ্গ উঠিলে, তাহাতে বিচিৎ কি?

আমি ধীকার করিতেছি যে একথা বলিয়া আমি দোষ শূন্য হইতে পারি। তেজি না। সকারণে হউক, আর নিষ্ঠারূপেই হউক, পাণি সকল অবস্থাতেই পাণি পাণের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাণ ও এই শেষ পাণ।

পাণকশীলয় ফিরিয়া আসিয়া, আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাঁকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঙ্কনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাঁকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, “চিনি-মাছি।”

এক-সময়ে রাম রাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য জুইয়া বাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—জুইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাকট মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রাম রাম দত্তকে বলিলেন, “রাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন, যে পাক অতি পরিপাতি হইয়াছে।

রাম রাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, “বলিলেন, হাঁ উনি রাখেন ভাল।”

আমি মনে মনে বলিলাম “তোমার মাতা আর ঈশ্বর রাখি।”

নিমন্তিত বাবু করিলেন, স্নিকিট এ বড় আশ্চর্য্য যে আপনার বাড়ীতে ছই এক খানা বাঞ্ছন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, “চিনি-মাছি।” বস্তুতঃ ছই এক খানা বাঞ্ছন

আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রাম রাম বলিলেন, “তা হবোণ্ড গুঁর বাড়ী এ দেশে নয়।”

ইনি এবার যে পাইলেন, একেবারে আমারে বুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া “বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথা গা?”

আমার প্রথম সমস্যা; কথা কই কি না কই। “স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, কথা বলিব। কেন এ রূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাড়ায্যগ্রিয়, বক্রপ-পথানী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, “আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এমন আর একটা বলিয়া দেখি।” এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম,

“আমাদের বাড়ী কালান্দীঘি।”

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কণেক পরে সুস্থরয়ে কহিলেন, “কোন কালান্দীঘি, ডাকতে কালান্দীঘি?”

আমি বলিলাম “হাঁ।”

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংস পাক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ভব্য, তাহা আমি জুইয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রাম রাম দত্ত বলিলেন,

“উপেক্ষ বাবু, আহার করুন না।”

এটি শুনিবার আমার বাকি ছিল উপেক্ষ

বাবু! আমি নাম শুনিবার আগে ইচ্ছা-নাছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাণকশীলয় গিয়া পাক ফেলিয়া এক বার অনেক কালের পর আছাঁদ করিতে বসিলাম। রাম রাম দত্ত বলিলেন, “কি পড়িল?” আমি রাখসের পাক খানা জুইয়া ফেলিয়া “দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে এই ইতিবৃত্ত মধ্যে এক শত বার আছাঁদ স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রাসিকা সেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দেও, আমি কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব? এক শত বার “স্বামী স্বামী” করিয়া কান জালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামিক “উপেক্ষ” বলিতে আরম্ভ করিব? না, “প্রাণ নাথ” “প্রাণ কান্ত” “প্রাণেশ্বর” “প্রাণ পতি,” এবং “প্রাণাধিকার” ছড়া-ছড়ি করিব? যিনি স্বাম্যাদিগের সর্বপ্রিয় সম্বোধনের পাক, স্বাম্যাকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক স্বামী (সে একই সহস্র বর্ষের) স্বামিকে “বাবু” বলিয়া ডাকিত—কিন্তু স্বপ্ন বাবু বলিতে তাহার মনট লাগিল না—সে মনেজ্ঞাথে স্বামিকে শেষে “বাবুরাম” বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করতছে, আমি তাই করি।

মাংসপাক জুইয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে স্থির করিলাম, “যদি বিধাতা হারা ধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বলিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।”

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজন স্থান হইতে বহিঃস্থ জীতে গমন কালে যে এদিক ওদিক চাহিতে হইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে বলিলাম যে, যদি ইনি এ দিক ওদিক চাহিতে না যান, তবে আমি এ কড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই। আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মাঝিয়া করিও—আমি মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কৈ দার, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অত্রের রাম রাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। ভায় পর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিকে কাহার অঙ্গসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অঙ্গসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া মাত, আমি ইচ্ছাপূর্বক, “কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্বপর্যে যেন জীবন্তিরাঙ্গ স্বভাবসিদ্ধ, কটাকও স্বাম্যাদিগের ভাই। স্বাম্যাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একই অধিক করিয়া বিশ্বাস করিয়া না দিব কেন?” বোধ হয়, “প্রাণ নাথ” আহত হইয়া থাকিবে—গেলেন।

হারানী নামে রাম রাম দত্তের এক

জন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, “বি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। এ বাবুটি কখন যাইবে, আমাকে শত্রু খবর আনিয়া দে।”

হারানী মৃদু হাসিল। বলিল, “হি! দিদি! কখন? তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।”

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, “মাস্ত্র-ঘের স্কলন মনমান-বয়স।” এখন তুই গুরুমহাশয় গিরি রাথ—আমার এ উপকার করবি কি না, বল।”

হারানী বলিল, “তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব। কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।”

হারানীর নীতি শিক্ষা এই রূপ।

হারানী যীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছুইফট করিতে লাগিলাম। চারি দণ্ড পরে হারানী ফিরিয়া আসিয়া স্নানিতে হাসিতে বলিল, “বাবুর অশ্রু ধরিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লুইতে আসিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “কি জানি, যদি অপ-রাধে চলিয়া যান—তুই একটু নির্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস যে আমাদের রাঁধুনী তাঁহারানী বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই—রাতি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন।” কিন্তু রাঁধুনীর নির্বিক্রম, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া

থাকিবেন।” হারানী আবার হাসিয়া বলিল, “হি!” কিন্তু “দৌত্য যীকৃতা হইয়া গেল। হারানী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, “তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ্য নহেন—রাজি হইয়াছেন।”

শুনিয়া আত্মদ্রবিত হইলাম, কিন্তু মনেও তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমন কোন মতেই মন্থবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এ জন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমন কোন লক্ষণও দেখান নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্পরী জানিয়া যে আমার এণায়শায় লুপ্ত হইলেন, শুনিয়া মনেও নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথা আর আলোচনা করিলাম না। মনেও সন্দেহ করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্ভাব্য তাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল পুঞ্জিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। রাম রায় দত্তের সঙ্গে তাঁহার মদ্য পানো ছিল। সেই ছুইট

তাঁহার সঙ্গে স্ত্রুতন আদ্বীয়াতা। অপ-রাধে তিনি তাঁহারানীর কথায় স্বীকৃত হইয়া রাক রামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, “যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।” রাম রাম বাবু বলিলেন, “কৃত্তিক কি? কিন্তু কাগজ পঞ্জর অব-দ্রুত আছে, আনিতে পাঠাই।” আসিতে রাত হইবে। যদি অক্লান্ত করিয়া কাল প্রাতে একবার পর্যাপণ করেন—কিন্তু অন্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।” তিনি উত্তর করিলেন, “তাঁহার বিচ্ছিন্ন কি? এ আমায়ই ঘর। একবার কাল প্রাতে যাইব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিশ্চন্দ্রে রাম রায় দত্তের ঠৈঠকখানায় গেলাম। তথায় আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়া ছিলেন।

যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামী সন্মান। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত সুখী—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফটিল না। কঠোর হইয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গীত কাণিতে লাগিল। হৃদয় মধ্যে গুরুতর শঙ্ক হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি

আপনি আসিয়াছে—তবে কাঁদ কেন?”

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্মে পাড়া হইল, তিনি যে আমাকে বুঝীতা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন,—যদি মনে করেন যে, ইহার বাড়ী কালান্দীশ, অবশ্য আমার স্ত্রী হরণের সন্ততি শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য মোতে আনার খাঁ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস জমাইব? স্ত্রুতরায় পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্র-রম্ব হইলাম। অন্যান্য কথা আর পরে তিনি বলিলেন, “কালান্দীশ তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কলান্দীশ যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এমন আমার বিশ্বাস হই-তেছে না।”

আমি নেকী সাক্ষ্য বলিলাম, “আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গো-রব।” এই ছল ক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই লজ্জাসা করিলাম, “তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?”

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ? আমি বলিলাম, “আমি মাসেক ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসি-

মাছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।
উত্তর। “না।”

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইল। বলিলাম, “আপনার যেমন বড় লোক, এটি তেমন বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পরে আপনার জীবকে পাওয়া যায়, তবে ছই সত্যিই চৈতন্যবোধ বাধিবে।”

‘‘তিনি মুখ হাসিয়া বলিলেন, “সে ভয় নাই। সে জীবকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমনতর বোধ হয় না। তাঁহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।’’

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলেও, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিলেন না। আমার এবারকার নারী জন্ম রূপায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন।’’

‘‘তিনি অমান বদনে বলিলেন, “তাকে তাগ করিব।’’

‘‘কি নির্দম! আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।’’

সেই রাত্রে আমি স্বামি:শয্যায় বসিয়া তাঁহার আনন্দিত মোহন মুক্তি দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, “ইনি আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণ-তাগ করিব।’’

বটে পরিচ্ছেদ।

তখন সে চিন্তিতভাবে আমার দূর হইল। ইতিপূর্বেই ব্রহ্মিতে পান্ডিত্যহি-লাম, যে তিনি আমার হাস্য কটাক্ষের বশীভূত হইয়াছেন। মনেই করিলাম, যদি গুণ্যরের বজ্র এযোগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর শুণ্ড এযোগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখ বাহুরে পাপ না থাকে, যদি সাহসের শূঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উত্তরের মন্ত্রলার্থে তাঁহার এযোগ করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঘুরে আসিয়া বলিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, “আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি জন্ম জগন্মুখ হইবে, তাহাতেই আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতেই কবরী মোচন পুঙ্খক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস ব্রহ্মিতে পারিবে?) আবার ব্রহ্মিতে বলিলাম “আপনার একটি জন্ম জগন্মুখ হইবে। আমি কবরী নহি। আপন-নার নিকটে দেশের সম্বন্ধ শুনিব বলি-য়াই আসিয়াছি। অসং অভিপ্রায় কিছুই নাই।’’

গোপন হয়, একথা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বলিলেন। আমি তখন হাসিতে বলিলাম, “তুমি কথা শুনিবে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ,’’ এই বলিয়া আমি গাত্ৰোথান করিলাম।

‘‘আমি সত্য সত্যই গাত্ৰোথান করি-

লাম দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন; আমি-য়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, “তুমি ভাল নাহয় নও। আমাকে ছুইও না। আমাকে দৃষ্টান্তে মনে করিও না।’’

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্র-সর হইলাম। স্বামী—অন্যথা সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত বাড় করিয়া ডাকিলেন, “আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, ঘাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।’’ আমি তাঁহার ফিরিলাম—কিন্তু বলিলাম না—বলিলাম, “প্রাণাধিক! আমি কোন দ্বার, আমি যে তোমা ফেন রক্ত তাগ করিয়া ঘাইতেছি, ইচ্ছাতেই আমার মনের দুঃখ বৃদ্ধিও। কিন্তু কি করিব? ধর্ম্মই আমা-দিগের এক মাত্র প্রধান উপায়—এক দিনের মূণের জন্য আমি ধর্ম্ম তাগ করিব না। আমি চলিলাম।’’

‘‘তিনি বলিলেন, “আমি শপথ করি-য়াছি, তুমি চিরকাল আমার স্বয়ম্ভর হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য কেন?”

‘‘আমি হাসিয়া বলিলাম, “পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই।’’ এই বলিয়া আমার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসি-লাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি ছুই, হস্তে আমার দুই চরম ধরিয়া পথ রোধ করিলেন।

‘‘তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, “হঠাৎ তোমার রাসায়-চল—এখানে থাকিলে তুমি আমার ত্যাগ করিয়া ঘাইবে।’’

‘‘তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁ-হার বাসা গিমলায়, অপদূর, সেই রা-ত্রেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গে-লেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

‘‘তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি ক-রিতে লাগিলেন, আমি হাসিতেই বলি-লাম, “আমি এখন তোমারই দাসী হই-লাম। কিন্তু দেখি তোমার এননের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনই ভাল বাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আ-লাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।’’

‘‘আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অনাগ গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অ-নেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম। দেখি-লাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, “প্রাণনাথ, হয় আটকে রুমরস মদুর বাড়ী পাঠা-ইয়া হাও, নচেৎ অটোহ আমার সঙ্গে অলাপ করিও না। এই অটোহ তোমার পরীক্ষা।’’ তিনি অটোহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

‘‘সুপ্তম পরিচ্ছেদ।’’

‘‘পুরুষকে দক্ষ করার যত্নে যে কোন উ-পায় বিধাতা জীবলোকে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অটোহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি জীবলোক—কোন করিয়া মুখ

ফুটিয়া সে সকল কথা বলিল। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাতে এত আগুন জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুটকার দিলাম—কি প্রকারে আমি মীর হুম্ম দক্ষ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি না। যদি আমার কোন পাঠিকা নর হত্যার ত্রুত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবেই তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এই রূপ নরহত্যার হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, শ্রীলোকেই পৃথিবীর কলক। আমাদের জাত হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে এই নরহত্যার বিদ্যা সকল শ্রীলোকে জানে না; তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অটীক আমি সর্বদা আমার কাছে রাখি। থাকিতাম—আদার করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনী, অশ্রুতী, সে সকল দি ইতর শ্রীলোকের অঙ্গ। আমি প্রথম দিন আদার করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অজ্ঞারাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার যরকনর কাজ করিতে স্ফোরিত করিলাম; বাহাতে তাঁহার আঙ্গুরের পারিপাটা, শয়নের পারিপাটা, শয়নের পারিপাটা হয়, সর্বাংশে বাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বল্পে কথ্য করিতাম; খড়িকাটী পর্যন্ত যৎ প্রস্তুত করিলাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—এক দিন একটু কাঁদিলাম; কেন

কাঁদিলাম, তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অথচ একটুই বুঝিতে দিলাম যে অটীক পরে পাছে বিক্ষুব্ধ হয়—পাছে তাঁহার অজ্ঞারাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। “এক দিন, তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপচরণ শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না—আমি যুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাল রাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তিনি যে পরমাণে আমার প্রতীক অজ্ঞারাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহার প্রতি অজ্ঞারাগিণী হইয়াছিলাম।” বলা বাহুল্য যে তিনি অটীক পরে আমাকে মারিয়া তাড়িয়া দিলেও আমি বাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অজ্ঞারাগুনলে অপরিমিত ঘৃণা হইতে পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্য ক্রোধ হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম করিতাম—তিনি বালকর মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দমনীয় বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইচ্ছিতমাত্রের প্তির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করতেন, বলিতেন, “আমি এ অটীক তোমার কথা পান্ডন করিব—তুমি আমায় তাগ করিয়া থাকিও না।” ফলে প্রাণি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে তাগ করিলে তাঁহার উদ্ভাদ প্রস্তুত হইয়া যাস্তব নহে।

পরীক্ষার শেষ দিন আমিও তাঁহার

সঙ্গে কাঁদিলাম। বলিলাম, “প্রাণাধিক! আমি তোমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করি নাই—যে তোমাকে রাখা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পক্ষীরা মিথ্যা ক্রম মাত্র। মানুষের মন স্থির নয়। তুমি আট দিন আমাকে ভাল বলিলে—কিন্তু আট মাস পরে তোমার এ ভাল বাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমায় তাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?”

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তোমার যদি সেখি ডাবনা হয়, তবে আমি তোমারক সেইই বাবজীবনের উপায় করিয়া দিতছি। পূর্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার বাবজীবনের সংস্থান করিয়া দিব।”

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, “ছি! তুমি যদি তাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া থাকিলেও জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তুমি তাগ করিলে জীবন রক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, বাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এ জন্মে আমায় তাগ করিবে না। আজ শেষ পরীক্ষার দিন।”

তিনি বলিলেন, “কি করিব, বল। তুমি বাসা বলিবে, তাহাই করিব।” আমি বলিলাম “আমি শ্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।” পরে অনন্য কথা পাড়িলাম। কথাত্রয় একটি মিথ্যা গম্প করিলাম। তাহাতে কোন বাস্তব স্থাপন উপপত্তীকে সমুদায়

সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে প্রাণাধিক গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার কাছ ছাড়ি হইলেন। কখনক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরাজে আবার গেলেন। এবার এক ধানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, “ইহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ী হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আমি কখন তাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।”

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রু জল পড়িল—তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন! আমি তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া বলিলাম, “আজি হইতে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তাঁহার পরেই মনেই বলিলাম, “এই বার সোণার চাঁদ, আর কোথা বাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?” যে অভিপ্রায়ে, আমার এত জাল পাতি তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার শ্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যথ্য গ্রহণ না করেন, তব্লে তাঁহাকে সর্বতাগ হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন

“ইন্দিরা”—যাভা নাম রাখিয়াছিলেন “কুমুদিনী।” শশুর বাড়ীতে ইন্দিরা নামই জ্ঞানিত, কিন্তু পিতাভয়ে অনেকেই আমাকে কুমুদিনী বলিত। রাম রাম মন্তব্য বাড়ীতে আমি কুমুদিনী নাম ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইহার কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখা পড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতায় মুখে সম্বন্ধে রহিলাম। আমি এ পর্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একবারে মহেশপুত্রে গিয়া পরিচয় দি। ছলে কৌশলে আমি নিজেই হইতে মহেশপুত্রে সুবাদ সুরু জানিয়াছিলাম—সকলে বুঝিলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন বাস্তব হইয়াছিল। আমি স্বামীকে বলিলাম, “আমি একবার কালানীধি বাইয়া পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।”

স্বামী ইচ্ছাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কি একারে থাকিবেন? কিন্তু এদিকে আমার আত্মিকারী, “না” বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, “কালানীধি বাইতে আসিতে এখানে ইতে পনের দিন পথ; এতদিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

অধম বলিলাম, “আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালানীধি গিয়া কোথায় কবিরে?”

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কালানীধিতে কতদিন থাকিব?”

আমি বলিলাম, “তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচদিনের বেশী থাকিব না।”

তিনি বলিলেন, “সেই পাঁচদিন আমি বাড়ীতে থাকিব। পাঁচদিনের পর তুমি আমাকে কালানীধি হইতে লইয়া আসিব।”

এই রূপ কথা বাড়ী হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে শিবিকারোহণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালানীধি নামক সেই হস্ত-ভাণা দীঘি পার করিয়া গ্রামের মধ্যে পর্যন্ত পছড়াইয়া দিয়া নিজালায় অভিযুক্ত যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমি বাচক-দিগকে বলিলাম, “আমি আগে মহেশপুর যাইব—তাহার পর কালানীধি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।”

তাঁহার আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষক-দিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জন স্থানে বাসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিষা অজ্ঞানে বিম্ব হইলেন। সে সকল কথা এতদন বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাঁহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, “এর পর বলিব।”

পর দিন পিতা আমার শশুর বাড়ী লোক পাঠাইলেন। পাত্র বাচককে বলিয়া দিলেন, “তোমাতা যদি বাড়ী না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।”

আমি মাতাকে বলিলাম, “আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জ্ঞানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ নিতাই।”

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, “আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরমাত্মীয়, আর সন্ধিবেচক। পত্রএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।” তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে বার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী সৌম্যবল্লভন করিলেন। পরে বলিলেন, “আপনি পুঞ্জ ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনাদর দর্শন লাভ করিলাম, ইচ্ছাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনাদর কন্যা এত দিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিতে কাহার গৃহে ছিলেন, তাঁহা কেবল জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।”

পিতা মর্থাস্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সময়স্বাক্ষরিণের বলিলাম, “তোমরা উভাদিগকে চিন্তা করিও

না।” তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাঁহা হইলেই আমি তাঁহাকে গ্রহণ করাইব।

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই সক্ষম হইলেন না। বলিলেন, “আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাবণও করিব না।” শেষে মাতার রোদন এবং আমার সময়স্বাক্ষরিণের ব্যস্তের জ্বালায় সম্ভার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। দেহ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্য মনে, যুথ নত করিয়া, আহা করিতে ছিলেন, এমন সময় আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতেই বলিলেন,

“হাঁ দেখ, কামিনি, তুমি আরও কি কচ খুকী যে আমার ব্যাধির উপর পড়িস?”

কামিনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, “আমি কামিনি নই, কে বল, তবে ছাড়িও।”

আমার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “এ কি এ?”

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বলিলাম, “চতুর চূড়ামণি আমার নাম ইন্দিরা—আমি হস্তোত্তর দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনাদর কুমুদিনী মঙ্গল ত?”

তিনি অবাক হইলেন। আমাকে দেখি

রাই যে তাঁহার আচ্ছাদ্য হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, “এ আবার কোন রকম সুখদিনী? তুমি এখানে কোথা হইতে?”

আমি বলিলাম, “কুখদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোরব গণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রাম রাম মন্ত্রের বাড়ী ভোজন করিতে দেখি-
য়াছিলো, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। ঐশ্ব্যাদিক—আমি কুলটা নহি।”

তিনি একটু আশা বিম্বৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এতদিন জঁত চলন করিয়া ছিল কেন?”

আমি বলিলাম, “তুমি প্রথম সাক্ষা-
তের দিনে বলিয়াছিছে যে তোমার ক্রীড়োপাইলেও গ্রহণ করিব না। নচেৎ
সেই দিনেই পরিচয় দিতাম।” দান পত্র
খানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়া-

ছিলাম। তাহা বুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম
“সেই রাজ্যেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলাম যে হয় তুমি আমার গ্রহণ করবে,
নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।” সেই
প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এই খানি লেখা-
ইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল
করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করি-
য়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায়
গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি
তোমার উঠান ঝাঁট দিয়া খাইব—
তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব,
দান পত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।”

এই বলিয়া সেই দান পত্র তাঁহার স-
ম্মুখে থওন করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাজোখান করিয়া—আমাকে
আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, “তুমি
আমার সর্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে
আমি প্রাণে মরি। তুমি আমার গৃহে
গৃহিণী হইবে, চল।”

সমাপ্ত।

বঙ্গ দেশের লোক সংখ্যা।

গত বৎসর শীতকালে বঙ্গদেশের
প্রজা গণনা হইয়াছিল। এ বৎসর ঐ
কার্যের বিজ্ঞাপনী একাশ হইয়াছে। গণ-
নায় যে কথ্য জানিতে পারা গিয়াছে,
তাঁহার মধ্যে কোন কথ্য পাঠকে
জানাইতিহি।

প্রথম। এদেশে কত লোক? বঙ্গীয়
লোক সংখ্যার এই প্রথম প্রকৃত গণনা।
ইহাতে স্থির হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লে-
টেটনট গবর্ণরের শাসনাধীনে যে প্র-
দেশ, তাহাতে ৬৬,৮৫,৬৮৫ জন লোক
বসতি করে। প্রায় সাতকোটি।

দ্বিতীয়। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী কত?
বঙ্গীয় লেটেটনট গবর্ণরের শাসনাধীনে
৫টি পৃথক দেশ আছে, যথা, বাঙ্গালা,
বেহার, উড়িয়া, আশাম, এবং ছোট
নাগপুর। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া,
আসানী, এবং বন্যজাতি, এই পাঁচটি
দেশে যথাক্রমে বাস করে। অতএব
বাঙ্গালীর সংখ্যা সাত কোটি নহে। এই
কয় প্রদেশের লোক সংখ্যা পৃথক
লিখিত হইল।

বাঙ্গালা	৩৬,৭৬৯,৭৫৫
বেহার	১৯,৭৩৬,১০১
উড়িয়া	৪,০১৭,৯৯৯
ছোট নাগপুর	৬,৮২৫,৫৭১
আসাম	২,২০৭,৪৫৩
উপরে যে বাঙ্গালার ৩৬,৭৬৯,৭৫৫	

* আমরা এই পাঁচটি প্রদেশের সমগ্র লোক সংখ-
্যাকে “বাঙ্গালার বাসমানকে “বাঙ্গালা” বা
“বঙ্গ বাঙ্গালী” বলিতে থাকিব।

জন লোক লেখা হইল, তাহাও সকল
বাঙ্গালী নহে। উহার মধ্যে কয়েকটি
জেলা গণিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গা-
লীর বাস নহে। যথা, দারজিলিং,
পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি। এবং তন্নিম্ন
ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিও
বাঙ্গালায় বাস করে। বাঙ্গালী ভিন্ন
যে সকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করে,
তাঁহার সংখ্যা ৪৬৫,৬৮৪। অর্থাৎ
সকলই বাঙ্গালী। তন্নিম্ন সাত্তাল পূর্ণিয়া
গোয়ালপাড়া ও নানকুনের অনেকাংশ
বাঙ্গালীর বাস এবং পশ্চিমে কোচাও
অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী আছে। অতএব
সর্ব শুদ্ধ তিন কোটি সাত লক্ষ ক আট
লক্ষ বাঙ্গালী ভারতবর্ষে আছে।
তৃতীয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের
সঙ্গে তুলনায় কি সিদ্ধান্ত হয়?
গতবর্ষে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের
ও লোক সংখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু সে
সকল প্রদেশের বিজ্ঞাপনী এ পর্যন্ত প্র-
কাশ হয় নাই। বিবলী সাহেব অত-
সদ্ধানে জানিয়াছেন যে, তাঁহার ফল
নিম্ন লিখিত মত হইয়াছে,—

উত্তর পশ্চিম	১,১০,৯৬,৪৫০
বোম্বাই	১,০৯,৮৩,৯৯৮
মাদ্রাজ	৩,১১,৭৩,৫৭৭
মহীশূর রূপ	৫২,২০,৬৬৩

তন্নিম্ন অন্যান্য প্রদেশের লোক সং-
খ্যায় এবার কিঞ্চিৎ হইয়াছে, তাহা জানি-
বায় না, কিন্তু পূর্ব গণনার ফল নিম্ন-
লিখিত মত জানা আছে।—

অযোধ্যা ...	১,১২,২০,২২
পঞ্জাব ...	১,৭৫,৯,৯৪৬
মধ্যভারতবর্ষ ...	৯৯,০৪,৫১১
বেরাড ...	২২,৩১,৫৬৫
ত্রিটনীয় ব্রহ্ম ...	২৩,৩০,৪৫৩

এই সকল সংখ্যা গুলন একত্র করিলে ১২, ৪২, ৫৫, ৩৯৫ হয়। এবং ইহার সহিত বাঙ্গালার লোক সংখ্যা সংযোগ করিলে ১৮, ১১,১২ ২৫৪। সমগ্র ত্রিটনীয় ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা এই। দেখা যাইতেছে যে ইহার মধ্যে একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের অধীনে, ইহার তৃতীয়ভাগের একাংশ। বঙ্গদেশ লইয়া গবর্নর জেনেরলের অধীন দশটি খণ্ডরাজ্য। এক এক খণ্ড রাজ্য এক একজন গবর্নর বা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, বা চীফ কমিশনার শাসন করেন। অন্যান্য নয় জন যত লোক শাসন করেন, একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাহার সমস্তি অর্দ্ধেক শাসন করেন। মাস্তাজে একজন গবর্নর কোসিল সহিত নিযুক্ত, এবং উত্তর পশ্চিমে, এক জন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর নিযুক্ত, কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাঁহাদের উপরে দ্বিগুণ লোকের উপর কর্তা। পঞ্জাবে একজন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, কিন্তু বঙ্গদেশের 'লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, তাঁহার চারি গুণ লোক শাসিত করেন। বোম্বাইতে এক জন গবর্নর এবং তাঁহার কোসিল আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে লোক সংখ্যা বোম্বাইয়ের ৫ গুণ। এক পাটনা কমিশনারের অধীন যে প্রদেশ, তাহাই লোক সংখ্যায় বোম্বাই গবর্নরের শাসিত রাজ্যের তুল্য। অযোধ্যার এবং

মধ্য ভারতবর্ষের চীফ কমিশনারদিগের শাসিত রাজ্য তদুপেক্ষায় স্থান। বর্মী শুরের কমিশনারের শাসিত রাজ্য, ত্রি-ছত্ জেলার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক যাত্র। ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনার যে রাজ্য শাসিত করেন, তাহার লোক সংখ্যা ত্রিছত্ জেলার লোকের প্রায় অর্দ্ধেক, মেদিনীপুরের অপেক্ষায় কম, এবং সারন এবং কলিক পরগণার প্রায় সমতুল্য। অতএব অনাজ, যেখানে একটি গবর্নর, বঙ্গদেশের সেখানে একটী কমিশনারের কর্ম নির্বাহ হইতেছে। অনাজ যেখানে একটি চীফ কমিশনারের আবশ্যক, বঙ্গদেশে সেখানে একটি মাজিষ্ট্রেট কলেজটরের দ্বারা কর্ম নির্বাহ হইতেছে।

চতুর্থ। কোথায় কোথায় ঘন বসতি? যে পাঁচটি দেশ বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের অধীন, তাহার মধ্যে বর্মমাইল প্রতি বাঙ্গালার, ৩৮ জন, বেরাডে ৪৩ জন, উড়িষ্যায় ১৮ জন, ছোট নাগপুরে ৭ জন, এবং আসামে ৫১ জন। অতএব বেরাডে সর্বাধিক লোক ঘন বসতি। আসামে সর্বাধিক লোক। বঙ্গদেশে যে কয়েকটি প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে চারিটি স্থানে অত্যন্ত ঘন বসতি দেখা যায়। যথা,—

এখন, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাবড়া, এই তিন জেলা লইয়া যে প্রদেশ।
দ্বিতীয়, ঢাকা, ফরীদপুর এবং পাবনা জেলা লইয়া যে প্রদেশ।
তৃতীয়, রঙ্গপুর।

চতুর্থ, পাটনা, ত্রিছত্ এবং সারন লইয়া যে প্রদেশ।

এই কয় জেলায় বর্ম মাইল প্রতি ৬৫ জন লোকের অধিক। ইহার মধ্যে লোকের সংখ্যা অধিক সর্বাধিক ত্রিছত্, তৎপরে মেদিনীপুরে। কিন্তু এই ছই জেলায় যে সর্বাধিক ঘন বসতি এমত নহে; এই ছই জেলায় অতি হৃৎ, কিন্তু বর্ম মাইল প্রতি লোক সংখ্যার পড়তা করিলে হুগলী হাবড়া সর্বাধিক অধিক লোক। তথায় বর্ম মাইল প্রতি ১০৪ জন লোক। তৎপরে ২৪ পরগণা ৭৯ জন। তার পর সারনে ৭৭ জন, পাটনায় ৭৩ জন। এই কয় জেলায় সাত শতের উপর। অবশিষ্ট কয় জেলা, অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রঙ্গপুর এবং ত্রিছত্ বর্ম মাইল প্রতি ছয় শতের উপর।

তৎপরে বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, বশোহর, মুর্শাদাবাদ, রাজশাহি এবং ত্রিপুরা। এই কয় জেলায় লোক মাইল প্রতি পাঁচ শতের উপর।

তৎপরে মেদিনীপুর, রঙড়া, কুচবেহার, বাধরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোওয়াখালি, গা, চাম্পারন, মুন্সের, ভাগলপুর এবং কটক। এই কয় জেলায় লোক বর্ম মাইল প্রতি চারি শতের উপর।

দেখা যাইতেছে, সকল জেলার মধ্যে হুগলী জেলাই জনাকীর্ণ। কিন্তু জেলা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র ভাগ ধরিতে গেলে কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে। কলিকাতার উপনিবেশিকভাগ যে সর্বাধিক অধিক লোকপূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের মধ্যে যে কয়েক স্থান অতিশয় জনাকীর্ণ, নিম্নে দেখান যাইতেছে।

থানা।	জেলা।	বর্ম মাইল প্রতি লোক সংখ্যা।
কলিকাতা		৫৫৯৫০
পাটনানগর	পাটনা	১৭৬৫৬
কলিকাতা		
উপনিবেশ	২৪ পরগণা	১১,২৫৬
হাবড়া	হাবড়া	৮১৪৯
শ্রীরামপুর	হুগলী	৬৪১১
জাঁড়িয়াদহ	২৪ পরগণা	৬৯৪৪
দানাপুর	পাটনা	২৯২৪
দিনাজপুর	দিনাজপুর	২৬০৪
নবাবগঞ্জ	২৪ পরগণা	১৬২৫
(বারাকপুর)		
শাহানগর (শহর মুর্শাদাবাদ)	মুর্শাদাবাদ	১৫৬২
দমাদমা	২৪ পরগণা	১৪৪৪
ডুমুড়	হাবড়া	১৪১৭
হাসনাদ	২৪ পরগণা	১৪১৪
টারিগঞ্জ	এ	১৬৩৯
মোনামপুর		
চণ্ডীতলা	হুগলী	১৩৬৬
দাগপুর	মেদিনীপুর	১৩৩৩
বৈদ্যাবাটী	হুগলী	১২৭৪
মাহুলাবাজার	মুর্শাদাবাদ	১২৬৮
শ্রীনগর	ঢাকা	১২৫০
বাটাল	হুগলী	১১৮১
আতিপুর	২৪ পরগণা	১১২২
স্বজাগঞ্জ	মুর্শাদাবাদ	১১০৮
(বহরমপুর)		
আমতা	হুগলী	১০৩৩
রঘুনগঞ্জ	মুর্শাদাবাদ	১০২১
(জলপুৰ)		
হুগলী	হুগলী	১০৮৯
জগৎবল্লভপুর	হাবড়া	১০৭০

ঝালকাটি	বাখরগঞ্জ	১০৬৫
পুটিয়া	রাজশাহী	১০২২
দেবরা	মেদিনীপুর	১০১৬
● তমলুক	এ	১০০৪

বঙ্গ দেশের মধ্যে যে কয়েক স্থান, সর্কপেক্ষা জনাকীর্ণ, তাহা উপরে দেখান গেল। এ সকল স্থানেই বর্গ মাইল প্রতি সহস্রাধিক লোক। উহার মধ্যে যে কয়েক স্থানে ● চিহ্ন দেওয়া গেল, তাহা নগর বা উপনগর, বাননগর বা উপনগরবিশিষ্ট প্রদেশ। গ্রাম প্রদেশের মধ্যে বঙ্গদেশে সর্কপেক্ষা আঁড়িয়াদহের থানায় বর্গ মাইল প্রতি লোক অধিক। তৎপরে ডুমকুর, ও স্বকরবন সম্বাদত হাসনাবাদ (টাকি, অঞ্চল)। যে কয়েক স্থানে বর্গ মাইল প্রতি সহস্রাধিক লোক, তাহা সকলই হুগলী, ২৪ পরগণা, হাবড়া, পাটনা, সিদ্ধাবাদ, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ এবং রাজশাহী অঙ্গুর্গত। কিন্তু শেখোক্ত চারটি জেলায় কেবল একই থানায় এ রূপ লোকাসিক। ঢাকা, শান্তিপুর, স্কননগর, ভাগলপুর, মুন্সের প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গ জনাকীর্ণ নগর এই ভালিকার অন্তর্গত নহে। তাহার কারণ এই সকল স্থান যেই থানার অন্তর্গত, সেই সকল থানার মধ্যে অনেক সামান্য গ্রাম আছে, গড় পড়তা অধিক হয় নাই।

পঞ্চম। বিলাতের সঙ্গে, তুলনায় কি জানি যায়? দেখা যায় যে এ বিষয়ে বঙ্গ দেশের সঙ্গে ও বিলাতের সঙ্গে বিশেষ সামান্য আছে। তুল্যত্ব আছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতির মোট বিস্তার ১২১,১১৫ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৩,১৮,১৭,০৮। বঙ্গ দেশের পরিমার্গ ইহার দ্বিগুণ এবং লোক সংখ্যাও দ্বিগুণ। ব্রিটেন বর্গ মাইল প্রতি ২৬৩ জন লোক, বঙ্গদেশে বর্গ মাইল প্রতি তদপেক্ষা ছয় জন বেশী অর্থাৎ ২৬৯ জন লোক। নিজ ইংলণ্ডে বর্গ মাইল প্রতি ৪২২ জন লোক, বহোরে তদপেক্ষা ৪৩ জন বেশী অর্থাৎ ৪৬৫ জন, এবং বাঙ্গালায় তদপেক্ষা ৩৩ মাত্র কম, অর্থাৎ ৩৮৯ জন। হুগলী প্রভৃতি যে ২৭ জেলার উল্লেখ পূর্বে হইয়াছে, তাহা একত্র করিলে পরিসরে প্রটেক্টরটের তুল্য হইবে। কিন্তু লোক সংখ্যায় তাহার গড় বর্গ মাইল প্রতি ৪২২ জনের অনেক অধিক। অতএব এ সকল প্রদেশ ইংলণ্ড অপেক্ষাও জনাকীর্ণ। ইউরোপে যে রাজ্যে গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক বাস করে, সে রাজ্য বই জনাকীর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। জর্ডানি ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে দুইটি অতি প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ প্রধান ও স্বসভা রাজ্য। কিন্তু তথায় বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক নাই।

অতএব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহার পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত জনাকীর্ণ প্রদেশ। এ রূপ লোকের আভিষা মঙ্গলের কারণ নহে—অমঙ্গলের কারণ। যথ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে এই রূপ লোক বাঙ্গলা পৃথিবীর আছে, না ইদানীন্তন রক্ষি হইয়া আসিতেছে? ইহার সম্ভব দিবার কোন উপায় নাই। পূর্বে কখন লোক সংখ্যা করা হয় নাই। ইংরাজেরা দেওয়ানী প্রাপ্ত

হইলে কিছু পরে অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার লোক সংখ্যা এক কোটি। পরে এমত বিবেচনা হয় যে এ অনুমান অস্বার্থ—লোক আরও অধিক হইবে। সর উইলিয়ম জোসেফ তৎপরে অনুমান করেন যে এই প্রদেশে বাহাণবী বিভাগ সমতে ২,৪০,০০,০০০ লোক আছে। ১৮০২ শালে কোলকাতা সাহেব অনুমান করেন যে, এই প্রদেশে তিন কোটি লোক আছে। ১৮১২ শালে বিখ্যাত “পঞ্চম বিজ্ঞাপনীতে” এ দেশের লোক সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

১৮০৭ শালে ডাকার কুন্সিস বুকা-ন নামা এক জন বিতর্কন ইংরাজ বঙ্গ দেশে সম্বন্ধীয় নানা প্রকার তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হইলেন। সাত বৎসর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম করেন। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্যা নির্ণীত করিতে যত্ন করেন। তাহার নির্ণয়ানুসারে উক্ত অংশে তৎকালে ১,৬৪,৪১,২২০ জন লোক ছিল। বর্তমান পণ্যায় তৎপ্রদেশে, ১,৪৯,২৬,০৩৭ জন লোক পাওয়া গিয়াছে। অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিবেচনা করিতে হইবে, যে পূর্বাংশের লোক সংখ্যা ভ্রাস হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আসন্ন নিত্যন্ত দুর্গতি নহি।

সর্বাঙ্গই যে লোক সংখ্যার ভ্রাস হইয়াছে, বুকাননের নির্ণয়ে এমত সিদ্ধান্ত হয় না; কোথাও ভ্রাস—যথা—মালদহ, দিনাজপুর, পুণ্ডিয়া। কোথাও রক্ষি—যথা—মুন্সের, রঙ্গপুর, সাঁওতাল পরগণা।

সপ্তম। বঙ্গদেশে কত হিন্দু, কত মুসলমান? তাহার সংখ্যা বিজ্ঞাপনীর পরিশিষ্টের ১বি চিহ্নিত নক্সায় নিজ বাঙ্গালা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত সংখ্যা পাওয়া যায়—

হিন্দু	১,৬৮,০০,৪৩৮
মুসলমান	১,৭৬,০১,১০৫

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান। মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ মাত্র অধিক হিন্দু আছে। তবে হিন্দুদিগের প্রাধান্য এই বৈ, মুসলমানেরা প্রায় ইককি, এবং সামান্য শ্রেণীর লোক। তন্মূল্যে অধিকাংশই হিন্দু, কিন্তু তাই বলিয়া এই বঙ্গদেশকে কেবল হিন্দুর দেশ বলা যায় না। যেমন ইহা হিন্দুর দেশ, সেই রূপই ইহা মুসলমানের দেশ।

মোটের উপর নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান তুল্য বলিয়া সকল জেজ্ঞেয় যে সেই রূপ, এমত বলা যায় না। নিম্ন লিখিত কয় জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিক, যথা—

০ যশোর, ঈদীয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, উড়িষ্যা, নোওয়াখালি, (মুন্সেরাম) জিপুর। এই কয়েকটিকে মুসলমান জেলা বলিলে কেহ আশ্চর্য্য করিতে পারেন না। নদীয়া ত্রিংশ এই সকল জেলাই পূর্বে বঙ্গানুগত। অতএব পূর্বে বঙ্গ মুসলমানের দেশ বটে।

ইহার মধ্যে সর্কপেক্ষা বগুড়া জেলাতেই মুসলমানের আধিক্য। তথায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান। তৎপরে

রাজশাহী; তথায় শতকরা ৭৭ জন মুসলমান। তার পর মুশারামে ৭৫ জন, চট্টগ্রামে ৭০ জন, পানায় প্রায় তাইই; বাথরগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরায় প্রায় ৬৫ জন, এবং রঙ্গপুরে ৬০ জন। অবশিষ্ট যশোর, নদীয়া, দিনাজপুর, ঢাকা এবং ফরিদপুরে যাটের কম, এবং পঞ্চাশের অধিক।

নিম্নলিখিত কয়টি জেলায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক, স্বতরাং এই কয়েকটিতে হিন্দুর দেশ বলা যায়। যথা—

বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, বীকানার, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৩ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, কাছাড়।

শ্রীহুটে হিন্দু মুসলমান প্রায় তুল্য। এই কয় জেলার মধ্যে বীকানার সর্বাধিক হিন্দুর অধিকা। তথায় শত নব্বাঃ জন মাত্র মুসলমান। মেদিনীপুরে তৃতীয়—তথায় মুসলমান শতকরা ৬ জন। তার পরে দারজিলিং ৬০, বীরভূমে ১৬, বর্ধমানে ১৭, হুগলী হাওড়ায় ১০, কাছাড় ৩৬, ২৩ পরগনায় ৪০, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, এবং জলপাইগুড়িতে ত্রিশের অধিক, পঞ্চাশের কম। কলিকাতায় শতকরা প্রায় ত্রিশ জন মুসলমান, ৬৫ জন হিন্দু, ৫ জন অপর ধর্মাবলম্বী।

পাঠক দেখিবেন যে যে জেলায় প্রায় মুসলমান রাজধানী ছিল, সেই জেলায় যে অধিক মুসলমান এসেছিল তাই হইলে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, সর্বাধিক অধিক মুসলমান হইত। বর্ধমান সাহেব কোন ২ জেলায় মুসল-

মানের আধিক্যের কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু বড় সফল হইতে পারেন নাই। সর্বাধিক বড় হাওয়া এবং রাজশাহীতে অধিক মুসলমান কেন, তাহার কোন সম্ভাব্যজনক কারণ নির্দিষ্ট হয় নাই।

পূর্বেই বলে ইতরজাতীয় হিন্দুগণ পূজাই হউক বা শ্রেষ্ঠা পূর্বকই হউক, মুসলমান ধর্মাবলম্বন করিতেই যে বঙ্গদেশে মুসলমানের ভাগ অধিক হইয়াছে, একথা বিবলি সাহেব সন্নিহিতের সমর্থিত করিয়াছেন। সে আয়াস নিশ্চয়ই অনর্থক, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

নিম্ন বাছালা ভিন্ন অন্য মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। বেহারে ১,৬৫ ২৬,৮৫০ জন হিন্দু, ২৩,৩৬,০৩৫ মুসলমান মাত্র। উড়িষ্যায় ৩৭,৮৭,৭২৭ জন হিন্দু, ৭৪,৪৭২ জন মাত্র মুসলমান। ছোট নাগপুর ও আসামেও মুসলমানের সংখ্যা অতি সামান্য। এই কয় প্রদেশের কোন জেলাতেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অধিকা নাই।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের অধীন কয় প্রদেশে মোট ২৫,৬৪৪,৭৭৫ মুসলমান আছে। অর্থাৎ যেটি লোক সংখ্যার তৃতীয়াংশের পুরা একাংশ নহে। হিন্দু ৭২,৬৪৪,৩৬১।

অষ্টম। মুসলমানের ভাগ বাড়িতেছে কি না? বিবলি সাহেব বলেন, বাড়িতেছে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কালে এ দেশে হিন্দু নাশ লুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। বিবলি সাহেবের এ সিদ্ধান্তে আমাদের বিশ্বাস হয় না, তিনি যে সকল কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সত্যো-

জনক নহে। প্রধানতঃ তিনি বুকানন প্রভৃতির কথা উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কোথায় কত ভাগ হিন্দু, কত ভাগ মুসলমান, সে বিষয়ে বুকানন প্রভৃতির কথা অস্বাভাবিক মূলক মাত্র। দ্বিতীয় কারণ এই একটি বলনে, যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বালক বালিকার ভাগ অধিক, এ জন্য মুসলমানের ভাগ অধিক জন্মিতেছে। মুসলমানের মধ্যে বালকের ভাগ অধিক বটে, কিন্তু সে কি অধিক সন্তান জন্মিতেছে বলিয়া, না মুসলমানের মধ্যে অকালমৃত্যু অধিক বলিয়া? এ কথা পরীক্ষণ করিতেছি।

নবম। হিন্দুর মধ্যে কোন জাতির সংখ্যা অধিক?

সর্বাধিক ঠেকবর্ড দাস অধিক। তথায় যে কয়েকটি জাতি সংখ্যার দশ লক্ষের অধিক, তাহা নিম্নে নির্দেশ করা গেল, ঠেকবর্ড দাস ... ২০,৬৪,৩২৪
চণ্ডাল ... ১৬,২০,৫৪৫
কায়স্থ ... ১১,৬০,৪৭৮
ব্রাহ্মণ ... ১১,০০,০০৫

আর সকল জাতি দশ লক্ষের কম। বেহারের সর্বাধিক গোয়াল অধিক। তথায় তিনটি জাতি মাত্র সংখ্যায় দশ লক্ষের অধিক। যথা—

গোয়াল ... ২০,০৭,৪০৬
ব্রাহ্মণ ... ১০,১৬,৬১৬
বড় ইতর ব্রাহ্মণ (বিশেষ) ১০,০১,৩৬২

উড়িষ্যায় কোন জাতিই সংখ্যায় দশ লক্ষ নহে। তথায় চায়া নামক কৃষি-বাসিন্দা জাতি সর্বাধিক অধিক। তৎপরে ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশে প্রায় এক হাজার জাতি জাতি বাস করে।

দশম। এদেশে স্ত্রীলোক অধিক, না পুরুষ অধিক?

কথিত আছে, যে পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক পুরুষ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু জীবিতে স্ত্রী পুরুষ তুল্য সংখ্যক। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, কেহও বলেন। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইউরোপীয় নামাদেশের প্রজা গণনায় শেষোক্ত কথাটি এক প্রকার সঙ্গত মাত্র হইয়াছে। বিলাতের (United Kingdom) লোক সংখ্যা গণনায় পুরুষ অপেক্ষা ১,২৫,৭৬৩ জন স্ত্রীলোক অধিক পাওয়া গিয়াছে। বিলাতের অনেক পুরুষ বিদেশে থাকে, তাহা বাদেও প্রায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র লক্ষ বৈশী হইয়াছে। নরওয়ে, এবং হালাণ্ডের লোক সংখ্যা গণনায় শতকরা ৪৫ জন স্ত্রীলোক বেশী হইয়াছে। জর্মানিতেও প্রায় চার জন (৩৭) স্ত্রীলোক শতকরা বেশী, অর্থাৎ যেখানে ১০০ জন পুরুষ, সেখানে ১০৩ জন স্ত্রীলোকের সংখ্যা। ১০০ পুরুষের স্থানে ১০২ জন স্ত্রী, পোলণ্ডে ১০৬ জন এবং ফিনলণ্ডে ১০৬ জন। অতএব ইউরোপের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কল হইতে পারে যে সর্বত্র পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক।

কিন্তু ভারতবর্ষে দৃষ্টিপাত করিলে এ সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে। তৎপরে পুরুষে সকল প্রদেশ লোকের সংখ্যা

করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পাই-
যে পুরুষের একশত জন পুরুষ প্রতি

পশ্চিমে	৮৬	৫ জন	স্ত্রীলোক
মধ্য	৯০	"	"
পূর্বে	৮০	"	"
উত্তরে	৯৫	"	"
বঙ্গ	৯৫	"	"

ভারতবর্ষে সতরাণ স্ত্রীলোক
পুরুষের সংখ্যা অধিক।

শে কোনও পার্থক্য প্রদে-
শে নাই। এবং বন্য জিপুরায়) স্ত্রী

পুরুষের সংখ্যা গণনা হয় নাই।

১৬, ৭২, ৭২ জন লোকের মধ্যে

পুরুষ করিয়া গণিত হইয়াছে।

৩, ৩০, ৯৮, ৭৫ জন পুরুষ, এবং

৩, ৭৭ জন স্ত্রীলোক।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের

পুরুষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু ভারতবর্ষের

প্রদেশের মধ্যে বঙ্গ প্রদেশের

এই যে, এখানে স্ত্রীপুরুষের সং-

খ্যাপ্ত ভারতবর্ষ। এক শত জন

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এই যে, ৯৯ জন স্ত্রীলোক।

এমত স্থলে এ দেশে পুরুষের বহু বিবাহ
প্রথার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ
অবস্থা সম্ভব বোধ হয়। এক জন স্ত্রী-
লোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করিতে
না পারিলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা নাই।

বঙ্গদেশের সর্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা
স্ত্রীলোক সংখ্যা অধিক নহে। কোথাও
স্ত্রীলোক বেশী, কোথাও পুরুষ বেশী।
কলিকাতায় স্ত্রীলোকের শ্রদ্ধা পুরুষ।
নিম্নলিখিত কলিকাতা জেলায় স্ত্রীলোক
বেশী—

বুদ্ধাবন, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর,
হুগলী, হাবড়া, নদীয়া, নুরশাদাবাদ,
মালদহ, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা,
ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, পাটনা, গয়া, সাহা-
বাদ, সারন, মুন্সের, কলক, বালেশ্বর,
খাসিয়া পাছাড়া। ইহার মধ্যে চট্টগ্রাম
এবং নুরশাদাবাদে সর্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকের
ভাগ অধিক।

এই কয় জেলায় পুরুষের বহু বিবাহ
প্রথা না চলিলে, কতক স্ত্রীলোককে অন্য
জেলায় গিয়া বিবাহ করিয়া আসিতে
হয়। তাহা বাস্তবিক, কি বহুবিবাহ বাস্ত-
বিক, তাহা দেশ হিতৈষী মহাশয়েরা
সীমাংসা করিবেন। শাস্ত্রে কি বলে ?
ব্রহ্মণ্ড, এবং মৌণ্ডাল পরগনায় স্ত্রী
লোকের সংখ্যা ঠিক সমান।

অবশিষ্ট কয় জেলায় পুরুষের সংখ্যা
অধিক।

এ সম্বন্ধে একটি কৌতুকবহু তত্ত্ব
এই যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের
মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক ; কেনে
বল উত্তর ভারতবর্ষের অন্যত্র সেরূপ
নহে। বাঙ্গালার হিন্দুদিগের, মধ্যে

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	স্তম্ভ।	শব্দ।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৪১	১	উপর হইতে	৫ম	পঞ্চ
২৪১	২	"	২৯শ	মুখ ভাঙ্গা
২৪৩	১	"	৯ম	গাইলেন
২৪৩	১	"	শেষ	চর
২৪৫	১	উপর হইতে	১৯২০	কেন বলবো ?
২৪৭	২	"	৩০শ	বলিবেন ?
২৫১	২	"	১০শ	অধায়
২৫১	১	"	২৫শ	সর্গ
২৫৩	১	"	৪র্থ	সর্গের
২৫৩	২	"	৭ম	লয়লা
২৫৩	২	"	১৫শ	অবধার্থ
২৫৫	২	"	১০ম	চিত্তপ্রীত

Poor Copy of
Original

স্ত্রীপুরুষ সম সংখ্যক। মুসলমানের
স্ত্রীলোক মোটের উপর এই, কিন্তু জেলায়
জেলায় বৈষম্য দেখা যায়।

একাদশ। কোন বয়সের লোক কত ?
সকল বয়সের লোক পৃথক করিয়া
গণা হয় নাই। দ্বাদশ বৎসরের অন-
ধিক বয়স্ক, এবং দ্বাদশ বৎসরের অধিক
বয়স্ক স্ত্রীপুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত
হইয়াছে। বালক বা বালিকা বলিলে
এ প্রবন্ধে বার বৎসরের অনধিক বয়স্ক
বুঝাইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত বলিলে বার বৎ-
সরের অধিক বয়স্ক বুঝাইবে। বয়সের
বিষয়ে এই কয়েকটি কথা পাওয়া যাই-
তেছে।

১। বঙ্গদেশে যেমন মোট স্ত্রীলোক
এবং পুরুষ প্রায় তুল্য, বালক বালিকা
সম্বন্ধে সেরূপ নহে। বিষয়কর কথা এই
যে, বালিকা অপেক্ষা বালক অধিক ;
কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক
অধিক। যে পরিমাণে বালকের আধিক্য,
প্রায় সেই পরিমাণেই স্ত্রীলোকের
আধিক্য। যথা একশত জনের মধ্যে
বালক ... ১৮৮
বালিকা ... ১৫৭

মোট অল্প বয়স্ক	৩৪৫
বয়ঃপ্রাপ্ত পুং ...	৩১৩
ঐ স্ত্রী ...	৩৪২
মোট বয়ঃপ্রাপ্ত	৬৫৫

২। এইটি কেবল মোটের উপর বর্তে
এমত মনে। সকল জেলাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত
বালক অধিক, বালিকা কম ; সকল
জেলাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক অধিক,
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অল্প। ইহাতে সিদ্ধান্ত

হইতেছে যে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে
কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্র
অধিক জন্মে, দ্বিতীয়তঃ সর্বত্রই
কের অপেক্ষা অধিক পুরুষ মরে।
পুরুষ জন্মে, বা অধিক পুরুষ মরে,
কি কোন কারণ আছে ?

৩। ইউরোপ অপেক্ষা ভারত
বালক বালিকাদিগের সংখ্যা
অধিক। ইউরোপের মধ্যে সর্ব
ইংলণ্ডে বালক বালিকার সংখ্যা
কিন্তু তথায় এক শত লোকের
২৯৪৫ জন মাত্র বালক বা বালিকা
কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে,

বঙ্গদেশ	৩৪
পঞ্জাবে	৩৫
উত্তর পশ্চিমে	৩৫
অযোধ্যায়
বেঙ্গাল (১৩৭৯সর পর্য্যন্ত)
মধ্য ভারতে (১৪ এ)

ইহার কারণ কি ? ভারতবর্ষেই
অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, তথায়
বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না, অল্প
সেই মরিয়া যায়, সেই জন্য কি
ঘটে ? কিন্তু তাহা হইলে অস্বাস্থ্য
বর্তমান এবং রাজধানী বিভাগে
বালক বালিকার সংখ্যা ভারতবর্ষের
প্রাপেক্ষা অল্প কেন ? এই দুই বিষয়
বালক বালিকা শতকরা ৩০.৯

৩০.৮ মাত্র। ইংলণ্ড হইতে কিছু
মাত্র। আর পীড়িত হুগলী ও বঙ্গদেশ
জেলায় ২৯.২ ও ২৯.৪ জন, অল্প
ইংলণ্ড অপেক্ষাও অল্প। ইহার একটি
কারণ এই নির্দিষ্ট হইয়াছে যে যাহার
সংক্রামক জ্বরে পীড়িত হয়, তাহার

ত্যাগপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। বঙ্গদেশে নিম্ন জাতি ও বোহার অপেক্ষা বনা ও পার্বত্য জাতির মধ্যে বালক-বালিকার আরও প্রাধান্য।

নাট্যাল পরগণায়, ছোট নাগপুর, ও আসামেই তহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। অন্যত্রও দেশী লোক অপেক্ষা বন্যজাতির মধ্যে সন্তানের আধিক্য। বিবর্তি সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে দেশী জাতির অপেক্ষা বন্যজাতির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি অধিক এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

৫। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বালক বালিকার সংখ্যা অধিক। বিবর্তি বলেন, যে বাঙ্গালায় মুসলমানের নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল—বন হইয়াছে। নীচজাতীয় হিন্দুরা নাজাতীয় ছিল। এই জন্য বাঙ্গালার মুসলমানেরা বন্যজাতির বন্যবালক-বালিকার সন্তানোৎপাদক। তাহা নীচজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও র আধিক্য হইত। বাস্তবিক তাহা হইতে না, জানা যায় না।

৬। মানজ বাঙ্গালায় সন্তানোৎপাদকের আর একটি কারণ নির্দিষ্ট করি-

য়াছেন, যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কেই বিবাহ করিতে হয়, এবং সন্তানোৎপাদন পরমধর্ম। তবে হিন্দুর সন্তানোৎপাদিকা হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে বিবাহের আরও বাল্য বিবাহ সন্তানোৎপাদকের হইতে পারে।

৭। এদেশে বালক বালিকার এবং বাছলো ছুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে অবস্থা সত্য বোধ হয়। হয়, ইউরোপে অপেক্ষা এদেশে অকাল মৃত্যু অধিক এদেশে অধিক সন্তান জন্মে। প্রথমে সিদ্ধান্তটি সত্য বোধ হয়। কিন্তু বিবাহকে বিবর্তি সাহেব যে অকাল মৃত্যুর কারণ বলিয়াছেন, একথা অমূলক।

৮। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে বঙ্গের বালিকার অপেক্ষা অধিক বালক জন্ম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বন্যজাতি মধ্যে সর্বাধিক। এই তারতম্য অসম্ভব অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে বালকের আধিক্য এবং হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে আরও অধিক।

স্থানানুভব প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় প্রাক-ঐতিহাসিক আরও অনেক গুলি জাতীয় কথা মকলন করিতে পারিলাম না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হিন্দু ধর্মের প্রেতভা। ত্রিভাঙ্গনারাণ বহু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় মন্ত্র।

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পর যে গ্রন্থের উল্লেখ করা বহিঃকৃত, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা আরও হইয়া, আমরা একটি আনন্দ অর্জন করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালী গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অমুখ, আমাদিগেরও অমুখ। লেখক আমাদেরই মূঢ় বিশ্বাস থাকে যে “আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্তমান প্রণীত হইয়াছে, সর্বাধিক উৎকৃষ্ট।”

সমালোচক যদি ইহার অনাথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষয়-রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবী মধ্যে, বর্তমান দেশে মত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোক পাঁচা জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালি গ্রন্থকার সর্বাধিক অপরূপ।

সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না। অপ্রশংসা দেওয়া, লেখক সমুদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভা জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মাড়েন; দুই এক জন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিত্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালির স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্যে পরাজয় হউন না কেন, কলঙ্ক কমাণি পরাজয় নহেন। সমালোচনার অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—

প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সমুদায় লেখকদিগের মূঢ় বিশ্বাস আছে যে, লোকের ভাষা এবং ভুল্লোকের বাল্য বর্জনীয়। যে দেশে অপেক্ষা হ কবির লড়াই ভুল্লোকের প্রধান মৌল ছিল—যে দেশে অসামান্য পুণ্ড্র প্রচলিত, যে দেশের লোক গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে, সে দেশের কুরু লেখকেরা রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা সহস্রবার স্মৃতি পরিচয় দিতে থাকে হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখনও দেখিয়াছি যে মহাসভায় মান্য ব্যক্তিও আপনাদের সম্মানে হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হইতরোগ প্রকাশ অবলম্বন করিয়া এবং মাড় ভাষাকে কলুষিত করিয়া কখনও দেখিয়াছি, রাগান্বিত লেখক সমালোচনার মর্ম গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চরিত্রকে বর্ণনা করিয়া “মৃত্যু” বলি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, যে সে মৃত্যুর কথা গুলিকে হতন বর্ণনা করিয়া যদি কোন গ্রন্থে দুই বার দুই চারি বার এমত কথা পঠিত করিয়া তাহা শুনে বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার কলঙ্ক তত্ত্ব সভা সভাই দুজনের বলিয়া করিয়াছে। সুতরাং তিনি অসমর্থ হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে তাঁহা কথা গুলি অতি প্রাচীন এবং সর্বত্র

। কখনও দেখিয়াছি কোন
রিচিত লেখক মনেও স্থির
আমরা কিয়ৎ বশাই তাঁহার
করিয়াছি। এ সকল রহস্য
আমি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ষটে,
গুলি, ভাল মাহুরকে যে
রা থাকি, এবং তাঁহাদিগের
হই, ইহা আমাদিগের বড়
এবং বন্ধী পুস্তক সমালোচনা
বড় অস্বীকৃত কাব্য হইয়া
কেবল কর্তব্যানুসারেই আসি
এরূপ। কর্তব্যানুসারেই
যজ্ঞ হইয়াও অপ্রশংসনীয়
শংসা করিয়া থাকি। আমা
কান্না যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ
হাতে পড়ে আমরা প্রা
লেখক সমাজকে জানাই
বিশ্বনিম্নক নহি। আমা
গ্যক্রমে, এবং বাঞ্ছা ভাষার
ম সে রূপ গ্রন্থ অতি বিরল।
নি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমা
রগত হইয়াছে। তাই আজি
র এত আস্থা। তাহার
জনায়াগ বাবুর গ্রন্থ খানি
সমালোচনীয়।
ধর্ম যে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, এই
পদক্ষেপেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।
মাসিক পত্রীয় সভায় রাজনী
উপস্থিত পত্র একটী বক্তৃতা
তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া
করিয়াছেন। তাহাতেই এ
উৎপত্তি।
নর প্রথম প্রচার কালে কার্যা
প্রণয়ন সমক্ষে প্রতিপ্রত হইয়া

ছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম সম্প্রদায়ের
মতামতের সমালোচনা হইবে না। যা
ধরা সেই প্রতিজ্ঞা বন্ধ। সেই প্রতিজ্ঞা
লজ্জন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের
উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না
কেননা তাহা করিতে গেলে হিন্দু ধর্মের
দোষ গুণ স্ফিটার করিতে হয়। অতএব
আমরা ইহার একত সমালোচনায় উন্নত
হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের চেষ্টা
রছিল।
কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত
না হইয়াও যদি এক জন হিন্দু বংশজাত
লেখক বলেন, যে আমাদেব, দেশের ধর্ম
সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা এক জন সুপণ্ডিত
লোকের নিকট শুনিয়া শ্রুত হইল, তবে
বোধ করি, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকের
তাঁহাকে মার্জনা করিবেন।
আমরা বলিতেছি, এ কথা শুনিয়া
আমাদের শ্রুত হইল, কিন্তু এ কথা আমরা
বর্থা করিয়া স্বীকার করিতেছি না, বরং
অর্থার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না।
হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মগোষ্ঠা শ্রেষ্ঠ না
তদ্বিষয়ে কোন অভিসম ব্যক্ত না
করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা, বোধ
হয়, বলা বাহিতে পারি।
লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দু ধর্ম বলেন
তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহা
উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অস্বপ্নে। তিনি
বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম।
অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম
কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য
দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠ
তা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য
নহে। হিন্দু ধর্ম সর্বগোষ্ঠা শ্রেষ্ঠ

বিষয় আমাদের দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ,
এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্মকে
তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের
বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা
সকল ধর্মের অন্তর্গত—সকলেরই
সারভাগ।
আমরা বাবু নিজ প্রশংসিত
মূলধর্মণ যেমনি হিন্দু শাস্ত্রের
উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে ধর্মের
উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মূল হিন্দু
শাস্ত্রে আছে, ইহা বার্থ্য। কিন্তু উহা
হিন্দু ধর্মের একাংশ মাত্র—অতি অ-
পাংশ। কোন-পার্থ্যকেই অংশ মাত্র
সেই পূর্ণার্থ সম্পাদনা করায় মতোর বিঘ্ন
হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সকল
পার্থ্যেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনা
য়াগ বাবু যেমন হিন্দু ধর্মের অংশ
বিশেষ গ্রহণ করিয়া এ ধর্মের প্রশংসা
করিয়াছেন, তেমনি এ ধর্মের অ-
পাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল
কথাই খণ্ডন করা বাহিতে পারে।
যেমন অজ্ঞানীয় মধ্যস্থ জীবকে অজ্ঞানীয়
বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপা-
সনাকে হিন্দু ধর্ম বলা যায় না। যেমন
কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না,
তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু
ধর্ম বলা যায় না। উপর্যুক্ত হইতে
বিস্তৃত পরিস্রুত ব্রহ্মোপাসনা কোন
কালে একা ভারতবর্ষ বা ভারত-
বর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম
কিম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত
নি কি না, সন্দেহ। যদি এ কথা সত্য
হয়, তবে ব্রাহ্ম ধর্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপ-
ন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে।

বোধ হয়, রাজনীয়াগ বাবু এ কথা
অস্বীকার করিবেন না।
ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা
করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সক-
লেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম
পরিবর্তে হিন্দু কথাটি ব্যবহারে বিশেষ
উপকার আছে। হিন্দু ধর্মের সহিত
ব্রাহ্ম ধর্মের একতা স্বীকার করায় আ-
মাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের
মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পূর্ণ
হইয়া একা কোন সদমুঠানে রত
তবে আমার একারই উপকার; যদি
সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদমু-
ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাঁহার
ফল ভোগী হইবে। অস্পষ্ট লোক নই
একটি মৃত্তন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষ
বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্মের
শোধন ভাল। কেননা তাহাতে,
লোকের ইচ্ছা সাধন হয়। আমরা
কোন সম্প্রদায় ভুক্ত নহি; কোন সা-
দায়ের আত্মকুলো এ কথা বলিলাম না।
হিন্দু জাতির আত্মকুলোই এ কথা
বলিলাম।
অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন
বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের
রচনার প্রশংসা করিয়া প্রায়শ্চিন্দ্য
হইব। এই প্রবন্ধের রচনা অগাধী, অসু-
পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ স্বাধ-
সকলের বোধগম্য এবং প্রতি সুখদ
ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়া
ছেন। সিংধা বাগাড়ম্বর পরিভ্রমণ
করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় মচারকরণ
কৃষ্ণা সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার সং-
গ্রহও প্রশংসনীয়। সর্বগোষ্ঠা তাঁহার

র শেষ ভাগে স্নিগ্ধবেশিত জয়ো-
আমাদের প্রীতি প্রদ হইয়াছে।
তাহা উক্ত করিয়া পাঠকদিগকে
র দিলান। ইহাতে স্মৃতি ন কথা
নাই, কিন্তু এ রূপ পুরাতন কথা
হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে
তই আমাদের স্বর্থ। রাজনারায়ণ
হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হই-
বলিয়াই, তাহাতে আমাদের

আমার এই রূপ অশ্রু হইতেছে,
যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি
জনা বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমন
সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জনা
পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন
স্বজাতীয় গুণতির সম্বন্ধে এক
বলিয়াছেন,—

thinks I see in my mind a
and puissant nation rousing
if like a strong man after sleep
shaking her invincible looks;
nks I see her as an eagle me-
her mighty youth and kind-
her undazzled eyes at the full
day heaven.

নিও সেই রূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে
ত পদ্বি, আমি দেখিতেছি, আবার
র সম্বন্ধে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু
নিজ হইতে উজ্জ্বল হইয়া বীর-
পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং
কসে উন্নতির পথে দাবিত হইতে
হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে
জাতি পুনরায় নববোধনান্বিত হইয়া
র ক্রান্তি ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জল
পৃথিবীক স্মৃশোভিত করিতেছে;

হিন্দু জাতির কীর্তি হিন্দু জাতির
পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতে
এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের
চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃত্য স-
করিতেছি।

হিন্দু সভ্যতার প্রধান
ভারত জাতির প্রধান
কেন্দ্র হইয়াছে।
ফলস্বরূপ

শতাব্দীর রক্তের নিধান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি শুভ কি শুভ,
গাও ভারতের জয় ॥

রূপবতী সাক্ষী সতী ভারত মলনা।
তোমা কিব তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা সাক্ষী গীতা, দময়ন্তী পতি-
অতুলনা ভাও মলনা।
হোক ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ সৌম্য অগ্নি মহামুনি যথ
বিধামিহ ভূগুতপোষন।
বালমীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস
কবিবর ভারত সুভাষ।
হোক ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

কেন ডর, ভীক, কর মাহম আশ্রয়,
বতোধর্ম সন্তোজ।
জিহ্ম ভিয় হীনবল, একোত্তর পাইবে বর
মাগের মুখ উন্নত করিবে কি ভয়
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়
কি শুভ কি শুভ,
গাও ভারতের জয়

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর
পূর্ণ চন্দন রুচি হউক। এই মহাগীত
ভারতের মর্মজ গীত হউক। হিমালয়
কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যদুনা
সিন্ধু নর্ঘনা গোদাবরী তটে রক্তে মর্ম-
রিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গভীর
গর্জনে মল্লীভূত হউক! এই বিংশতি
কোটি ভারত বাসির হৃদয় যন্ত্র ইহার
সঙ্গে বাজিতে থাকুক!

কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রহসন, কলি-
কাতা বাজীকি যন্ত্র।

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি
প্রহসনের কিছু ছুড়াছড়ি হইয়াছে। সেই
সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে
হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই ব্রহ-
মশ্রেণে প্রহসন বলে। ছুই খানি প্রহ-
সন এই পরিভাষা হইতে বিশেষ রূপে
বর্জিত, একেই কি বলে সভ্যতা এবং
মধবীর একাদশী। মধবীর একাদশী
অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য
গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এ রূপ প্রহসন
চলিত। “কিঞ্চিৎ জলযোগ” এ ছুই-
প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও
বর্জিত করিতে পারি। ইহাও এক খানি
উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি
পংক্তি এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে
নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই
প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট
নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র,
কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের
আচর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই;
বরং রাস্য ইচ্ছা। সেই বাস্তব যদি কোন
প্রকৃতি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে
তথাপি নির্দোষ নহে, কেননা বাস্তব

অসুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও
দেখিলাম না। বাস্তব বাস্তব যে
তৎপ্রতি বাস্তব প্রযুক্ত; তাহাতে অনিষ্ট
নাই, ইহা আছে। কে বাস্তব যোগ্য,
তহার নীমাংসার স্থান এ নহে; সং-
ক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

কার্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার
মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য
হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য সফল
হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইচ্ছা
হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি
তাহার ফলে পদের অনিষ্ট হয়, তবে
তাহাকে কড়ার অভিপ্রায় হেঁদে পাপ
বা জাতি বলি। যদি অসদভিপ্রায়ে
সেই অনিষ্টজনক কার্য কৃত হইয়া থাকে,
তবে তাহা পাপ বা দুষ্কৃত্য। যদি
অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটয়া থাকে, তবে
তাহা জাতি মাত্র।

দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ,
জাতি, কেহই বাস্তব যোগ্য নহে।
প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি বাস্তব অপ্র-
যুক্ত। পাপ, ভৎসনা, দণ্ড, বা শোচ-
নার যোগ্য, তৎপ্রতিও বাস্তব অপ্রযুক্ত।
বাহ্যতে হুৎক করা উচিত, তাহা বাস্তব
যোগ্য নহে। তজ্জন, জাতিও বাস্তব
যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুক্ত।

নিষ্ফল জিয়ার প্রতি অবস্থা বিশেষে
বাস্তব প্রযুক্ত। জিয়া যে নিষ্ফল হয়,
তাহার সত্যচর্য্য কারণ এই যে উদ্দেশ্য
সহিত অস্বাধীন সম্ভব থাকে না। যে
খানে অস্বাধীন উদ্দেশ্যে অগম্য, সেই
খানে বাস্তব প্রযুক্ত। বাস্তবতার উপর
অগ্রভুল হেতু ইহাকেও প্রসাদ বাস্তব
হয়, কিন্তু অপ্রযুক্ত জাতির সম্ভব

হার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য পৃথকই নাম আছে। একটিকে Error বলে আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের পাপ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

কথা স্মৃদ্ধে যেরূপ, ক্রিয়ায় অপরি-
মিত মনের ভাব স্মৃদ্ধেও সেইরূপ।
পুণ্যের উপযোগী চিন্তভাবকে ধর্ম বলা
যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম
বলা যায়, এবং জ্ঞানিত উপযোগী ভাবকে
জ্ঞানিতা বলা যায়। এই তিনই ব্যঙ্গের অ-
পযোগ্য। কিন্তু যে চিন্তভাব হইতে প্রসঙ্গ
হয়, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আরার
কিছু ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি,
যে একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ
হয় না। Mistake বৈকল্পিক ব্যঙ্গের
যোগ্য, Follyও তজ্জপ। এই নাটকে
প্রাচীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরাসের

চিত্র যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা এই
অসঙ্গত কার্য বা ভাবের উপর লক্ষ্য
সত্ত্বাৎ নির্দোষ নহে। পরন্তু এই
মনের আদ্যোপান্ত পাঠ বাজ
দর্শন প্রীতিকর; ইহা সারস্বত
নহে, কেননা কল্যাণ বা পাপের
প্রায় তাহা অসঙ্গত বলা যায়।
পরিভ্রমণের বিষয় এই যে, এই
নের কোনই স্থলে সঙ্গত কথা ব্যবহার
হইয়াছে যে ভ্রমের দ্বারা পরস্পরের
কাজে উচ্চারণ করেন না। ইহা
অসঙ্গত বলা যায় বা না যায়
একই দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠ
বলা যাইতে পারে যায়, যে ইহা
কথ্য ভাবজনক কথা কিছুই না
এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাপ
করে বা দর্শকের মন কলুষিত হয়
পারে।

মূল্য প্রাপ্তি। কেবল্যরি ১৮৭৩।

কলিকাতা।		শ্রীমুক বাবু গঙ্গারাম প্রধান	
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	পাথুরেঘাটা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	হেমচন্দ্র মিত্র বড়বাজার	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	যোগেন্দ্রচন্দ্র দে পটলভাড়া	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	মহেন্দ্রচন্দ্র দাস কলিকাতা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	ইন্দ্রচন্দ্র দ্বিবালাগর নীকিয়া	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	জিউ	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	জুবনমোহন বিশ্বাস সিমলা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	রামলাল জীবান	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	বাগবাজার	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	প্রমথ কুমার পাণ্ডে পোতা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	Rev. J. E. Payne	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	বেহারি কুমার বসু	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	শ্যামপুত্র	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	হরিহর সেন কলিকাতা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	তারাকান্ত চন্দ্রবর্তী	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	জোড়ানীকো	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	উপেন্দ্র চন্দ্র বসাক	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	পাথুরেঘাটা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	বেদীমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	মেজোবাজার	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	রামতারণ চৌধুরী	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	নীলমণি দে কলিকাতা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	চন্দ্রভাড়া	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেহালা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	গোপালচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	হরিশোহন মুখোপাধ্যায় হেদেন	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	গোপালচন্দ্র ঘোষ হাইলেকট	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	হোটেল	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	বাহালদাস ঘোষ	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	নর্ম্যালস্কুল	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	রতন দাস পেট গরুঘাটা	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	দুর্গাদাস ঘোষ ভবানীপুর	৩
শ্রীমুক বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	অক্ষয় কুমার বসু বোয়ালবুড়	৩

১০ তারক সরকার চট্টোপাধ্যায়
 জুজ্ঞাথ চট্টোপাধ্যায়
 ভবানীপুর ...
 ত্রিগুণ নাথ চট্টোপাধ্যায়
 রমিহাবান ...
 শারদা প্রসন্ন গুহ চক্রবেড় ...
 কৃষ্ণকিশোর নেওগী
 কলিকাতা ...
 ভোলানাথ ধর প্রেত কলেজ ...
 নন্দকুমার বসু ...
 যোগেশচন্দ্র দে ...
 হেহারী কুমার বসু শ্যামপুর ...
 বেবেলুনাথ বসু ইটালি ...
 মফঃস্বল।
 বু মথুর মোহন ভট্টাচার্য
 কাপুর্ ...
 শশীভূষণ রায় লক্ষ্মীতলা ...
 দুর্গাচরণ মোহন কুমিলা ...
 প্রতাপ চন্দ্র চাকুরতা বদিশাল ...
 যোগেশচন্দ্র নারায়ণ রায় ঢাকা ...
 মোর মুন্দর পাণ্ডে বীরভূম ...
 গোপাল চন্দ্র অধিকারী
 মেমারি ...
 কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
 ত্রিহুত ...
 দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়
 গুনাও ...
 হরিশ্চন্দ্র বারাহাদী ...
 তারক চন্দ্র সেন মেরেলগঞ্জ ...
 ব্রজ প্রসাদ রাগজি
 রামপুরা ...
 শ্যামারাম মুনসি ...
 শ্যামাচরণ খাঁ এ ...
 ললিত চন্দ্র রায় ঢাকা ...
 কালীকুমার জর চট্টগ্রাম ...
 দীননাথ সিংহ বাকিপুর ...
 ইরকুম নাথ দে বালেশ্বর ...

১১ মুক বাবু হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী বীরভূম
 ১২ রতনন্দন লাল দানাপুর
 ১৩ আনন্দ চন্দ্র সেন বরিশাল
 ১৪ হরি প্রসন্ন রায় গোরহাড়া
 ১৫ ললিতমোহন চৌধুরী
 ১৬ গাভলীরা ...
 ১৭ হেমচন্দ্র সরকার করকড়া
 ১৮ তারক নাথ চক্রবর্তী তমলুক
 ১৯ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
 ২০ বরহমপুর ...
 ২১ ক্ষেত্রনাথ রায় এ ...
 ২২ শ্যামাচরণ বসু চৌতী ...
 ২৩ রামমোহন নাথাল
 ২৪ ময়লপুর ...
 ২৫ উপেন্দ্র চন্দ্র সন্তমরাইল
 ২৬ কালীকুমার পাল কাপানিয়া
 ২৭ ব্রজনাথ দাস মহারাজপুর
 ২৮ কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
 ২৯ কানপুর ...
 ৩০ হরিশ্চন্দ্র সরকার হাটড়া
 ৩১ মোহিন চন্দ্র চৌধুরী
 ৩২ তাকুট ...
 ৩৩ অভয়ানন্দ দাস বরিশাল
 ৩৪ কীর্তিচন্দ্র রায় আলাহাবাদ
 ৩৫ মথুরানাথ রায় সিদ্ধকাজী
 ৩৬ কেদার নাথ দাস বহমান
 ৩৭ কাশীরঞ্জন লাখড়া পুট্রি
 ৩৮ লক্ষী এজেন্ট লক্ষী
 ৩৯ ইন্দ্রনারায়ণ তেরারি
 ৪০ মুরাদপুর ...
 ৪১ যদুনাথ রায় ত্রিপুর
 ৪২ কালীপ্রসাদ মিত্র এ
 ৪৩ শ্যামারাম মজুমদার
 ৪৪ নগরোপাধি ...
 ৪৫ নরীন্দ্রনাথ পালিত আকমা
 ৪৬ বৈকুণ্ঠ নাথ দাং তাম্র
 ৪৭ রাজেন্দ্র চন্দ্র দে কাজল
 ৪৮ মিলিত চন্দ্র দে বাকিপুর

৪৯ মুক বাবু রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
 ৫০ হাওড়া ...
 ৫১ কালীকুমার বক্রবর্তী
 ৫২ চট্টগ্রাম ...
 ৫৩ অন্নদা প্রসাদ দাস
 ৫৪ ময়মনসিংহ ...
 ৫৫ ক্ষেত্রপাল সিংহ
 ৫৬ বড় জাগলি ...
 ৫৭ কৃষ্ণবৈহারি ঘোষ মোকামে ...
 ৫৮ মহিমচন্দ্র ঘটক দিনাজপুর ...
 ৫৯ জগদ্বাথ দাস মেকনিপুর ...
 ৬০ রাজকুমার রায় নরাইল ...
 ৬১ শ্যামাচরণ মিত্র আলাহাবাদ ...
 ৬২ আশুতোষ ঘোষ মেলিনীপুর ...
 C. W. Bolton Esq.
 Berhampore ...
 ৬৩ সুরেন্দ্র মোহন রায় ঢাকা ...
 ৬৪ দুর্গাপাতি মৈত্র সেরাজগঞ্জ ...
 ৬৫ বিননাথ সোম বারভূম ...
 ৬৬ হরিকুমার মজুমদার খাগড়া ...

৬৭ শ্রীধর কানকী কাঠ রায় নগরোপাধি
 ৬৮ কালী কিশোর সেন শ্রীহট্ট
 ৬৯ চন্দ্র নাথ মৈত্র নাটোর ...
 ৭০ মাধব চন্দ্র রায় বাগের হাট ...
 ৭১ চণ্ডীচরণ সিংহ জামালপুর ...
 ৭২ রত্ন প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
 ৭৩ কাশীনাথ ...
 ৭৪ আনন্দ প্রসন্ন সেন
 ৭৫ কামারপুর ...
 ৭৬ দ্বারকানাথ মাণ্ডাল
 ৭৭ পূজনী ...
 ৭৮ কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ৭৯ বারাসাত ...
 ৮০ নরীন্দ্র সেন চট্টগ্রাম
 ৮১ হেমচন্দ্র সরকার পানদা ...
 ৮২ গঙ্গানারায়ণ সিংহ বহু মান ...
 ৮৩ ব্রজপ্রসাদ চক্রবর্তী
 ৮৪ ময়মনসিংহ ...
 ৮৫ হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেরা ...
 ৮৬ শ্রীকুমার মলিক মৈহেরপুর ...